বারাহীনে আহমদীয়া

মহান আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে
উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি

৪র্থ খণ্ড

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

বারাহীনে আহমদীয়া

মহান আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার স্বপক্ষে
উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি

৪র্থ খণ্ড

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

বারাহীনে আহমদীয়া

৪র্থ খণ্ড

বারাহীনে
আহমদীয়া

মহান আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার স্বপক্ষে
উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি

৪র্থ খণ্ড

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

প্রকাশনায়
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

বারাহীনে আহমদীয়া
৪র্থ খণ্ড

গ্রন্থস্বত্ত্ব | ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ. কে.

প্রকাশনায় | আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

মূল | হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)

ভাষান্তর | মওলানা ফিরোজ আলম
ইনচার্জ, মরকযী বাংলা ডেস্ক, ইউ. কে.

প্রকাশকাল | মে ২০২৩

সংখ্যা | ১০০০ কপি

মুদ্রণে | বাড-ও-লিভস্
বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লি. ভবন,
৮৯-৮৯/১ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

Barahin-e-Ahmadiyya
Part-4

বারাহীনে আহমদীয়া
৪র্থ খণ্ড

by **Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian**
The Promised Messiah and Imam Mahdi [as]

Translated into Bengali by
Maulana Feroz Alam

First Published in Bangladesh in May 2023

Published by
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
© **Islam International Publications Ltd., UK**
ISBN 978-984-991-068-8

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

ভূমিকা

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগান্তকারী রচনা 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এখন চতুর্থ খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশের সৌভাগ্য লাভ করায় আমরা মহান আল্লাহ্র দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, আলহামদুলিল্লাহ্! আশা করছি অদূর ভবিষ্যতে অনূদিত পঞ্চম খণ্ড প্রকাশেও আমরা সক্ষম হব, ইনশাআল্লাহ্।

১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের মূল সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর পুস্তকটির পরবর্তী খণ্ডগুলো জরুরি ভিত্তিতে পাওয়ার জন্য মুসলিম ও অমুসলিমদের পক্ষ থেকে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর নিকট উপর্যুপরি অনুরোধ আসতে থাকে। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশনার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে পর্যাপ্ত তহবিল ছিল না। যাহোক, পরবর্তীতে তহবিলে যতটা সংকুলান হয় তা দিয়েই তিনি (আ.) 'বারাহীনে আহমদীয়া' পুস্তকের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের ব্যবস্থা নেন। তৃতীয় খণ্ডের মূল পুস্তক এবং টীকা, পাদটীকার বিষয়বস্তু চলমান রেখে পুস্তকটি সমাপ্ত করা হয় যা ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত পুস্তকটির চতুর্থ খণ্ডে গিয়ে পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করে।

'বারাহীনে আহমদীয়া' পুস্তকটির মূল উর্দু সংস্করণে প্রতিপাদ্য মূল বিষয়, টীকা ও পাদটীকা সমান্তরালে একই পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু পাঠকের সুবিধার্থে অনূদিত এই গ্রন্থে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর সদয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মূল পাঠ একটানা শেষ করার পর যথাক্রমে টীকা এবং পাদটীকা সন্নিবেশিত রয়েছে।

এই পুস্তকটি অনুবাদ করেছেন মোহতরম মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, ইনচার্জ, মরকযী বাংলা ডেস্ক, লন্ডন। আল্লাহ্ তা'লা তার এই ঐকান্তিক পরিশ্রম গ্রহণ করে তাকে পরজীবনে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চরণে ঠাঁই দিন। পুস্তকটির প্রচ্ছদ নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রাণপ্রিয় খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) নির্বাচিত করে সদয় অনুমোদন দান করেছেন।

এ পুস্তকটি বাংলা ভাষায় ছাপার ক্ষেত্রে যাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য তারা হলেন সর্বজনাব আহমদ তারেক মুবাশ্বের, মরহুম মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ, মুহাম্মদ আকরামুল ইসলাম, মোহাম্মদ সোলায়মান, মাহমুদ আহমদ সুমন, মোবারিজ আহমদ, অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কমান্ডার জাফর আহমদ, শেখ মোস্তাফিজুর রহমান এবং কিশওয়ার হাসীন দিশা সাহেবা ছাড়াও আরো অনেকে। এছাড়া যারাই এ কাজের সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িত খোদা তাদের পুরস্কৃত করুন। আশা করি বাংলা ভাষাভাষী মানুষ এ পুস্তকের মাধ্যমে সঠিক পথের দিশা পাবে এবং ইসলাম ও আমাদের প্রিয়নবী, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বিশ্ববাসীর কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হবে– আল্লাহ্ তা'লার কাছে এটিই আমাদের প্রত্যাশা।

আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
ন্যাশনাল আমীর — ঢাকা
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ — মে ২০২৩

অবতরণিকা

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.), খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী (আ.) ১৮৮৪ সালে বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকের ৪র্থ খণ্ড প্রকাশ করেন যা বারাহীনে আহমদীয়ার ৩য় খণ্ড প্রকাশের ২ বছর পর প্রকাশিত হয়। পূর্বের মতো এই খণ্ডেও তিনি (আ.) পবিত্র কুরআন ও হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে খোদার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, তার অকাট্য দলিলপ্রমাণ উপস্থাপন করেছেন এবং শক্তিশালী যুক্তিপ্রমাণের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতাও তুলে ধরেছেন।

তিনি (আ.) ইসলামের অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য উপস্থাপনের পাশাপাশি সমসাময়িক বিভিন্ন ধর্মের (তথা খ্রিষ্ট, ইহুদি, ব্রাহ্ম, হিন্দু) ধর্মের বিভিন্ন অযৌক্তিক মতবাদের ইসলামের সাথে তুলনামূলক আলোচনা সবার সামনে তুলে ধরেন। পবিত্র কুরআন যে ঐশী উৎস হতে উৎসারিত তা দেখাতে গিয়ে এই বইয়ের একটি বড়ো অংশে সূরা আল-ফাতিহার অবিস্মরণীয় সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য তিনি (আ.) উপস্থাপন করেন।

বারাহীনে আহমদীয়ার ৪র্থ খণ্ড লেখার সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অজস্র ধারায় মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এলহাম লাভ করতে থাকেন। এর মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আধ্যাত্মিক মর্যাদা প্রমাণের পাশাপাশি ভবিষ্যতে আধ্যাত্মিক একটি জামা'ত গঠনের ভিত্তিও রচিত হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সে সময়ে প্রাপ্ত কিছু এলহাম নিম্নরূপ–

মহানবী (সা.)-এর মহিমান্বিত মর্যাদা

প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বারংবার এই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন যে, মহানবী (সা.)-এর পরিপূর্ণ আনুগত্যই ঐশী কল্যাণ লাভের একমাত্র চাবিকাঠি। নিম্নোক্ত ইলহামপ্রাপ্তির পর তিনি (আ.)-এর ব্যাখ্যাও উপস্থাপন করেন,

صل علی محمد و اٰل محمد سید ولد ادم و خاتم النبیین۔

"মুহাম্মদ ও তাঁর বংশধরের প্রতি দরূদ প্রেরণ করো যিনি সমগ্র আদমসন্তানের

সর্দার ও খাতামান্নাবীঈন। এটি এ কথার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে যে, এসব মর্যাদা ও অনুগ্রহরাজি এবং ঐশী দান তাঁরই কল্যাণে আর তাঁকে ভালোবাসারই প্রতিদান। সুবহানআল্লাহ্! খোদার সন্নিধানে এই বিশ্বনেতার কত মহান মর্যাদা আর কত অসাধারণ নৈকট্য যে, তাঁর প্রেমিক খোদার প্রেমাস্পদে পরিণত হয় আর তাঁর সেবককে সারা পৃথিবীর সেবাধন্য হওয়ার মর্যাদা দেয়া হয়।

ہیچ محبوبے نماند ہمچو یار دلبرم   مہر و مہ را نیست قدرے در دیارِ دلبرم

কোনো প্রেমাস্পদ আমার প্রেমাস্পদের মতো হতে পারে না
আমার প্রেমাস্পদের দেশে চন্দ্র-সূর্যের কোনো মূল্য নেই

(এই পুস্তকের পৃ. ৩৬৪)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দায়িত্ব

এভাবেই মহানবী (সা.)-এর আগমনের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু একইভাবে পবিত্র কুরআনে ইসলামের পূর্ণ বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণীও রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা সুসংবাদ দিয়েছেন যে, সমগ্রবিশ্বে ইসলাম প্রচার তার মাধ্যমেই সংঘটিত হবে।

তিনি (আ.) লিখেছেন, মহাসম্মানিত খোদা যেহেতু বিশেষ উপকরণকে কাজে লাগানোর জন্য এই অধমকে বেছে নিয়েছেন আর এই অধমকে এমন যুগে সৃষ্টি করেছেন যা তবলীগের কাজের সম্পূর্ণতার জন্য অত্যন্ত উপযোগী ও সহায়ক, তাই তিনি বদান্যতা ও কৃপাবশত এই শুভসংবাদও দিয়েছেন, অর্থাৎ আদি থেকে এটিই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, উল্লিখিত আয়াত এবং وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ আয়াত আধ্যাত্মিকভাবে এই অধমের ক্ষেত্রে পূর্ণ হওয়ার ছিল। খোদা তা'লা সেই সকল যুক্তিপ্রমাণকে এবং সেই সকল কথাকে যা এই অধম বিরোধীদের উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করেছে নিজেই বিরোধীদের কাছে পৌঁছে দিবেন। পৃথিবীর সামনে তাদের ব্যর্থ, নির্বাক ও পরাস্ত হওয়া প্রকাশ করে, উল্লিখিত আয়াতের অর্থকে তিনিই বাস্তবায়ন করবেন فالحمد لله على ذٰلك [অতএব এজন্য সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার]। (এই পুস্তকের পৃ. ৩৬৩)

নতুন জামা'ত গঠন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তার মিশনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া

ইসলামকে পুরো বিশ্বে প্রচারের জন্য তার হাতে একটি নতুন জামা'ত গঠন করা হবে মর্মে আল্লাহ্ তা'লা এলহামের মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে জানান, যার মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে–

اردت ان استخلف فخلقت اٰدم انی جاعل فی الارض۔

অর্থাৎ আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করার ইচ্ছা করলাম, তাই আমি আদমকে সৃষ্টি করলাম। আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করতে যাচ্ছি– এটি পুরো বাক্যের সংক্ষিপ্ত রূপ, অর্থাৎ তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছি। এখানে খলীফা বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে যিনি হেদায়েত ও পথপ্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্ ও সৃষ্টির মাঝে যোজক হয়ে থাকেন। এই যোজক জাগতিক খেলাফত নয় যা রাজত্ব ও জাগতিক শাসনের ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয় আর তা কোরাইশ ছাড়া ইসলামী শরিয়তে অন্য কারো জন্য স্বীকৃতিও পেতে পারে না বরং এতে কেবল আধ্যাত্মিক মর্যাদা ও আধ্যাত্মিক প্রতিনিধিত্বেরই উল্লেখ করা হয়েছে। আদম বলতে সেই আদম বুঝায় না যিনি আদি পিতা ছিলেন বরং এমন ব্যক্তি বুঝায় যার মাধ্যমে সঠিক পথের দিশা প্রদান ও হেদায়েতের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জন্মের ভিত রচিত হবে তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের নিরিখে সত্যান্বেষীদের পিতা হবেন। এটি একটি সুমহান ভবিষ্যদ্বাণী যার মাধ্যমে এমন সময়ে আধ্যাত্মিক জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যখন এ জামা'তের নামগন্ধও ছিল না। (এই পুস্তকের পৃ. ৩৫৫)

বারাহীনে আহমদীয়ার ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং ভবিষদ্বাণীর পূর্ণতা

প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বলেছেন, বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থায় অসাধারণ উন্নতি এই কথার সাক্ষ্য বহন করে যে, এটাই সেই যুগ যেখানে ইসলাম পুরো বিশ্বে প্রচার করতে হবে। প্রযুক্তি এতটাই উন্নতি করেছে যে, মুহূর্তের মধ্যেই পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বার্তা পৌঁছে যায়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, যদিও ইসলাম ধর্ম স্বীয় সত্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে আদি হতেই জয়যুক্ত হয়ে চলেছে আর শুরু থেকে এর বিরোধীরা

লাঞ্ছিত হয়ে আসছে, কিন্তু বিভিন্ন দল ও জাতির সামনে এই বিজয়ের বহিঃপ্রকাশ এমন এক যুগের জন্য নির্ধারিত ছিল যা বিভিন্ন পথ খুলে যাওয়ার কারণে সারা পৃথিবীর দেশগুলোকে সংযুক্ত রাষ্ট্র বা একই জাতিসত্তায় পরিণত করবে। এছাড়া শিক্ষাও ধর্ম প্রচারের সকল উপকরণ পূর্ণ সুযোগসুবিধা সহকারে উপস্থাপন করবে যা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে ঐশী শিক্ষার জন্য হবে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও যথাযথ।

অতএব এটিই সেই যুগ, কেননা রাস্তা খুলে যাওয়া ও এক জাতির অন্য জাতি সম্পর্কে এবং এক দেশের অন্য দেশ সম্পর্কে অবহিত হওয়ায় এখন তবলীগের উপকরণ সহজলভ্য হয়েছে। এছাড়া ডাক, রেল, তার, জাহাজ, পত্রপত্রিকা ইত্যাদির কারণে ধর্মীয় পুস্তকপুস্তিকা ইত্যাদির প্রচারের জন্য অনেক সহজসাধ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। এককথায় নিঃসন্দেহে এখন সে সময় এসে গেছে যাতে সারা পৃথিবী একটি বিশ্বপল্লীতে রূপ নিয়েছে। এছাড়া বেশ কিছু ভাষার বিস্তার ও প্রচলনের কারণে বুঝার ও বোঝানোর অনেক মাধ্যম সামনে এসেছে। অপরিচিতি ও না জানার সমস্যা হতে অনেক ক্ষেত্রে মুক্তি লাভ হয়েছে। স্থায়ী মেলামেশা ও সকালসন্ধ্যা সহাবস্থানের কল্যাণে প্রকৃতিগতভাবে এক জাতির প্রতি অন্য জাতির যে ঘৃণা ও ভীতি ছিল তা অনেকটাই কমে গেছে। (এই পুস্তকের পৃ. ৩৬১-৩৬২)

তাই ইসলামী হেদায়েত ও ঐশী নিদর্শনের ডঙ্কা বাজানোর জন্য এযুগে এত শক্তি ও সামর্থ্য বা উচ্ছ্বাস দেখা যায় যার দৃষ্টান্ত কোনো যুগে খুঁজে পাওয়া যায় না। এক দেশের ঘটনাবলী অন্য দেশে পৌঁছানোর জন্য রেল, তার, পত্রপত্রিকা ইত্যাদি শতশত মাধ্যম সদা প্রস্তুত। অতএব নিঃসন্দেহে যৌক্তিক ও আধ্যাত্মিকভাবে ইসলাম ধর্মের সত্যতার প্রমাণাদি সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করা এমনই যুগের জন্য অপেক্ষমান ছিল আর উপকরণে সজ্জিত এ যুগই এ সম্মানিত অতিথির সেবার জন্য সকল প্রকার উপকরণ প্রস্তুত করে রেখেছে। (এই পুস্তকের পৃ. ৩৬২-৩৬৩)

বারাহীনে আহমদীয়া খোদার অস্তিত্বের প্রতি মানুষের ঈমানকে বৃদ্ধি করার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে এবং এর মাঝে নিহিত বার্তা ১০০ বছর পূর্বে যেভাবে গুরুত্ববহ ছিল সেভাবে আজও সেই গুরুত্বই বহন করে। এর কারণ

হলো বর্তমানে বিশ্বে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস ও মতবাদের মাঝে দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে। একদিকে মানুষের মাঝে নাস্তিক্যবাদের প্রবণতা আর অপরদিকে ধর্মীয় গোঁড়ামি বা ধর্মান্ধতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই দুইপ্রকার চরমপন্থা একই রোগের কারণে সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ তারা তাদের স্রষ্টাকে চিনতে পারছে না। কাজেই মানবজাতির জন্য স্রষ্টাকে চেনা অন্যান্য যে-কোনো সময়ের চাইতে বর্তমানে অনেক গুরুত্ব বহন করে। মানবজাতিকে তাদের স্রষ্টাকে জানতে হবে এবং তাঁর প্রাপ্য প্রদান করতে হবে। এর মাধ্যমেই মানবজাতি আসন্ন ভয়াবহ সংকট থেকে মুক্তি পেতে পারে।

সকল আহমদীর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অবিস্মরণীয় এই রচনা অবশ্যই পাঠ করা এবং এটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ আপনাদেরকে তাঁর নৈকট্য প্রদান করুন এবং ইসলামের প্রকৃত বাণীকে পুরো বিশ্বে সফলভাবে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করুন।

মির্যা মসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস
লন্ডন
জুলাই ২০১৬

লেখক পরিচিতি

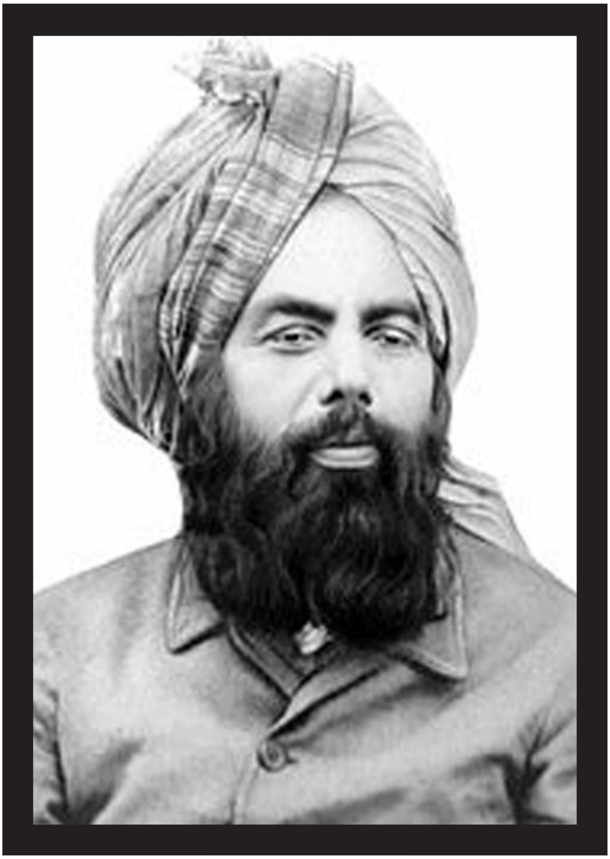

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ১৮৩৫ সনে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম্য অনুসন্ধান, দোয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবনযাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের বিরুদ্ধে নোংরা অপবাদ, আক্রমণ, মুসলমানদের চরম অবনতি, নিজ ধর্মবিশ্বাসে সন্দেহ, সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের যথার্থ

ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর বিশাল রচনাসমগ্র (প্রায় ৮৮টি পুস্তক), বক্তৃতা, আলোচনা, ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতিতে তিনি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে সাব্যস্ত করেন, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এরই বিশ্বাসসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমে মানবকুল তার পরম স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও ইসলাম ধর্মের বিধিবিধানই কেবল মানবজাতিকে নৈতিকতা, উন্নততর বুদ্ধিবৃত্তি এবং আধ্যাত্মিকতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে। তিনি ঘোষণা করেন– কুরআন, বাইবেল ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মহান আল্লাহ্ তাঁকে মসীহ্ ও মাহদী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সন হতে তিনি তাঁর হাতে সকলকে একত্র হওয়ার জন্য বয়আত গ্রহণ করা শুরু করেন যা এখন বিশ্বের ২২০টি দেশজুড়ে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। ১৯০৮ সনে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ (আ.)-এর মৃত্যুর পর হযরত মওলানা হেকীম নূরুদ্দীন (রা.) খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) প্রথম খলীফা নির্বাচিত হয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

১৯১৪ সনে খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা)-এর মৃত্যুর পর হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর প্রতিশ্রুত পুত্র হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) প্রায় ৫২ বছর খলীফাতুল মসীহ্ হিসেবে তাঁর কার্যক্রম চালিয়ে যান। ১৯৬৫ সনে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বড়ো পুত্র ও ইমাম মাহ্দীর প্রতিশ্রুত পৌত্র হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। প্রায় ১৭ বছর জামা'তের অভূতপূর্ব সেবা করার পর ১৯৮২ সনে তাঁর তিরোধান হয়। এরপর তাঁর ছোটো ভাই হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। ১৯ এপ্রিল ২০০৩ সনে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) জামা'তকে বিশ্বময় ব্যাপক পরিচিতি ও বর্তমানের শক্তিশালী অবস্থায় আনার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করেন। হযরত মির্যা মসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) নিখিল বিশ্ব আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা, আধ্যাত্মিক পিতা ও প্রধান হিসেবে বর্তমানে নেতৃত্ব দান করে চলেছেন এবং তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর আধ্যাত্মিক আশিস লাভকারী এক সৌভাগ্যবান প্রপৌত্র।

সূচিপত্র

৪র্থ খণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা
১) বারাহীনে আহমদীয়া ৪র্থ খণ্ডের বিষয়সূচি (উর্দু ১ম সংস্করণ)	৩
২) মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থা এবং ইংরেজ সরকার	৪
[তৃতীয় খণ্ডের ধারাবাহিকতায়]	
৩) চতুর্থ প্রারম্ভিক বিষয়	২১
৪) পঞ্চম প্রারম্ভিক বিষয়	২৯
৫) ষষ্ঠ প্রারম্ভিক বিষয়	৩৩
৬) সপ্তম প্রারম্ভিক বিষয়	৩৩
৭) অষ্টম প্রারম্ভিক বিষয়	৪৪
৮) প্রথম অধ্যায় (কুরআন শরীফের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব-সংক্রান্ত বাহ্য বা বহিস্থ প্রমাণাদির বিবরণ প্রসঙ্গে)	৪৬
৯) টীকা নম্বর এগার (১১) [তৃতীয় খণ্ডের ধারাবাহিকতায়]	৬৭
১০) পাদটীকা নম্বর দুই (২) [তৃতীয় খণ্ডের ধারাবাহিকতায়]	২৬১
১১) পাদটীকা নম্বর তিন (৩)	২৬৯
১২) পাদটীকা নম্বর চার (৪)	৪০৪
১৩) আমরা এবং আমাদের গ্রন্থ	৪১৬

ٹائیٹل بار اوّل

جلد چہارم

جاء الحق وزھق الباطل ان الباطل کان زھوقا

براھین احمدیہ

ملقب بہ

البراھین الاحمدیہ علی حقیت کتاب اللہ القرآن والنبوۃ المحمدیہ

جسکو فخر اہل اسلام پنجاب جناب میرزا غلام احمد صاحب رئیس اعظم قادیان ضلع گورداسپور پنجاب دام فیوضہ نے کمال تحقیق اور تدقیق سے تالیف کرکے منکرین اسلام پر حجت اسلام پوری کرنیکے لئے بوعدہ انعام دس ہزار روپیہ شایع کیا۔

مطبع ریاض ہند امرتسر میں باہتمام کمترین محمد حسین مرادآبادی ۱۸۸۴ء میں طبع ہوئی

প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদের অনুবাদ

৪র্থ খণ্ড

جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

এ পৃথিবী ও সমগ্র বিশ্বজগতের
পথপ্রদর্শকের মহান কৃপায় আর পথহারাদের
সঠিক পথপ্রদর্শনকারী খোদার সর্বজনীন করুণায়,
শানিত যুক্তিতে সমৃদ্ধ অখণ্ডনীয় এ গ্রন্থের নাম রাখা হয়েছে–

এটি মুক্তির পথ-দিশারী। এ গ্রন্থের প্রকাশকাল ১২৯৭ হিজরী। গাণিতিক
মানের নিরিখে যা চমৎকারভাবে 'গ্বাইয়্যুর' শব্দের পূর্ণ সংখ্যামান নির্দেশক।

'বারাহীনে আহমদীয়া'

সুবহান আল্লাহ্! এটি কী অনুপম এক গ্রন্থ যা খুবই অল্প কালের
মধ্যে মানুষকে সত্য ধর্মের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে।

এর পুরো নাম হলো:

**'আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা
হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহিল কুরআনে
ওয়ান্ নবুয়্যাতিল মুহাম্মদীয়াহ্'**।

চূড়ান্ত গবেষণা ও সূক্ষ্ম বিচারবিশ্লেষণের ওপর
ভিত্তি করে এটি রচনা করেছেন মুসলমানদের
গর্ব, পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত
কাদিয়ান নিবাসী সম্মানিত রইস
জনাব **মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব**
(খোদা তাঁর সম্মান স্থায়ী করুন)। অস্বীকারকারী
বিরোধীদের সামনে ইসলামের সত্যতা প্রতিপন্ন
করে ১০ হাজার রুপি (পুরস্কার) প্রদানের
প্রতিশ্রুতির সাথে তিনি এটি প্রকাশ করেছেন।

সফীরে হিন্দ ছাপাখানা
অমৃতসর, পাঞ্জাব
১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দ

বারাহীনে আহমদীয়া ৪র্থ খণ্ডের বিষয়সূচি*

১. ঐশীবাণীর প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ উপস্থাপনঃ একথার প্রমাণস্বরূপ যে, মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভের জন্য প্রকৃত ও প্রকৃষ্ট ঈমান এবং তত্ত্বজ্ঞান যা এ পৃথিবীতেই অর্জন করা বাঞ্ছনীয় তা ঐশী বাণী বা এলহাম ছাড়া অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে ব্রাহ্ম পণ্ডিত, দার্শনিক ও নেচারীদের (অর্থাৎ প্রকৃতিপূজারি) উদ্ভাবিত বহু ধ্যানধারণার খণ্ডনঃ পৃ. ২৯৭ থেকে ৫৬২ এর ১১ নং টীকা ও পুস্তকের মূল পাঠ্যাংশে।

২. কুরআন শরীফের একটি সূরা অর্থাৎ সূরা ফাতিহার অনন্য নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বিশেষত্বের বিবরণ পৃ. ৩৩৯ থেকে পৃ. ৫২৭ পর্যন্ত।

৩. একত্ববাদ সংক্রান্ত কুরআন শরীফের আরো কিছু আয়াতের বিবরণঃ পৃ. ৩৪৭ থেকে ৫৬২ এর টীকা ১১-তে বর্ণিত।

৪. একত্ববাদের শিক্ষা এবং বাগ্মিতা ও ভাষার অলংকারের দিক থেকে বেদ যে অন্তঃসারশূন্য– এর বর্ণনা। এছাড়া বেদের আরো কিছু শ্লোকের উল্লেখ পৃ. ৩৯৭ থেকে ৪৬৮ এর টীকা-পাদটীকা ৩-এ।

৫. বেদে উল্লিখিত মিথ্যা-বিশ্বাস থেকে উদ্ধৃতি, পৃ. ৩৯২ থেকে ৪৩৩ এর টীকা ১১-তে।

৬. পণ্ডিত দিয়ানন্দ এবং তার নির্বাক হওয়ার উল্লেখ এবং সে সকল প্রশ্নেরও উল্লেখ যাতে তিনি নিরুত্তর নির্বাক ছিলেন; আর তার মৃত্যু সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী যা পূর্ণ হওয়ার আগেই কয়েকজন আর্যকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিলঃ পৃ. ৫৩১ থেকে ৫৩৬ এর টীকা ১১’এ।

৭. ইঞ্জিল ও কুরআন শরীফ-প্রদত্ত শিক্ষার বিশ্লেষণাত্মক তুলনা পৃ. ৩৩২ থেকে ৩৩৬ পর্যন্ত।

৮. এমন সব ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ যা কিছুসংখ্যক আর্যকেও অবহিত করা হয়েছে– পৃ. ৪৬৮-৫১৪-এর টীকা, পাদটীকা ৩’এ।

৯. পরবর্তী যুগের সাথে সম্পর্কযুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর বিবরণ– পৃ. ৫১৪-৫৬২ টীকা, পাদটীকা নং ৩’এ।

১০. হযরত ঈসার কোনো নিদর্শন প্রকাশিত হওয়া কিংবা তাঁর কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করার প্রমাণ নেই– পৃ. ৪৩৪-৪৬৯-এর মূল অংশে।

১১. প্রকৃত মুক্তি কাকে বলে আর কীভাবে তা লাভ হতে পারে? পৃ. ২৯৩-৩০৬, টীকা-পাদটীকা ২’এ।

টীকাঃ এই বিষয়সূচি প্রথম সংস্করণে রয়েছে আর এতে উল্লিখিত পৃষ্ঠা সংখ্যা বর্তমান সংস্করণের টীকায় নির্দেশিত আছে।

মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থা এবং ইংরেজ সরকার

ترسم کہ بہ کعبہ چوں رویؔ اَے اَعرابی   کیں رہ کہ تو مے روی بترکستان است

হে বেদুঈন! তোমার কা'বায় পৌঁছা সম্পর্কে আমার আশঙ্কা রয়ে গেছে,
কেননা যে পথ তুমি ধরেছ তা (কা'বায় নয়) তুর্কিস্তানে যায়।

বর্তমানে আমাদের ধর্মীয়-ভাই অর্থাৎ মুসলমানরা ধর্মীয় দায়িত্ব পালন, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন ও জাতিগত সহমর্মিতার দাবি পূরণে এমন ঔদাসীন্য, ভ্রুক্ষেপহীনতা ও আলস্য প্রদর্শন করছে যে, কোন জাতির মাঝে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। সত্য বলতে কী! জাতিগত ও ধর্মীয় সহমর্মিতার বৈশিষ্ট্য এদের মাঝ থেকে হারিয়েই গেছে। অভ্যন্তরীণ নৈরাজ্য, শত্রুতা ও বিভেদ তাদেরকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করেছে। অধিকন্তু অযথা কর্মকাণ্ডে বাড়াবাড়ি ও করণীয় কাজে শৈথিল্য তাদেরকে মূল লক্ষ্য হতে যোজন-যোজন দূরে ঠেলে দিয়েছে। তাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদে স্বার্থান্ধতার চিত্র যেমন প্রকাশ পাচ্ছে, যার ফলে কেবল এই আশঙ্কাই দেখা দেয় নি যে, তাদের অমূলক শত্রুতা প্রতিদিন প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং কিছু লোক অপর কতককে পোকার মতো ভক্ষণ করবে আর নিজ হাতে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনবে, বরং এই নিশ্চিত ধারণাও করা হয় যে, যদি তাদের হাল-অবস্থা এমনই থাকে, তাহলে একদিন তাদের হাতে ইসলামের ভয়ানক ক্ষতি হবে। তাদের কারণে সমালোচনা ও নৈরাজ্যের অনেক সুযোগ বহিরাগত নৈরাজ্যবাদী শত্রুর হস্তগত হবে। অধুনা কিছু মৌলভীর জন্য পরিতাপের আরেকটি বিষয় হলো– নিজ ভাইদের বিরুদ্ধে তারা তড়িঘড়ি আপত্তি করে বসে এবং নিশ্চিত ও সঠিক জ্ঞান অর্জনের পূর্বেই নিজ ভাইয়ের ওপর আক্রমণে উদ্যত হয়। আর কেনই বা তা হবে না? স্বার্থপরতার মোহের কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে মুসলমানই তাদের চোখে পড়ে, তারা চায় তাকে যেন যেকোনভাবেই নিশ্চিহ্ন করে দেয়া যায়। সে যেন পরাজয় ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সম্মুখীন হয়– আর আমাদের বিজয় ও শ্রেষ্ঠত্ব যেন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারণেই কথায় কথায় তাদেরকে বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডায় লিপ্ত হতে হয়। খোদা তাদের মাঝ থেকে বিনয়, নম্রতা, সুধারণা পোষণ এবং ভ্রাতৃত্বসুলভ ভালোবাসা সম্পূর্ণভাবে উঠিয়ে নিয়েছেন। انا للّٰہ وانا الیہ راجعون

মাত্র কিছুদিন পূর্বের কথা, বারাহীনে আহমদীয়ার ৩য় খণ্ডে, ইংরেজ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশমূলক যে বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সে সম্পর্কে মুসলমানদের কেউ কেউ আপত্তি উত্থাপন করেছে। কেউ কেউ চিঠিও পাঠিয়েছে আর ইংরেজ শাসনকে অন্য শাসনকালের ওপর কেন প্রাধান্য দিলাম, এ অজুহাতে কয়েক ব্যক্তি পীড়াদায়ক কঠোর কথাবার্তা লিখেছে। কিন্তু জানাকথা যে, যে সরকার স্বীয় ভব্যতা ও সুশাসনের সুবাদে শ্রেষ্ঠত্ব রাখে, তাদের সেই গুণকে কীভাবে গোপন করতে পারি? গুণ বা বৈশিষ্ট্য, তা যে সরকারের মাঝেই থাকুক না কেন, স্বীয় অবস্থা-অবস্থানের নিরিখে গুণই বটে! হিকমত বা প্রজ্ঞা মু'মিনের হারানো সম্পদ। আর এটিও বুঝতে হবে যে, মুসলমান জাতি যে রাজত্বের ছত্রচ্ছায়ায় বসবাস করে তাদের অনুগ্রহে সিক্ত হবে, যার নিরাপত্তার ছায়ায় শান্তি ও প্রাচুর্যের মাঝে জীবিকার নির্ধারিত উপকরণ উপভোগ করবে, এর নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কাররাজির কল্যাণে লালিত-পালিত হবে, আবার বিচ্ছুর ন্যায় তাদেরকেই হুল ফুটাবে আর এর সদ্ব্যবহার ও স্নেহ-মায়ার বিন্দু পরিমাণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না– ইসলামের নীতি মোটেই এটি নয়। বরং আমাদেরকে আমাদের মহা সম্মানিত ও দানশীল খোদা স্বীয় প্রিয় রসূলের মাধ্যমে এ শিক্ষাই দিয়েছেন যে, আমরা যেন পুণ্যের প্রতিদান প্রভূত পুণ্যের মাধ্যমে দিই আর পুরস্কারদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি; যখনই সুযোগ আসে এমন সরকারের প্রতি পরম আন্তরিক নিষ্ঠায় সিক্ত সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করি আর সানন্দে-সাগ্রহে ও ন্যায়সঙ্গতভাবে আনুগত্য প্রদর্শন করাকে যেন আবশ্যক জ্ঞান করি। সুতরাং ৩য় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত নির্দিষ্ট অধ্যায়ে এ অধম ইংরেজ সরকারের প্রতি যতটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে, তা কেবল ব্যক্তিগত ধারণার বশবর্তী হয়ে করে নি বরং কুরআন শরীফ ও হাদীসের সেসব জোরালো তাগিদ আমাকে এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বাধ্য করেছে যা অধমের দৃষ্টিতে রয়েছে। সুতরাং এটি আমাদের কিছু নির্বোধ ভাইয়ের অতি বাড়াবাড়ি যেটাকে নিজেদের অদূরদর্শিতা ও মজ্জাগত কার্পণ্যের কারণে তারা ইসলামের অংশ ভেবে বসেছে।

اے جفاکیش نہ عذرست طریق عشاق   ہرزہ بدنام کنی چند نکو نامے را

হে নিষ্ঠুর ব্যক্তি! অজুহাত দেখানো প্রেমিকদের রীতি নয়,
তুমি অনর্থক কতক পুণ্যবান লোকের বদনাম করছ।

যেমনটি আমরা এখনই আমাদের কিছু ভাইয়ের বাড়াবাড়ির কথা উল্লেখ করেছি, একইভাবে তাদের কেউ কেউ (গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে) শৈথিল্যের ব্যাধিতেও আক্রান্ত। ধর্ম নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই বরং তাদের চিন্তাধারার পুরোটাই জাগতিকতার জন্য নিবেদিত; কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো তাদের পার্থিব স্বার্থও অর্জিত হয় নি। ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আর পার্থিব-স্বার্থ অর্জিত হবেই বা কীভাবে? ধর্মতো তাদের হাতছাড়া হয়েই গেছে; জাগতিক আয়-উপার্জনের জন্য যে যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন, সেটিও তারা অর্জন করে নি। 'শেখ চিল্লি'র ন্যায় হৃদয়ে কেবল জাগতিক চিন্তাধারাই ছেয়ে আছে। যে পন্থা অনুসরণে জাগতিক স্বার্থসিদ্ধি হয়, সে পন্থা তারা অনুসরণ করে নি এবং এরা নিজেদের মাঝে সে অনুপাতে পরিবর্তনও আনে নি। সুতরাং এখন তাদের অবস্থা হলো, তারা একূল-ওকূল দুকূলই হারালো। ইংরেজ, যারা তাদেরকে অর্ধবন্য বলে, এটিও তাদের মহানুভবতা বলে ধরে নিতে পারেন, কেননা বেশিরভাগ মুসলমানকে বন্যদের চেয়েও অধম মনে হয়। তাদের মাঝে বিবেক-বুদ্ধি, সংকল্প, আত্মসম্মানবোধ এবং ভালোবাসার লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই। তাদের প্রতিবেশী আর্যদের দৃষ্টিতে তুচ্ছ প্রাণী গাভীর যে কদর ও মর্যাদা রয়েছে, তাদের হৃদয়ে স্বজাতি, আপন ভাই ও স্বীয় ধর্মসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর প্রতি সত্যিকার অর্থে ততটুকু সম্মানবোধও নেই। কেননা আমরা নিজ চোখে অহরহ দেখছি যে, গাভীর সম্মান অক্ষুণ্ন রাখার জন্য দৃঢ়-সংকল্পবদ্ধ আর্যজাতি যে চেষ্টা করে লক্ষ লক্ষ রুপি জমা করে, মুসলমানরা আল্লাহ্ ও রসূলের সম্মান প্রকাশার্থে এর সহস্র ভাগের একভাগও জমা করতে পারে না। বরং যেখানেই ধর্মীয় সাহায্যের কথা আসে, সেখানেই নারীদের ন্যায় মুখ লুকায়। আর্যরা যে দৃঢ়সংকল্প জাতি, চিন্তা করলে তা আরো স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। কেননা গাভীর প্রাণরক্ষার চেষ্টা করা তাদের ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যিকার অর্থে তুচ্ছ একটি কাজ। আর এটি যে মহৎ কাজ, তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে এর কোনো প্রমাণও পাওয়া যায় না, বরং তাদের গবেষক পণ্ডিতরা খুব ভালোভাবে জানেন যে, কোনো বেদেই গাভীর মাংস হারাম মর্মে নির্দেশ দেখা যায় না। বরং ঋগ্বেদের প্রথম অংশ হতেই প্রমাণিত হয় যে, বেদের যুগে গাভীর মাংস সচরাচর বাজারে বিক্রি হতো আর আর্যরা সাগ্রহে তা ভক্ষণ করতো। সম্প্রতি একজন বড় গবেষক অর্থাৎ মোম্বাইয়ের সাবেক গভর্নর জনাব মাউন্ট স্টুয়ার্ট

আলফান্‌স্টন সাহেব বাহাদুর হিন্দুদের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীর আলোকে আর্য জাতির ঘটনাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন যার নাম হলো ভারতের ইতিহাস। এর ৮৯তম পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ভদ্রলোক মনুর সংকলন সম্পর্কে লেখেন যে, এতে বড় বড় অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদেরকে ষাঁড়ের মাংস খেতে জোর তাগাদা দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ না খেলে পাপী বলে গণ্য হবে। একইভাবে সম্প্রতি কোলকাতায় এক পণ্ডিত আরো একটি পুস্তক ছাপিয়েছেন যাতে লেখা আছে যে, বেদের যুগে গাভীর মাংস খাওয়া হিন্দুদের জন্য অবশ্য-পালনীয় ধর্মীয়-দায়িত্বাবলীর অন্তর্গত বিষয় ছিল, আর বড় বড় ও উৎকৃষ্ট টুকরোগুলো পেতো ব্রাহ্মণরাই। অনুরূপভাবে, মহাভারতের ত্রয়োদশ পর্বে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, গাভীর মাংস শুধু বৈধ ও পবিত্রই নয়, বরং পিতৃপুরুষের জন্য ব্রাহ্মণদেরকে তা ভক্ষণ করানো অন্য সকল প্রাণীর মাংস খাওয়ানোর চেয়ে উত্তম এবং এটি খেলে পূর্বপুরুষগণ ১০ মাস পর্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকে। এককথায়, বেদের সকল ঋষি তথা মনুজী ও বিয়াসজী গাভীর মাংস ব্যবহার করা অবশ্য-পালনীয় ধর্মীয়-দায়িত্বাবলীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং পুণ্যের কারণ জ্ঞান করতেন। পণ্ডিত দয়ানন্দ, যিনি ১৮৮৩ সনের ৩০ অক্টোবর তারিখে ইন্তেকাল করেছেন, তাকে যদি উল্লিখিত সর্বসম্মত মতের বাইরে রাখি, তাহলে কারো কারো দৃষ্টিতে আমাদের বিবৃতি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই একথা দৃষ্টিগোচর রাখা চাই যে, পণ্ডিত সাহেব তার কোনো গ্রন্থেই গাভী নিষিদ্ধ বা অপবিত্র হওয়া মর্মে কিছু লিপিবদ্ধ করেন নি আর না বেদের ভিত্তিতে এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বা এর জবাই নিষিদ্ধ হওয়া প্রমাণ করেছেন; বরং দুধ ও ঘি সস্তা হওয়ার কারণে এ সংক্রান্ত প্রথার প্রচলন হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। কোনো কোনো উপলক্ষ্যে গাভীহত্যা যুক্তিযুক্ত বলেও মনে করতেন, যেমনটি কিনা তার 'সতিয়ারথ প্রকাশ' ও বেদের তফসীর থেকে স্পষ্ট হয়। আমাদের এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য আদৌ এটি উল্লেখ করা নয় যে, আর্যরা কেন তাদের পবিত্র বেদ, তাদের সম্মানিত ঋষি বিয়াসজী আর মনুজীর মহান নির্দেশাবলী ও নিজেদের গবেষক এবং বিজ্ঞ-পণ্ডিতদের কথার বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, বরং এখানে একমাত্র উদ্দেশ্য হলো এটি স্পষ্ট করা যে, আর্যরা কতইনা দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ, দৃঢ়চিত্ত ও একতাবদ্ধ জাতি যে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যে কথার কোনো ভিত্তি নেই, এমন একটি তুচ্ছ বিষয়েও তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় আর স্বল্পতম সময়ের ভিতর এর জন্য সহস্র সহস্র রুপি

চাঁদা জমা হয়ে যায়। সুতরাং যে জাতির মাঝে অর্থহীন বিষয়ে এ মানের ঐক্য ও অবেগ-উচ্ছ্বাস বিদ্যমান, বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সে জাতির দৃঢ়তা ও আন্তরিক প্রেরণা কেমন হতে পারে- একজন মানুষ তা সহজেই অনুমান করতে পারে। সুতরাং হীনবল মুসলমানদের মরে যাওয়াই শ্রেয়! খোদা ও রসূলের ভালোবাসাই যদি না থাকে, তাহলে ইসলামের অনুসারী হওয়ার দাবি কেন করেন? একদিকে নোংরা কার্যকলাপ ও অবাধ্য প্রবৃত্তির দাসত্ব আর অলীক সম্মানের আশায় বিপুল পরিমাণ সম্পদ নষ্ট করা, অন্যদিকে খোদা ও রসূলের ভালোবাসা এবং সহমর্মিতার বশবর্তী হয়ে একটি শস্যদানা পর্যন্তও ব্যয় না করা– এটিই কি ইসলাম? না, এটি মোটেই ইসলাম নয়। এটি একটি অভ্যন্তরীণ কুষ্ঠ। এই পশ্চাদপদতা বা অধঃপতনেরই শিকার হচ্ছে মুসলমানরা। অধিকাংশ ধনাঢ্য মুসলমান ধর্মকে এমন একটি বিষয় ভেবে বসে আছে, যার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন (তাদের মতে) কেবল দরিদ্রদের জন্যই আবশ্যক, আর সম্পদশালীরা যেন এর উর্ধ্বে, যাদের জন্য এই বোঝায় হাত লাগানোও নিষিদ্ধ! এই গ্রন্থ ছাপতে গিয়ে এ অধমের এ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা লাভের যথেষ্ট সুযোগ হয়েছে। অথচ একথা খুব ভালোভাবে প্রচার করা হয়েছিল যে, পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির কারণে এর প্রকৃত মূল্য ১০০ রুপি রাখা যথাযথ মনে হয়। একইসাথে দরিদ্রদের যেহেতু তা কেবল ১০ রুপি মূল্যে দেয়া হচ্ছে আর এর মূল্য-ঘাটতি পুষিয়ে নেয়াও আবশ্যক, তাই সামর্থ্যবান ব্যক্তিবর্গের তা বিবেচনায় রাখা যথার্থ হবে! দুঃখের বিষয় হলো, সাত-আট ব্যক্তি ছাড়া সকলেই দরিদ্রদের দলে যোগ দিয়েছে। আমাদের ক্ষতিপূরণ খুব ভালোই হয়েছে। যখনই কোন মানি-অর্ডার সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছি যে, বইয়ের মূল্য বাবদ এই ৫ রুপি কার পক্ষ থেকে এসেছে বা বইয়ের মূল্য বাবদ এই ১০ রুপি কে পাঠিয়েছেন– এমন ক্ষেত্রে প্রায় সময় এটিই উদঘাটিত হয়েছে যে, অমুক নবাব সাহেব বা অমুক রইসে আযম সাহেব পাঠিয়েছেন। অবশ্য হায়দ্রাবাদের নবাব ইকবালুদ্দৌলা এবং নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বুলন্দ জেলা শহর থেকে আরেক রইস বইয়ের একটি অনুলিপির মূল্য বাবদ এক শত রুপি করে পাঠিয়েছেন। আফযাল খান নামের এক কর্মকর্তা এক শত দশ রুপি এবং মালিরকোটলার নবাব সাহেব তিন খণ্ডের জন্য একশত রুপি পাঠিয়েছেন। লুধিয়ানার সর্বমহান হিন্দু রইস সর্দার আতর সিং সাহেব মহানুভবতা ও উদারতার স্বাক্ষর রেখে সাহায্যস্বরূপ ২৫ রুপি পাঠিয়েছেন।

সর্দার সাহেব হিন্দু হয়ে ইসলামের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন। যাদের বড় বড় নাম ও উপাধি দেয়া হয় আর যারা কারুনের ন্যায় অঢেল সম্পদ হস্তগত করে রেখেছে, এমন কৃপণ ও বখিল মুসলমানদের উচিত এখানে সর্দার সাহেবের মোকাবিলায় নিজেদের অবস্থান খতিয়ে দেখা। মুসলমানদের ভেতর এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার, যারা স্বজাতির প্রতি সহমর্মিতা রাখে। অথচ আর্যদের মাঝে এমন মানুষও রয়েছে, যারা ভিন্ন জাতির প্রতিও সহানুভূতি প্রদর্শন করে। সুতরাং উত্তর দাও, এ জাতির উন্নতি কী করে সম্ভব?

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوۡا مَا بِاَنۡفُسِهِمۡ

(সূরা আর রা'দ: ১২)

মুসলমান ব্যতীত পৃথিবীর সকল ধর্মের ধনাঢ্যদের মাঝে ধর্মীয় সহানুভূতি দেখা যায়। ধনী মুসলমানদের মাঝে এমন মানুষ খুব কমই পাওয়া যাবে, স্বীয় সত্য ও পবিত্র ধর্মের জন্য যাদের তিল পরিমাণ চিন্তাও আছে। মাত্র স্বল্পকাল পূর্বে এ অধম একজন পবিত্রচেতা মুত্তাকী ও জ্ঞানগরিমায় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী আর কুরআন হাদীসের বিদগ্ধ আলেম নবাবের কাছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রেক্ষাপটে সাহায্যের জন্য লিখেছে। প্রত্যুত্তরে নবাব সাহেব যদি এ কথা লিখতেন যে, আমাদের মতে গ্রন্থটি এত উন্নত মানের নয় যার জন্য সাহায্য করা যায়! তাহলে তাতে আক্ষেপের কারণ থাকতো না। কিন্তু প্রথমে তিনি লিখেছেন যে ১৫-২০টি গ্রন্থ অবশ্যই ক্রয় করবো। পুনরায় স্মরণ করালে উত্তর এলো যে, ধর্মীয় বিতর্ক-সম্বলিত গ্রন্থাবলী ক্রয় বা সে উদ্দেশ্যে কোন সাহায্য প্রদান করা ইংরেজ সরকারের ইচ্ছার পরিপন্থি কাজ, তাই এই রাজ্যের কাছে ক্রয়ের কোনো আশা রাখবেন না। সত্যিকার অর্থে আমরাও নবাব সাহেবকে আশা-ভরসার স্থল মনে করি না, বরং প্রকৃত আশা-ভরসার স্থল হলেন মহাসম্মানিত খোদা, আর তিনিই যথেষ্ট। (ইংরেজ সরকারকে খোদা নবাবের প্রতি সন্তুষ্ট রাখুন)। কিন্তু আমরা এ সশ্রদ্ধ নিবেদন করবো যে, এমন মনোভাব ভদ্রতার আবরণে সরকারের প্রতি বিরূপতা বৈ কিছু নয়। কোনো জাতিকে তাদের ধর্মের সত্যতা প্রমাণে বাধা দেবে বা ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে সাহায্য-সহযোগিতা করা হতে বারণ করবে– ইংরেজ সরকারের নীতি এটি নয়। অবশ্য কোনো রচনা যদি শান্তিশৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটায় বা রাজত্ব পরিচালনায় বাদ সাধে তাহলে সরকার তাতে হস্তক্ষেপ করবে। নতুবা স্ব-স্ব

ধর্মের উন্নতিকল্পে বৈধ উপকরণ কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে সকল জাতির জন্যই অনুমতি রয়েছে। এছাড়া যে জাতির ধর্ম প্রকৃতপক্ষে সত্য, উৎকর্ষতায় সমৃদ্ধ আর যার সত্যতা দৃঢ় প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, সে জাতি সুস্থ মনোবৃত্তি, বিনয় ও নম্রতার সাথে সৃষ্টির কল্যাণ সাধনের জন্য স্বীয় সত্য-সঠিক যুক্তিমালা প্রকাশ করলে ন্যায়পরায়ণ সরকার কেন রাগান্বিত হবে? আমাদের মুসলমান ধনাঢ্যরা এ সম্পর্কে অতি স্বল্পই অবহিত যে, সরকারের ন্যায়নিষ্ঠ ও প্রজ্ঞার দাবি হলো আন্তরিক সদিচ্ছা ও স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে স্বাধিকার বহাল রাখা। এমন যোগ্য ও সুস্থ বিবেকসম্পন্ন অনেক ইংরেজকে আমরা স্বচক্ষে দেখেছি, যারা চাটুকারিতা ও কপটতাপূর্ণ আচার-আচরণ পছন্দ করেন না এবং তাকওয়া, খোদাভীতি, সততা ও অকপট আচরণকে পছন্দ করেন। সকল কল্যাণ সত্যিকার অর্থে সততা ও খোদাভীতির মাঝেই নিহিত, আর আপন-পর সবার ওপর কোনো না কোনো সময় এর প্রতিফলন ঘটেই থাকে। খোদা যার প্রতি সন্তুষ্ট, তার প্রতি অবশেষে তাঁর সৃষ্টিও সন্তুষ্ট হয়ে যায়। এককথায়, সদিচ্ছা ও সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ধর্মীয় ও জাতিগত সহমর্মিতার কাজে নিয়োজিত হওয়া আর ধর্মীয় ও জাগতিক বিষয়ে সত্যিকার ও আন্তরিক আবেগ-উচ্ছ্বাস নিয়ে সৃষ্টির হিতৈষণা এমন এক প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য যে, কোনো রাজত্বে এমন মানুষের বসবাস নিঃসন্দেহে সেই সরকারের জন্য গর্বের বিষয়। আকাশ থেকে কল্যাণরাজি সে দেশে বর্ষিত হয়, যে দেশে এমন মানুষ বিদ্যমান। কিন্তু চরম দুর্ভাগা সেই সরকার, যার অধীনস্থ সকলেই মুনাফিক, যারা ঘরে এক কথা বলে আর সরকারের সামনে ভিন্ন কথা বলে। তাই নিশ্চিতভাবে বোঝা উচিত যে, মানুষের নিষ্ঠা ও সততায় ক্রমাগত উন্নতি করে যাওয়া আর সরকারকে এক অনুগ্রহশীল বন্ধু মনে করে তার সাথে অকৃত্রিম ব্যবহার করাই ইংরেজ সরকারের সৌভাগ্য। একারণেই আমাদের তত্ত্বাবধায়ক শাসক স্বাধীনতার কেবল বুলিসর্বস্ব পাঠ দেয় না, বরং ধর্মীয় বিষয়ে স্বয়ং স্বাধীন কর্মকাণ্ডের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ব্যবহারিক উপদেশের মাধ্যমে আমাদেরকে স্বাধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। উদাহরণস্বরূপ হয়ত এটি বলাই যথেষ্ট হবে যে, মাসখানেক পূর্বে আমাদের দেশের পাঞ্জাব প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর নবাব স্যার চার্লস এচীসন সাহেব বাহাদুর গুরুদাসপুরের বাটালায় আসেন। গির্জার ভিত্তিপ্রস্তর রাখার সময় তিনি পরম সরলতা ও অকৃত্রিমতার সাথে খ্রিষ্টধর্মের প্রতি স্বীয় সহমর্মিতা

প্রকাশ করে বলেন, আমার আশা ছিল কয়েকদিনের ভেতর এ দেশ ধর্মানুবর্তিতা ও সততার ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি করবে, কিন্তু অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, উন্নতি অতি স্বল্পই হয়েছে (অর্থাৎ এখনো মানুষ ব্যাপকহারে খ্রিষ্টান হয় নি আর খ্রিষ্টানদের পবিত্র দল সংখ্যায় এখনো অল্প)। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের নিরাশ হওয়া উচিত নয়; কারণ পাদরি সাহেবদের কাজ নিরর্থক নয় এবং তাদের শ্রম পণ্ড হবে না, বরং পুণ্য অনুপাতে অন্তরে তা প্রভাব বিস্তার করে থাকে আর অভ্যন্তরীণভাবে অনেকের হৃদয় প্রস্তুত হয়ে চলেছে। যেমন- অন্যূন একমাস হবে, এক রইস বা ধনাঢ্য ব্যক্তি আমার কাছে আসেন এবং আমার সাথে এক ঘণ্টা পর্যন্ত ধর্মীয় আলোচনা করেন। এমন মনে হচ্ছিল যে, তার মন প্রস্তুতির জন্য কিছুটা সময় চায়। তিনি বলেন, আমি ধর্মীয় পুস্তক অনেক দেখেছি, কিন্তু আমার পাপের বোঝা অপসারিত হয় নি আর আমি ভালোভাবে জানি যে, পুণ্যকর্ম করতে পারব না। আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত। প্রত্যুত্তরে আমি আমার আধো-আধো উর্দুতে তাকে মানবজাতির জন্য সেই রক্ত দেয়ার কথা বোঝালাম যা সকল পাপ হতে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করে আর সেই তাকওয়া সম্পর্কেও বোঝালাম যা কর্মের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে না বরং বিনামূল্যে লাভ হয়। তিনি বলেন, আমি সংস্কৃত ভাষায় ইঞ্জিল দেখেছি আর দু'একবার হযরত ঈসার কাছে দোয়াও করেছি। এখন থেকে আমি রীতিমতো ইঞ্জিল পাঠ করবো আর চিৎকার করে ঈসার কাছে প্রার্থনা করবো (অর্থাৎ আপনার বক্তৃতায় আমার ওপর সুগভীর প্রভাব পড়েছে আর খ্রিষ্টধর্মের প্রতি পূর্ণ আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে)। এখন ভাবা উচিত, গভর্নর বাহাদুর নবাব লেফটেন্যান্ট সাহেব কত কষ্ট করে হিন্দু জমিদারকে নিজের ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করেছেন। নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য এ ধরনের রইসগণ শাসক-শ্রেণির সামনে যদিও এমন কপটতামূলক কথাবার্তাই বলে থাকে, যেন শাসকরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং তাদেরকে স্বীয় ধর্মভাই মনে করেন। কিন্তু এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো, সাহেবের আলোচনার আলোকে ইংরেজ সরকার-প্রদত্ত ধর্মীয় স্বাধীনতার ধারণা নেয়া বা ধারণা দেয়া। কেননা যেখানে স্বয়ং নবাব লেফটেন্যান্ট গভর্নর বাহাদুর আন্তরিক আগ্রহের সাথে ভারতে নিজের প্রিয় বিশ্বাস প্রচারে গভীর আগ্রহ রাখেন, বরং সুযোগমতো কখনো কখনো এর জন্য মানুষকে অনুপ্রাণিতও করেন, সেখানে অন্যদের স্ব-স্ব ধর্মের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনে

কেন তিনি অসন্তুষ্ট হবেন? সত্যিকার অর্থে অকপটে সহানুভূতি প্রদর্শন একটি নেক বৈশিষ্ট্য, আর কপটাচার পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়। এই সততায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুম্বাইয়ের সাবেক গভর্নর স্যার রিচার্ড টিমপল সাহেব মুসলমানদের সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন এবং তা বিলাতের পত্রিকা ইভনিং স্ট্যান্ডার্ডে ছেপে উর্দু পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়। তিনি লিখেন, পরিতাপ! মুসলমানরা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে না। এর কারণ হলো, তাদের ধর্ম সে সকল অবাস্তব কথায় পরিপূর্ণ নয়, যাতে হিন্দু ধর্ম নিমজ্জিত। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদেরকে হয়ত হাসি-ঠাট্টার ছলে সাধারণ যুক্তি দিয়েই ধর্মান্তরিত করা সম্ভব; কিন্তু ইসলাম দক্ষতার সাথে সেসব যুক্তির মোকাবিলা করে আর যুক্তির মাধ্যমে ইসলামকে খণ্ডন করা যায় না। খ্রিষ্টানরা সহজেই অন্য ধর্মের অসার-অযৌক্তিক-অসম্ভব বিষয়াদি দৃশ্যপটে এনে সেসব ধর্মের অনুসারীদেরকে ধর্মচ্যুত করতে পারে, কিন্তু মুহাম্মদীয়দের বা মুসলমানদের সাথে এমনটি করা তাদের জন্য কঠিন বিষয়। তাই এই অকপটতা ধনাঢ্য মুসলমানদের মাঝে দেখা যায় না। এটি নিয়ে ভাবা তো দূরের কথা।

বিনীত

(মির্যা) **গোলাম আহমদ**

প্রথম অধ্যায়
[তৃতীয় খণ্ডের ধারাবাহিকতায়]

অর্থাৎ তাঁর সত্তা, গুণাবলী ও কর্মে অন্যের অংশীদারিত্ব থেকে পবিত্র থাকা আর পূর্ণ ক্ষমতায় সমৃদ্ধ থাকা এমন বিষয় নয় যা কেবল অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, বরং যৌক্তিক-প্রমাণাদিও খোদার সত্তা, গুণাবলী ও কর্মে এক-অদ্বিতীয় হওয়া অনস্বীকার্য ও আবশ্যক বলে সাব্যস্ত করে এবং নিশ্চিতভাবে তিনি যে সত্য-উপাস্য কিংবা তাঁর খোদা হওয়া তাঁর সেসকল বিশেষত্বের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার সাথে শর্তযুক্ত আখ্যায়িত করে। অতএব এখন লজ্জাশীলতা ও লজ্জাবোধকে কিছুটা হলেও এই নির্বোধদের কাজে লাগিয়ে ভাবা উচিত, যারা ঐশীবাণী বা ঐশী-গ্রন্থের অনন্যতা অস্বীকারে কেবল এই আপত্তি উত্থাপন করে বেড়ায় যে, যেখানে খোদার বাণীও আমাদের কথারই শ্রেণিভুক্ত আর সেসব কথা ও শব্দেরই সমন্বয় যার ভিত্তিতে আমাদের কথা গঠিত, সেখানে আমরা এর অনুরূপ কিছু বানাতে পারব না– এর কারণ কী? এমন লোকদের অবস্থা দেখে কান্না পায়, যাদের এমন সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট সত্যও বুঝে ওঠা হয় নি, যা অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। এদের ভেতর খোদা-প্রদত্ত জ্ঞান যদি সামান্য পরিমাণও থাকত, তাহলে বাজে এই আপত্তি করতে গিয়ে প্রথমেই তারা এটিই ভাবতো যে, সত্তা, গুণাবলী ও সমুদয় কর্মে খোদার এক অদ্বিতীয় হওয়া আবশ্যক কিনা? হায়! এই প্রমাণ সম্পর্কে না ভাবলেও অন্ততপক্ষে এই দ্বিতীয় প্রমাণ নিয়েই যদি চিন্তা করত যে, যেই সত্তাকে (যেসব) জ্ঞান ও প্রকৃতিগত শক্তিতে সবচেয়ে শক্তিশালী, অনন্য ও অতুলনীয় মানি, সেসকল শক্তির ছাপকেও অনন্য এবং অতুলনীয় বলে স্বীকার করা উচিত। কেননা আমরা যেভাবে বর্ণনা করে এসেছি যে, কথা বা বাণীর মাহাত্ম্য ও প্রতাপ বক্তার জ্ঞানগত যোগ্যতা বা জ্ঞানগত শক্তির অধীন। জ্ঞানের শক্তিতে যে অধিক শক্তিশালী, তার বক্তব্যের মাহাত্ম্য ও প্রতাপও অধিক হয়ে থাকে। হায়! তারা যদি এই প্রমাণকেও অবজ্ঞা করে থাকে, তাহলে নিদেনপক্ষে বস্তুর সত্য বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্যের কথাই স্মরণ রাখত! তারা কী জানে না যে, শত শত জিনিস একই শ্রেণির হয়ে থাকে বরং একই প্রকারভুক্ত, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রজ্ঞার মূর্ত প্রতীক (খোদা) প্রত্যেক বস্তুতে পৃথক পৃথক বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্য অন্তর্নিহিত রেখেছেন? কিছু মানুষ এই আত্মপ্রতারণায় নিমগ্ন যে, কথা বা ভাষা মানুষের আবিষ্কার। যেখানে তা মানুষের আবিষ্কার, সেখানে কথা বা

বাণীর সাথে সংশ্লিষ্ট আবশ্যকীয় বাগ্মিতা ও বাক্যালঙ্কার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্বে প্রয়োজন অনুসারে মানুষ সর্বোচ্চ মর্যাদায় পৌঁছতে পারে। কেননা মানুষ স্বীয় আবিষ্কারে উন্নতি করতে অক্ষম ও ব্যর্থ থাকবে, এ কথা সম্পূর্ণভাবে অযৌক্তিক ও অকল্পনীয়। কথা বা বাণীর বাগ্মিতা ও আলঙ্কারিকতায় সকল প্রকার উন্নতি করা ও পরম মার্গে উপনীত হওয়া যেখানে যুক্তি বা বিবেকের কাছে অসম্ভব নয়, সেখানে কুরআনের বাক্যালংকার বা কুরআনী বাগ্মিতার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করাও অসম্ভব হবে না। অতএব স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, এই সন্দেহ প্রধানত আমাদের উপরোল্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে দূরীভূত হয়ে যায়, যাতে আমরা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধ করেছি যে, মানুষের জ্ঞানগত শক্তিসমূহ কোনোভাবেই খোদা তা'লার জ্ঞানগত শক্তির সমান হতে পারে না, আর জ্ঞান-শক্তির ক্ষেত্রে তুচ্ছ-উচ্চ, শক্তিশালী ও দুর্বলের মাঝে যে পার্থক্য থেকে থাকে তা কথায় বা বাণীতে প্রকাশ পাওয়া অবধারিত। অর্থাৎ যে বাণী বা গ্রন্থ মহান শক্তি থেকে উৎসারিত, তা উচ্চ আর যা নিম্নমানের শক্তি থেকে উৎসারিত হয়েছে, তা নিম্নমানের বা তুচ্ছ, যেমনটি কিনা ভিন্ন-ভিন্ন যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষের সামর্থ্যের ওপর দৃষ্টিপাতে এই পার্থক্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট ও প্রকাশিত হয়। শক্তিসামর্থ্যে দুর্বল ব্যক্তি শক্তিশালী ব্যক্তির সামনে দাঁড়াতে পারে না, অথচ মানুষ হিসেবে সব মানুষ একই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া এ ধারণাও সঠিক নয় যে, সব ভাষা মানুষেরই আবিষ্কার, বরং গভীর গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত যে, মানুষের ভাষার আবিষ্কারক ও স্রষ্টা সেই সর্বশক্তিমান খোদা, যিনি স্বীয় উৎকৃষ্ট ক্ষমতাবলে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং কথা বলার সামর্থ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে তাকে ভাষা দিয়েছেন। ভাষা যদি মানুষের আবিষ্কার হতো তাহলে সদ্যজাত কোনো শিশুর ভাষা শিক্ষার কোনো প্রয়োজন হতো না বরং প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে সে নিজেই কোনো ভাষা আবিষ্কার করে নিত। কিন্তু যুক্তির নিরিখে এটি অতি স্পষ্ট যে, যদি কোনো শিশুকে ভাষা শেখানো না হয়, তাহলে সে কিছুই বলতে পারবে না। তুমি সেই শিশুকে গ্রীসের কোনো জঙ্গলেও যদি লালন-পালন কর বা ইংল্যান্ডের কোনো দ্বীপে ছেড়ে দাও বা তুমি তাকে বিষুব রেখার নীচেই নিয়ে যাও না কেন, ভাষার ক্ষেত্রে সে শিক্ষার মুখাপেক্ষী হবেই আর না শেখালে সে ভাষাহীন থেকে যাবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে এই ধারণা উপস্থাপন করা যে, আমরা স্বচক্ষে দেখি, ভাষায় সর্বদা শত শত প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন নিজ থেকেই হতে থাকে,

যার মাধ্যমে ভাষায় মানুষের হস্তক্ষেপের প্রমাণ পাওয়া যায়! স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, এই সন্দেহ সম্পূর্ণভাবে আত্ম-প্রতারণার শামিল। ভাষায় সব সময় যে পরিবর্তন হচ্ছে তা মানুষের ইচ্ছায় নয়, আর এটি কোনো নিয়ম হিসেবেও নির্ধারিত হতে পারে না যে, স্বয়ং মানব-প্রকৃতি বিশেষ বিশেষ সময়ে ভাষায় পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে থাকে। বরং গভীরভাবে মনোনিবেশ করলে জানা যাবে যে, এই পরিবর্তনও সব কারণের আদি কারণ অর্থাৎ খোদার ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে প্রকাশিত হয়ে থাকে, যেভাবে সকল স্বর্গীয় ও মর্তীয় পরিবর্তন তার বিশেষ ইচ্ছায় প্রকাশিত। এটি কখনো প্রমাণিত হতে পারে না যে, পৃথিবীতে যত ভাষা রয়েছে সকল ভাষা সম্মিলিতরূপে বা পৃথক পৃথকভাবে মানুষ আবিষ্কার করেছিল। কেউ যদি এই সন্দেহ ব্যক্ত করে যে, খোদা তা'লা যেখানে স্বাভাবিকভাবে ভাষায় সবসময় পরিবর্তন করে থাকেন, সেখানে এমন ধারণা করা কেন বৈধ হবে না যে, প্রারম্ভেও হয়ত কোনো এলহামই হয় নি আর এভাবেই বিভিন্ন ভাষা আবিষ্কৃত হয়ে গিয়ে থাকবে? এর উত্তর হলো– প্রারম্ভিক যুগের জন্য প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম হলো, খোদা তা'লা সবকিছুকে স্বীয় নিরঙ্কুশ বলে সৃষ্টি করেছিলেন। আকাশ, পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্র আর স্বয়ং মানব-প্রকৃতির ওপর দৃষ্টিপাতে বোঝা যাবে যে, প্রাথমিক সেই যুগ শুধু শক্তি প্রদর্শনের যুগ ছিল, যাতে প্রচলিত বা সাধারণ উপকরণের কোনো মিশ্রণ ছিল না। সে যুগে খোদা তা'লা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তা এমন মহান কুদরত বা শক্তির মাধ্যমে করেছেন যা দেখে মানব-বিবেক বিস্মিত হয়। পৃথিবী, আকাশ, সূর্য-চন্দ্র ইত্যাদি গ্রহ-উপগ্রহের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখ! এত বড় কাজ কীভাবে কোনো উপকরণ, নির্মাণ-শিল্পী এবং শ্রমিকদের সাহায্য ছাড়া শুধু ইচ্ছার ভিত্তিতে নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমেই সাধন করলেন?

সুতরাং এই প্রারম্ভিক যুগে খোদার পুরো কাজ যেখানে তাঁর ক্ষমতা ও শক্তির বলে সাধিত হতে দেখা যায়, যা প্রকৃতি ও উপকরণের মিশ্রণ হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত আর সম্পূর্ণভাবে ঐশী ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে ভাষা সম্পর্কে ঈমানহীনদের মতো খোদাকে কীভাবে এ বিষয়ে অক্ষম মনে করা যেতে পারে? যেখানে তিনি সবকিছু নিছক শক্তি বা কুদরতের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছিলেন, সেখানে তিনি কি ভাষা সৃষ্টি করার শক্তি রাখতেন না? মানুষকে যিনি স্বয়ং পিতামাতা ছাড়া সৃষ্টি করে স্বীয় পূর্ণ শক্তিমত্তার প্রমাণ দিয়েছেন, সেখানে ভাষা সম্পর্কে কেন তাঁর কুদরত বা শক্তিকে অসম্পূর্ণ মনে করা হবে? এককথায়,

সকল বুদ্ধিমানকে যেখানে স্বীকার করতে হয় যে, প্রথম যুগ সম্পূর্ণভাবে কুদরত বা শক্তিমত্তা প্রদর্শনের যুগ ছিল আর তাতে প্রকৃতির সার্বজনীন নিয়ম ছিল সকল কাজ প্রচলিত বা সাধারণ উপকরণের মিশ্রণ ছাড়া সাধন করা; সুতরাং ভাষাকে এই সাধারণ ও সার্বজনীন নিয়ম থেকে বের করে প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করা সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার শামিল। সে যুগের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে এ যুগের অবস্থা উপস্থাপন করা সঠিক নয়। যেমন, এখন মানব-সন্তান পিতামাতার মাধ্যম ছাড়া জন্ম নিতে পারে না। কিন্তু প্রাথমিক সেই যুগেও যদি মানুষের জন্ম পিতামাতার অস্তিত্বের ওপরই নির্ভরশীল হতো, তাহলে এ পৃথিবীর সৃষ্টি হওয়া কীভাবে সম্ভব হতো? এছাড়া ভাষায় প্রকৃতিগতভাবে যেসব পরিবর্তন ঘটে থাকে, সেসব পরিবর্তন এবং দ্বিতীয় এই রূপে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে শূন্য থেকে কোনো ভাষা সৃষ্টি করার মাঝে বড় পার্থক্য রয়েছে। বর্তমান কোনো ভাষায় কোনো পরিবর্তন আসা এক বিষয় আর সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি ভাষার সম্পূর্ণভাবে শূন্য থেকে সৃষ্টি হওয়া ভিন্ন কথা। এসব কথা ছাড়াও খোদা তা'লা এখনও যেখানে স্বীয় এলহামের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষা নিজ বান্দাদের প্রতি এলকা করে থাকেন বা তাদের হৃদয়ে সঞ্চার করেন, তিনি এমন সব ভাষায় এলহাম করতে পারেন যেসব ভাষার কোনো জ্ঞানই সেসব বান্দার থাকে না; যেভাবে আমরা টীকা পাদটীকা নং ১-এ এর প্রমাণ দিয়েছি।

সুতরাং সেখানে এই ধারণা করা কত বড় নির্বুদ্ধিতা যে, আদিতে জ্ঞানের মূর্ত প্রতীক খোদা তা'লার এই এলকা করা বা প্রেরণা সঞ্চারের পূর্ণ শক্তি ছিল না; কেননা যেখানে বা যে অবস্থায় তাঁর সীমাহীন শক্তির এখনো স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় অর্থাৎ তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে এমন এমন ভাষায় এলহাম করেন, যা সম্পর্কে সেসব বান্দা সম্পূর্ণভাবে অনবহিত আর যা তারা নিজেদের পিতামাতার কাছেও শেখে নি এবং কোনো শিক্ষকের কাছেও শিক্ষা পায় নি, তাহলে এর কারণ কী যে, সৃষ্টির সূচনায় মানুষকে ভাষা শিক্ষা দেয়া খোদা তা'লার সর্বোৎকৃষ্ট কুদরতের জন্য অসম্ভব গণ্য করা হবে– যা ছিল একান্ত মুখাপেক্ষিতার যুগ? আর খোদাকে দুর্বল ও অক্ষম আখ্যায়িত করে মানুষের ওপর কেন এত সমস্যা চাপানো হবে এবং এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে একথা বলা হবে যে, মানুষ সৃষ্টি হওয়ার পর দীর্ঘকাল বোবা ও ভাষাহীন ছিল, আর সেই দুর্ভাগ্যের যুগে শতশত সমস্যা ও বিপদাপদের মাঝে কেবল ইঙ্গিতে কার্যসাধন করতে থাকে? আর যে সকল দীর্ঘ বক্তব্য বা সূক্ষ্ম বিষয়াদি ইঙ্গিতে প্রকাশ করা

সম্ভব হয় নি, তা প্রকাশে ব্যর্থ হয়ে সে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির বোঝা বহন করতে থাকে যা সেসব বক্তব্য না বোঝা ও বোঝাতে না পারার কারণে দেখা দেয়া আবশ্যক ছিল? আর যেসব কষ্টের সম্মুখীন মানুষ হয়, সেসব কষ্টভোগ সত্ত্বেও খোদা তার ব্যথার কোনো সুরাহা করলেন না এবং তার চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন আর খোদা স্বীয় পূর্ণ-শক্তির বলে যদিও মানুষকে শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং এরপর তাকে ভাষা শিখিয়েছেন, চোখ দিয়েছেন, কান দিয়েছেন এবং উন্নতি করার বিভিন্ন প্রকার সামর্থ্য দিয়েছেন, অনুরূপভাবে স্বীয় পূর্ণ-শক্তির কল্যাণে এত পরিমাণ নিয়ামতরাজি দান করেছেন যা মানুষ গণনা করেও শেষ করতে পারে না; কিন্তু সেই কাদের খোদা মানুষকে ভাষা শিক্ষা দিতে পারেন নি, যা মানুষের জন্য একান্ত আবশ্যক ছিল! এমনকি মানুষ দীর্ঘদিন ভাষা-শূন্যতার সমস্যায় জর্জরিত থেকে নিজেই ভাষা আবিষ্কার করেছে! এটি কি এমন এক বিশ্বাস, যার মাধ্যমে খোদা হিসেবে তাঁর শক্তি বা ক্ষমতা প্রশংসার যোগ্য হতে পারে? সেই সম্পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান (খোদা) সম্পর্কে কোনো বিশ্বাসী এমন কুধারণা পোষণ করতে পারে কি যে, শক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তিনি এখনও আদিকালেই রয়ে গেছেন? আর যখন ঈশ্বরত্বের শক্তিনিচয় অজ্ঞ বান্দাদের সামনে প্রকাশ করা উদ্দেশ্য ছিল, তখন তিনি আবশ্যকীয় কিছু শক্তি প্রদর্শনে ব্যর্থ থাকেন?

এটি কি অনুমান করা যায় যে, কয়েক হাজার সৃষ্টিকে যিনি কোনো বস্তু ও আকৃতি বা পূর্বকাঠামোর সাহায্য ছাড়াই সৃষ্টি করে দেখিয়েছেন, ভাষা আবিষ্কারের তিনি শক্তি রাখবেন না? মানুষকে যিনি মহান এক উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন আর বিশেষ ইচ্ছায় তাকে শ্রেষ্ঠ-সৃষ্টি বানিয়েছেন, তিনি তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ রেখে ছেড়ে দেবেন আর মানুষ দৈবক্রমে নিজের ঘাটতি নিজেই পূর্ণ করবে– বিবেকবান কোনো ব্যক্তি কি একথা গ্রহণ করতে পারে? প্রশ্ন হলো, আদি থেকে যে সত্তার এ সকল ভাষার জ্ঞান রয়েছে, যার গভীর দৃষ্টির সামনে ভবিষ্যতে অস্তিত্ব লাভকারী সবকিছু কার্যত এখনই বিদ্যমান হওয়ার অর্থ বা মর্যাদা রাখে আর যার পূর্ণ কুদরত সকল প্রকার শিক্ষা ও জ্ঞান দিতে পারে, তাঁর সম্পর্কে এ ধারণা করা কি সুবিচার হবে যে, তিনি জেনেশুনে মানুষকে ভাষাহীন পেয়ে তাকে ভাষা শিক্ষা দিতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকেন। এমনকি মানুষ তার মনোযোগের অভাবে দীর্ঘকাল পর্যন্ত পশু ও বন্যদের ন্যায় জীবন কাটাতে থাকে আর অবশেষে তার (অর্থাৎ মানুষের) নিজেরই এই উপলব্ধি হয়

যে, কোনো ভাষা আবিষ্কার করা উচিত। এ ধারণা ভিত্তিহীন হওয়া এতটাই স্পষ্ট যে, খোদার সেসব কামেল শক্তি ও পরম করুণা এবং উৎকৃষ্ট তরবিয়ত বা শিক্ষাপ্রদান, যা সকল যুগে দৃশ্যমান, তা এটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। যে খোদার এলহামে ব্যবহৃত ভাষার বিস্ময়কর দিকগুলোর মাঝে এখনো যা দেখা যায় তা হলো, তা অজানা সব ভাষা বান্দাদের সামনে প্রকাশ করে, আর তাঁরই সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করা যে, যুগের সূচনাতে এলহামের যখন একান্ত প্রয়োজন ছিল, তখন এলহাম করার বিষয়ে খোদা দ্বিধাদ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন! এমনটি মনে করা চরম অজ্ঞতা ও হৃদয়ের অন্ধত্বের প্রমাণ। কারো মনে যদি এই ধারণা জাগ্রত হয় যে, বন্য লোকদের, যারা ভাষা না থাকার কারণে কেবল ইশারা ইঙ্গিতে কাজ চালায়, তাদেরকে এলহামের মাধ্যমে কোনো ভাষা সম্পর্কে কেন অবহিত করা হয় না আর কেনইবা নবজাত কোনো শিশুকে জঙ্গলে রাখলে খোদার পক্ষ থেকে সে কোনো এলহাম লাভ করে না? এর উত্তর হলো, খোদার গুণাবলী সম্পর্কে এটি একটি ভুল ধারণা; কেননা 'এলকা' ও 'এলহাম' এমন বিষয় নয় যা সর্বত্র, অকালে-অস্থানে যোগ্যতা বিবেচনা ছাড়াই হয়ে যাবে, বরং এলকা ও এলহামের জন্য যোগ্যতারূপী বৈশিষ্ট্য থাকা অত্যাবশ্যকীয় এক শর্ত। দ্বিতীয় আবশ্যকীয় শর্ত হলো– এলহামের সত্যিকার প্রয়োজনীয়তা। প্রথমদিকে খোদা যখন মানব সৃষ্টি করেছেন, তখন এলহামের মাধ্যমে ভাষা শিক্ষা প্রদান করা এমন একটি বিষয় ছিল, যাতে উভয় প্রকার শর্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রধানত, মানুষের মাঝে যেমনটি এলহাম লাভের জন্য ব্যক্তিগত যোগ্যতা থাকা উচিত তা বিদ্যমান ছিল। অন্যদিকে সত্যিকার প্রয়োজনও এলহামের দাবিদার ছিল। কেননা সে সময় হযরত আদমের সাথে স্নেহশীল সাথী খোদা তা'লা ছাড়া আর কেউ ছিল না, যে তাকে কথা বলা শেখাবে আর শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে সভ্যতা-ভব্যতা শেখাবে। বরং হযরত আদমের জন্য ছিলেন কেবল খোদা তা'লা, যিনি আদমের সকল আবশ্যকীয় চাহিদা পূরণ করেছেন। তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্) স্বয়ং তাকে সুন্দর শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতা-ভব্যতা শিখিয়ে সুশীল মানুষের স্তরে পৌঁছিয়েছেন। অবশ্য এরপর যখন হযরত আদমের সন্তানরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে আর আল্লাহ্ তা'লা আদমকে যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন তা যথাযথভাবে তাঁর সন্তানসন্ততির মাঝে সঞ্চারিত হতে থাকে, তখন কিছু মানুষ অপর কিছুসংখ্যক মানুষের শিক্ষক ও ওস্তাদের ভূমিকা পালন করে।

ভাষা শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিশুর জন্য তার পিতামাতা স্নেহশীল সাথী

হিসেবে দৃশ্যপটে আসেন। কিন্তু আদমের জন্য এক খোদা ছাড়া আর কেউ ছিল না যে তাকে ভাষা শিক্ষা দিতো এবং মানবিক ভদ্রতা-শিষ্টাচার শেখাতে পারত; তার জন্য শিক্ষক, ওস্তাদ ও পিতামাতার স্থলে খোদা একাই ছিলেন, যিনি তাকে সৃষ্টি করে নিজেই সবকিছু শিখিয়েছেন। এককথায়, স্বয়ং আদমের তরবিয়ত করা ও তার চাহিদা পূরণ করা খোদার এক আবশ্যকীয় ও সত্যিকারের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তার সন্তানসন্ততির জন্য এর প্রয়োজন দেখা দেয় নি। কারণ, এখন কোটি কোটি মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলে এবং সন্তানসন্ততিকে শেখায়। এছাড়া আমরা যেভাবে এখনই বর্ণনা করে এসেছি যে, ব্যক্তিগত যোগ্যতাও এলহাম লাভের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত, যা আদম-সন্তানদের প্রত্যেকের মাঝে পাওয়া যায় না। কারো ভিতর যদি ব্যক্তিগত যোগ্যতা থাকে, তাহলে আজও সে এলহামের মাধ্যমে তার প্রয়োজনীয় বিষয়ে খোদা তা'লা থেকে সংবাদ পেতে পারে আর খোদা তাকে আদৌ ব্যর্থ হতে দেন না, পরিত্যাগ করেন না। খোদার সুগভীর দৃষ্টি সব মানুষের যোগ্যতা ও সামর্থ্যের গভীরতম জায়গায় পৌঁছে যায়। যোগ্যদেরকে নিজ যোগ্যতা বা সামর্থ্য প্রকাশ করা থেকে তিনি বঞ্চিত রাখেন না। আর এমনটি কখনো হয় না যে, কোনো ব্যক্তি খোদার দৃষ্টিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ আর বেলায়েত, নবুয়্যত ও রিসালত লাভের যোগ্যতা রাখে, আর এরপর জাগতিক দুর্বিপাকের কারণে বা বন্য হিসেবে জন্মগ্রহণের কারণে তদ্রুপ দুর্দশায় মারা যায় আর খোদা তাকে মহান মর্যাদায় পৌঁছান না যেখানে পৌঁছার যোগ্যতা তাকে দেয়া হয়েছে! সত্যিকার অর্থে জংলি বোবা, বন্য ও অজ্ঞ সে ব্যক্তিই থেকে যায়, যে প্রকৃতিগত দিক থেকে অসম্পূর্ণ, বাজে এবং চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়। এছাড়া কোটি কোটি মানুষকে খোদা যেখানে বিভিন্ন প্রকার ভাষা ও অভিব্যক্তি প্রদান করে সাধারণ শিক্ষার দ্বার অন্যদের জন্য উন্মোচন করেছেন, সেখানে বিশেষ পরিস্থিতিতে অর্থাৎ কোনো নিদর্শন প্রকাশ করা যদি উদ্দেশ্য না হয় তাহলে অন্য সবক্ষেত্রে এলহামের মাধ্যমে ভাষা শেখার কোনো আবশ্যকতা নেই। অধিকন্তু খোদা তা'লা, যিনি প্রজ্ঞার মূর্ত-প্রতীক, তিনি প্রয়োজন ছাড়া কোনো কাজ করেন না আর বৃথা ও অলাভজনক রীতিগুলো অকারণে অবলম্বন করেন না। কোনো কোনো নির্বোধ আর্য একমাত্র সংস্কৃত ভাষাকে পরমেশ্বরের ভাষা আখ্যা দিয়ে বাকি সকল ভাষা, যা স্রষ্টার শত শত সৃষ্টিশৈলী বা বিস্ময়াবলীতে পরিপূর্ণ, সেসবকে মানুষের আবিষ্কার আখ্যা দেয় যেন মানুষের হাতেও এক ধরনের ঈশ্বরত্ব রয়েছে; অর্থাৎ পরমেশ্বর কেবল একটি ভাষা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু মানুষ এমন শক্তি বা যোগ্যতা দেখিয়েছে

যে, তারা অধিকতর উত্তম বহু ভাষা আবিষ্কার করেছে। আর্যদের আমরা জিজ্ঞেস করি যে, একথাই যদি সত্য হয়ে থাকে যে, একমাত্র সংস্কৃতই পরমেশ্বরের মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে আর অন্যান্য ভাষা মানুষের সৃষ্টি এবং পরমেশ্বরের মুখ থেকে দূরে পড়ে আছে, তাহলে বল, সেই বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বগুলো কী কী যা কেবল সংস্কৃত ভাষায় রয়েছে আর অন্য কোনো ভাষায় নেই?

বস্তুত, মানবীয় সৃষ্টির ওপর পরমেশ্বরের বাণী বা উক্তির শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্যই থাকা উচিত। স্বীয় সত্তা, গুণাবলী ও কর্মে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, অনন্য ও অতুলনীয় হওয়ার কারণেই তিনি খোদা। আমরা যদি ধরে নিই যে, সংস্কৃত পরমেশ্বরের ভাষা যা হিন্দুদের পিতৃপুরুষদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আর অন্যান্য ভাষা অন্যদের পিতৃপুরুষরা নিজেরাই বানিয়েছে, কেননা তারা হিন্দুদের চেয়ে বেশি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ছিল! কিন্তু একইসাথে আমরা কি এটিও ধরে নিতে পারি যে, পরমেশ্বর থেকেও তারা কিছুটা বড় ছিল, যাদের কামেল ক্ষমতা শত শত উন্নত ভাষা বানিয়ে দেখিয়েছে, কিন্তু পরমেশ্বর কেবল একটি ভাষা বানিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন! যাদের শিরা-উপশিরায় বহু ঈশ্বরের পূজা বদ্ধমূল হয়ে আছে, তারা তাদের পরমেশ্বরকে অনেক ক্ষেত্রে (তাদের) সমপর্যায়ের এক মানুষ মনে করে বসে আছে। আর কেনইবা তা হবে না? সে তো অনাদি! খোদার শরীক! কারো মনে যদি এই সন্দেহ জাগে যে, খোদা একটি ভাষাতেই সন্তুষ্ট থাকলেন না কেন? এই সন্দেহও প্রণিধানশক্তির দুর্বলতা থেকে উদ্ভূত। বুদ্ধিমান কোন ব্যক্তি বিভিন্ন মহাদেশের ভিন্ন ভিন্ন রূপ এবং বিভিন্ন প্রকৃতির ওপর দৃষ্টিপাত করলে নিশ্চিতভাবে জানতে পারবে যে, একই ভাষা তাদের সবার অবস্থার সাথে সমানভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না, বরং কোনো কোনো দেশের মানুষ কোনো কোনো প্রকার শব্দ ও অক্ষর সহজেই উচ্চারণ করতে পারে। আবার কোনো কোনো দেশের মানুষের জন্য সেসব অক্ষর ও শব্দ উচ্চারণ করা কঠিন একটি বিষয়। অতএব এটি কী করে সম্ভব যে, প্রজ্ঞার মূর্ত প্রতীক কেবল একটি ভাষাকে ভালোবেসে– وضع الشيء فى موضعه অর্থাৎ কোনো জিনিস অস্থানে অপাত্রে না রাখার নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন না আর বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের জন্য সার্বজনীন উপযোগিতা বা প্রজ্ঞার দাবিকে অবজ্ঞা করবেন এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকদের একই ভাষার সংকীর্ণ খাঁচায় বন্দি করে দেবেন। এটি কি যুক্তিযুক্ত? এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ভাষা সৃষ্টির মাধ্যমে খোদা তা'লার অধিক শক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। অক্ষম, দুর্বল বান্দাদের বিভিন্ন ভাষায় তাঁর প্রশংসার গান গাওয়া খোদার দাসত্ব বা ইবাদত-বন্দেগীর জগতে একটি সৌন্দর্য বইকি।

চতুর্থ প্রারম্ভিক বিষয়

খোদা তা'লার সকল সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাতে এ নীতি প্রমাণিত হয় যে, যে সকল বিস্ময়কর ও বিরল দিকগুলো তিনি তাঁর সৃষ্টিতে অন্তর্নিহিত রেখেছেন তা দু'প্রকারের। প্রথম প্রকারটি হলো সেটি, যা সর্বসাধারণের কাছে বোধগম্য, যেমন সবাই জানে যে, মানুষের দুচোখ, দুকান ও এক নাক এবং দুপা ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রয়েছে। এ হলো সে সকল প্রকাশ্য বিষয় যা বাহ্যিক দৃষ্টিতেও বোঝা যায়। দ্বিতীয় প্রকারটি হলো সেসকল বিষয়, যাতে দৃষ্টির সূক্ষ্মতা প্রয়োজন। যেমন চোখের সেই গঠন যার মাধ্যমে উভয় চোখ এক বস্তুর ন্যায় একাত্ম হয়ে কাজ করে এবং ছোটো-বড় সকল বস্তু দেখতে সক্ষম বা কানের সেই গঠন যার মাধ্যমে তা বিভিন্ন শব্দ পৃথক পৃথকভাবে শুনতে পায়। এসব বিষয়, যা ভাসা দৃষ্টিপাতে আবিষ্কৃত হতে পারে না বরং যারা মানবদেহ ও চিকিৎসাশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ, দীর্ঘদিন চিন্তা-ভাবনা ও প্রণিধান করে তারা সেই সকল সত্য উদঘাটন করেছে আর এখনো মানুষের জৈব গঠনের এমনও শত শত সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও সত্য-তথ্য প্রচ্ছন্ন আছে, যা আজও কোনো বিদগ্ধ ব্যক্তির চিন্তাচেতনা আয়ত্ত করতে পারে নি। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও সত্য-তথ্যের মহান উদ্দেশ্য হলো, মানুষের সেই পূর্ণ প্রজ্ঞাময় সত্তার (অর্থাৎ খোদার) পূর্ণ শক্তির কথা স্বীকার করা, যিনি তার সৃজনে এমনসব বিস্ময়কর কাজ করেছেন। কিন্তু কোনো নির্বোধ এখানে এই আপত্তি করতে পারে যে, যে কাজের উদ্দেশ্য হলো খোদাকে চেনা, খোদা তা'লা সেই কাজকে কেন এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বানিয়েছেন, যা বোঝার জন্য চিন্তা ও প্রণিধানশক্তি দীর্ঘকাল পর্যন্ত কাজে নিয়োজিত? কিন্তু তা সত্ত্বেও আশা করা যায় না যে, সেসকল প্রজ্ঞাপূর্ণ রহস্য পরিপূর্ণভাবে হস্তগত হয়ে যাবে। এই সমস্যার কারণেই আজ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে সিন্ধু হতে বিন্দু পরিমাণও অর্জন করা সম্ভব হয় নি; অথচ তার সকল বিস্ময়কর ও বিরল বিষয়াদি স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল, যাতে করে সে উদ্দেশ্য হস্তগত হয়, যে উদ্দেশ্যে মূর্তিমান প্রজ্ঞা (খোদা) মানবদেহে তা সৃষ্টি করেছিলেন!

সুতরাং এ সন্দেহ এবং এধরনের অন্যান্য সন্দেহ কেন, যা খোদার সৃষ্টির বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যাবলী আর সূক্ষ্ম ও সুপ্ত বিশেষত্ব সম্পর্কে হৃদয়ে সংশয় ও সন্দেহের জন্ম দিতে পারে, এর উত্তর হলো– নিঃসন্দেহে খোদার স্বীয় সকল শিল্প বা প্রত্যেক সৃজনে, যা তাঁর পক্ষ থেকে উৎসারিত, সূক্ষ্ম বিস্ময়কর প্রকৃতির

নিয়ম এটিই যে, তিনি বাহ্যিক বা দৃশ্যমান বিষয়াবলী পর্যন্তই কথা সীমিত রাখেননি বরং তিনি (যা তাঁর কুদরত বা শক্তির গুণে প্রকাশিত, তাতে) সূক্ষ্ম বিস্ময়াবলীও (যা অত্যন্ত গভীর) প্রচ্ছন্ন রেখেছেন। কিন্তু খোদার এই কাজকে বৃথা ও অর্থহীন মনে করা পুরো অজ্ঞতা বইকি। স্মরণ রাখা উচিত যে, খোদা মানুষকে অন্যান্য পশুর ন্যায় তথা পশুর প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেন নি যে, তার জ্ঞান কয়েকটি জানা ও দেখা কথার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে, বরং তিনি তাকে যোগ্যতা ও সামর্থ্য দান করেছেন যেন সে চিন্তা-চেতনাকে কাজে লাগিয়ে অনন্ত জ্ঞানের জগতে এগিয়ে যাওয়ার সফর অব্যাহত রাখে। একারণেই বিবেকের ন্যায় অন্ধকার বিমোচনকারী মহামূল্যবান প্রদীপ তাকে দিয়েছেন যা অন্যান্য প্রাণীকে দেয়া হয় নি। এটি জানাকথা যে, এসকল বিরল-বিস্ময়কর ঐশী বিষয়াদি যদি একেবারে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হতো, আর তা নিয়ে কোনো প্রকার চিন্তাভাবনার প্রয়োজন না পড়তো, তাহলে মানুষ, যার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে তার দৃষ্টি ও প্রণিধানশক্তিকে পরিপূর্ণতা দেয়ার ওপর, সে কী নিয়ে ভাবতো আর কী নিয়ে চিন্তা করত? আর চিন্তা ও প্রণিধান যদি না করত, তাহলে তার জন্য শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা কী করে সম্ভব হতো? অতএব পুরো মানবতা যেহেতু নির্ভর করে মানুষের বিবেকবুদ্ধি বা চিন্তা-প্রণিধান শক্তিকে কাজে লাগানোর ওপর, তাই সেই মূর্তিমান প্রজ্ঞা (খোদা) অধিকাংশ সূক্ষ্ম রহস্যাবলী ও সত্য-তথ্যকে এমনভাবে গোপন রেখেছেন যে, মানুষ যতদিন তার খোদা-প্রদত্ত শক্তিসামর্থ্যকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ব্যবহার না করবে, সেসব সূক্ষ্ম বিষয়াদি প্রকাশ পাবে না। এর পেছনে মূর্তিমান প্রজ্ঞা খোদা তা'লার এটিই উদ্দেশ্য যে, উন্নতির পথ অবারিত থাকবে আর যে মোক্ষলাভের জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে যেন সেই মোক্ষলাভে সক্ষম হয়।

এককথায়, কেবল জ্ঞাত বা সাধারণ ও পরিচিত সৃষ্টির গণ্ডিতেই খোদার সব কাজ সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, বরং এতে যত খনন করবে (বা অনুসন্ধান চালাবে) তত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিক সামনে আসবে। সুতরাং খোদার পক্ষ থেকে উৎসারিত এসব বস্তু সম্পর্কে যেখানে এই সাধারণ নিয়ম প্রমাণিত অর্থাৎ সেগুলো সূক্ষ্ম রহস্যাবলী ও সুগভীর তত্ত্বকথায় পরিপূর্ণ, সেখানে প্রকৃতির সেই নিয়ম অনুসরণে সকল বিবেকবান মানুষের একথাও মানতে হবে যে, খোদার বাণীও সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় রহস্যশূন্য হওয়া সঙ্গত নয়, বরং তাতে সবচেয়ে বেশি সূক্ষ্মতা অন্তর্নিহিত থাকা আবশ্যক; কেননা তা খোদার উক্তি।

আর প্রজ্ঞার মূর্ত প্রতীক খোদার আদি জ্ঞানের ভাণ্ডারকে খোদা তা'লা একথার মাধ্যম বানিয়েছেন যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে বিরাজমান প্রকৃতির সকল নিয়মাবলীর সংশোধনের জন্য এতে উপকরণ থাকা আবশ্যক। সুতরাং তিনি যদি দুর্বল বা ত্রুটিপূর্ণ হন, তাহলে তাঁর মাধ্যমে এত বড় কাজ কীভাবে সমাধা হতে পারে? মানুষকে যদি তিনি সকল ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্ত করতে না পারতেন, তাহলে কেবল গুটিকতক ভ্রান্তি থেকে মুক্ত করা সত্যিকার অর্থে গন্তব্যে পৌঁছানোর পূর্বে মাঝপথেই অসহায় পরিত্যাগ করার নামান্তর হতো। এক কথায় খোদার প্রকৃতির নিয়মে যেখানে এটিই প্রমাণিত যে, সকল বস্তু যা তাঁর পক্ষ হতে উৎসারিত, সেসব কিছুতে খোদা তা'লা অবশ্যই সুগভীর সূক্ষ্মতা অন্তর্নিহিত রেখেছেন, কেবল মোটাদাগে কথা বলেই বিষয়ের ইতি টানেন নি। সুতরাং এই গবেষণার মাধ্যমে সেসব লোকের মিথ্যাচার প্রকাশ পেয়ে গেছে, যাদের দাবি হলো খোদার বাণীতে কেবল এমন কিছু শিক্ষা বা আদেশ-নিষেধ থাকা প্রয়োজন যা দ্রুত বোধগম্য হয়। সূক্ষ্ম কথা-বার্তা এতে অনাহুত-অনাকাঙ্ক্ষিত এবং সেটি নেইও। নিজেদের এই সন্দেহকে দৃঢ়তা দেয়ার জন্য তারা এখানে একটি যুক্তি দাঁড় করিয়েছে আর সেটি হলো– ঐশী গ্রন্থাবলী অবতীর্ণ হয়েছে স্বল্পজ্ঞান, স্বল্পবুদ্ধি বা নিরক্ষর ও মরুবাসীদের জন্য। সুতরাং এসব গ্রন্থের শিক্ষা সেসব লোকদের বোধ-বুদ্ধি অনুসারেই অবতীর্ণ হওয়া উচিত। কেননা নিরক্ষর ও অশিক্ষিত মানুষ সূক্ষ্ম কথা থেকে উপকৃত হতে পারে না এবং এ সম্পর্কে তাদের অবহিত হওয়াও সম্ভব নয়। কিন্তু স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, এই সন্দেহ তাদের মনে কেবল অদূরদর্শিতার কারণেই দানা বেঁধেছে। সেকেলে ও অর্থহীন-ভিত্তিহীন এই ধারণা থেকে চরম নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতার দুর্গন্ধ আসে।

হায়! ঐশীবাণীকে তারা যদি এটি জানার উদ্দেশ্যে মনোযোগ সহকারে দেখতো তাহলে বুঝত যে, খোদার এমন পবিত্র ও শ্রেষ্ঠতম বাণী সম্পর্কে এমন ধারণা করা আসলে চাঁদে থুথু ছোঁড়ার নামান্তর। এরূপ মানুষ এখনো যদি এ গ্রন্থ সচেতনতার সাথে পাঠ করে আর খোদার বাণীর অগণিত সেসব গভীর তত্ত্ব এবং সূক্ষ্ম তথ্য যা আমরা এ গ্রন্থে যথাস্থানে পুরো স্পষ্টতার সাথে লিপিবদ্ধ করেছি, ভেবে-চিন্তে জাগ্রত মন-মানসিকতার সাথে লক্ষ্য করে, তাহলে রুগ্ন ধ্যান-ধারণা সেভাবে দূরীভূত হয়ে যাবে যেভাবে সূর্য উদিত হলে অন্ধকার কেটে যায়। এটি জানাকথা যে, অনুভূত ও দেখা বিষয়ের

মোকাবিলায় অনুমানের কোন ঠাঁই নেই। নিরবচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার ফলে একটি জিনিসের কোনো বৈশিষ্ট্য যেখানে উদ্‌ঘাটিত ও প্রমাণিত হয়ে গেছে সেখানে কেবল অনুমানকে প্রমাণ বানিয়ে সেই বাস্তব বিষয়কে অস্বীকার করা পাগলামি ও উন্মাদনা বৈ আর কী। খোদাপ্রদত্ত বুদ্ধিকে যদি এরা একটু কাজে লাগায় তাহলে জানতে পারবে যে, তাদের সেই ধারণাটিই বাজে ও অর্থহীন। আর এটি একান্ত সে ধরনের একটি ধারণা যেভাবে কেউ উদ্ভিদের সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যাবলীকে অস্বীকার করে বলে যে, খোদা যদি পরিকল্পিতভাবে সৃষ্টির কল্যাণের জন্য এই কাজ করে থাকেন অর্থাৎ উদ্ভিদ ও জড়-সৃষ্টির মাঝে বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্য যদি রেখে থাকেন তাহলে এসকল গুণাবলীকে এত গভীরে লুকিয়ে রেখেছেন কেন? যা অজানা থাকার কারণে দীর্ঘকাল পর্যন্ত মানুষ চিকিৎসা ছাড়াই মৃত্যুর শিকার হয়ে আসছে আর আজ পর্যন্ত সকল অজানা গুণাবলী আয়ত্ত করা সম্ভব হয় নি? কিন্তু জানাকথা যে, খোদার সাধারণ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর (নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা সমানভাবে বিরাজমান) এমন সন্দেহে নিপতিত হওয়া সেসব লোকের কাজ, যারা প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে আদৌ চিন্তা করে না আর খোদার গুণাবলী ও রীতিনীতি আর নিয়মকানুন (যেভাবে তা প্রকৃতিতে বিরাজমান) ভালোভাবে অনুসন্ধানের পূর্বেই তাঁর সত্তা ও তাঁর গুণাবলীর ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে লিখতে বসে যায়। অথচ মানুষ যদি উন্মীলিত নয়নে চতুর্দিকে সামান্য দৃষ্টিপাতও করে, তাহলে দেখবে যে, খোদার রীতিনীতি বা নিয়মকানুন কোনো একটি বা দুটি বিষয়েই সীমাবদ্ধ নয় এবং সেভাবে গোপনও নয় যা বোঝা কঠিন হতে পারে। বরং এ বিষয়টি দিবালোকের মতো স্পষ্ট, অর্থাৎ সূক্ষ্ম-বৈশিষ্ট্যাবলী ও সুমহান সৃষ্টির কথা না হয় বাদই দিলাম, সামান্য একটি মাছিও (যা কিনা তুচ্ছ, ঘৃণ্য ও অপছন্দনীয় কীটপতঙ্গ মাত্র) প্রকৃতির এই নিয়মের বাইরে নয়। তাহলে নাঊযুবিল্লাহ্‌, এই ধারণা করা যেতে পারে কী যে, খোদার বাণী, যা কিনা তাঁর সত্তার ন্যায় পবিত্র ও উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যে সুষমিত হওয়া উচিত, তা এতটা তুচ্ছ ও হীন যে, সুপ্ত-গুপ্ত সূক্ষ্মতার ক্ষেত্রে এক মাছির সমপর্যায়েও তা পৌঁছবে না। এখানে একথাও স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, ধর্মীয় প্রয়োজনের কোনো কিছুই খোদা গোপন রাখেন নি। আর সুগভীর সূক্ষ্ম রহস্যাবলী এমন, যা ধর্মীয় বিশ্বাসের ঊর্ধ্বের বিষয় আর তা সেসকল আত্মার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যাদের মাঝে সুমহান শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের যোগ্যতা ও সামর্থ্য রয়েছে।

সকল কাণ্ডজ্ঞানহীন ও অর্বাচীনের ন্যায় যারা এসব বিষয়ের ওপর নির্ভর করতে চায় না, তারা সূক্ষ্ম এসব বিষয়াদির মাধ্যমে প্রজ্ঞা ও তত্ত্বজ্ঞানে উন্নতি করে আর অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞানের সেই মহান উচ্চতায় পৌঁছে যায়, যা মানবীয় শক্তি ও সামর্থ্যের নিরিখে সবচেয়ে উঁচু-মর্যাদা। এটি জানাকথা যে, জ্ঞান-সংক্রান্ত রহস্যাবলীর পুরোটাই যদি প্রকাশিত-বিষয় হতো, তাহলে বুদ্ধিমান ও নির্বোধের মাঝে পার্থক্য থাকত কি? এভাবে পুরো জ্ঞানই ধ্বংস হয়ে যেত এবং যোগ্যতা ও সামর্থ্যকে চেনা ও বোঝার জন্য যে উন্নতমান ও মাপকাঠি রয়েছে যার মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি ও প্রণিধানশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের ব্যক্তিত্ব পরিপূর্ণতা লাভ করে তা হারিয়ে যেত। আর সেই রীতিই যদি হারিয়ে যেত, তাহলে মানুষ আর কোন্ বিষয়ে ভাবত আর কী নিয়ে চিন্তা করত? আর চিন্তা ও প্রণিধান যদি সে না করত তাহলে জানা ও দেখার একটি পরিসরে সে-ও অন্যান্য প্রাণিতুল্য বলে গণ্য হতো আর অশেষ উন্নতির যোগ্যতা রাখত না।

সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে যে মোক্ষলাভের জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেই সৌভাগ্য থেকে সে বঞ্চিত থেকে যেত। সুতরাং খোদা মানুষকে যে চিন্তা ও প্রণিধানের শক্তি দান করেছেন এবং তাকে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের সামর্থ্য দিয়েছেন, তার সম্পর্কে কী করে এই কুধারণা করা যেতে পারে যে, তিনি স্বীয় গ্রন্থ অবতীর্ণ করে মানুষকে কোনো শ্রেষ্ঠ মার্গে পৌঁছাতে চান না বরং শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করেন! এটি কি সত্য নয় যে, খোদা স্বীয় বাণী অবতীর্ণ করেছেন মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য? অতএব খোদার গ্রন্থ যদি অন্ধকার বিদূরিত করতে না পারে বরং এরিস্টোটল ও প্লেটোর রচনাবলীই তা পারে, 'তাহলে আমার গ্রন্থ সকল অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে থাকে'– মর্মে খোদার কথা কি কেবল বুলিসর্বস্বই প্রমাণিত হলো? একটি কথার সত্যতা, যখন অভিজ্ঞতা ও অনুমানের মাধ্যমে পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে যায় তখন এর সামনে কে দাঁড়াতে পারে? যেসকল সূক্ষ্ম-সুন্দর-নাজুক ও উন্নতমানের সত্য-বিষয় কুরআন শরীফ হতে বের করে এ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছি তা খতিয়ে দেখলেই আমাদের এই বিবৃতির পক্ষে জোরালো, সরব-সাক্ষী ও চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া যাবে। আর পুরো অন্ধ না হলে কুরআনী এসব সূক্ষ্ম-তত্ত্ব ও সত্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে সবাইকে একথা মানতে হবে যে, শত শত সূক্ষ্ম-তত্ত্ব ও সত্য, যে সম্পর্কে প্লেটো ও এরিস্টোটল স্বপ্নেও ভাবতে

পারত না, কুরআন সেসবকে পরিবেষ্টন করে আছে। সুতরাং এর ফলাফল কি এটি বের হয় না যে, খোদা তা'লার বাণী সকল ধর্মীয় সূক্ষ্ম বিষয়াদির সমাহার? আমি একথা আবারও লিখছি যে, এই রীতি অবলম্বন করে খোদা মানুষকে কোনো সমস্যায় ফেলেন নি বরং প্রধানত তাকে দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন এবং এরপর প্রণিধানের উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। এসবই হলো ঐশী-দান, যার ফলে মানুষের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় আর মানুষ ও পশুর মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। পশুকে খোদা তা'লা চিন্তাশক্তি দান করেন নি এবং তারা কোনো কিছু চিন্তাও করে নি। এছাড়া লক্ষ্য করে দেখ, তারা কি সেভাবেই রয়ে যায় নি? আর এই সন্দেহ ঠিক নয় যে, খোদা স্বীয় গ্রন্থ নিরক্ষর ও জংলিদের জন্য পাঠিয়েছেন! (আর তা তাদের বোধবুদ্ধি অনুসারে হওয়া উচিত ছিল)। প্রধানত এককথায় যে মিথ্যা লুক্কায়িত আছে তা হলো, সে বাণী নিছক নিরক্ষরদের শিক্ষার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। খোদা নিজেই বলেছেন, সারা বিশ্ব ও বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের সংশোধনের জন্য এই গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে। যেভাবে নিরক্ষররা এ গ্রন্থে সম্বোধিত, একইভাবে এতে খ্রিষ্টান, ইহুদি, তারকাপূজারী, সাবী, ধর্মহীন ও নাস্তিক ইত্যাদি সকল ফির্কা সম্বোধিত, আর এতে সবার কলুষিত চিন্তাধারার খণ্ডন রয়েছে। সকলকে শোনানো হয়েছে যে–

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

(সূরা আল আ'রাফ: ১৫৯)

সুতরাং যেখানে এ বিষয়টি প্রমাণিত যে, কুরআন শরীফকে সমগ্র বিশ্বের সকল প্রকৃতির মানুষের সাথে বোঝাপড়া করতে হয়েছে, সেখানে নিজেই চিন্তা করে দেখো যে, এমন ক্ষেত্রে সকল প্রকৃতির মানুষের সামনে স্বীয় মাহাত্ম্য ও সত্যতা প্রকাশ করা ও সন্দেহ দূরীভূত করা আবশ্যক ছিল, কি ছিল না? এছাড়া যদিও এ গ্রন্থ ও বাণীতে নিরক্ষররাও সম্বোধিত, কিন্তু এর অর্থ এটি নয় যে, খোদা নিরক্ষরদেরকে নিরক্ষরই রাখা পছন্দ করতেন। বরং তিনি চাইতেন যে, মানবতা ও বিবেকের যে সকল শক্তি তাদের প্রকৃতিতে রয়েছে, তা যেন অন্তর্নিহিত শক্তি থেকে প্রকাশিত বৈশিষ্ট্য হিসেবে সামনে এসে যায়। নির্বোধকে যদি চিরনির্বোধই রাখতে হয়, তাহলে শিক্ষা দ্বারা লাভ কী হলো? জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রতি মানুষকে খোদা নিজেই অনুপ্রাণিত করেছেন। দেখো আয়াত–

يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا

(সূরা আল বাকারা: ২৭০)

এ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ওপর কতটা জোর দেয়া হয়েছে! এর অর্থ হলো, খোদা যাকে চান প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে প্রজ্ঞা দেয়া হয়েছে তাকে প্রভূত ধনভাণ্ডার দেয়া হয়েছে। পুনরায় বলেন–

وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ

(সূরা আল বাকারা: ১৫২)

অর্থাৎ মহানবী (সা.)-কে কিতাব ও প্রজ্ঞা এবং সেসব সত্য ও তত্ত্বজ্ঞান শেখান যা নিজ শক্তিবলে অবগত হওয়া তোমাদের জন্য সম্ভব ছিল না। আবার বলেন–

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

(সূরা আল ফাতির: ২৯)

অর্থাৎ খোদাকে তারাই ভয় করে যারা জ্ঞানী। পুনরায় বলেন–

قُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا

(সূরা তা হা: ১১৫)

দোয়া করো যে, 'হে খোদা! আমাকে জ্ঞানের সোপানে ক্রমান্বয়ে উন্নতিদান করো'। পুনরায় বলেন–

مَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا

(সূরা বনী ইসরাঈল: ৭৩)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ পৃথিবীতে অন্ধ আর খোদা সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে নি, পরজগতেও সে অন্ধ থাকবে বরং অন্ধদের চেয়েও নিকৃষ্ট হবে। এরপর এই দোয়া শেখান–

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

(সূরা আল ফাতেহা: ৬-৭)

অর্থাৎ হে স্রষ্টা! আমাদের সামনে সেই 'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সরল পথ প্রকাশ

করো, যা তুমি উৎকর্ষ সাধনকারী লোকদের সামনে প্রকাশ করেছ, যাদের প্রতি তোমার কৃপা ও দয়া ছিল। উৎকর্ষ সাধনকারী লোকদের সোজা পথ হলো তারা অন্ধদের মতো নন, বরং তারা অন্তর্দৃষ্টির নিরিখে সত্য উদঘাটন করেন। সুতরাং এই দোয়ার সারকথা এটিই প্রমাণিত হলো যে, 'হে খোদা! সেই সকল সত্য জ্ঞান ও সঠিক-তত্ত্ব, সুগভীর রহস্যাবলী ও সূক্ষ্ম-সত্য, যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লোকদেরকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময় তুমি দিয়ে এসেছো, এখন তার সবকটির সমাহার আমাদের মাঝে ঘটাও। সুতরাং দেখুন! এই দোয়া'তেও খোদার কাছে জ্ঞান ও প্রজ্ঞাই চাওয়া হয়েছে আর সেই জ্ঞান যাচনা করা হয়েছে যা সারা বিশ্বের বিভিন্ন পর্যায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। সারকথা হলো, মুক্তির নীতিগুলো খোদা তা'লা যদিও অতি স্পষ্ট ও সহজভাবে স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যা জানা ও উদঘাটন করতে কোনো প্রকার সমস্যা নেই এবং কোনো অস্পষ্টতাও নেই আর সকল শিক্ষিত ও অশিক্ষিত এক্ষেত্রে সমান, কিন্তু প্রজ্ঞার সেই মূর্ত-প্রতীক ঐশী জ্ঞানের সূক্ষ্মতা ও মহান রহস্য সম্পর্কে চেয়েছেন যে, মানুষ যেন পরিশ্রম করে তা খুঁজে বের করে, যাতে করে সেই পরিশ্রম তার আপন সত্তার উৎকর্ষতার কারণ হতে পারে। কেননা সকল মানবীয় শক্তি-বৃত্তির স্থায়ীত্ব ও স্থিতি পরিশ্রম ও অনুশীলনের ওপর নির্ভর করে। মানুষ যদি সদা চোখ বন্ধ রাখে, কখনো তা দিয়ে দেখার কাজ না করে তাহলে (যেমনটি চিকিৎসাশাস্ত্রের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত) কিছুদিন পর সে অন্ধ হয়ে যাবে, কান বন্ধ রাখলে বধির হয়ে যাবে, আর যদি হাত পা নাড়াচাড়া না করে, তাহলে চূড়ান্ত ফলাফলস্বরূপ সেগুলোতে আর কোনো অনুভূতি এবং নড়াচড়ার শক্তি– কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। একইভাবে স্মৃতিশক্তি কাজে না লাগালে স্মরণশক্তিতে ত্রুটি দেখা দিবে। অনুরূপভাবে চিন্তাশক্তিকে অকেজো করে রাখলে সেটিও কমতে কমতে বিলুপ্তপ্রায় হয়ে যাবে। সুতরাং এটি তাঁর কৃপা ও বদান্যতা যে, তিনি বান্দাদেরকে সে পথে পরিচালিত করতে চেয়েছেন, যার ওপর তাদের দৃষ্টিশক্তির পূর্ণতা নির্ভর করে। পরিশ্রম করা থেকে খোদা তা'লা যদি তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে বিরত রাখতে চাইতেন তাহলে স্বীয় শেষ গ্রন্থ পুরো মানবকুলের জন্য (যারা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলে) একই ভাষায় (অর্থাৎ আরবি ভাষায়) অবতীর্ণ করার কোনো যুক্তি ছিল না, যে ভাষা সম্পর্কে তারা অনবহিত। কারণ ভিন্ন ভাষা সম্পর্কে অবগত হওয়া অনুসন্ধান ও পরিশ্রম ছাড়া সম্ভব নয়, তা সে যত সামান্যই হোক না কেন।

পঞ্চম প্রারম্ভিক বিষয়

বিবেক যে নিদর্শনকে শনাক্ত করে এবং তা খোদার পক্ষ থেকে হওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তা সেসব নিদর্শন থেকে সহস্র সহস্র গুণ শ্রেয় যা কেবল কল্পকাহিনী হিসেবে উদ্ধৃত করা হয়। এই (যুক্তিকে) প্রাধান্য দেয়ার দু'টো কারণ রয়েছে। প্রধানত গ্রন্থমূলে উদ্ধৃত নিদর্শন বা মোজেযাসমূহ আমাদের জন্য, যারা নিদর্শন দেখানোর শত শত বছর পর জন্ম গ্রহণ করেছে, পর্যবেক্ষণ বা অভিজ্ঞতা গণ্য হতে পারে না আর পরম্পরাগত বা গ্রন্থমূলে উল্লিখিত সংবাদ হওয়ার কারণে (এসবের) সেই মর্যাদা লাভ হওয়া সম্ভব নয় যা চোখে দেখা বিষয় ও অভিজ্ঞতায় রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, যারা পরম্পরাগত বা গ্রন্থাবলীতে উল্লিখিত নিদর্শনাবলী দেখেছে যা যুক্তিবুদ্ধির উর্ধ্বে, তা তাদের জন্যও পূর্ণ প্রবোধ ও প্রশান্তির কারণ বলে গণ্য হতে পারে না। কেননা এমন অনেক বিস্ময়কর বিষয়াদিও রয়েছে যা ভেল্কিবাজরা দেখিয়ে বেড়ায় তা ধোঁকা ও প্রতারণাই হোক না কেন। কিন্তু দুরভিসন্ধিবাজ এসব বিরোধীর সামনে কী করে প্রমাণ করা যায় যে, নবীদের পক্ষ থেকে এধরনের যে বিস্ময়কর বিষয়াদি প্রকাশ পেয়েছে, অর্থাৎ কেউ সাপ বানিয়ে দেখিয়েছেন, কেউ মৃতকে জীবিত করে দেখিয়েছেন, তা সে ধরনের ভেল্কিবাজি থেকে পবিত্র, যা ভেল্কিবাজরা করে বেড়ায়। এই সকল সমস্যা কেবল আমাদের যুগেই সৃষ্টি হয় নি, বরং সে যুগেই হয়ত এসব সমস্যা দেখা দিয়ে থাকবে। যেমন, আমরা যোহনের ইঞ্জিলের ৫ অধ্যায়ের ২ থেকে ৫ শ্লোক পর্যন্ত পড়লে তাতে এটি দেখতে পাই যে, *যিরুশালেমে মেষ-দ্বারের নিকট একটি পুকুর আছে, ইব্রীয় ভাষায় সেটির নাম বাইতে হুদা আর এর পাঁচটি স্বচ্ছ পানির ঘাট রয়েছে। সেই সকল ঘাটে অনেক অক্ষম, অন্ধ, খঞ্জ ও বিমর্ষের ভীড় ছিল যারা জল সঞ্চালনের অপেক্ষায় ছিল, কেননা ঐ পুকুরে খোদার এক দূত নেমে জল কম্পন করতেন; সেই জলকম্পের পরে যে কেউ প্রথম জলে নামত, তার যেকোনো রোগ হোক সে তা হতে আরোগ্য লাভ করত। সেখানে একটি লোক ছিল, যে আটত্রিশ বছর ধরে অসুস্থ ছিল। যীশু তাকে পড়ে থাকতে দেখেন এবং জানতে পারেন যে, দীর্ঘকাল থেকে সে সেই অবস্থায় আছে; তিনি বলেন, তুমি কি সুস্থ হতে চাও? রোগী উত্তরে বললো, মহাশয়! আমার এমন কোনো লোক নেই যে, যখন জল কম্পিত হয় তখন আমাকে পুকুরে নামিয়ে দেবে; আমার যেতে যেতে আরেকজন আমার আগে নেমে*

পড়ে। এখন জানা কথা যে, সে ব্যক্তি, যে হযরত ঈসার নবুয়্যত ও তাঁর নিদর্শনাবলীর অস্বীকারকারী, যখন যোহনের এই শ্লোক পড়বে এবং এমন চৌবাচ্চার সংবাদ পাবে, যা হযরত ঈসার দেশে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছিল এবং যাতে প্রাচীনকাল থেকেই এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল যে, তাতে একবার ডুব দিলেই রোগ, তা যত ভয়াবহই হোক না কেন, সকল প্রকার রোগের নিরাময় হতো! তার হৃদয়ে অনর্থক এক দৃঢ় ধারণার সৃষ্টি হবে যে, হযরত ঈসা বিস্ময়কর অলৌকিক লীলা যদি দেখিয়ে থাকেন তাহলে তার কারণ এটিই হবে যে, সেই পুণ্যবান ব্যক্তি হয়ত চৌবাচ্চার পানিতে কোনোভাবে কারসাজি বা হস্তক্ষেপ করে এধরনের অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করে থাকবেন। কেননা, পৃথিবীতে সর্বকালে এমন ঘটনার বহু দৃষ্টান্ত বিরাজমান ছিল আর এখনও আছে। যুক্তি ও বিবেকের নিরিখে একথা একান্ত সঠিক এবং সহজেই অনুমেয় যে, হযরত ঈসার হাতে অন্ধ ও খোঁড়াদের আরোগ্যলাভ যদি হয়েই থাকে, তাহলে নিশ্চিতভাবে এই ব্যবস্থাপত্র হযরত ঈসা এই চৌবাচ্চা থেকে হস্তগত করে থাকবেন; এরপর নির্বোধ ও অতি সরল লোকদের মাঝে, যারা বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে না আর প্রকৃত সত্য শনাক্ত করার সামর্থ্য রাখে না, এটি রাষ্ট্র করে দিয়ে থাকবেন যে, এক রূহ বা ফিরিশতার মাধ্যমে এমন সব কাজ করি। বিশেষকরে, যেখানে একথাও প্রমাণিত যে, হযরত ঈসা প্রায়শ সেই চৌবাচ্চায় যেতেন, সেখানে এই ধারণা আরো বদ্ধমূল হবে। বস্তুত বিরোধীদের দৃষ্টিতে এমন নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে, যা আদি হতে এই চৌবাচ্চা প্রদর্শন করে আসছে, তাতে হযরত ঈসা সম্পর্কে বহু সন্দেহ এবং সংশয় সৃষ্টি হয় আর এ কথা প্রমাণে বড় সমস্যার মুখে পড়তে হয় যে, হযরত ঈসা (আ.) ভেল্কিবাজ ও প্রতারক ছিলেন না (যেমনটি ইহুদিরা মনে করে), বরং নেক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, যিনি স্বীয় নিদর্শন দেখানোর ক্ষেত্রে এই প্রাচীন চৌবাচ্চার কোনো সাহায্য নেন নি এবং বাস্তবেই নিদর্শন দেখিয়েছেন।

এছাড়া কুরআন শরীফে ঈমান আনার পর এসব কুমন্ত্রণা থেকে যদিও পরিত্রাণ লাভ হয়ে যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি এখনো কুরআন শরীফে বিশ্বাস স্থাপন করে নি আর ইহুদি, হিন্দু বা খ্রিষ্টান, সে কী করে এমন কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে পারে! কী করেইবা তার হৃদয় প্রশান্তি পেতে পারে যে, এমন অভিনব চৌবাচ্চা, যেখানে সহস্র সহস্র খোঁড়া ও নুলা আর জন্মান্ধ এক ডুবেই সুস্থ হয়ে যেত আর যা শত শত বছর থেকে নিজের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যের কল্যাণে ইহুদি

এবং এদেশের সকল মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ এবং বহুল আলোচিত, অগণিত মানুষ তাতে ডুব দেয়ার কল্যাণে আরোগ্য লাভ করেছিল এবং প্রতিদিনই লাভ করত। এক ধরনের মেলা লেগে থাকত আর ঈসাও প্রায়শ সেখানে যেতেন এবং এর বিস্ময়কর সব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও এসকল নিদর্শন প্রদর্শনে, যা আদি থেকে সেই চৌবাচ্চা প্রদর্শন করে আসছিল, সেই চৌবাচ্চার পানি বা মাটি থেকে মসীহ্ কোনো সাহায্য নেন নি আর তাতে কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে নিজের ব্যবস্থাপত্র বের করেন নি। অতএব নিঃসন্দেহে এমন ধারণা প্রমাণহীন যা বিরোধীদের সামনে কোনো কাজের নয় আর নিঃসন্দেহে এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের চৌবাচ্চার অস্তিত্ব সম্পর্কে ভাবলে হযরত ঈসার বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি উত্থাপিত হয়, যা কোনোভাবে খণ্ডিত হতে পারে না। এসম্পর্কে যতই ভাববে, সন্দেহ-সংশয় ততই বৃদ্ধি পাবে আর খ্রিষ্টানদের জন্য মুক্তির কোনো পথ চোখে পড়বে না। কেননা পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা দেখে এই সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়। মানুষের নিজের স্মৃতিশক্তিই এমন ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার অনেক দৃষ্টান্ত সামনে নিয়ে আসে, বরং এসব ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সকল মানুষ চাক্ষুষ ঘটনাবলীর একটি স্তুপ নিজের হৃদয়ে ধারণ করে। এধরনের প্রতারণা অতিসরল ও অজ্ঞদের সামনে এমনভাবে কার্যকরী প্রমাণিত হয় আর এমনভাবে দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায় যা প্রতারকদেরকে তাদের প্রতারণায় আরো ধৃষ্ট করে তোলে। সাধারণ মানুষ, যাদের অধিকাংশ পশুতুল্য হয়ে থাকে, তাদের এদিকে দৃষ্টিই থাকে না যে, দীর্ঘ কোনো অনুসন্ধান করবে এবং বিষয়ের গভীরে অবগাহন করবে।

অধিকন্তু এমন তামাশার প্রদর্শনকাল অতি সংক্ষিপ্তই হয়ে থাকে, যা সম্পর্কে চিন্তাভাবনার জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া সম্ভব হয় না। তাই প্রতারকদের জন্য প্রতারণামূলক দক্ষতা প্রদর্শনের অনেক সুযোগ থাকে আর তাদের গুপ্ত-রহস্য সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ কমই আসে। এছাড়া সাধারণ মানুষ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, কলা ও দর্শনশাস্ত্রের কিছুই জানে না আর মূর্তিমান প্রজ্ঞা– খোদা, বিশ্বজগতে বিভিন্ন প্রকার যে বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যাবলী অন্তর্নিহিত রেখেছেন, সেসবে তাদের আদৌ কোনো জ্ঞান থাকে না। সুতরাং তারা সবসময়ে আর সকল যুগে প্রতারণার শিকার হওয়ার জন্য প্রস্তুত। আর কেনইবা প্রতারিত হবে না? কারণ বস্তুর বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্যাবলী এমনিতেই অনেক বিস্ময়কর, আর অজ্ঞতার অবস্থায় তা অধিক বিস্ময়কর হয়ে থাকে। যেমন, মাছি এবং

অন্য কিছু প্রাণির একটি বিশেষত্ব হলো, যদি এদের মৃত্যু এমনভাবে ঘটে যে, এদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সন্ধিস্থল থেকে বেশি বিচ্ছিন্ন না হয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আসল রূপ ও অবস্থায় অক্ষত থাকে আর পঁচেও না বরং তরতাজা থাকে এবং মরার পর ২-৩ ঘণ্টার বেশি সময় অতিবাহিত হয় না, যেমনটি পানিতে পড়ে থাকা মৃত মাছির হয়ে থাকে; তবে এমন পরিস্থিতিতে লবণ মিহি করে যদি সেই মাছি ইত্যাদিকে এর নীচে পুঁতে রাখা হয় এবং এরপর এর ওপর সেই পরিমাণ মাটির প্রলেপ দিয়ে দেয়া হয় তাহলে সেই মাছি জীবিত হয়ে উড়ে চলে যায়। এই বৈশিষ্ট্য সর্বজনবিদিত ও সুপরিচিত, যা অধিকাংশ (অল্পবয়স্ক) ছেলেরাও জানে। এ ব্যবস্থাপত্র সম্পর্কে সরল কোনো মানুষের যদি জানা না থাকে আর কোনো প্রতারক সেই নির্বোধ ও জ্ঞানহীন ব্যক্তির সামনে মাছির চিকিৎসক হওয়ার দাবি করে আর সেই পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে মাছিকে জীবিত করে এবং তা বাহ্যত এটি বোঝানোর জন্য যে, সে মন্ত্রের জোরে মাছি জীবিত করছে, পাশাপাশি কোনো তন্ত্র-মন্ত্রও যদি পাঠ করতে থাকে, তাহলে অতি সরল ব্যক্তির সে বুদ্ধি ও সময় কোথায় যে, সে গবেষণা করে বেড়াবে? তোমরা কী দেখো না যে, ধুরন্ধর ষড়যন্ত্রকারীরা এ যুগে পৃথিবীকে ধ্বংস করছে। কেউ স্বর্ণ বানিয়ে দেখায় আর কিমিতি কোনো সাধারণ ধাতুকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মূল্যবান ধাতুতে রূপান্তর করার দাবি করে আর কেউ নিজেই মাটির নীচে পাথর পুঁতে রেখে হিন্দুদের সামনে দেবী বের করার ভান করে। কিছু লোক জামাল গোটার রং নিজের দোয়াতের কালিতে মেশায়, তারপর সেই কালি ব্যবহার করে অতি সরল কোনো ব্যক্তিকে তাবিজ লিখে দেয়, যেন দাস্ত হলে তাবিজের ভেল্কি প্রকাশ পায়। এমন আরো সহস্র ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা রয়েছে, যা এযুগে প্রকাশ পাচ্ছে। এছাড়া কিছু প্রতারণা এত গভীর যে, বড় বড় জ্ঞানীরাও এর দ্বারা প্রতারিত হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সুগভীর সূক্ষ্ম রহস্যাবলী ও দৈহিক গঠন এবং শক্তি-বৃত্তির বিস্ময়কর বিশেষত্ব, যা আধুনিক যুগে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত বিস্তার লাভ করে চলেছে, এসব হলো নতুন বিষয় যার মাধ্যমে মিথ্যা নিদর্শন প্রদর্শনকারীরা নিত্যনুতন প্রতারণা ও ভেল্কি দেখাতে পারে। সুতরাং এ গবেষণার মাধ্যমে এটি স্পষ্ট যে, যেসব নিদর্শন বাহ্যত এসব ষড়যন্ত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, সত্য হলেও সেগুলোর বাস্তবতা পর্দাবৃত আর সেসবের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করার পথে বড় বড় অন্তরায়ও বিদ্যমান।

ষষ্ঠ প্রারম্ভিক বিষয়

যেভাবে সেসব নিদর্শন, যার সত্যতা আবৃত ও অপ্রকাশিত থাকে তা যৌক্তিক নিদর্শনাবলীর সমান হতে পারে না, অনুরূপভাবে ভবিষ্যদ্বাণী ও অতীতের সংবাদ, যা জ্যোতিষী, গণক, ভবিষ্যদ্‌বেত্তা ও ঐতিহাসিকদের বর্ণনার রীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে থাকে, তা সেসব ভবিষ্যদ্বাণী ও অদৃশ্য সংবাদের সমান হতে পারে না যা কেবল সংবাদ নয়, বরং তার সাথে ঐশী শক্তিও সম্পৃক্ত থাকে। কেননা নবীগণ ছাড়াও পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ দেখা যায়, যারা ঘটনা ঘটার পূর্বেই এমন এমন সংবাদ দিয়ে থাকে; যেমন, ভূমিকম্প আসবে, মহামারি দেখা দেবে, যুদ্ধবিগ্রহ হবে, দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে, এক জাতি অন্য জাতির ওপর আগ্রাসী হামলা করবে, এই হবে– সেই হবে, আর তাদের কোনো না কোনো সংবাদ বহুবার সত্যও হয়ে যায়। অতএব এসব সন্দেহ দূরীভূত করার জন্য সেসব ভবিষ্যদ্বাণী ও অদৃশ্যের সংবাদ অসাধারণ ও সম্পূর্ণ বিবেচিত হবে, যার সাথে ঐশী শক্তিমত্তার এমন নিদর্শন থাকা বাঞ্ছনীয় যাতে গণক, স্বপ্নদ্রষ্টা ও জ্যোতিষী প্রমুখের অংশীদার হওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ তাদের মাঝে খোদা তা'লার কামেল প্রতাপের প্রবাল্য ও তাঁর সাহায্য-সমর্থনের এমন মহান ঔজ্জ্বল্য ও জ্যোতি পরিদৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় যা পরিষ্কারভাবে তাঁর বিশেষ দৃষ্টির স্বাক্ষর বহন করবে। অধিকন্তু তা এমন সাহায্যের সংবাদভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাতে নিজের বিজয় আর বিরোধীদের পরাজয়, স্বীয় সম্মান ও বিরোধীদের লাঞ্ছনা, নিজের উন্নতি এবং বিরোধীদের অবনতি সবিস্তারে প্রকাশিত থাকবে। যথাস্থানে আমরা এর বর্ণনা দিব এবং কিছুটা দিয়েছিও, এই উন্নত পর্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো কেবল কুরআনেরই বিশেষত্ব, যা পাঠে ঐশী-প্রতাপের এক জগৎ চোখে পড়ে।

সপ্তম প্রারম্ভিক বিষয়

কুরআন শরীফে বিভিন্ন রহস্যাবলী ও তত্ত্বজ্ঞানের বর্ণনার পাশাপাশি ধর্মীয় জ্ঞান, সূক্ষ্ম ঐশী-বিষয়াদির জ্ঞান ও সত্য-নীতি সংক্রান্ত সুনিশ্চিত প্রমাণাদির যেসব সূক্ষ্মসত্য উল্লিখিত আছে, সেগুলো যদিও স্বীয় বৈশিষ্ট্যে এমন যে, সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানবীয় শক্তি-বৃত্তি তা আবিষ্কারে অক্ষম আর কোনো বুদ্ধিমানের বুদ্ধি তা উদ্ভাবনের জন্য নিজে প্রথমে কিছু করার ক্ষমতা রাখে না।

কেননা এ বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য পূর্ববর্তী বিভিন্ন যুগের প্রতি সন্ধানী-দৃষ্টিপাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, এসকল জ্ঞান ও তত্ত্ব উদ্ভাবনকারী কোনো দার্শনিক বা জ্ঞানী ব্যক্তি অতিবাহিত হয় নি। কিন্তু এখানে মহাবিস্ময়কর যে বিষয়টি বিদ্যমান তা ভিন্ন। অর্থাৎ সে জ্ঞান ও তত্ত্ব এমন এক নিরক্ষরকে প্রদান করা হয়েছে, যিনি আদৌ লিখতে-পড়তে জানতেন না, সারাজীবন যিনি কোনো মক্তবের চেহারাও দেখেন নি, না কোনো গ্রন্থের কোনো অক্ষর পড়েছেন আর না কোনো বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সাহচর্য লাভ হয়েছে, বরং তার সারাজীবন অতিবাহিত হয়েছে বন্য ও পশুতুল্য লোকদের মাঝে। তাদের মাঝেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং তাদের মাঝেই লালিতপালিত হন আর তার মেলামেশাও ছিল তাদেরই সাথে। মহানবী (সা.)-এর নিরক্ষর ও শিক্ষাদীক্ষাহীন হওয়া এমন একটি সুবিদিত বিষয় যে, ইসলামের কোনো ঐতিহাসিক এ সম্পর্কে অনবহিত নয়, কিন্তু এ বিষয়টি যেহেতু পরবর্তী অধ্যায়গুলোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর হবে, তাই আমরা কুরআনের কিছু আয়াত লিখে মহানবী (সা.)-এর অক্ষরজ্ঞানহীন হওয়া প্রমাণ করব। কাজেই সেসব আয়াত সবিস্তারে নিম্নে উদ্ধৃত হচ্ছে–

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

(সূরা আল জুমুআ: ৩)

অর্থাৎ সেই খোদা, যিনি নিরক্ষরদের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে এক রসূল প্রেরণ করেন। তাদের সামনে সে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করে, তাদেরকে পবিত্র করে, তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয়; যদিও তারা ইতিপূর্বে প্রকাশ্য ভ্রষ্টতায় নিপতিত ছিল।

عَذَابِىْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ ۗ فَسَاَكْتُبُهَا
لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ۝
اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ
فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ۫ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ الۡخَبٰٓئِثَ وَ يَضَعُ عَنۡهُمۡ اِصۡرَهُمۡ وَ الۡاَغۡلٰلَ الَّتِىۡ كَانَتۡ عَلَيۡهِمۡ ؕ فَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا بِهٖ وَ عَزَّرُوۡهُ وَ نَصَرُوۡهُ وَ اتَّبَعُوا النُّوۡرَ الَّذِىۡۤ اُنۡزِلَ مَعَهٗۤ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ○

قُلۡ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىۡ رَسُوۡلُ اللّٰهِ اِلَيۡكُمۡ جَمِيۡعَا ۨ الَّذِىۡ لَهٗ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحۡىٖ وَ يُمِيۡتُ ۖ فَاٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَ رَسُوۡلِهِ النَّبِىِّ الۡاُمِّىِّ الَّذِىۡ يُؤۡمِنُ بِاللّٰهِ وَ كَلِمٰتِهٖ وَ اتَّبِعُوۡهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُوۡنَ ○

(সূরা আল আ'রাফ: ১৫৭-১৫৯)

অর্থাৎ আমি যাকে চাই শাস্তি দেই আর আমার রহমত সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। সুতরাং যারা সকল প্রকার শিরক, কুফর ও অশ্লীলতা এড়িয়ে চলে, যাকাত প্রদান করে এবং আমাদের নিদর্শনে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে, আমি তাদেরকে নিজ রহমতে সিক্ত করবো; তারাই সেই রসূল-নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, যার মাঝে আমাদের পূর্ণ শক্তির দুটো নিদর্শন রয়েছে।

একটি হলো– বাইরের (অর্থাৎ পূর্ববর্তী গ্রন্থে বিধৃত) নিদর্শন অর্থাৎ তওরাত ও ইঞ্জিলে তার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যা তারা নিজেরাও নিজেদের গ্রন্থে বিদ্যমান দেখতে পায়। দ্বিতীয়ত, সেই চিহ্ন যা সেই নবীর সত্তায় বিদ্যমান আর তা হলো, নিরক্ষর ও শিক্ষাদীক্ষাহীন হওয়া সত্ত্বেও সে এমন পরিপূর্ণ হেদায়েত নিয়ে আসে যে, সকল প্রকার প্রকৃত সত্য, যার সত্যতা বিবেক ও শরীয়ত শনাক্ত করে আর যা পৃথিবী থেকে হারিয়ে গিয়েছিল তা মানুষের হেদায়েতের জন্য বর্ণনা করে, তাদেরকে তা পালনের নির্দেশ দেয় আর সকল অযৌক্তিক কথা, যার সত্যতা যুক্তি ও শরীয়ত অস্বীকার করে, তা থেকে বারণ করে, পবিত্র বস্তুকে পবিত্র আর নোংরা বস্তুকে নোংরা আখ্যায়িত করে আর ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের মাথা থেকে সেই ভারী বোঝা অপসারণ করে যা তাদের ওপর নিপতিত ছিল। অধিকন্তু যে সকল বেড়িতে তারা আবদ্ধ ছিল, তা থেকেও তাদেরকে পরিত্রাণ দেয়। সুতরাং যারা তার ওপর ঈমান আনবে এবং তাকে শক্তি যোগাবে, সাহায্য করবে আর সেই আলোর শতভাগ আনুগত্য করবে যা তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে, তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত। মানুষকে বলে দাও, আমি খোদার পক্ষ থেকে তোমাদের সবার প্রতি প্রেরিত হয়েছি। সেই খোদা, যিনি অংশীদারিত্ব-মুক্তভাবে অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি, যিনি

ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য অন্য কোনো খোদা নেই। তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দেন। সুতরাং সেই খোদার ওপর আর তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আন, যিনি কিনা নিরক্ষর; সেই নবী, যে আল্লাহ্ এবং তাঁর বাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আর তোমরা তাঁর অনুসরণ কর যেন হেদায়েত পেতে পার।

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ؕ مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ؕ وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

(সূরা আশ শূরা: ৫৩)

অর্থাৎ এভাবে আমরা আমাদের নির্দেশে তোমার প্রতি একটি রূহ অবতীর্ণ করেছি। কিতাব ও ঈমান কাকে বলে তোমার জানা ছিল না। আর আমরা একে একটি নূর বা জ্যোতি বানিয়েছি। আমরা যাকে চাই এর মাধ্যমে হেদায়েত দান করি। নিশ্চয় তুমি সঠিক পথের দিকেই হেদায়েত দিয়ে থাক।

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ○ بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ○

(সূরা আল আন্‌কাবূত: ৪৯-৫০)

অর্থাৎ আর এর পূর্বে তুমি কোনো কিতাব পড়তে না আর না স্বহস্তে কিছু লিখতে, তাহলে হয়ত মিথ্যা-পূজারীদের সন্দেহ করার কোনো যৌক্তিকতা থাকত। সত্যকথা হলো, তা স্পষ্ট আয়াত যা জ্ঞানীদের বক্ষে রয়েছে আর কেবল তারা তা অস্বীকার করে, যারা সীমালঙ্ঘনকারী।

তিনি এমন কোনো দেশে দাবি করেন নি, যে দেশের মানুষকে তাঁর অবস্থা ও ঘটনাবলী সম্পর্কে অনবহিত ও অজ্ঞ আখ্যা দিতে পারি। বরং তারা সকলে এমন ছিল, যাদের মাঝে মহানবী (সা.) জীবনের প্রারম্ভ থেকে বেড়ে উঠেছেন এবং পুরো জীবনের একটি অংশ তাদের সাথে মেলামেশার মাঝে ও তাদের সাহচর্যে কাটিয়েছেন। সুতরাং তিনি (সা.) সত্যিই যদি নিরক্ষর না হতেন, তবে নিজের উম্মী হওয়ার কথা তাদের মাঝে উচ্চারণও করতে পারতেন না। তাদের সামনে তাঁর কোনোকিছু গোপন ছিল না, যারা সদা তাঁর কথায় কোনো

অসামঞ্জস্যতা প্রমাণ করা ও তা রাষ্ট্র করে দেয়ার দুরভিসন্ধি নিয়ে ওঁৎ পেতে থাকত, যাদের শত্রুতা এমন পর্যায়ে উপনীত ছিল যে, সুযোগ পেলে মিথ্যা কথা বানিয়েই তারা তা প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে দিত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের সকল কুধারণার এমন দাঁতভাঙা জবাব দেয়া হতো যে, তাদের মুখ বন্ধ হয়ে যেতো এবং তারা নির্বাক হয়ে যেতো। উদাহরণস্বরূপ, মক্কার কিছু নির্বোধ যখন একথা বলা আরম্ভ করে যে, কুরআনে বর্ণিত একত্ববাদ আমাদের পছন্দ নয়; এমন কোনো কুরআন আনো যাতে প্রতিমাপূজা ও তাদের সম্মান করার কথা বিধৃত থাকবে বা এতে কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে একত্ববাদের পরিবর্তে শির্ক অন্তর্ভুক্ত কর, তাহলে আমরা গ্রহণ করব এবং ঈমান আনব। খোদা তা'লা তখন নিজের নবীকে তাদের প্রশ্নের সেই উত্তর শিখিয়েছেন যা মহানবীর জীবনের ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টি দিলে বুঝা যায়, আর তা হলো:

قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ ؕ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○ قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ○

(সূরা ইউনুস: ১৬-১৮)

অর্থাৎ যারা আমাদের সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে না অর্থাৎ আমাদের সাথে সম্পর্ক পুরোপুরি ছিন্ন করে ফেলেছে, তারা বলে যে, এই কুরআনের পরিবর্তে অন্য এমন কোনো কুরআন নিয়ে আস, যার শিক্ষা এর শিক্ষা থেকে ভিন্ন হবে বা এতে পরিবতর্ন আনো। তাদেরকে এ উত্তর দাও যে, আমার এ শক্তি নেই আর খোদার বাণীতে নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তন আনয়ন করা সঙ্গতও নয়। আমি কেবল সেই ওহীর অনুসরণকারী, যা আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়ে থাকে আর আমি আমার খোদার অবাধ্য হওয়াকে ভয় করি। খোদা যদি চাইতেন তাহলে আমি তোমাদেরকে এই বাণী শোনাতাম না আর খোদা তোমাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিতও করতেন না। ইতিপূর্বে আমি এত দীর্ঘ একটি সময় (অর্থাৎ ৪০ বছর) তোমাদের মাঝে অতিবাহিত করেছি, তারপরও কি তোমরা

বিবেকবুদ্ধি খাটাবে না? অর্থাৎ তোমরা কি সবিশেষ অবগত নও যে, মিথ্যা-দাবি করা আমার কাজ নয় আর মিথ্যা বলা আমার অভ্যাস নয়? এরপর বলেন, সে ব্যক্তির চেয়ে বড় অন্যায়কারী আর কে হবে, যে খোদার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে বা খোদার বাণী সম্পর্কে বলে যে, এটি মানুষের বানানো বিষয়। নিঃসন্দেহে অপরাধীরা মুক্তি পাবে না।

এককথায়, খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের দৃষ্টিতে মহানবী (সা.)-এর নিরক্ষর হওয়া এত স্পষ্ট ও নিশ্চিত এক বিষয় ছিল যে, তারা এটি কোনোভাবে অস্বীকার করার সাহস দেখাতে পারতো না। বরং এ দৃষ্টিকোণ থেকে তারা তওরাতের অধিকাংশ কাহিনী, যা কোনো শিক্ষিত মানুষের সামনে গোপন থাকতে পারে না, সম্পূর্ণরূপে মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যতকে পরীক্ষা করার জন্য তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করত; আর সঠিক উত্তর পেয়ে এবং তওরাতের কাহিনীতে যেসব মারাত্মক ভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল, সেসব ভ্রান্তি থেকে তাঁর উত্তরকে মুক্ত পেয়ে তাদের মাঝে যারা জ্ঞানের গভীরতায় বিদগ্ধ ছিল, তারা আন্তরিকভাবে ঈমান আনত; যার কথা কুরআন শরীফে এভাবে উল্লেখ রয়েছে–

وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝ وَاِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۝ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۙ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ۝

(সূরা আল মায়েদা: ৮৩-৮৫)

অর্থাৎ সব ফির্কার মাঝে মুসলমানদের প্রতি বেশি আকর্ষণ রাখে খ্রিষ্টানরা; কেননা তাদের মাঝে কেউ কেউ জ্ঞানী ও সন্যাসীও রয়েছে যারা অহংকার করে না। তারা যখন রসূলের প্রতি অবতীর্ণ খোদার বাণী শোনে, তুমি তাদের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে দেখবে। কেননা তারা ঐশী-বাণীর সত্যতা বুঝে যায়, আর বলে, হে খোদা! আমরা ঈমান আনলাম। আমাদেরকে সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও, যারা তোমার ধর্মের সত্যতার সাক্ষী। আর আমরা খোদা ও খোদার সত্য-বাণীর ওপর কেন ঈমান আনব না– যখন কিনা আমাদের বাসনা হলো, খোদা! আমাদেরকে পুণ্যবান বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন?

اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖۤ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ○ وَّ يَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ○ وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ○

(সূরা বনী ইসরাঈল: ১০৮-১১০)

অর্থাৎ ইহুদি-খ্রিষ্টানদের মধ্য থেকে যারা জ্ঞানী, তাদের সামনে যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তারা অবনত মস্তকে কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে আর বলে, আমাদের খোদা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা থেকে পবিত্র। আমাদের খোদার প্রতিশ্রুতি একদিন পূর্ণ হওয়ারই ছিল। অধিকন্তু ক্রন্দনরত অবস্থায় তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে আর খোদার বাণী তাদের মাঝে বিনয় ও নম্রতা বৃদ্ধি করে।

সুতরাং এ হলো তাদের অবস্থা, যারা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের মাঝে জ্ঞানী এবং ন্যায়পরায়ণ ছিল। মহানবী (সা.)-এর অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করে একদিকে তারা দেখত যে, তিনি পুরোপুরি নিরক্ষর; শিক্ষাদীক্ষার বিন্দুমাত্রও তিনি অর্জন করেন নি এবং কোনো সভ্য জাতির মাঝে তাঁর বসবাসও ছিল না আর কোনো জ্ঞানগর্ভ বৈঠক দেখার সুযোগও হয় নি। অপরদিকে কুরআনে তারা কেবল অতীত গ্রন্থাবলীর কাহিনী নয় বরং শত শত সূক্ষ্ম-সত্য দেখতে পেত, যা হচ্ছে পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলীকে পূর্ণতা ও সম্পূর্ণতা প্রদানকারী। একদিকে তারা মহানবী (সা.)-এর নিরক্ষরতার কথা ভাবত, অপরদিকে সেই অন্ধকার যুগে সেসকল জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব দেখত। এছাড়া বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্যোতি প্রত্যক্ষ করে মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যত তাদের কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট মনে হতো। এটি জানাকথা যে, মহানবী (সা.)-এর নিরক্ষর ও খোদার মদদপুষ্ট হওয়া সম্পর্কে খ্রিষ্টান এই আলেমদের যদি বিশ্বাস না থাকত, তাহলে তারা এমন একটি ধর্ম ছেড়ে, যার সমর্থনে রোমান বাদশাহ্‌র রাজত্ব কাজ করছিল এবং যা কেবল এশিয়ায় নয় বরং ইউরোপের কোনো কোনো অংশেও বিস্তার লাভ করেছিল, নিজেদের পৌত্তলিকতাপূর্ণ শিক্ষার কারণে সকল জগৎ-পূজারির কাছে যা ছিল প্রিয় ও সমাদৃত, কেবল সন্দেহ নিয়ে এমন ধর্ম গ্রহণ তারা করত না যা একত্ববাদের শিক্ষা দেয়ার কারণে সকল পৌত্তলিকের কাছে অপছন্দনীয় মনে হতো আর একই সাথে এর মান্যকারীরা প্রতিটি মুহূর্তে সকল দিক থেকে ধ্বংসের মুখোমুখি ও বিপদাপদে নিপতিত ছিল। সুতরাং যে বিষয় তাদের

হৃদয়কে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছে তা হলো, তারা মহানবী (সা.)-কে সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষর ও আপাদমস্তক খোদার মদদপুষ্ট পেয়েছে। অধিকন্তু তারা কুরআন শরীফকে মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে দেখতে পেয়েছে। পূর্ববর্তী বিভিন্ন গ্রন্থে তারা এই শেষ নবীর আগমন-সংক্রান্ত বিভিন্ন শুভ সংবাদের কথা নিজেরা পাঠ করত। সুতরাং ঈমান আনার জন্য খোদা তা'লা তাদের বক্ষ উন্মোচিত করেছেন, আর বিশ্বাসে তারা এতটা সৎ প্রমাণিত হয়েছেন যে, খোদার পথে নিজেদের রক্ত দিয়েছেন। ইহুদি, খ্রিষ্টান ও আরবদের মধ্য থেকে যারা চরম অজ্ঞ ও দুষ্কৃতিপরায়ণ এবং নোংরা হৃদয়ের মানুষ ছিল, তাদের অবস্থার প্রতিও দৃষ্টিপাত করলে জানা যায় যে, তারাও মহানবী (সা.)-কে নিরক্ষরই মনে করত।

একারণেই যখন তারা বাইবেলের কোনো কোনো অংশ পরীক্ষাস্বরূপ মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করে সঠিক উত্তর পেত তখন একথা বলার ধৃষ্টতা দেখাত না যে, মহানবী (সা.) কিছুটা পড়ালেখা জানতেন, তাই তিনি নিজেই বইপুস্তক দেখে উত্তর প্রদান করতেন! বরং যেভাবে কেউ নির্বাক ও লজ্জিত হয়ে ভিত্তিহীন অজুহাত সন্ধান করে, অনুরূপভাবে চরম লজ্জার সাথে তারা বলত যে, হয়ত গোপনে বাইবেলের ইহুদি বা খ্রিষ্টান কোনো আলেম এই কাহিনী তাঁকে শিখিয়ে থাকবে। সুতরাং জানাকথা যে, মহানবী (সা.) যে উম্মী ছিলেন, তা তাদের হৃদয়ে যদি পূর্ণবিশ্বাসের সাথে বদ্ধমূল না হতো, তাহলে তারা একথা প্রমাণ করার যারপর নাই চেষ্টা করত যে, মহানবী (সা.) নিরক্ষর নন, অমুক মক্তব ও মাদ্রাসায় তিনি শিক্ষা পেয়েছেন। এমন বাজে কথাবার্তা বলার কী প্রয়োজন ছিল যার মাধ্যমে তাদের নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায়? কেননা এই অপবাদ আরোপ করা যে, পর্দার অন্তরালে কিছু ইহুদি ও খ্রিষ্টান আলেম মহানবী (সা.)-এর বন্ধু ও সাহায্যকারী– এটি স্পষ্টতই মিথ্যা ছিল। এর কারণ হলো, বিভিন্ন স্থানে কুরআন যেখানে আহলে কিতাবের ওহীকে ত্রুটিযুক্ত বা দুর্বল আর তাদের গ্রন্থাবলীকে প্রক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত আখ্যা দেয় আর তাদের বিশ্বাসকে রুগ্ন ও মিথ্যা আর ঈমানহীন হিসেবে মৃত্যু বরণের ক্ষেত্রে তাদের অভিশপ্ত ও জাহান্নামী আখ্যা দেয়; অধিকন্তু তাদের কৃত্রিম নীতিমালাকে শক্তিশালী প্রমাণাদির মাধ্যমে খণ্ডন করে, সেখানে স্বীয় ধর্মের সমালোচনা তারা নিজেরাই কুরআন দ্বারা করাবে, নিজেদের গ্রন্থাবলীর খণ্ডন নিজেরাই লেখাবে, আর স্বীয় ধর্ম নির্মূলের কারণ নিজেরাই হবে– এটি কী করে সম্ভব

হতে পারে? সুতরাং জগৎ-পূজারিদের এসব অলীক গালগল্প ও ভ্রান্ত-অসংলগ্ন কথাবার্তার কারণ হলো– যুক্তিযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের উপায় তাদের চোখে পড়ত না আর সত্যের সূর্য চতুর্দিকে এমনভাবে উজ্জ্বল কিরণ বিচ্ছুরিত করছিল যে, এ থেকে বাঁচার জন্য তারা বাদুড়ের ন্যায় পালিয়ে বেড়াত। কোনো একটি কথায় আদৌ তারা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিল না বরং বিদ্বেষ ও শত্রুতা তাদেরকে উন্মাদপ্রায় করে রেখেছিল। প্রথমে কুরআনের কাহিনী, যাতে ইস্রাঈলী নবীদের উল্লেখ ছিল, তা শুনে তারা এই সন্দেহে লিপ্ত হয় যে, হয়ত আহলে কিতাবের এক ব্যক্তি গোপনে এসকল কাহিনী শিখিয়ে থাকবে। যেমন কুরআনে তাদের এই উক্তি এভাবে উল্লিখিত আছে যে–

إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ

(সূরা আন নাহল: ১০৪)

অর্থাৎ এরপর যখন দেখল যে, কুরআন শরীফে কেবল কাহিনী নয় বরং এতে মহাসত্য নিহিত রয়েছে, তখন দ্বিতীয় এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করল–

وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ

(সূরা আল ফুরকান: ৫)

অর্থাৎ বিশাল একটি গোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে কুরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করেছে; এটি কোনো এক ব্যক্তির কাজ নয়। এরপর কুরআন শরীফে যখন তাদেরকে এই উত্তর দেয়া হলো যে, আলেম, ফাযেল ও কবিরা যদি সম্মিলিতভাবে কুরআন বানিয়ে থাকে তাহলে তোমরাও কোনো এমন জামা'তের সাহায্য নিয়ে কুরআনের কোনো দৃষ্টান্ত উপস্থাপন কর যেন তোমাদের সত্য হওয়া প্রমাণিত হয়। তখন এর সদুত্তর দিতে না পেরে তারা এই মতামতকেও বাদ দিয়েছে এবং একটি তৃতীয় মতামত প্রকাশ করেছে আর তা হলো, জিনদের সাহায্য নিয়ে সে কুরআন বানিয়েছে; এটি মানুষের কাজ নয়। খোদা তা'লা এর উত্তরও তখন এমনভাবে দিয়েছেন, যার সামনে তারা কোনো প্রকার উচ্চবাচ্য করতে পারে নি।

যেভাবে তিনি বলেন,

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ○ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ○ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ○

(সূরা আত তাকভীর: ২৫-২৭)

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا○

(সূরা বনী ইসরাঈল: ৮৯)

অর্থাৎ কুরআন হচ্ছে সকল প্রকার অদৃশ্য বিষয় সংবলিত আর এসব বলা জিনদের জন্য সম্ভব নয়। এদেরকে বলে দাও, যদি সকল জিন ঐকমত্যে পৌঁছে আর একই সাথে আদম সন্তানরাও একমত হয় আর সবাই সম্মিলিতভাবে এই কুরআনের ন্যায় কোনো কুরআন বানাতে চায়, তবুও তাদের জন্য আদৌ তা সম্ভব হবে না, যদি তারা একাজে পরস্পরের সাহায্যকারীও হয়।

এসব দুর্ভাগার সামনে যখন তাদের সকল চিন্তাধারার মিথ্যা হওয়া স্পষ্ট হলো আর কোনো কথাই ধোপে টিকল না, তখন ইতর লোকদের ন্যায় চরম নির্লজ্জতার সাথে তারা একথা বলা আরম্ভ করে যে, এ শিক্ষা যাতে প্রসার লাভ করতে না পারে, তা নিশ্চিত করা উচিত। যেভাবে কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন–

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ○

(সূরা হা মীম আস্ সাজদা: ২৭)

অর্থাৎ কাফিররা বলেছে যে, এই কুরআন শ্রবণ করো না আর যখন তা তোমাদের সামনে পাঠ করা হয়, তোমরা হট্টগোল বাঁধিয়ে দিও আর এভাবেই হয়ত তোমরা জিতে যাবে। ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলেছে যে, এ কৌশল অবলম্বন কর– সকালে গিয়ে এই কুরআনে ঈমান আন আর সন্ধ্যাবেলা নিজ ধর্মে ফিরে আস; এভাবে মানুষ হয়ত সন্দেহে নিপতিত হবে এবং ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দেবে।

وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ○

(সূরা আলে ইমরান: ৭৩)

অর্থাৎ তুমি কি দেখ নি যে, এসব ইহুদি ও খ্রিষ্টান, যারা নামেমাত্র তৌরাত ও ইঞ্জিল পড়েছে তাদের বিশ্বাস হলো– দেবী, দেবতা ও প্রতিমায়।

মুশরিকদেরকে তারা বলে যে, তাদের ধর্ম অনেক ভালো, যা কিনা প্রতিমাপূজা; আর একত্ববাদের রীতি কিছুই নয়, যা মুসলমানরা পালন করে। এরাই সেসব লোক, যাদেরকে খোদা তা'লা অভিশাপ দিয়েছেন, আর খোদা যাকে অভিশপ্ত করেন, তার কোনো সাহায্যকারী নেই।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰٓؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ○ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ○

(সূরা আন নিসা: ৫২-৫৩)

এখন এই বক্তব্যের সারকথা হলো– মহানবী (সা.) যদি নিরক্ষর না হতেন, তাহলে ইসলাম-বিরোধীরা, বিশেষ করে ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা স্পষ্টত একটি সত্য-পরিপন্থী বিষয় দেখেও কীভাবে নীরব থাকত, যারা বিশ্বাসগত বিরোধিতা ছাড়াও এই হিংসা ও বিদ্বেষও লালন করত যে, বনী ইসরাঈল হতে রসূল আসে নি বরং তাদের ভাইদের মধ্য হতে অর্থাৎ বনী ইসমাঈল হতে এসেছেন? নিঃসন্দেহে একথা তাদের কাছে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখ থেকে যা কিছু নিঃসৃত হয় তা কোনো অশিক্ষিত নিরক্ষরের কাজ নয় আর দশ-বিশ ব্যক্তির কাজও নয়। সেকারণেই তারা অজ্ঞতাবশত বলত–

اَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ

(সূরা আল ফুরকান: ৫)

আর তাদের মাঝে যারা বুদ্ধিমান ও প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী ছিল, তারা ভালোভাবে জেনে গিয়েছিল যে, কুরআন শরীফ মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে। আর তাদের সামনে বিশ্বাসের দরজা এমনভাবে উন্মোচিত হয়ে গিয়েছিল যে, খোদা তাদের সম্পর্কে বলেন–

يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ؕ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ

(সূরা আল বাকারা: ১৪৭)

অর্থাৎ তারা সেই নবীকে এমনভাবে শনাক্ত করে, যেভাবে তারা নিজেদের সন্তানদেরকে চেনে। আর সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞানের এই দ্বার

কেবল তাদের জন্যই খোলে নি, বরং এ যুগেও সবার সামনে তা খোলা রয়েছে। কেননা কুরআনের সত্যতা অবগত হওয়ার জন্য এখনো একই কুরআনী নিদর্শন, কুরআনের একই প্রভাব ও কার্যকারিতা আর একই অদৃশ্য সাহায্য-সমর্থন এবং একই সন্দেহাতীত নিদর্শনাবলী বিদ্যমান, যা সে যুগে বিদ্যমান ছিল। যুক্তিনিষ্ঠ ও সুদৃঢ় এই ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখার অমোঘ সিদ্ধান্ত ছিল খোদা তা'লার। সেকারণেই তিনি এর সকল কল্যাণ ও নিদর্শনাবলীকে স্থায়ীরূপ দিয়েছেন আর খ্রিষ্টান, ইহুদি ও হিন্দুদের প্রক্ষিপ্ত এবং মিথ্যা ও ত্রুটিপূর্ণ ধর্মাবলীর ধ্বংস চাইতেন। তাই তাদের হাতে কেবল কেচ্ছাকাহিনিই রয়ে গেছে, সত্যিকার কল্যাণরাজি ও ঐশী সাহায্য-সমর্থনের নামগন্ধও তাতে নেই। তাদের গ্রন্থাবলী এমন নিদর্শনের কথা বলছে, যার স্বপক্ষে তিল পরিমাণ প্রমাণও তাদের হাতে নেই; কেবল অতীত কাহিনির বরাত টানা হয়। কিন্তু কুরআন শরীফ এমন নিদর্শন উপস্থাপন করে, যা অবলোকন করা সবার জন্য সম্ভব।

অষ্টম প্রারম্ভিক বিষয়

কোনো ওলীর পক্ষ থেকে অলৌকিক যে বিষয় প্রকাশ পায়, তা সত্যিকার অর্থে সেই অনুসরণীয় ব্যক্তির নিদর্শন, যার সে উম্মত আর এটি এক স্পষ্টকথা ও জানা বিষয়। কারণ যেখানে কোনো বিশেষ ব্যক্তি ও বিশেষ কিতাবের অনুসরণের সাথে কোনো বিষয় প্রকাশিত হওয়ার সম্পর্ক আর অনুসরণ ছাড়া তা প্রকাশই পেতে পারে না, সেখানে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হলো যে, সে বিষয়টি বাহ্যত যদিও কোনো অনুসারীর পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে সেই অনুসরণীয় নবীই সে বিষয়ের প্রকাশক যার অনুসরণের কল্যাণের সাথে তার প্রকাশ সম্পর্কযুক্ত। নবীর নিদর্শন কেন অন্যের মাধ্যমে প্রকাশ পায়? এর রহস্য হলো– কোনো ব্যক্তি যখন সেই কাজই করে যা তার অনুসরণীয় শরীয়ত আনয়নকারী (নবী) করেছেন আর সে বিষয় এড়িয়ে চলে যা তার শরীয়ত আনয়নকারী করতে বারণ করেছেন আর সেই কিতাবই অনুসরণ করে যা তার শরীয়ত আনয়নকারী তাকে দিয়েছেন তাহলে এই অবস্থায় সে নিজের অবাধ্য প্রবৃত্তির তাড়না হতে মুক্ত হয়ে স্বীয় অনুসৃত শরীয়ত আনয়নকারীর তত্ত্বাবধানে এসে যায়।

সুতরাং শরীয়ত আনয়নকারী যদি দক্ষ চিকিৎসকের ন্যায় যথাযথভাবে সোজা

পথের দিশা দেন, আর সেই আশিসময় কিতাব এনে থাকেন যাতে অনুসরণকারী ব্যক্তির আধ্যাত্মিক ব্যাধির চিকিৎসা এবং তার জ্ঞান ও কর্মে উৎকর্ষতা সাধনের পুরো উপকরণ থেকে থাকে আর তার অনুসারী সকল প্রকার বাহ্যিক বা আধ্যাত্মিক প্রতিবন্ধকতা ও বিপত্তিমুক্ত থেকে সেসব শিক্ষাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে, তাহলে পূর্ণ অনুসরণ ও আনুগত্যের কল্যাণে যে জ্যোতি ও লক্ষণাবলী প্রকাশ পায় তা সত্যিকার অর্থে সেই অনুসরণীয় নবীরই কল্যাণ। অতএব এদিক থেকে যদি ওলীর পক্ষ হতে কোনো অলৌকিক বিষয় প্রকাশ পায়, তাহলে তা সেই অনুসরণীয় নবীরই কল্যাণরাজির অংশ হবে।

এসকল প্রারম্ভিক কথা বা ভূমিকার পর এখন কুরআন শরীফের সত্যতার প্রমাণাদি লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

و نسئل الله التوفيق و النصرة هو نعم المولى و نعم النصير

আমরা খোদার কাছে সামর্থ্য ও সাহায্য যাচনা করি; তিনি কতইনা উত্তম প্রভু আর কতইনা উত্তম সাহায্যকারী!

প্রথম অধ্যায়

কুরআন শরীফের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব-সংক্রান্ত বাহ্য বা বহিস্থ প্রমাণাদির বিবরণ প্রসঙ্গে

প্রথম প্রমাণ: আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰۤى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ
وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○ وَمَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى
اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○ وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ
مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ○

(সূরা আন নাহল: ৬৪-৬৬)

وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا
سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ كَذٰلِكَ
نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ
وَالَّذِىْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ؕ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ○

(সূরা আল আ'রাফ: ৫৮-৫৯)

اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِى السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهٗ
كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَاۤ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ
اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ○ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ ○
فَانْظُرْ اِلٰۤى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْىِ
الْمَوْتٰى ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

(সূরা আর রূম: ৪৯-৫১)

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا

(সূরা আর রা'দ: ১৮)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ اَیْدِی النَّاسِ لِیُذِیْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِیْ
عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوْنَ ○ قُلْ سِیْرُوْا فِی الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلُ ؕ کَانَ اَکْثَرُهُمْ مُّشْرِکِیْنَ ○

(সূরা আর রূম: ৪২-৪৩)

اَوَلَمْ یَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَآءَ اِلَی الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا تَاْکُلُ مِنْهُ
اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ ؕ اَفَلَا یُبْصِرُوْنَ ○

(সূরা আস সাজদা: ২৮)

وَجَعَلْنَا الَّیْلَ وَالنَّهَارَ اٰیَتَیْنِ فَمَحَوْنَآ اٰیَةَ الَّیْلِ وَجَعَلْنَآ اٰیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً

(সূরা বনী ইসরাঈল: ১৩)

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ ○ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ ○ لَیْلَةُ الْقَدْرِ ۙ
خَیْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ○ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِکَةُ وَالرُّوْحُ فِیْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ کُلِّ اَمْرٍ ○
سَلٰمٌ ۛ هِیَ حَتّٰی مَطْلَعِ الْفَجْرِ ○

(সূরা আল ক্বদর: ২-৬)

اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَیْکُمْ رَسُوْلًا ۙ شَاهِدًا عَلَیْکُمْ کَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلٰی فِرْعَوْنَ
رَسُوْلًا ○

(সূরা আল মুজাম্মিল: ১৬)

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ؕ

(সূরা বনী ইসরাঈল: ১০৬)

یٰٓاَهْلَ الْکِتٰبِ قَدْ جَآءَکُمْ رَسُوْلُنَا یُبَیِّنُ لَکُمْ عَلٰی فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا
جَآءَنَا مِنْۢ بَشِیْرٍ وَّلَا نَذِیْرٍ ۫ فَقَدْ جَآءَکُمْ بَشِیْرٌ وَّنَذِیْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰی کُلِّ
شَیْءٍ قَدِیْرٌ ○

(সূরা আল মায়েদা: ২০)

وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ
لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

(সূরা আলে ইমরান: ১০৪)

وَلَوْلَاۤ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَاۤ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا
رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

(সূরা আল কাসাস: ৪৮)

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ
فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَاِنَّكَ لَمِنَ
الْمُرْسَلِيْنَ ○

(সূরা আল বাকারা: ২৫২-২৫৩)

وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ○ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّاۤ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ○
اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ ۗ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ
هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ○

(সূরা আল আম্বিয়া: ১০৮, সূরা ইয়াসিন: ৭, সূরা আল ফুরকান: ৪৫)

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ

(সূরা আল ফাতির: ৪৬)

وَهُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ○
لِّنُحْـِۧيَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَاۤ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِيَّ كَثِيْرًا ○

(সূরা আল ফুরকান: ৪৯-৫০)

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ○ فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ
جِهَادًا كَبِيْرًا ○

(সূরা আল ফুরকান: ৫২-৫৩)

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ○

(সূরা আল ফুরকান: ৬৩)

وَهُوَ الَّذِیۡ خَلَقَ مِنَ الۡمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَہٗ نَسَبًا وَّ صِہۡرًا ؕ وَ کَانَ رَبُّکَ قَدِیۡرًا ○

(সূরা আল ফুরকান: ৫৫)

اَلَمۡ تَرَ اِلٰی رَبِّکَ کَیۡفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوۡ شَآءَ لَجَعَلَہٗ سَاکِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلۡنَا الشَّمۡسَ عَلَیۡہِ دَلِیۡلًا ○ ثُمَّ قَبَضۡنٰہُ اِلَیۡنَا قَبۡضًا یَّسِیۡرًا ○ وَہُوَ الَّذِیۡ جَعَلَ لَکُمُ الَّیۡلَ لِبَاسًا وَّالنَّوۡمَ سُبَاتًا وَّ جَعَلَ النَّہَارَ نُشُوۡرًا ○

(সূরা আল ফুরকান: ৪৬-৪৮)

اِعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰہَ یُحۡیِ الۡاَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِہَا ؕ قَدۡ بَیَّنَّا لَکُمُ الۡاٰیٰتِ لَعَلَّکُمۡ تَعۡقِلُوۡنَ ○

(সূরা আল হাদীদ: ১৮)

অর্থাৎ উপাস্য হিসেবে আমরা আপন সত্তার কসম খাচ্ছি, যিনি সকল পথনির্দেশনা ও প্রতিপালনরূপী কল্যাণের উৎস এবং সকল উৎকৃষ্ট গুণাবলীর সমাহার, তোমার পূর্বে আমরা পৃথিবীর বহু জাতি ও গোষ্ঠীতে বার্তাবাহক প্রেরণ করেছি। অতঃপর তারা শয়তানের প্রতারণায় বিভ্রান্ত হয়ে গেছে এবং নোংরা কাজ তাদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সুতরাং সেই শয়তানই আজ তাদের সকলের বন্ধু, যে তাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করছে। এছাড়া এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য হলো– তাদের মধ্যকার মতভেদ দূরীভূত করা, যেন মু'মিনদের সামনে সেসব পথনির্দেশনা পুরোপুরি বর্ণনা করা যায়, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলীতে অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছিল, যেন তা পূর্ণ আশীর্বাদে পর্যবসিত হয়। সত্য কথা হলো, সারা পৃথিবী মৃত্যুর শিকারে পরিণত হয়েছিল, খোদা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন আর সেই মৃত ভূমিকে নতুনভাবে সঞ্জীবিত করেছেন। এটি সেই গ্রন্থের সত্যতার একটি নিদর্শন; কিন্তু তা কেবল তাদের জন্য যারা শোনে অর্থাৎ সত্য-সন্ধানী। এরপর বলেন, খোদা তা'লা হচ্ছেন সেই মহান ও দয়ালু সত্তা, যাঁর প্রকৃতির নিয়ম হলো, আদিকাল থেকে তিনি স্বীয় রহমত বর্ষণের পূর্বে অর্থাৎ বৃষ্টির পূর্বে বায়ু প্রেরণ করেন। এক পর্যায়ে সেই বাতাস যখন ভারী মেঘমালা বহন করে, তখন আমরা কোনো মৃত শহরের দিকে অর্থাৎ যে অঞ্চলে অনাবৃষ্টির কারণে ভূমি শুকিয়ে মৃতবৎ হয়ে গেছে সেখানে এসব বায়ুকে তাড়া করে নিয়ে যাই, এরপর তা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ

করি এবং এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার ফলফলাদি উৎপন্ন করি। আধ্যাত্মিকভাবে মৃতদেরকে আমরা এভাবে মৃত্যুর গহ্বর থেকে বের করে থাকি। এ দৃষ্টান্তগুলো এজন্যে বর্ণনা করা হয়েছে যেন তোমরা মনোনিবেশ করতে পার আর একথা অনুধাবন করতে পার যে, যেভাবে ভয়াবহ অনাবৃষ্টির সময় আমরা মৃতভূমিকে সঞ্জীবিত করে তুলি, একইভাবে আমাদের রীতি হলো ভয়াবহ ভ্রষ্টতা যখন ছড়িয়ে যায় আর ভূমিরূপী হৃদয় মরে যায়, তখন আমরা এতে প্রাণ সঞ্চার করি। অধিকন্তু যে ভূমি উর্বর তাতে আল্লাহ্ যেমন চান তেমন ফসল উৎপন্ন হয় এবং যা অনুর্বর ভূমি, তাতে যৎসামান্য ফসল উৎপন্ন হয় এবং ফসলও তাতে ভালো হয় না। এভাবে আমরা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে (বিভিন্ন আঙ্গিকে) বিষয় বর্ণনা করি যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে। পুনরায় বলেন, খোদা তা'লা সেই মহানুভব ও দয়ালু সত্তা যিনি প্রয়োজনের সময় এমন বায়ু প্রবাহিত করেন, যা মেঘমালাকে গতিশীল করে। এরপর খোদা তা'লা যেভাবে চান তা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত করেন। এরপর তুমি দেখ! এর মধ্য হতে বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং বান্দাদের মধ্য থেকে যাদেরকে তিনি সেই বৃষ্টি দ্বারা উপকৃত করেন তারা স্বচ্ছলতা লাভ করে আর রাতারাতি খোদা তাদের দুঃখকে আনন্দে বদলে দেন। বৃষ্টির পূর্বে চরমভাবাপন্ন পরিস্থিতির কারণে তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু খোদা তা'লা হঠাৎ স্নেহপরবশ হয়ে তাদের হাত নিজের হাতে নেন অর্থাৎ এমন সময়ে রহমতবারি বর্ষিত হয়, যখন মানুষের মন ভেঙে যায় আর বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার সকল আশাই তিরোহিত হয়। আবার বলেন, তুমি খোদার করুণা বা রহমতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখো এবং তাঁর রহমতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে চিন্তা করো যে, তা কীভাবে মৃত ভূমিকে সঞ্জীবিত করে? নিঃসন্দেহে তিনিই খোদা যাঁর এটিও রীতি যে, মানুষ যখন আধ্যাত্মিকভাবে মৃত্যুর শিকার হয় আর পরিস্থিতি কঠিন রূপ ধারণ করে, তিনি তাদেরকেও জীবিত করেন এবং সকল বিষয়ে তিনি সর্বশক্তিমান ও ক্ষমতাবান। আকাশ থেকে পানি বা বৃষ্টি তিনিই বর্ষণ করেন আর তখন সব উপত্যকা স্ব স্ব ধারণ ক্ষমতা ও সামর্থ্য অনুসারে প্লাবিত হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় সাধ্যানুসারে তা থেকে লাভবান হয়। এরপর বলেন যে, সেই রসূল তখন এসেছেন, যখন জল-স্থলের সর্বত্র নৈরাজ্য মাথাচাড়া দেয় অর্থাৎ সমগ্র ভূপৃষ্ঠে অন্ধকার ও ভ্রষ্টতা ছেয়ে যায়। নিরক্ষর হোক বা কোনো ঐশী গ্রন্থের অনুসারী হোক বা জ্ঞানী

লোকই হোক না কেন, সকলেই বিকৃতির শিকারে পরিণত হয়েছে; সত্যের ওপর কেউ প্রতিষ্ঠিত থাকে নি। এসব নৈরাজ্যের কারণ হলো, মানুষের হৃদয় থেকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা হারিয়ে গিয়েছিল এবং তাদের কর্ম খোদার জন্য ছিল না বরং তাদের মাঝে অনেক বিপত্তি দেখা দেয় আর সকলেই জগৎমুখী ও সত্যবিমুখ হয়ে যায়। তাই তাদের জন্য ঐশী-সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। স্বীয় যুক্তিপ্রমাণকে পূর্ণতা প্রদান ও নিজের রীতি নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য খোদা আপন রসূল পাঠিয়েছেন, যেন তাদেরকে তাদের কর্মের প্রতিফল আস্বাদন করাতে পারেন আর যেন তারা প্রত্যাবর্তন করে। তুমি বলো, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর আর তারপর দেখ যে, তোমাদের পূর্বে যেসব অস্বীকারকারী ও বিদ্রোহী অতিবাহিত হয়েছে তাদের পরিণতি কী হয়েছে। তাদের অধিকাংশই মুশরিক ছিল। তারা কি কখনো দেখে নি যে, আমাদের রীতি হলো, আমরা শুষ্ক ভূমির দিকে পানি পরিচালিত করি আর তাতে ফসল উৎপন্ন করি, যেন তাদের গবাদি পশু এবং তারা নিজেরাও তা থেকে ভক্ষণ করতে পারে এবং মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পায়। সুতরাং তোমরা মনোযোগ দিয়ে কেন লক্ষ্য কর না যেন তোমরা একথা বুঝতে পার যে, দয়া ও কৃপার আধার সেই খোদা, যিনি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির সময় তোমাদেরকে দৈহিক মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার জন্য রহমতবারি বর্ষণ করেন, ভয়াবহ ভ্রষ্টতার সময় অর্থাৎ আধ্যাত্মিক দুর্ভিক্ষের সময় তিনি কেন জীবনসুধা অবতীর্ণ করবেন না? পুনরায় বলেন, আমরা রাত ও দিনকে দুটি নিদর্শন বানিয়েছি। অর্থাৎ ভ্রষ্টতার প্রসার রাতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আর সত্যের বিস্তার দিনের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। রাতের অমানিশা যখন চরম রূপ নেয়, তখন তা দিন উদ্ভাসিত হওয়ার প্রমাণ বহন করে আর দিন যখন পূর্ণমাত্রায় অলোকে উদ্ভাসিত হয়ে যায়, তা রাতের আগমনবার্তা দেয়। অতএব আমরা রাতের চিহ্ন মিটিয়ে দিনের চিহ্নকে পথপ্রদর্শক বানিয়েছি অর্থাৎ যখন দিবস উদ্ভাসিত হয় তখন বোঝা যায় যে, এর পূর্বে অন্ধকার ছিল। সুতরাং দিনের নিদর্শন এত স্পষ্ট যে, এর মাধ্যমে রাতের স্বরূপও স্পষ্ট হয়ে যায়। আর রাতের নিদর্শন অর্থাৎ ভ্রষ্টতার যুগ নির্ধারণের কারণ হলো দিনের নিদর্শন অর্থাৎ হেদায়েত প্রসারের সৌন্দর্য ও শোভা যেন এর মাধ্যমে প্রকাশ পায়। কারণ, সুন্দর চেহারার মূল্য ও মর্যাদা বোঝা যায় কুৎসিত চেহারার সাথে তুলনার নিরিখে; তাই ঐশী প্রজ্ঞা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, আলো ও অন্ধকার পালাক্রমে পৃথিবীতে আসবে। আলো

যখন স্বীয় পরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন অন্ধকার পা বাড়াবে। আর অন্ধকার যখন চরম রূপ ধারণ করে, তখন আলো স্বীয় প্রভা বা প্রিয় চেহারা প্রদর্শন করবে। সুতরাং অন্ধকারের প্রাধান্য আলোর আবির্ভাবের একটি প্রমাণ আর আলোর ছেয়ে যাওয়া অন্ধকার আগমনের একটি পথ (উন্মোচন করে) বৈ-কী। প্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে যে, প্রত্যেক পরাকাষ্ঠার সাথে পতনও লেগে আছে। সুতরাং এই আয়াতে একথার দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, অন্ধকার যখন চরম পর্যায়ে উপনীত হয় আর জল-স্থল অন্ধকারে ছেয়ে যায়, তখন আমরা আমাদের চিরাচরিত রীতি অনুসারে আলোর নিদর্শন প্রকাশ করেছি, যেন বুদ্ধিমান মানুষ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী খোদার শক্তিকে পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করে স্বীয় বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারে। এরপর বলেন–

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

(সূরা আল ক্বদর, ৯৭:২)

যেভাবে আমরা পূর্বেও লিখেছি, এই সূরার সত্যিকার উদ্দেশ্য হলো সার্বজনীন ও সর্বব্যাপী সেই নিয়মটি বর্ণনা করা, যা কিনা সুগভীর সত্যের সমন্বয়ে গঠিত। অর্থাৎ এটি বর্ণনা করা যে, পৃথিবীতে কখন এবং কোন্ সময়ে– কোনো গ্রন্থ ও পয়গম্বর প্রেরণ করা হয়। সুতরাং সেই নিয়ম হলো, হৃদয়ে যখন এমন এক ভয়াবহ অন্ধকার ছেয়ে যায় যে, হঠাৎ তাদের সবার হৃদয় জগৎমুখী হয়ে যায় এবং এর অশুভ পরিণতিতে তাদের সকল বিশ্বাস, কর্ম, চরিত্র, রীতিনীতি, লক্ষ্য ও মনোবলে সার্বিক ও পূর্ণ বাধাবিপত্তির অনুপ্রবেশ ঘটে, হৃদয় হতে খোদাপ্রেম পুরোপুরি তিরোহিত হয়ে যায় এবং এই মহামারি এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, পুরোটা যুগ রাতের ন্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়, এমন সময়ে অর্থাৎ যখন সেই অমানিশা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে তখন সেই অন্ধকার থেকে মুক্ত করার জন্য আর যেসব পদ্ধতিতে তাদের সংশোধন যুক্তিযুক্ত হয়ে থাকে, ঐশী কৃপা মানুষকে স্বীয় বাণীতে সেসব রীতি বর্ণনা করার প্রতি দৃষ্টি দেয়।

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, আমরা কুরআনকে এমন এক অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে অবতীর্ণ করেছি, যে রাতে বান্দাদের সংশোধন ও কল্যাণের জন্য সহজসরল পথের চিত্র বর্ণনা করা এবং শরীয়ত ও ধর্মের সীমাপরিসীমা নির্ধারণ করা অত্যাবশ্যক ছিল। অর্থাৎ ভ্রষ্টতার অন্ধকার যখন ভয়াবহ অমানিশাঘন রাতের রূপ ধারণ করে, তখন

ঐশী রহমত এমন প্রখর আলো নাযিলের দিকে দৃষ্টিপাত করে, যা সেই অন্ধকার দূর করতে পারে। সুতরাং কুরআন শরীফ অবতীর্ণ করে খোদা বান্দাদের সেই মহান আলো দিয়েছেন, যা সন্দেহ ও সংশয়ের অমানিশা দূর করে এবং আলোর প্রসার ঘটায়। এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, আধ্যাত্মিক এই লাইলাতুল কদর সাধারণ্যে প্রসিদ্ধ বাহ্যিক লাইলাতুল কদর থেকে ভিন্ন কিছু নয়, বরং খোদার রীতি এভাবে চলে আসছে যে, সকল কাজ তিনি যথাযথভাবে ও সামঞ্জস্যের নিরিখে সম্পাদন করেন আর আধ্যাত্মিক ও অন্তর্নিহিত সত্যের যে বাহ্যিক চিত্র যুক্তিযুক্ত হতে পারে তা তাকে তিনি দান করেন। যেহেতু লাইলাতুল কদরের অন্তর্নিহিত সত্য হলো চরম ভ্রষ্টতার সেই সময়টি, যাতে ঐশী-কৃপা পৃথিবীর সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তাই পারস্পরিক সেই সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ভ্রষ্টতার সে যুগের শেষ অংশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য খোদা তা'লা একটি আক্ষরিক রাত নির্ধারণ করেছেন যখন ভ্রষ্টতা চরমরূপ ধারণ করেছিল। এটি ছিল সে রাত, যাতে পৃথিবীকে চরম ভ্রষ্টতার মাঝে নিপতিত পেয়ে খোদা তা'লা স্বীয় পবিত্র বাণী নিজের নবীর প্রতি অবতীর্ণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ রাতে পরম কল্যাণ সৃষ্টি হয়েছে বা এভাবে বলতে পার যে, খোদার স্থায়ী অভিপ্রায় অনুসারে আদিকাল থেকে এতে তা সৃষ্ট বা অন্তর্নিহিত ছিল। বিশেষ এই রাতে সেই গ্রহণীয়তা ও কল্যাণ স্থায়িত্ব লাভ করে। এরপর বলেন, অন্ধকার সেই সময়, যা অন্ধকার রাতসদৃশ ছিল, তাকে আলোকিত করার জন্য ঐশীবাণীর আলো অবতীর্ণ হয়েছে আর তাতে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কল্যাণে এক রাতকে সহস্র মাস থেকে উত্তম হবার মর্যাদা দেয়া হয়েছে। যৌক্তিক দিক থেকে দেখলেও এটি স্পষ্ট যে, খোদার ইবাদত ও তাঁর আনুগত্যের ক্ষেত্রে ভ্রষ্টতার যুগ অপরাপর যুগ থেকে খোদার অধিক নৈকট্য ও অধিক পুণ্যলাভের কারণ হয়ে থাকে। সুতরাং অন্যান্য যুগ থেকে তা অধিক উত্তম। অবস্থার ভয়াবহতা ও চরম সমস্যা বিরাজমান থাকার কারণে এতে ইবাদত দ্রুত গৃহীত হয় এবং ঐশী রহমত লাভে এ যুগের ইবাদতকারীরা অধিক যোগ্য হয়ে থাকে। কেননা সত্যিকার ইবাদতকারী ও বিশ্বাসীদের প্রকৃত মর্যাদা এমন সময়েই খোদার দরবারে প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ জগত-পূজার তিমির রাত যখন সারা পৃথিবীর মানুষের ওপর ছেয়ে যায়, সত্যের প্রতি দৃষ্টিপাতে যখন প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, আর একথা সততই স্পষ্ট

যে, হৃদয় যখন নেতিয়ে পড়ে ও মরে যায়, দুনিয়ারূপী লাশের মাংস ভক্ষণই যখন সবার কাছে প্রিয় ও আকর্ষণীয় মনে হয় আর আধ্যাত্মিক মৃত্যুর বিষাক্ত বায়ু সর্বত্র বইতে থাকে, হৃদয় থেকে খোদার ভালোবাসা সম্পূর্ণভাবে লোপ পায়, সত্যমুখী হওয়া ও খোদার বিশ্বস্ত বান্দা হওয়াকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষতিকর মনে করা হয় আর এপথে চলার কোনো সাথিও যখন পাওয়া যায় না আর এ পথ-পরিক্রমায় কোনো সমব্যথীও পাওয়া যায় না। বরং এপথের যাত্রীর ওপর মৃত্যু-মুখে ঠেলে দেয়ার মতো সমস্যাবলী নিপতিত হতে দেখা যায় এবং মানুষের দৃষ্টিতে সে লাঞ্ছিত ও তুচ্ছ গণ্য হয়; এমন সময় অবিচলতার সাথে স্বীয় প্রকৃত প্রেমাস্পদমুখী হওয়া আর নিজের অযোগ্য আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, আপনজন ও নিকটাত্মীয়ের সাহচর্য পরিত্যাগ করা এবং বিনয়, দীনতা ও নিঃসঙ্গতার কষ্ট শিরোধার্য করা, দুঃখ, লাঞ্ছনা ও মৃত্যুর পরোয়া না করা সত্যিকার অর্থে তখন এমন কাজ যে, দৃঢ়-প্রত্যয়ী রসূল, নবী ও সিদ্দীকগণ ব্যতিরেকে অন্য কারো হাতে তা সাধিত হয় না, যাদের ওপর মহাসম্মানিত খোদার কৃপাবৃষ্টি বর্ষিত হয় আর যারা স্বীয় প্রেমাস্পদের প্রতি অবলীলায় আকৃষ্ট হন। এমন ক্রান্তিকালের অবিচলতা, ধৈর্য ও খোদার ইবাদতের সেই প্রতিদান সত্যিকার অর্থে তখনই লাভ হয়, যা অন্য কোনো সময়ে লাভ হতে পারে না। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে লাইলাতুল কদরের ভিত্তি এমন সময়ে রাখা হয়েছে, যাতে চরম ভ্রষ্টতার কারণে পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া বড় বীরত্বের কাজ ছিল। বীরপুরুষদের গুরুত্ব ও মর্যাদা এই যুগেই প্রকাশ পায় আর কাপুরুষদের লাঞ্ছনাও এই যুগেই চরম পর্যায়ে পৌঁছে। তমসাচ্ছন্ন এই যুগই তিমির রাতের ন্যায় ভয়াবহ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং তুফানের এই সময়ে, যা সত্যই পরীক্ষার সময় হয়ে থাকে, কেবল তারাই ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা পায় যাদেরকে ঐশী-কৃপার একটি বিশেষ ছায়া আচ্ছাদিত করে থাকে। সুতরাং এসব কারণেই খোদা তা'লা এ যুগের একটি অংশকে লাইলাতুল কদর নির্ধারণ করেন যাতে ভ্রষ্টতার অমানিশা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। এরপর স্বর্গীয় যেসকল কল্যাণের মাধ্যমে এই ভ্রষ্টতার সুরাহা করা হয়, সেসবের স্বরূপ বা প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, সেই সর্ব দয়ালু খোদার রীতি হলো– অন্ধকার যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায় আর অমানিশা সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে, অর্থাৎ সেই পরম মার্গে গিয়ে ঠেকে যার নাম আধ্যাত্মিকভাবে লাইলাতুল কদর

তখন খোদা তা'লা সেই রাতে, যার অন্ধকার হৃদয়ের অন্ধকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, অন্ধকার জগতের প্রতি দৃষ্টি দেন এবং তাঁর বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে ফিরিশতা ও রূহুল কুদুস ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করে আর সৃষ্টির সংশোধনের জন্য খোদা তা'লার নবী আবির্ভূত হন। তখন ঐশী-জ্যোতি লাভ করে সেই নবী খোদার সৃষ্টিকে অমানিশা থেকে বের করেন। যতদিন সেই জ্যোতি পরম রূপ ধারণ না করে, ততদিন ক্রমশ উন্নতি করতে থাকে। একই বিধান অনুসারে সেই ওলীদের জন্ম হয়, যারা মানুষকে বোঝানো ও সৃষ্টির হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হন। যেহেতু তারা নবীদের উত্তরাধিকারী, তাই তারা নবীদের পদাঙ্কে পরিচালিত হন।

এখন স্মরণ রাখা উচিত যে, কুরআন শরীফে খোদা তা'লা একথা অতি জোরালোভাবে বর্ণনা করেছেন যে, পৃথিবীর অবস্থায় আদি থেকে একটি জোয়ার-ভাটা বিরাজমান আর তাঁর উক্তি–

تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ

(সূরা আলে ইমরান: ২৮)

এর মাঝে সেদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে অর্থাৎ হে খোদা! তুমি কখনো রাতকে দিনে আর কখনো দিনকে রাতে প্রবিষ্ট কর, অর্থাৎ ভ্রষ্টতার প্রাধান্যের পর হেদায়েত আর হেদায়েতের প্রাধান্যের পর ভ্রষ্টতা সৃষ্টি কর। আর এই জোয়ার-ভাটার স্বরূপ হলো, কখনো কখনো মানুষের মনে খোদার নির্দেশে এক প্রকার বদ্ধাবস্থা ও পর্দা বিরাজ করে আর পৃথিবীর সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা তাদের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে। তাদের সকল শক্তিসামর্থ্য জাগতিক সুখশান্তি এবং জাগতিক ভোগ-বিলাসিতার পেছনেই নিয়োজিত থাকে। এটি অন্ধকার যুগ, এর শীর্ষবিন্দুতে যে রাত থাকে তা লাইলাতুল কদর হিসেবে আখ্যায়িত হয় আর সেই লাইলাতুল কদর সবসময় আসে। কিন্তু পূর্ণমাত্রায় আসে তখন, যখন মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবকাল এসে যায়। কেননা ভূপৃষ্ঠে তখন এমন ভয়াবহ অমানিশা ছেয়ে গিয়েছিল, যা পূর্বে কখনো ছড়ায় নি আর ভবিষ্যতেও কিয়ামত পর্যন্ত কখনো ছড়াবে না। বস্তুত এই অন্ধকারের মাত্রা যখন এর জন্য নির্ধারিত চরম-বিন্দুতে পৌঁছে যায়, তখন ঐশী বদান্যতা পৃথিবীকে আলোকিত করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে আর কোনো আলোকিত ব্যক্তিকে পৃথিবীর সংশোধনের জন্য প্রেরণ করা হয়। তিনি যখন আসেন, তখন অনুসন্ধিৎসু

সোচ্চার হৃদয় তাঁর প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হতে থাকে আর পবিত্র প্রকৃতি স্বতঃপ্রণোদিত ভাবেই সত্যমুখী হতে থাকে, যেভাবে প্রদীপ প্রজ্বলিত হলে এর দিকে পতঙ্গের ধাবিত না হওয়া অসম্ভব। একইভাবে আলোকিত কোনো মানুষের আবির্ভাবের সময় সুস্থ-প্রকৃতির মানুষ তাঁর প্রতি ভালোবাসার সাথে আকৃষ্ট হবে না-এটিও অসম্ভব। এ আয়াতগুলোতে খোদা তা'লা যা বর্ণনা করেছেন তা হলো মৌলিক দাবি, আর এর সারকথা হলো, মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের সময় পৃথিবীর ওপর অমানিশা এমনভাবে ছেয়ে গিয়েছিল, যা হাতছানি দিয়ে ডাকছিল যে, সত্যের সূর্যের আবির্ভাব ঘটুক। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন শরীফে খোদা তা'লা বারংবার স্বীয় রসূলের যে কাজ উল্লেখ করেছেন তা হলো, তিনি পৃথিবীকে ভয়াবহ অন্ধকারে নিমজ্জিত পেয়েছেন এবং এরপর তা থেকে তাদেরকে বের করেছেন, যেমন তিনি বলেন–

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

(সূরা ইব্রাহীম: ২)

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

(সূরা আল বাকারা: ২৫৮)

هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

(সূরা আল আহযাব: ৪৪)

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۝ يَّهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

(সূরা আল মায়েদা: ১৬-১৭)

قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝ رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ

(সূরা আত তালাক: ১১-১২)

অর্থাৎ এটি আমাদের গ্রন্থ, যা আমরা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যেন তুমি অন্ধকারে নিপতিত লোকদেরকে আলোর দিকে নিয়ে আসতে পার। সুতরাং খোদা তা'লা এ যুগের নাম 'অন্ধকার যুগ' রেখেছেন আর বলেন যে, খোদা ও

তাঁর ফিরিশতাগণ মু'মিনদের প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন, যেন খোদা তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসতে পারেন। পুনরায় বলেন, অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের চিকিৎসার জন্য খোদার পক্ষ থেকে আলো আসে আর সেই আলো হলো তাঁর রসূল ও তাঁর গ্রন্থ। সে জ্যোতির মাধ্যমে সেসব লোকদের খোদা পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তুষ্টির সন্ধানী। তাই খোদা তা'লা তাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করেন। পুনরায় বলেন, খোদা স্বীয় গ্রন্থ ও স্বীয় রসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি তোমাদের সামনে ঐশীবাণী পাঠ করেন বিশ্বাসী ও পুণ্যবানদেরকে অন্ধকার হতে আলোর পানে পরিচালনার জন্য। সুতরাং এ সকল আয়াতে খোদা তা'লা স্পষ্টভাবে বলেন, যেযুগে মহানবী (সা.) প্রেরিত হয়েছেন এবং কুরআন শরীফ অবতীর্ণ করা হয়েছিল, সেযুগ ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তির অমানিশায় ছেয়ে গিয়েছিল। এমন কোনো জাতি ছিল না যারা অমানিশার বাইরে ছিল। উপরোল্লিখিত আয়াতগুলোর বাকি অংশের অনুবাদ হলো– খোদা তা'লা বলেন, আমরা তোমাদের প্রতি এক রসূল প্রেরণ করেছি, যিনি তোমাদের পাপ-পঙ্কিল অবস্থা ও ভ্রষ্টতায় নিপতিত হওয়ার সাক্ষ্য বহন করেন। আর এই রসূল সেই রসূলের ন্যায়, যাকে ফেরাউনের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিল। এই বাণী আমরা সত্যিকার প্রয়োজনে অবতীর্ণ করেছি আর সত্যিকার প্রয়োজনেই এটি অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ এই বাণী নিজ গুণে সত্য ও সঠিক, আর এর আগমনও যথার্থ এবং প্রয়োজনের নিরিখে হয়েছে। এমন নয় যে তা বৃথা, অনর্থক ও অসময়ে নাযিল হয়েছে। হে আহলে কিতাব! তোমাদের কাছে এমন সময়ে আমাদের রসূল এসেছেন, যার পূর্বে দীর্ঘকাল ধরে রসূলের আগমনধারা বিচ্ছিন্ন ছিল। সুতরাং শূন্যতার (অর্থাৎ রসূলদের আগমনের ধারা বিচ্ছিন্ন থাকার) যুগে সেই রসূল এসে তোমাদেরকে সেই সোজা পথের সন্ধান দেন, যা তোমরা ভুলে গিয়েছিলে; যেন তোমরা একথা বলতে না পার যে, আমরা পথভ্রষ্ট ছিলাম, আমাদেরকে সতর্ক করার জন্য খোদার পক্ষ থেকে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা আসে নি। সুতরাং এখন নিশ্চিত হতে পার যে, সেই সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা, যার প্রয়োজন ছিল তিনি এসে গেছেন। এছাড়া খোদা তা'লা, যিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান, তিনি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট পেয়ে স্বীয় বাণী ও স্বীয় রসূল প্রেরণ করেছেন। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অগ্নিকুণ্ডের কিনারায় পৌঁছে গিয়েছিলে, খোদা

তোমাদেরকে তা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবে তিনি নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেন, যেন তোমরা হেদায়েত পেতে পার আর শাস্তি এসে গেলে পথভ্রষ্ট মানুষ যেন একথা বলার সুযোগ না পায় যে, হে খোদা! তুমি শাস্তির পূর্বে কেন স্বীয় রসূল প্রেরণ করলে না, যার কল্যাণে আমরা তোমার নিদর্শনাবলীর অনুসরণ করতে পারতাম এবং মু'মিন হয়ে যেতাম। আর পুণ্যবানদের মাধ্যমে খোদা যদি ভ্রষ্টদের তদারকি না করতেন এবং কিছু লোককে কিছু লোকের মাধ্যমে প্রতিহত না করতেন, তাহলে পৃথিবী নৈরাজ্যে নিপতিত হতো। খোদার একান্ত কৃপা যে, ভ্রষ্টতা প্রসারের সময় তিনি নিজের পক্ষ থেকে হেদায়েতদাতা প্রেরণ করেন। কেননা তাঁর রীতি হলো কৃপা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা। আর তোমাকে আমরা সারা বিশ্বের প্রতি প্রেরণ করেছি স্নেহদৃষ্টি প্রদান, মুক্তির পথ উন্মোচন, উদাসীনদেরকে সত্যের প্রতি আকর্ষণ এবং সতর্ক করার জন্য। তুমি কি মনে কর যে, তাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ কথা শোনে ও বোঝে? না! এরা চতুষ্পদ জন্তুতুল্য বরং এর চেয়েও অধম। পাপের কারণে খোদা যদি তাদেরকে পাকড়াও করতেন, তাহলে ভূপৃষ্ঠে একজনকেও জীবিত রাখতেন না। আর খোদা সেই সম্মানিত ও দয়ালু সত্তা, যিনি বৃষ্টির পূর্বেই বায়ু প্রবাহিত করেন। এরপর আমরা মৃতভূমিকে সঞ্জীবিত করতে এবং বহু মানুষ ও তাদের চতুষ্পদ জন্তুকে পান করানোর জন্য এক প্রকার স্বচ্ছ পানি আকাশ থেকে বর্ষণ করি। আমরা বিভিন্নভাবে উপমা বর্ণনা করি যেন মানুষ হৃদয়ে একথা গেঁথে নেয় যে, নবীদেরকে প্রেরণের প্রকৃত কারণ ও মূল এটিই। যদি আমরা চাইতাম, তাহলে সকল জনপদের জন্য পৃথক পৃথক রসূল প্রেরণ করতাম। কিন্তু এটি এজন্য করা হয়েছে, যেন তোমার হাতে কঠোর সাধনা ও অধ্যবসায়ের সূচনা হয়; অর্থাৎ এক পুরুষ যখন সহস্র মানুষের কাজ একাই করবে, তখন সে যে অনেক বড় প্রতিদান পাবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আর এ বিষয়টি তার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হবে। সুতরাং মহানবী (সা.) যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ নবী আর সব রসূলের চেয়ে উত্তম ও অধিক সম্মানিত, তাই ব্যক্তিগত যোগ্যতার নিরিখে যেভাবে তিনি সত্যিকার অর্থে সব নবীদের সর্দার, অনুরূপভাবে বাহ্যিক সেবার দৃষ্টিকোণ থেকেও তাঁর সবার উর্ধ্বে ও শ্রেষ্ঠ হওয়া পৃথিবীবাসীদের সামনে প্রকাশিত ও স্পষ্ট হয়ে যাক– খোদা তা'লা এটিই চাইতেন। এ কারণেই মহানবী (সা.)-এর রিসালতকে খোদা তা'লা সমগ্র মানবজাতির জন্য সার্বজনীন হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, যেন তাঁর

প্রচেষ্টা ও সাধনা সর্বজনীনরূপে প্রকাশ পেয়ে যায়; কেবল মূসা ও ইবনে মরিয়মের ন্যায় বিশেষ একটি জাতির জন্য যেন নির্ধারিত না হয়, আর সকল দিক ও সকল দল এবং সকল জাতির পক্ষ থেকে কঠিন কষ্টের সম্মুখীন হয়েও যেন সেই মহা প্রতিদানের যোগ্য গণ্য হন, যা অন্য নবীদের লাভ হবে না। এরপর বলেন, খোদা তিনি, যিনি রাতের পর দিন আর দিনের পর রাত আনয়ন করেন, যেন যার স্মরণ রাখার, সে স্মরণ রাখতে পারে বা যার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার থাকে, সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে। অর্থাৎ দিনের পর রাত এবং রাতের পর দিন আসা– এ কথার একটি নিদর্শন যে, যেভাবে হেদায়েতের পর ভ্রষ্টতা ও ঔদাসীন্যের যুগ এসে যায়, অনুরূপভাবে ভ্রষ্টতা ও ঔদাসীন্যের পর হেদায়েতের যুগও আসবে, খোদার পক্ষ থেকে এটিও নির্ধারিত। পুনরায় খোদা বলেন, খোদা সেই সর্বশক্তিমান সত্তা, যিনি মানুষকে স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতাগুণে সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য আবার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও আত্মীয়তার পরিধিও নির্ধারণ করেছেন।

অনুরূপভাবে, মানুষের আধ্যাত্মিক জন্মের বিষয়েও তিনি ক্ষমতাবান। আধ্যাত্মিক জন্মের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রকৃতির নিয়ম হুবহু দৈহিক জন্মের ন্যায়, অর্থাৎ প্রধানত ভ্রষ্টতার সময়, যা শূন্যতার অর্থ রাখে, কোনো মানুষকে তিনি আধ্যাত্মিকভাবে নিজ হাতে সৃষ্টি করেন, এরপর তার মান্যকারীদেরকে, যারা তার বংশতুল্য হয়ে থাকে, তার অনুসরণের কল্যাণে আধ্যাত্মিক জীবন দান করেন। সুতরাং সকল প্রেরিত-পুরুষ আধ্যাত্মিক অর্থে আদম এবং তাদের উম্মতের পুণ্যবানরা তাদের আধ্যাত্মিক প্রজন্ম। আধ্যাত্মিক ও দৈহিক ধারা পরস্পরের সাথে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য রাখে আর খোদার জাগতিক ও আধ্যাত্মিক আইনে কোনো প্রকার বিরোধ নেই। পুনরায় বলেন, তুমি কী খোদার দিকে তাকাও না– কীভাবে তিনি ছায়াকে প্রসারিত করেন, এমনকি একপর্যায়ে সমগ্র ভূপৃষ্ঠে কেবল অন্ধকারই চোখে পড়ে? আর তিনি যদি চাইতেন, অন্ধকারকে চিরস্থায়ী করে দিতেন আর কখনো আলো দেখা যেতো না, কিন্তু আমরা সূর্যকে এজন্য নিয়ে আসি যেন একথা প্রমাণ হয়ে যায় যে, এর পূর্বে অন্ধকার ছিল আর যেন আলোর মাধ্যমে অন্ধকারের অস্তিত্ব চেনা যায়। কারণ বৈপরীত্যের মাধ্যমে বিপরীত বিষয় চেনা সহজ হয়; আর আলোর গুরুত্ব ও মর্যাদা তার সামনেই প্রকাশ পায়, যে অমানিশার অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। পুনরায় বলেন, আমরা আলোর মাধ্যমে অন্ধকারকে ধীরে ধীরে বিদূরিত করতে থাকি

যেন অন্ধকারে বসা মানুষ সেই আলো থেকে ধীরে ধীরে লাভবান হয় আর আকস্মিক পরিবর্তনে যে বিস্ময় ও ভীতির আশঙ্কা করা হয়, সেটিও যেন না থাকে। ঠিক একইভাবে, ধরাপৃষ্ঠে যখন আধ্যাত্মিক অন্ধকার বিরাজ করে তখন সৃষ্টিকে আলো দ্বারা উপকৃত করার জন্য, এছাড়া আলো ও অন্ধকারে যে পার্থক্য রয়েছে তা প্রকাশের জন্য খোদা তা'লার পক্ষ থেকে সত্যের আলো প্রকাশ পায় এবং পৃথিবীতে ধীরে ধীরে তা বিস্তৃত হয়। এরপর বলেন, খোদা তা'লার প্রকৃতির নিয়ম হলো– ভূমি প্রাণহীন হয়ে গেলে তিনি জমিনে নতুনভাবে প্রাণসঞ্চার করেন। এই নিদর্শনের কথা আমরা পরিষ্কার করে বর্ণনা করেছি যেন মানুষ চিন্তা করে ও বোঝে।

এই আয়াতগুলোতে খোদা তা'লা কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা এবং খোদার পক্ষ থেকে এর উৎসারিত হওয়ার প্রমাণ উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেন, কুরআন শরীফ এমন সময় এসেছে, যখন সকল উম্মত সত্য-নীতি পরিত্যাগ করেছে। খোদাকে শনাক্ত করা, পবিত্র বিশ্বাস পোষণ ও নেক-কর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার মতো কোনো ধর্মই ভূপৃষ্ঠে ছিল না, বরং সকল ধর্ম বিকৃতির শিকারে পরিণত হয়েছিল এবং সেগুলোতে নানাপ্রকার নৈরাজ্য দেখা দেয়। জগৎ-পূজার মোহ স্বয়ং মানবপ্রকৃতিতে এতটা বৃদ্ধি পায় যে, জাগতিক খ্যাতি ও আরাম-আয়েশ, ইহজগতের সম্মান, প্রতিপত্তি, জাগতিক সুখ-শান্তি ও ধনসম্পদ ছাড়া তাদের আর কোনো আরাধ্যই ছিল না আর খোদাপ্রেম এবং খোদাপ্রেমের প্রতি আকর্ষণ ও আগ্রহের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণভাবে দেউলিয়া ও হতভাগা হয়ে যায়। সামাজিক কুপ্রথা ও কদাচারকেই ধর্ম জ্ঞান করা হয়। সুতরাং খোদা তা'লা, যার প্রকৃতির নিয়ম হলো কঠিন পরিস্থিতি ও সমস্যার সময় তিনি স্বীয় অসহায় বান্দাদের তত্ত্বাবধান করেন, অনাবৃষ্টির ন্যায় কঠোর কোনো পরিস্থিতির ফলে তাঁর বান্দারা যখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়, তখন রহমতবারি বর্ষণের মাধ্যমে তিনি তাদের সমস্যা দূরীভূত করে থাকেন– তিনি চান নি যে, আল্লাহর সৃষ্টি এমন বিপদাপদে নিপতিত থাকবে, যার পরিণাম হচ্ছে নিশ্চিত ধ্বংস। সুতরাং স্বীয় চিরাচরিত রীতি অনুসরণে, যা দৈহিক ও আধ্যাত্মিকভাবে আদিকাল থেকেই চলে আসছে, সৃষ্টির সংশোধনের জন্য তিনি কুরআন শরীফ অবতীর্ণ করেছেন। এমন অমানিশাপূর্ণ যুগেই কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক ছিল। কেননা তমসাচ্ছন্ন এই যুগে বিরাজমান অবস্থার সুরাহার জন্য এমন মহান গ্রন্থ ও এমন মহান রসূলের

প্রয়োজন ছিল। আর সত্যিকার ও বাস্তব প্রয়োজন এ কথারই দাবি করছিল যে, বিশ্বময় বিস্তৃত এই অন্ধকারের যুগে, যা চরম রূপ ধারণ করেছিল, সত্যের সূর্য উদিত হোক। কেননা সেই সূর্য উদিত হওয়া ছাড়া এমন অন্ধকার রাতের নিজ শক্তিবলে উজ্জ্বল এক দিনে উত্তরণ লাভ করা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। এর প্রতিই ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তা'লা অন্যত্র যা বলেন তা হলো–

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ
الْبَيِّنَةُ ○ رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ○ فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ○

(সূরা আল বাইয়্যেনাহ্: ২-৪)

অর্থাৎ আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফের হয়ে গেছে, তাদের প্রতি এমন মহান নবী প্রেরণ করা ব্যতীত সঠিক পথে ফিরে আসা তাদের জন্য আদৌ সম্ভব ছিল না, যিনি এমন মহান গ্রন্থ আনবেন যা হবে সকল ঐশীগ্রন্থের সম্যক তত্ত্ব ও সত্য সম্বলিত এবং সকল ভ্রান্তি ও ত্রুটিবিচ্যুতি হতে মুক্ত। এই যুক্তির প্রমাণ এখন দুটো উপক্রমণিকার প্রমাণের ওপর নির্ভরশীল। প্রধানত খোদা তা'লার চিরাচরিত রীতি এটিই যে, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে তিনি সাহায্য করে থাকেন। অর্থাৎ দৈহিক সমস্যার সময় বৃষ্টি ইত্যাদির মাধ্যমে আর আধ্যাত্মিক কষ্টের সময় স্বীয় নিরাময়ী বাণী প্রেরণের মাধ্যমে দুর্বল বান্দাদের হাত নিজের হাতে নেন। এই ভূমিকার সত্যতা স্পষ্ট। কেননা বিবেকবান কোনো ব্যক্তি একথা অস্বীকার করবে না যে, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক এই ধারা আজ পর্যন্ত সঠিকভাবে চলে আসছে। এর কারণ হলো, মহাসম্মানিত খোদা এগুলোকে নিশ্চিহ্ন হওয়া হতে রক্ষা করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, খোদা তা'লা যদি দৈহিক ব্যবস্থার সুরক্ষা না করতেন আর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় করুণাবারি দ্বারা সাহায্য না করতেন, তাহলে অবশেষে এর ফলাফল যা দাঁড়াত তা হলো, প্রথম ফসলের যা ঘরে আসে, তার পুরোটাই মানুষ খেয়ে ফেলত এবং এরপর খাদ্যশস্য না থাকার কারণে সবাই ছটফট করে মারা পড়ত এবং মানব প্রজন্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। অথবা খোদা তা'লা যদি যথাসময়ে রাত-দিন, সূর্য-চন্দ্র এবং বাতাস ও মেঘমালাকে সেবায় নিযুক্ত না করতেন, তাহলে পুরো বিশ্ব-ব্যবস্থা ভেঙে পড়ত। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

اَمۡ یَقُوۡلُوۡنَ افۡتَرٰی عَلَی اللّٰہِ کَذِبًا ۚ فَاِنۡ یَّشَاِ اللّٰہُ یَخۡتِمۡ عَلٰی قَلۡبِکَ ؕ وَ یَمۡحُ اللّٰہُ الۡبَاطِلَ وَ یُحِقُّ الۡحَقَّ بِکَلِمٰتِہٖ ؕ اِنَّہٗ عَلِیۡمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوۡرِ ○

(সূরা আশ শূরা: ২৫)

অর্থাৎ এসব অস্বীকারকারী কি বলে যে, এটি খোদার বাণী নয়– আর (সে) খোদার নামে বানিয়ে মিথ্যা বলেছে। যদি খোদা চান, এর অবতীর্ণ হওয়া বন্ধ করে দিতে পারেন, কিন্তু তিনি বন্ধ করেন না। কেননা তাঁর রীতি এভাবেই চলে আসছে যে, তিনি স্বীয় বাণীর মাধ্যমে সত্যের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেন আর মিথ্যা যে মিথ্যা, তার প্রমাণ দেন। আর এই পদে তাঁকেই শোভা পায়। কেননা আধ্যাত্মিক ব্যাধির জ্ঞান তিনিই রাখেন আর রোগ নিরাময় ও স্বাস্থ্য বহাল করার শক্তিও তিনিই রাখেন। এরপর যুক্তি-প্রমাণ দিতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ্ই হচ্ছেন সেই নিরঙ্কুশ আশীর্বাদপূর্ণ সত্তা আর আদিকাল থেকে তাঁর প্রকৃতির নিয়ম হলো–

وَ ہُوَ الَّذِیۡ یُنَزِّلُ الۡغَیۡثَ مِنۡۢ بَعۡدِ مَا قَنَطُوۡا وَ یَنۡشُرُ رَحۡمَتَہٗ ؕ وَ ہُوَ الۡوَلِیُّ الۡحَمِیۡدُ ○

(সূরা আশ শূরা: ২৯)

অর্থাৎ এমন কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি অবশ্যই পানি বর্ষণ করেন, মানুষ যখন নিরাশ হয়ে যায় সেই কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি অবশ্যই পানি বর্ষণ করেন আর ভূপৃষ্ঠে স্বীয় রহমত বিস্তৃত করেন। আর তিনিই সত্যিকার কার্যবিধায়ক এবং দৈহিক ও আধ্যাত্মিক অর্থে তিনিই প্রশংসার যোগ্য। অর্থাৎ পরিস্থিতি যখন চরমরূপ ধারণ করে, মুক্তির আর কোনো আশা থাকে না, এমন পরিস্থিতিতে এটিই তাঁর চিরায়ত রীতি যে, তিনি অবশ্যই দুর্বল বান্দাদের খবরাখবর রাখেন আর ধ্বংসের হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন। যেভাবে তিনি দৈহিক বা জাগতিক চরমভাবাপন্ন পরিস্থিতিতে দয়া প্রদর্শন করেন, অনুরূপভাবে ধর্মীয় চরমভাবাপন্ন পরিস্থিতি যখন দেখা দেয় অর্থাৎ ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তি চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায় আর মানুষ সঠিক পথ ছেড়ে দেয়, তখনও তিনি নিজের পক্ষ থেকে কাউকে ওহীর সম্মানে ভূষিত করে তাঁর বিশেষ জ্যোতি থেকে জ্যোতি দান করেন এবং এর মাধ্যমে ভ্রষ্টতার ধ্বংসাত্মক অমানিশাকে দূরীভূত করেন। আর যেহেতু সাধারণ লোকদের দৃষ্টিতে জাগতিক বা দৈহিক কৃপা একটি সুবিদিত বিষয়, এ কারণে আল্লাহ্ তা'লা উল্লিখিত আয়াতে প্রধানত কুরআন

শরীফ অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজনীতা কী তা স্পষ্ট করেছেন এবং এরপর ব্যাখ্যা হিসেবে জাগতিক নিয়মের বরাত টেনেছেন, যেন বুদ্ধিমানরা দৈহিক আইন বা নিয়মকে দেখে, যা অতি স্পষ্ট ও প্রকাশ্য বিষয় এবং খোদা-প্রদত্ত আধ্যাত্মিক নিয়মকে সহজেই বুঝতে পারে। এখানে একথাও স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, কিছু গ্রন্থকে যারা খোদার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হিসেবে বিশ্বাস করে, তাদের নিজেদেরকেই মানতে হয় যে, সেসব গ্রন্থ এমন সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে, যখন তা অবতীর্ণ হওয়ার আবশ্যকতা ছিল। সুতরাং এই স্বীকারোক্তির প্রেক্ষাপটে তাদের এই দ্বিতীয় কথাও স্বীকার করা আবশ্যক যে, প্রয়োজনে ঐশী-গ্রন্থাবলী অবতীর্ণ করা খোদার চিরায়ত রীতি। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজীদের ন্যায় ঐশী-গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা যারা স্বীকার করে না, এমন লোকদেরকে অভিযুক্ত করার জন্য যদিও আমরা অনেক কিছু লিখে এসেছি, কিন্তু তাদের মাঝে যদি বিন্দুমাত্র ইনসাফ থাকতো, তাহলে সেই একটি প্রমাণই যথেষ্ট যা উপরোল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং বর্ণনা করেছেন। কেননা যেখানে তারা স্বীকার করে যে, ইহজাগতিক জীবনের সকল ব্যবস্থা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আর তিনিই স্বীয় স্বর্গীয় আলো ও বৃষ্টির পানির মাধ্যমে পৃথিবীকে অমানিশা ও ধ্বংস হতে রক্ষা করেন; সেখানে তারা এই স্বীকারোক্তি কী করে এড়াতে পারে যে, আধ্যাত্মিক জীবনের উপকরণও আকাশ হতেই আসে? ক্ষণস্থায়ী জীবনের সব ব্যবস্থা খোদার বিশেষ কুদরতের মাধ্যমে হয় বলে স্বীকার করে নেয়া হবে, আর যা সত্যিকার ও অবিনশ্বর জীবন, অর্থাৎ খোদার মা'রেফত ও অভ্যন্তরীণ আলো, সেটাকে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিবুদ্ধির ফসল আখ্যা দেয়া চরম অদূরদর্শিতা ও অন্তর্দৃষ্টির অভাব বইকি! সেই খোদা, যিনি দৈহিক ব্যবস্থাকে সচল রাখার জন্য উপাস্য হিসেবে স্বীয় দৃঢ় শক্তিনিচয় প্রকাশ করেছেন আর মানুষের হাতের মাধ্যম ছাড়াই অসাধারণ শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন, স্বীয় শক্তি প্রকাশের সময় তাঁকে আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল ও অক্ষম ভাবা যেতে পারে কি? প্রশ্ন হলো, এমন ধারণা করলে তিনি কামেল থাকতে পারেন কি বা তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে কি? সত্যিকারের প্রশান্তি-প্রবোধ, যার ভিত্তি এক সুদৃঢ় বিশ্বাসের ওপর হওয়া উচিত, কেবল কাল্পনিক ধ্যানধারণার মাধ্যমে তা অর্জিত হতে পারে না। অনুমানভিত্তিক ধ্যানধারণার সর্বোচ্চ স্তর হলো সর্বব্যাপী অনুমান বা ধারণা অবধি। সেটিও কেবল তখন সম্ভব, যদি অনুমান অস্বীকারের দিকে অগ্রসর না হয়। এককথায়, নিছক বুদ্ধিনির্ভর কথাবার্তা

পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয় এবং তত্ত্বজ্ঞানের পরম মার্গ হতে তা পিছিয়ে আছে। আর সেসবের সর্বোচ্চ দৌড় হলো কেবল বাহ্যিক অনুমানভিত্তিক কথাবার্তা পর্যন্তই, যার মাধ্যমে আত্মার সত্যিকার প্রশান্তি ও তত্ত্বজ্ঞান অর্জিত হয় না আর অভ্যন্তরীণ কলুষ হতে পবিত্রতাও লাভ হয় না। বরং এমন মানুষ হীন চিন্তাধারার দাসত্ব করে 'মাকামাতে হারিরী'-র আবু যায়েদের ন্যায় স্বীয় জ্ঞান ও কৌশলকে ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। তার সকল বাকপটুতা ও সুন্দর বক্তৃতা আসলে মিথ্যার ফাঁদই হয়ে থাকে। মানুষের দুর্বল বোধবুদ্ধি তার নির্জন মুহূর্তে তাকে সেই বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিতে পারে কি, যে নিজ রিপুর আকর্ষণ, অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্যের শিকার হচ্ছে? মানুষের চিন্তাধারায় এমন কোনো শক্তি আছে কি, যা খোদা তা'লার জ্ঞান ও শক্তির সমান হতে পারে? আত্মাতে খোদার পবিত্র জ্যোতি যেসব প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং গভীর সন্দেহ থেকে মুক্তি দিতে পারে, তা কি অন্যদের পক্ষ থেকেও লাভ হওয়া সম্ভব? আদৌ নয়। বরং সে সকল মানুষ এমন প্রহসনের শিকার, যারা একথা কখনো ভাবে নি যে, আমাদের প্রকৃত মুক্তি কোন্ পর্যায়ের তত্ত্বজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল; ঐশী-শক্তি আমাদের আত্মার ওপর কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে, আর খোদার অশেষ কৃপার কতটা নিকটে আমরা আসতে পারি এবং কত ভালোভাবে তা শনাক্ত করতে পারি আর তা কতটা আমাদের পর্দা উন্মোচন করতে পারে! তাদের অর্জিত তত্ত্বজ্ঞান কেবল বাজে সন্দেহের মাঝেই সীমাবদ্ধ। যে তত্ত্বজ্ঞান নিশ্চিত, অকাট্য এবং মানুষের মুক্তির জন্য অত্যাবশ্যক, তা তাদের অদ্ভুত বিবেকবুদ্ধির হিসেব অনুসারে অসম্ভব ও নিষিদ্ধ। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে, এটি তাদের মারাত্মক ভ্রান্তি, যারা যৌক্তিক ধ্যানধারণাকেই যথেষ্ট মনে করে বসে আছে। ঐশী তত্ত্বজ্ঞানের সফরে অগণিত গূঢ়-রহস্য রয়েছে, যা মানুষের দুর্বল ও ঝাপসা বা অসম্পূর্ণ বুদ্ধি আবিষ্কার করতে পারে না। অনুমানের শক্তি স্বীয় চরম দুর্বলতা বা ত্রুটির কারণে ঈশ্বরত্ব বা খোদা-সংক্রান্ত সুমহান রহস্যাবলী আদৌ উদঘাটন করতে পারে না। সুতরাং সেই উচ্চতায় পৌঁছার জন্য খোদার মহান বাণী ছাড়া আর কোনো সোপান নেই। যে ব্যক্তি আন্তরিক সততা বা নিষ্ঠার সাথে খোদার সন্ধানী, তার জন্য এই সোপানেরই প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই দৃঢ় ও সুউচ্চ সোপানকে যতক্ষণ নিজের উন্নতির মাধ্যম হিসেবে অবলম্বন না করা হয় ততক্ষণ মানুষ ঐশী তত্ত্বজ্ঞানের সুউচ্চ মিনার পর্যন্ত আদৌ পৌঁছতে পারে না;

বরং এমন অন্ধকার ও তমসাচ্ছন্ন চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন থাকবে, যা কোনোভাবেই স্বস্তিকর নয় এবং অবাস্তব। এই ঐশী তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে তার সকল জ্ঞান দুর্বল ও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সূতা ছাড়া একটি সুঁই যেভাবে অকেজো ও অর্থহীন, সেলাইয়ের কোনো কাজ এটি দিয়ে সাধিত হতে পারে না; অনুরূপভাবে খোদার বাণীর সমর্থন ছাড়া যৌক্তিক দর্শন অত্যন্ত নড়বড়ে, অস্থিতিশীল ও ভিত্তিহীন।

پائے استدلالیاں چوبیں بود پائے چوبیں سخت بے تمکیں بود

যুক্তির ওপর ভরসাকারীদের পা হলো কাঠের (তৈরী অর্থাৎ অস্থিতিশীল),
কাঠের পা অত্যন্ত অস্থিতিশীল বা দুর্বল হয়ে থাকে।

টীকা নম্বর এগার (১১)

[তৃতীয় খণ্ডের ধারাবাহিকতায়]

এমন সন্দেহের আদৌ যে কোনো অবকাশ থাকে না। এমন প্রমাণিত বিষয়ে সন্দেহ করা সেসব উন্মাদ, সন্দেহবাদী ও তর্কবাগিশদের কাজ যাদের হৃদয় মূলত স্বভাবগত দিক থেকে এতটা সন্দেহের বশীভূত যে, কোনো সত্যের ওপর পুরো নিশ্চয়তার সাথে বিশ্বাস স্থাপন তাদের ভাগ্যে জোটে না এবং তারা সর্বদা সন্দেহে নিমজ্জিত থাকে। আলো অত্যন্ত উন্নত মানে উপনীত হলেও এদের স্বভাবজাত অন্ধত্ব, যা বাদুড়ের ন্যায় জন্মের সময় তাদের সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায়, আদৌ হ্রাস পায় না। এমনকি আল্লাহ্‌র সত্তা সম্পর্কেও তাদের সন্দেহ সদা লেগেই থাকে। অতএব এমন অন্ধদের ব্যাধির চিকিৎসা সত্যিকার অর্থে অসম্ভব। কেননা যে ব্যক্তি কিঞ্চিৎ পরিমাণও অন্তর্দৃষ্টি রাখে, সেও বুঝতে পারে যে, গবেষণা ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের ধারা যেখানে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যার ফলশ্রুতিস্বরূপ সত্য কার্যত পুরোমাত্রায় প্রকাশ পেয়ে যায় এবং চতুর্দিক থেকে স্পষ্ট ও অকাট্য সাক্ষ্যপ্রমাণাদি সূর্যের মতো ঔজ্জ্বল্য নিয়ে প্রকাশিত হয়, সেখানেই গবেষণা ও অনুসন্ধানের পরিসমাপ্তি ঘটে আর সেখানেই সত্য-সন্ধানীর দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হয়; আর তা গ্রহণ করা ছাড়া মানুষের আর কোনো উপায় থাকে না। এটি জানাকথা যে, যখন পুরো প্রমাণ হাতে এসে গেলো আর বিতর্কিত (অর্থাৎ যে বিষয়ে গবেষণা চলছে সে) বিষয়ের সকল দিক প্রভাতের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেল, বিষয়ের সত্যিকার চিত্র সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সাথে উদ্‌ঘাটিত হলো, সেখানে বুদ্ধিমান ও সুস্থ ইন্দ্রিয়ের মানুষ কেন সন্দেহ করবে আর সুস্থ বিবেকের মানুষের হৃদয় তারপরও তাতে প্রবোধ ও স্বস্তি পাবে না– এর কারণ কী? অবশ্য যতক্ষণ ভ্রান্তির আশঙ্কা থাকে আর পুরো স্বচ্ছতার সাথে বিষয় প্রকাশ না পায়, ততক্ষণ চিন্তাভাবনা ও প্রণিধানের কাজ ক্রমাগতভাবে এগিয়ে যেতে পারে এবং পর্যালোচনার পর পর্যালোচনার সুযোগ থাকে। সন্দেহপ্রবণদের ন্যায় প্রমাণিত বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে অনর্থক কুমন্ত্রণার শিকার হবে– এমনটি হওয়া উচিত নয়; আর

বি. দ্র.: টীকা নম্বর এগার (১১) তৃতীয় খণ্ডের মূল পুস্তকের ১৯ পৃষ্ঠার সাথে সম্পর্ক রাখে। –অনুবাদক

একে প্রগতিশীলতাও বলা যায় না, বরং এটি উন্মাদনামূলক উপসর্গ প্রকট হওয়া বইকি। যার সামনে একটি বিষয়ের বৈধতা বা অবৈধতা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট, সে কি অচেতন নাকি উন্মাদ যে, বিষয়ের পূর্ণ স্পষ্টতা সত্ত্বেও তার মনে এমন প্রশ্ন জাগবে যে, আমি যে বিষয়কে অবৈধ মনে করি তা বৈধও হতে পারে বা যাকে আমি বৈধ আখ্যা দিই, তা বাস্তবে অবৈধও হতে পারে! কিন্তু এমন প্রশ্নাবলী তখন দেখা দিতে পারে, আর এমন কুমন্ত্রণা তখন অন্তরে জাগ্রত হতে পারে যদি সবকিছু নির্ভর করে মানুষের বুদ্ধিগত ধ্যানধারণা ও অনুমানের ওপর, আর মানব-বুদ্ধি ব্রাহ্ম সমাজীদের বুদ্ধির ন্যায় এর দ্বিতীয় সাথি (অর্থাৎ এলহামের সাথে) ঐকমত্য ও এর সঙ্গ থেকে বঞ্চিত ও বিতাড়িত থাকে। কিন্তু সত্যিকার এলহামের অনুসারীদের বুদ্ধি এমন ভাগ্যবিড়ম্বিত ও নিঃসঙ্গ নয়, বরং এর সাহায্যকারী ও সহকারী হলো খোদার পরমোৎকর্ষ বাণী বা উক্তি, যা গবেষণার ধারাকে এর চূড়ান্ত কেন্দ্রবিন্দু বা পরম মার্গে পৌঁছায় এবং দৃঢ়বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে সেই মর্যাদা দান করে যার চেয়ে অগ্রগামী হওয়ার কোনো সুযোগই নেই। কেননা একদিকে তা যৌক্তিক প্রমাণাদিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করে, অপরদিকে তা স্বয়ং অনন্য হওয়ার সুবাদে খোদা ও তাঁর দিকনির্দেশনার ওপর বিশ্বাস স্থাপনের জন্য মোক্ষম বা অকাট্য যুক্তিও বটে।

সুতরাং এই দ্বিমুখী প্রমাণের মাধ্যমে সত্যসন্ধানীর যতটা প্রকৃত সত্যভিত্তিক বিশ্বাস অর্জিত হয় তার মূল্য কেবল সে ব্যক্তিই বোঝে যে আন্তরিকভাবে খোদাকে সন্ধান করে, আর সে ব্যক্তিই সেই মর্যাদার সন্ধানে থাকে যে আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে খোদার সন্ধানী। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজীরা, যাদের (শিক্ষার) মূলনীতি হলো, এমন কোনো গ্রন্থ বা এমন কোনো মানুষ নেই যাতে বা যার মাঝে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা নেই! যতদিন তারা এই শয়তানী নীতি পরিহার করে নিশ্চিত পথের সন্ধানী না হবে, কী করে বিশ্বাসের এই পর্যায়ে উপনীত হতে পারে? কেননা আজ পর্যন্ত যেখানে স্বয়ং ব্রাহ্ম সমাজীদের নিজেদের স্বীকারোক্তি অনুসারে এমন কোনো গ্রন্থ তাদের হস্তগত হয় নি, আর তারা নিজেরাও কোনো পুস্তক বানায় নি যা হবে ভ্রান্তিমুক্ত বিষয়াদির সমাহার! তাই এটি স্পষ্ট যে, তাদের বিশ্বাস আজও সন্দেহের আবর্তে নিপতিত। তাদের এই নীতি স্পষ্টভাবে এ কথার সাক্ষ্য বহন করে যে, খোদাকে চেনা সংক্রান্ত বিষয়াদির কোনোটিতেই তাদের বিশ্বাস নেই। কোনো গ্রন্থ ধর্মীয় জ্ঞানে সঠিক বিষয়াদি বা শিক্ষামালার সমাহার হবে– তাদের মতে এই কথাটি অসম্ভব; বরং

তারা প্রকাশ্যে এই মতামত ব্যক্ত করে বসেছে যে, কোনো গ্রন্থ যদি শতভাগ খোদার সত্তায় বিশ্বাসীও হয় এবং তাঁকে এক-অদ্বিতীয়, সর্বশক্তিমান, স্রষ্টা, অদৃশ্যে জ্ঞাত, প্রজ্ঞাবান, পরম করুণাময় ও অন্যান্য উৎকর্ষ গুণাবলীর আধার হিসেবে স্মরণ করে আর তাঁকে নতুনত্ব, বিলুপ্তি, পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও অন্যের অংশীদারিত্ব ইত্যাদি বহুবিধ নীচ ও হীন বিষয়াদির ঊর্ধ্বে ও পবিত্র জ্ঞান করে, তবুও সে গ্রন্থ এদের মতে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনার ঊর্ধ্বে নয় এবং তা একথার যোগ্য নয় যে, এর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যেতে পারে। এ কারণে এরা কুরআন শরীফকেও অস্বীকার করছে। এখন দেখ, এদেরই স্বীকারোক্তি অনুসারে এদের ধর্ম ও ঈমানের সারকথা হলো খোদার অস্তিত্ব, তাঁর একত্ববাদ ও তাঁর সর্বশক্তিমান হওয়া ভ্রান্তির সম্ভাবনা থেকে মুক্ত নয়।

বস্তুত যেখানে তারা নিজেরাই স্বীকার করে বসলো যে, তাদের কাছে এমন কোন গ্রন্থ নেই যার সঠিক হওয়া তাদের দৃষ্টিতে হবে সুনিশ্চিত, সেখানে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তাদের ধর্মের ভিত্তি নিছক ধারণার ওপর আর তাদের ঈমান বিশ্বাসের স্তর থেকে অধঃপতিত এবং সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত ও বিতাড়িত। সুতরাং এটি সে কথাই যা আমরা বহুবার এই টীকায় লিপিবদ্ধ করেছি, অর্থাৎ কেবল (তথাকথিত) বুদ্ধি-ভিত্তিক বক্তৃতার মাধ্যমে খোদা বা ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে পুরোপুরি প্রবোধ পাওয়া ও নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের ও ব্রাহ্মদের মাঝে এ কথায় মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হলো যে, কেবল বুদ্ধির পথনির্দেশনার ওপর নির্ভর করে কোনো মানুষ পূর্ণ বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না। বিতর্কিত বিষয় কেবল এটি ছিল যে, প্রকৃতিগত সহজাত বৈশিষ্ট্য হিসেবে পূর্ণ বিশ্বাস অর্জন ও নিরঙ্কুশ সত্য সন্ধানের আন্তরিক আবেগ-উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও মানুষ এই প্রকৃতিগত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ ও দুর্ভাগাই রয়ে গেল আর কেবল এমন চিন্তাধারা পর্যন্তই তার জ্ঞান সীমাবদ্ধ থেকে গেল যা ভ্রান্তির আশঙ্কা থেকে মুক্ত নয়, প্রশ্ন হলো, খোদা কি মানুষকে কেবল এ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন, যেমনটি কিনা ব্রাহ্মদের ধারণা? না-কি খোদা মানুষের পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান অর্জন ও পুরো সফলতার জন্য কোনো পথও নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং এমন কোনো গ্রন্থও দিয়েছেন যা উল্লিখিত নীতির বাইরে থাকবে, যাতে ভ্রান্তির সম্ভাবনার সর্বৈব নিয়মনীতি বিধৃত রেখেছেন? সুতরাং সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই আর তাঁরই সকল অনুগ্রহ। কেননা এমন গ্রন্থ খোদার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়া সুনিশ্চিত প্রমাণাদির মাধ্যমে আমাদের সামনে প্রতিভাত, আর আমরা উল্লিখিত প্রশংসনীয় গ্রন্থের মাধ্যমে ধ্বংসের সেই ঘূর্ণিপাক থেকে বেরিয়ে এসেছি যাতে

ব্রাহ্মরা লাশের ন্যায় পড়ে রয়েছে। সেই গ্রন্থ, সেই মহান ও পবিত্র গ্রন্থ, যার নাম হলো ফুরকান, যা সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরে আর তা সকল ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত, এর প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো–

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

(সূরা আল বাকারা: ৩)

এটিই আমাদের সামনে প্রকাশ করেছে যে, খোদা সত্য-সন্ধানীদের বিশ্বাসের বিভিন্ন প্রশংসনীয় মর্যাদা অর্জন করা থেকে বঞ্চিত রেখে ধ্বংস করতে চান না। বরং সেই দয়ালু ও কৃপাময় খোদা স্বীয় দুর্বল ও অযোগ্য বান্দাদের প্রতি এমন অনুগ্রহ করেছেন যে, মানুষের অপরিপক্ক বুদ্ধি যে কাজ সাধন করতে পারে না তা তিনি নিজেই করে দেখিয়েছেন। যে গগনচুম্বী মহীরুহ পর্যন্ত মানুষের খাটো হাতের পক্ষে পৌঁছা সম্ভব ছিল না, তার ফলরাজি তিনি নিজ হাতে নীচে ফেলেছেন; আর সত্য-সন্ধানী এবং সত্যের জন্য অপেক্ষমান ও পিপাসার্তদের সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত বিশ্বাসের উপকরণ দান করেছেন। অধিকন্তু ধর্মীয় সত্যের সহস্র সহস্র নিগূঢ় তত্ত্ব অণু-পরমাণুর ন্যায় আধ্যাত্মিক আকাশের সুদূর মহাশূন্যে যা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল, আর জীবনের যে বারিধারা কুয়াশার ন্যায় বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্নভাবে মানব-প্রকৃতির অমানিশা ও এর গভীর থেকে গভীরতর শক্তি-বৃত্তির মাঝে লুক্কায়িত ও পর্দার অন্তরালে ছিল তা দৃশ্যপটে নিয়ে আসা এবং অন্তহীন মহাশূন্য থেকে একস্থানে সেসব সমবেত করা ছিল মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তির নাগালের বাইরে; যা কিনা পুরোপুরি দেখার জন্য দৃষ্টি সঙ্গ দিতে পারত না আর যা একত্রিত করার জন্য জীবনও অবকাশ দিত না, মানবীয় দুর্বল শক্তি-বৃত্তির কাছে সত্যের এমন অতি সূক্ষ্ম ও গুপ্ত রহস্যাবলীকে (বা কণিকারাজিকে) সহজে আবিষ্কার ও করায়ত্ত করা আর সূক্ষ্ম ও অদৃশ্যকে পুরোপুরি দৃশ্যমান করার জন্য এমন কোনো উপকরণ বা যন্ত্র ছিল না।

প্রজ্ঞার সূক্ষ্ম সুন্দর দিকগুলো ও সূক্ষ্ম তত্ত্বকে এই সর্বাঙ্গসুন্দর ও অনুপম গ্রন্থ কোনোরূপ খুঁত, ভুলভ্রান্তি ও ভুলে যাওয়ার ব্যাধির ঊর্ধ্বে থেকে খোদার শক্তি ও সামর্থ্যের সুবাদে, খোদার প্রতিপালনের ক্ষমতা ও আধিপত্যের কল্যাণে আমাদের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে, যেন আমরা এ পানি পান করে রক্ষা পাই এবং ধ্বংসের বা মৃত্যুর গহ্বরে পতিত না হই। এর পরাকাষ্ঠা দেখুন! এত নিখুঁতভাবে তা সমবেত করেছে যে, সত্যের কোনো নিগূঢ় ও সূক্ষ্ম দিক বা প্রজ্ঞার সূক্ষ্ম-সুন্দর দিকগুলোর কোনো বিরল একটি দিকও বাদ পড়ে নি আর

এমন কোনো বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয় নি যা কোনো সত্যের পরিপন্থী ও বিরোধী হবে। যেমন আমরা বিরোধীদের অভিযুক্ত ও লাঞ্ছিত করার জন্য বিভিন্ন স্থানে স্পষ্টভাবে লিখে দিয়েছি এবং বজ্র-নিনাদ কণ্ঠে ঘোষণা করেছি যে, যদি কোন ব্রাহ্ম কুরআনের কোন বিবরণকে সত্য-পরিপন্থি (জ্ঞান করে) বা এতে কোনো একটি সত্য বাদ পড়েছে বলে মনে করে, তাহলে নিজের আপত্তি উপস্থাপন করুক। আমরা খোদার কৃপা ও দয়াকে পুঁজি করে তার সন্দেহ এমনভাবে নিরসন করব যে, যে কথাকে সে নিজের ভ্রান্ত ধারণা অনুসারে ত্রুটি মনে করে, তা যে এক কুশলতা ও সুকুমার চারুশৈলী তা তার সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

এখানে এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, নিছক বুদ্ধিভিত্তিক ধ্যানধারণার ত্রুটি কেবল এতটাই নয় যে, তা দৃঢ় বিশ্বাসের মর্যাদায় উপনীত হতে পারে না আর ঐশী সূক্ষ্ম রহস্যাবলীর সম্ভারকে আয়ত্ত করতে অক্ষম, বরং এর আরো একটি ত্রুটি হলো, নিরেট বুদ্ধিভিত্তিক কথাবার্তা হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত দুর্বল ও প্রাণহীন হয়ে থাকে। দুর্বলতার কারণ হলো, কোনো কথা বা বাণী হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হওয়া নির্ভর করে সে কথার সত্যতা এবং শ্রোতার মন-মস্তিষ্কে সেভাবে প্রতিষ্ঠিত ও প্রোথিত হওয়ার ওপর যাতে সন্দেহের লেশমাত্র থাকবে না। অধিকন্তু একথা দৃঢ়-বিশ্বাস হিসেবে হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়ার ওপর যে, আমাকে যে কথার সংবাদ দেয়া হয়েছে তাতে ভ্রান্তির কোনো আশঙ্কা নেই। এখনই প্রকাশ পেয়ে গেছে যে, নিছক যুক্তিবুদ্ধি পূর্ণ বিশ্বাসের পর্যায়ে উপনীত করতে আদৌ সক্ষম নয়। সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে এটি স্পষ্ট যে, সেসব লক্ষণ বা ফলাফল, যা দৃঢ়-বিশ্বাসের ফলশ্রুতিস্বরূপ প্রকাশ পায় আর সে সকল প্রভাব বা কার্যকারিতা যা সুনিশ্চিত সুদৃঢ় বাণী বা গ্রন্থ হৃদয়ে সৃষ্টি করে, তা নিছক বুদ্ধির কাছে মোটেই প্রত্যাশা করা যায় না, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় এর প্রমাণ স্পষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এক ব্যক্তি সুদূর বিলেত ভ্রমণ করে ফিরে আসে। স্বদেশে ফেরার পর আপন-পর সকলেই তার কাছে বিলেতের খবরাখবর জানতে চায়। মিথ্যার অভ্যাস আছে বলে যদি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ না থাকে, তাহলে তার চাক্ষুস বিবরণ হৃদয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষকরে যদি এমন কোনো সংবাদদাতা হয়ে থাকে, যে মানুষের দৃষ্টিতে পুণ্যবান ও সৎ, তাহলে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সন্দেহ ছাড়াই বাস্তবে তা সত্য ও সঠিক বলে গণ্য হয়। প্রশ্ন হলো, তার কথায় কেন এত প্রভাব? এ কারণে যে, প্রধানত তাকে ভদ্র ও পুণ্যবান মেনে তার সম্পর্কে এই

দৃঢ়-বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছে যে, সে সেসব দেশের যেসব ঘটনা বর্ণনা করে তা স্বচক্ষে দেখেছে এবং যে সংবাদ দিয়েছে তার পুরোটাই তার চাক্ষুস বৃত্তান্ত। সুতরাং এ কারণেই হৃদয়ে তার কথার সুগভীর প্রভাব পড়ে আর তার বিবৃতি হৃদয়ে এমনভাবে গেঁথে যায় যেন সেসব ঘটনার চিত্র চোখের সামনে এসে দণ্ডায়মান হয়। বরং প্রায়শ সে যখন তার ভ্রমণের কোনো বেদনাবিধুর ঘটনা শোনায় বা কোনো জাতির বেদনাঘন কাহিনী বর্ণনা করে, শুনতেই তা শ্রোতাদের হৃদয়কে এমনভাবে আন্দোলিত করে যে, তাদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে যেন তারা অকুস্থলে উপস্থিত এবং ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছে।

কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের ঘরের চতুঃসীমা থেকেই কখনো বের হয় নি, না কখনো অন্য কোনো দেশে গিয়েছে আর না দর্শকদের কাছে তার বৃত্তান্ত শুনেছে: সে যদি দাঁড়িয়ে অনুমানের ভিত্তিতে সে দেশের বৃত্তান্ত তুলে ধরা আরম্ভ করে, সেক্ষেত্রে তার বাগাড়ম্বরে আদৌ কোনো প্রভাব পড়বে না। বরং মানুষ তাকে বলবে যে, তুই কী পাগল নাকি উন্মাদ যে, এমন কথা বলছিস যা তোর পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার আওতাবহির্ভূত এবং তোর সীমাবদ্ধ জ্ঞানের ঊর্ধ্বে? এর উত্তরে সে এমন কথাই বলে যেমনটি কিনা এক বুযুর্গ কোনো আহাম্মকের কাহিনীতে লিখেছেন; অর্থাৎ সে কোনো জায়গায় আটার রুটির ভূয়সী প্রশংসা করতে গিয়ে বলছিল যে, তা খুবই সুস্বাদু হয়ে থাকে। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, তুমি কি কোনো সময় (আটার রুটি) খেয়েছ? তখন সে উত্তর দেয় যে, আমি কখনো খাই নি ঠিকই কিন্তু আমার দাদাজী বলতেন যে, একবার তাঁরা কাউকে খেতে দেখেছেন।

বস্তুত দর্শকের দৃষ্টিতে, যতক্ষণ কেউ স্বয়ং কোনো ঘটনা পুরোপুরি আয়ত্ত না করবে ততক্ষণ তার কথা হৃদয়ে কোনো প্রভাব বিস্তার করার পরিবর্তে অনর্থক তিরস্কার ও উপহাসের কারণ হয়। এ কারণেই বুদ্ধিমানদের নিছক প্রাণহীন বক্তৃতা কাউকে পরকালের প্রতি নিশ্চিতভাবে মনোযোগী করে নি। মানুষ এ ধারণাই করে আসছে যে, যেভাবে এরা নিছক অনুমানের বশবর্তী হয়ে কথা বলে, অনুরূপভাবে আমরাও এদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থি কাল্পনিক কথাবার্তা বলতেই পারি। অকুস্থলে গিয়ে প্রকৃত সত্য তারাও দেখে নি, আমরাও না। এ কারণেই যখন একদিকে কিছু বুদ্ধিমান খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করা আরম্ভ করল, তখন দ্বিতীয় শ্রেণির বুদ্ধিমানরা তাদের বিরোধিতায় নাস্তিক্যবাদের সমর্থনে পুস্তকাবলী লিখে ফেলল। সত্য কথা হলো, এসব

বুদ্ধিজীবির দল খোদার সত্তায় যৎসামান্য বিশ্বাসী ছিল ঠিকই কিন্তু তারা কখনো নাস্তিকতার ব্যাধি থেকে মুক্ত ছিল না আর এখনো নয়। এ ব্রাহ্মদের দেখ! তারা আবার কখন্ খোদাকে সকল উৎকর্ষ গুণাবলীর আধার মনে করে? একথা তারা আবার কখন্ স্বীকার করে যে, খোদা বোবা নন বরং সত্যিকার অর্থে তাঁর মাঝে বাকশক্তিও বিদ্যমান, যেভাবে এক জীবিত সত্তার মাঝে থাকা উচিত? তারা আবার কখন্ তাঁকে সত্যিকার অর্থে শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী ও জীবিকাদাতা জ্ঞান করে? কোথায় তাদের এ ঈমান যে, সত্যিকার অর্থে খোদা চিরঞ্জীব জীবনদাতা, চিরস্থায়ী স্থায়িত্বদাতা আর নিজের শব্দ বা কথা সত্যনিষ্ঠ হৃদয়ে পৌঁছাতে পারেন? বরং তারা তাঁর সত্তাকে কাল্পনিক ও লাশতুল্য কিছু মনে করে, যাকে মানবীয় বুদ্ধি নিছক ধ্যানধারণার বশবর্তী হয়ে কল্পনা-বিলাস হিসেবে প্রস্তাব করে থাকে। তাঁর পক্ষ থেকে জীবিতদের ন্যায় কোনো কথা বা শব্দ শোনা যায় না, যেন তিনি খোদা নন, বরং কোণে পড়ে থাকা কোনো প্রতিমা। আমি আশ্চর্য হই যে, এমন দুর্বল ও অপরিপক্ক ধ্যানধারণা নিয়ে এরা কেন এত উৎফুল্ল? আর এমন বানানো কথা বলে কিইবা ফল আশা করা যেতে পারে? কেন সত্যিকার সন্ধানীদের ন্যায় সেই খোদাকে সন্ধান করে না যিনি সর্বশক্তিমান, ক্ষমতাবান ও জাগ্রত-জীবন্ত আর আপন সত্তার নিজেই সংবাদ দেয়ার সামর্থ্য রাখেন? اِنِّیْ اَنَا اللّٰہ ধ্বনির মাধ্যমে মৃতদের নিমিষে জীবিত করতে পারেন? যেখানে এরা নিজেরাই জানে যে, নিছক বুদ্ধির আলো ঝাপসা হয়ে থাকে, তাই প্রশ্ন ওঠে যে, এরা কেন পূর্ণ আলো লাভের অভিলাষী হয় না? অদ্ভুত আহাম্মক! রোগাক্রান্ত হওয়ার কথা স্বীকার করে ঠিকই, কিন্তু চিকিৎসা নিয়ে আদৌ কোনো মাথাব্যথা নেই। পরিতাপ! বিষয়ের প্রকৃত রূপ দেখার জন্য কেন এদের চোখ খোলে না? সত্য কথা শোনার জন্য তাদের কান থেকে কেন পর্দা অপসারিত হয় না? তাদের হৃদয় কেন এতটা বক্র আর বোধবুদ্ধি কেন এত উল্টে গেল যে, যে আপত্তি সত্যিকার অর্থে তাদের বিরুদ্ধেই বর্তায়, তা তারা সত্য এলহামের অনুসারীদের ওপর আরোপ করা আরম্ভ করেছে? আমরা কী এখনো প্রমাণ করে তাদের দেখাই নি, তারা খোদাকে চেনার ক্ষেত্রে বড়ই দুর্বল ও বিপজ্জনক অবস্থানে রয়েছে? আমরা কী এখনো তাদের সামনে এটি প্রকাশ করি নি যে, পূর্ণ ও সর্বোৎকৃষ্ট তত্ত্বজ্ঞান কেবল কুরআন শরীফের মাধ্যমেই লাভ হতে পারে, অন্যভাবে নয়? সুতরাং সকল অর্থে যেখানে তাদের মিথ্যা ও ভ্রান্তিতে নিপতিত থাকা প্রমাণ হয়ে গেল, সেখানে এটি কেমন বিশ্বাস ও সততা যে, নিজ ঘরের শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে

অজ্ঞ থেকে ইসলামের অনুসারীদের রুগ্ন আখ্যা দেয়, আর নোংরা ও দুষ্কৃতিমূলক কথাবার্তা মুখে আনে? এর মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে এটি প্রমাণিত হয় যে, সদাচার ও সততাপূর্ণ জীবনের সাথে এদের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই; অধিকন্তু এগুলো তাদের কথা তো নয় বরং হিংসা ও বিদ্বেষের দুর্গন্ধে ভরা তশতরি।

ব্রাহ্ম সমাজীদের অপর একটি সন্দেহও রয়েছে– যা হলো এই সন্দেহ বা কুমন্ত্রণার পরিশিষ্ট। অর্থাৎ এলহাম একটি কারাগার আর আমরা সকল কারাগার থেকে মুক্ত! অর্থাৎ আমরা ভালো আছি, কেননা এক 'স্বাধীন' এক 'বন্দি' থেকে ভালো অবস্থায় থাকে! আমরা এ সমালোচনাকে স্বীকার করি ও মানি যে, নিঃসন্দেহে এলহাম একপ্রকার কারাগার; কিন্তু এমন কারাগার যা ছাড়া সত্যিকার মুক্তি লাভ হওয়া সম্ভব নয়। কেননা সত্যিকার স্বাধীনতা সেটি, যার মাধ্যমে সকল প্রকার ভুলভ্রান্তি ও সন্দেহ থেকে মুক্তি লাভ করে মানুষের দৃঢ় বিশ্বাসের মর্যাদা লাভ হয় আর এ পৃথিবীতেই স্বীয় অতীব সম্মানিত প্রভুর দর্শন লাভ করা যায়। অতএব আমরা যেভাবে এই টীকায় প্রমাণ করেছি যে, এই প্রকৃত মুক্তি কুরআনের মাধ্যমেই পৃথিবীতে কামেল ও খোদা-প্রেমিক মুসলমানদের লাভ হয়েছে, তাদের ব্যতিরেকে কোনো ব্রাহ্ম প্রমুখের তা অর্জন হয় নি। অবশ্য একটি কারণে ব্রাহ্ম সমাজীদের নামও স্বাধীন এবং লাগামহীন হতে পারে– এ ধারণার বশবর্তী হয়েই আমরাও এ গ্রন্থে কোনো কোনো স্থানে তাদের নাম স্বাধীন-লাগামহীন রেখেছি। তা হলো, যেমনটি কিনা কোনো লম্পট, মদ্যপ, মদ পান করে বা আফিমের এক পেয়ালা টেনে বা চরস ইত্যাদি মাদক সেবন করে সর্বপ্রকার লজ্জা-শরম ও মান-মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও যত্নবান হওয়া তো দূরের কথা বরং খোদাকেও মানা না মানার বিষয়ে স্বাধীন সেজে বসেছে আর যা মনে উদয় হয়, তাই বলে বসে আর যাচ্ছেতাই বকবক করে; এদের আচার-আচরণ অনুসারেই কতক ব্রাহ্ম আমাদের সামনে প্রমাণ করেছে যে, কার্যত তারা এ অর্থেই স্বাধীন। সত্যিকার অর্থে তারা বাছ-বিচারহীনভাবে ও স্বাধীন থেকে এ পৃথিবীর সুখ যথেষ্ট ভোগ করেছে অর্থাৎ হালাল-হারাম সবকিছু মুখে পুরেছে আর ধর্মীয় আদেশ-নিষেধের চাবিও তাদের নিজেদেরই হাতে এসে গেছে। অবাধ্য প্রবৃত্তির পরামর্শে যে দ্বারই খোলার ইচ্ছা হয় খুলে দাও, যা বন্ধ করার করে দাও, কেননা নিজেইতো ধর্ম-কর্মের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু এসব স্বাধীনতার স্বাদ সেদিন পাবে যেদিন খোদার দরবারে নিজের সব ঈমানহীনতার জবাব দিতে হবে।

এই সন্দেহের পরিশিষ্ট হলো ব্রাহ্মসমাজীদের অপর একটি উক্তি। আর তা হলো এলহামের অধীনস্থ হওয়া সঠিক পন্থা ও স্বাভাবিক রীতিনীতির বিরোধী বিষয়; এভাবে তারা যেন নিজেদের অর্বাচীনতা বা নির্বুদ্ধিতাকে ভিন্নভাবে প্রকাশ করল, কেননা সকল বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য পরিষ্কার ও সোজা পথ, যা প্রত্যেক মানুষের ভেতরকার সরব, সচেতন ও যৌক্তিক মানুষটি আপন প্রকৃতির দাবি অনুসারে কামনা করে তা হলো যৌক্তিক প্রমাণাদির মাধ্যমে সেই সত্যের স্বরূপ খোলাসা করা। যেমন চৌর্যবৃত্তি নোংরা হওয়ার প্রকৃত কারণ এটি নয় যে, কোনো ঐশী গ্রন্থে এটিকে পাপ আখ্যা দেয়া হয়েছে, বরং যার ওপর আধ্যাত্মিক প্রশান্তি নির্ভর করে তা হলো এটি একটি অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন, যা বিবেকের কাছেও অসঙ্গত এবং অবৈধ। অথবা দৃষ্টান্তস্বরূপ আর্সেনিক একটি বিষ, তা খাওয়া সত্যিকার অর্থে নিষিদ্ধ হতে পারে এ কারণে যে, তা প্রাণহারী ও ধ্বংসাত্মক, এ কারণে নয় যে, খোদার বাণীতে এটি খাওয়া ও পান করার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, বাস্তব ও প্রকৃত সত্যের পথ প্রদর্শক হলো যুক্তি বা বুদ্ধি, এলহাম নয়। কিন্তু এসব ব্যক্তিবর্গের এখন পর্যন্ত এটিও জানা নেই যে, এই সন্দেহের মূল তখনই উৎপাটিত হয়েছে যখন সুদৃঢ় ও জোরালো যুক্তি প্রমাণাদির মাধ্যমে তাদের যুক্তি-বুদ্ধির অসারতা ও অসম্পূর্ণতা প্রমাণ হয়ে গেছে। যেই সন্দেহকে দৃঢ় প্রমাণের শক্তিশালী বাহিনী পিষ্ট করেছে, সেই মৃত ধ্যানধারণাকে নির্লজ্জের মতো বারংবার উপস্থাপন করা বুদ্ধিমত্তা বলে গণ্য হতে পারে কি? পরিতাপ, পরিতাপ! আরে বাবা, তোমরা কী বারংবার শোনো নি যে, যদিও বস্তুর স্বরূপ যৌক্তিক প্রমাণাদির মাধ্যমে কিছুটা প্রকাশ পায় এটি নয় যে, বিশ্বাসের সকল পর্যায়ের পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া নিছক বুদ্ধির ওপরই নির্ভর করে। আপনারা আপনাদের উপস্থাপিত দৃষ্টান্তের মাধ্যমে নিজেরাই দোষী প্রমাণিত হবেন, কেননা আর্সেনিক প্রাণহারী হওয়া কেবল বুদ্ধি বা যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণের পর্যায়ে পৌঁছে নি, বরং প্রকৃত অর্থে এর এই বৈশিষ্ট্য তখন জানা গেছে, যখন বুদ্ধি সত্য অভিজ্ঞতাকে সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করে আর্সেনিকের সুপ্ত বৈশিষ্ট্যকে পর্যবেক্ষণ করেছে। তাই আমরাও আপনাদের এ কথাটিই বোঝাতে চাই যে, যেভাবে আর্সেনিকের বৈশিষ্ট্য নিশ্চিতভাবে আবিষ্কারের জন্য বুদ্ধির অন্য এক সাথি অর্থাৎ সত্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, অনুরূপভাবে ঐশী বিষয়াদি ও পারলৌকিক জগতের সত্য তথ্য

নিশ্চিতভাবে আবিষ্কার করার জন্য বুদ্ধির সাথে ঐশী এলহামের প্রয়োজন রয়েছে। যেভাবে জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় অপরাপর সাথিদের বাদ দিলে বুদ্ধি অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত থেকে যায়, একইভাবে এ সাথি ছাড়া ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধির কাজ চলতেই পারে না। বস্তুত যুক্তি বা বুদ্ধি কেবল নিজ যোগ্যতার বলে স্থায়ীভাবে কোনো কাজ নিশ্চিতরূপে সমাধা করতে পারে না যতক্ষণ না অন্য কোনো সাথী এর সাথে যোগ দেয়। সঙ্গীর সঙ্গ ছাড়া ভুলভ্রান্তি হতে নিরাপদ ও নিষ্পাপ থাকা সম্ভব নয়। বিশেষ করে খোদা-সংক্রান্ত বিষয়, যাকে ঘিরে সকল বিতর্ক ও অনুসন্ধানের রহস্য ও সত্য বিষয়াদি এ জগতের ধরাছোঁয়ার গণ্ডি হতে যোজন যোজন দূরে আর যার কোনো উদাহরণ এ পৃথিবীতে নেই, সেসব বিষয়ে মানুষের অসম্পূর্ণ বুদ্ধি ভ্রান্তিমুক্ত থাকা তো দূরের কথা, বরং তত্ত্বজ্ঞানের পরম মার্গেও পৌঁছতে পারে না। বুদ্ধির জোরে চূড়ান্ত পর্যায়ে যা কিছু আবিষ্কার করা হয় তা কেবল এতটুকু যে, অনুমান বাস্তব হোক বা অবাস্তব, অনুমানকারী অনুমানের ভিত্তিতে কোনো বিষয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে, কিন্তু এ কথা প্রমাণ করতে পারে না যে, যে বিষয়টি আবশ্যক আখ্যা দেয়া হয়েছে বাস্তব জগতে এর অস্তিত্ব আদৌ বিদ্যমান কিনা।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে তার জ্ঞানের ভিত্তি এমন একটি কাল্পনিক প্রয়োজনীয়তার ওপর হওয়ার কারণে, কার্যত ও বাহ্যত যার কোনো সন্ধান সে পায় নি, তা নিছক একটি ভিত্তিহীন ধারণা মনে হয় আর নিশ্চিত বিশ্বাসের মর্যাদা লাভ করার ক্ষেত্রে পূর্ণ নৈরাশ্য ও ভাগ্য বিড়ম্বনাই তার হাতে আসে। আর আমরা বারংবার লিখে এসেছি যে, শুধু কাল্পনিক প্রয়োজন ও নিছক ধারণার অলীক পাহাড় গড়ার মাধ্যমে বুদ্ধি, পূর্ণ বিশ্বাসের মানে পৌঁছে যাবে– এটি আদৌ সম্ভব নয়। বরং সেই পূর্ণ বিশ্বাস অর্জনের জন্য সমস্ত জাগতিক ও ধর্মীয় বিষয় একই দৃঢ় নীতি অনুসারে চলে অর্থাৎ ধর্মীয় হোক বা জাগতিক, সব বিষয় তখনই কেবল দৃঢ় বিশ্বাসের পর্যায়ে উপনীত হতে পারে যদি বস্তুর বাস্তবতার জ্ঞান নিছক অনুমান নির্ভর না হয়। মানুষের হাতে কোনো কিছুর অস্তিত্বের প্রমাণ কেবল এতটুকুই যেন না হয় যে, ধারণা এর অস্তিত্বের অবশ্যকতা দাবি করে, বরং বাস্তবে এ বিষয়ের অস্তিত্ব যে আছে কোনোভাবে এর প্রমাণ হস্তগত হওয়া চাই। দুর্বল বৃদ্ধারূপী বোধবুদ্ধি যেন কেবল অনুমানের ঘূর্ণাবর্তে নিমজ্জিত না থাকে বরং যে বিষয়ের অস্তিত্ব সে কাল্পনিকভাবে আবশ্যক জ্ঞান

করেছে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সত্যিকার অর্থে অবগত-অবহিতও হওয়া উচিত। যেখানে বিশ্বাসের পূর্ণতা নির্ভর করে ঘটনার জ্ঞানের ওপর আর জানাকথা, বাইরে ঘটিত বিষয়ের সংবাদ দেয়া বুদ্ধির কাজ বা দায়িত্ব নয়; বরং তা ঐতিহাসিক, প্রতিবেদক ও অভিজ্ঞদের দায়িত্ব যারা হয়ত চাক্ষুষ সেসব ঘটনা দেখে থাকবে বা সেই ঘটনাবলীকে কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনে থাকবে।

অতএব এমন পরিস্থিতিতে মানুষের দুর্বল বুদ্ধির জন্য ঘটনা বর্ণনাকারী ঐতিহাসিক ও অভিজ্ঞ লোকদের প্রয়োজন দেখা দিল। এ কারণেই কোনো বিষয় সম্পর্কে যতই চুলচেরা বিশ্লেষণ করো না কেন, এর যে গুরুত্ব ও মর্যাদা, অভিজ্ঞতা বা ইতিহাসের অংশগ্রহণে প্রকাশ পায় তা নিছক অনুমানের ভিত্তিতে আদৌ অর্জিত হতে পারে না। আর যে স্থানে কোনো দর্শনভিত্তিক সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয়, সেখানে অনুমান ও অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া কোনো কাজে আসে না। যে ব্যক্তি অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ে, যে শুধু মুখের কথার ওপর নির্ভর করে, সে ঘটনা সম্পর্কে সম্যক অবগত একজন অভিজ্ঞ ঐতিহাসিক বা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির স্থান নিতে পারে না। যদি পারতো তাহলে ঐতিহাসিক ও ঘটনাবেত্তা এবং অভিজ্ঞদের কোনো প্রয়োজন থাকতো না; মানুষ কেবল অনুমানের ভিত্তিতে পৃথিবীর বিভিন্ন অবস্থা অবগত হতে পারত আর এভাবে পুরো বিশ্বব্যবস্থা নিছক অনুমানের মাধ্যমে পরিচালনা করতে সক্ষম হতো যা অবগত হওয়া ইতিহাস, অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করে। যেহেতু শুধু বুদ্ধি ও নিছক অনুমান দ্বারা কাজ চলল না, কেবল অনুমানের নৌকায় বসে পৃথিবীর সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তলিয়ে যেতে চোখে পড়ল আর কেবল বুদ্ধির চাকায় ভর করার ফলে এই বিশ্ব জগতের সকল কাজ ধ্বংস হতে দেখল; সেহেতু ঐতিহাসিক, ঘটনাবেত্তা ও অভিজ্ঞ লোকদের প্রয়োজন দেখা দিল। অথচ পৃথিবীর সমুদয় বিষয় এমন বড় কোনো জটিল বিষয় নয় বরং এত পরিষ্কার ও স্পষ্ট, যেন তা আমাদের চোখের সামনে এবং দৃষ্টি-সীমার মাঝে রয়েছে। কিন্তু সেই অদেখা জগতের ঘটনাবলী বুঝতে যে সমস্যা সামনে আসে, অদেখা ও শত অদৃশ্যের পর্দাবৃত জগত সম্পর্কে ধারণা করার সময় ক্রমাগত অনিশ্চয়তা যেভাবে পরিদৃষ্ট হয় আর চিন্তা ও দৃষ্টির সামনে অকূল সমুদ্র চোখে পড়ে– এখানে এর সহস্র ভাগের একভাগও নেই। এমন পরিস্থিতিতে যদি আমরা প্রকাশ্যে বা জেনেবুঝে ভ্রষ্টতা অবলম্বন না করি তাহলে নিঃসন্দেহে একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, আমাদের সে

জগতের অবস্থা ও ঘটনাবলী সঠিকভাবে উদঘাটন এবং তাতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের জন্য, এ পৃথিবীর চেয়ে শত শত গুণ বেশি ঐতিহাসিক, ঘটনাবেত্তা ও অভিজ্ঞদের প্রয়োজন রয়েছে। অথচ সে জগতের ঐতিহাসিক ও ঘটনাবেত্তা খোদার বাণী ছাড়া আর কেউই হতে পারে না। আমাদের বিশ্বাসের জাহাজ ঘটনাবেত্তা ছাড়া ধ্বংস হয়ে চলেছে। কুমন্ত্রণার বিপজ্জনক হিমশীতল বাতাস ঈমানের নৌকাকে ধ্বংসের ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষেপ করে চলেছে। এমন পরিস্থিতিতে কে সেই বুদ্ধিমান, যে কেবল অসম্পূর্ণ বুদ্ধির পথনির্দেশনার ওপর নির্ভর করে এমন বাণীর প্রয়োজনীয়তার প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করবে যার ওপর তার জীবনের নিরাপত্তা নিহিত? আর যাতে বিধৃত বিষয়বস্তুগুলো কেবল অনুমানের মাঝে সীমাবদ্ধ নয় বরং যৌক্তিক প্রমাণাদি ছাড়াও তা এক সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক হিসেবে পরজগতের সত্য ঘটনার সংবাদও দিয়ে থাকে আর চাক্ষুষ ঘটনাবলী বর্ণনা করে?

از وحی خدا صبح صداقت بدمیدہ چشمے کہ ندید آں صُحُفِ پاک چہ دیدہ

খোদার ওহীর মাধ্যমে সত্যের প্রভাত উদিত হয়েছে,
যে চোখ সেই পবিত্র গ্রন্থ দেখে নি তা কী-ইবা দেখেছে?

کاخ دل ما شد زہماں نافہ معطّر وآں یار بیامد کہ ز ما بود رمیدہ

আমাদের হৃদয়-প্রাসাদ সেই কস্তুরীর সৌরভে পরিপূর্ণ,
যে বন্ধু আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তিনি ফিরে এসেছেন।

آں دیدہ کہ نورے نگرفت ست زفرقاں حقّا کہ ہمہ عمر ز کوری نہ رہیدہ

যে চোখ কুরআন থেকে আলো গ্রহণ করে না,
খোদার কসম, তা কখনো অন্ধত্ব থেকে মুক্তি পাবে না।

آں دل کہ جز ازوے گل وگلزار خدا جست سوگند تواں خورد کہ بویش نشمیدہ

সে হৃদয় যা একে বাদ দিয়ে ঐশী ফুল ও বাগান সন্ধান করে,
খোদার কসম, সে কখনো এর গন্ধও পায় নি।

با خور ندہم نسبت آں نور کہ بینم صد خور کہ بہ پیرامنِ او حلقہ کشیدہ

আমি যে আলো দেখি, সূর্যের সাথে তার তুলনা করতে পারি না,
কেননা আমি শত শত সূর্যকে বিনয়ের সাথে একে প্রদক্ষিণ করতে দেখি।

بے دولت و بدبخت کسانیکہ ازاں نور سر تافتہ از نخوت و پیوند بریدہ

দরিদ্র ও দুর্ভাগা তারা, যারা
অহংকারবশত এই আলো হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং (এর সাথে) সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

অবশ্য এটিও সত্য কথা যে, মানুষের বিবেকবুদ্ধিও অনুপকারী এবং অকল্যাণকর নয় আর আমরা কখন্ বললাম যে, তা অকেজো? কিন্তু এই পরিষ্কার সত্য স্বীকার না করে আমরা কোথায় পালাব যে, বুদ্ধি ও এলহামের সমন্বয়ে যা লাভ হয়, নিছক বুদ্ধি ও ধারণার মাধ্যমে আমাদের সেই পূর্ণ বিশ্বাসরূপী সম্পদ লাভ হতে পারে না আর স্খলন, ভুলভ্রান্তি, পথভ্রষ্টতা, আত্মশ্লাঘা ও অহংকার এড়াতে পারি না। আমাদের মনগড়া ধ্যানধারণা খোদার জোরালো, মহিমান্বিত, প্রতাপান্বিত এবং শক্তিশালী নির্দেশের ন্যায় প্রবৃত্তির তাড়নার বিরুদ্ধে জয়যুক্তও হতে পারে না। আমাদের স্বভাবজ কল্পনা, প্রাণহীণ ধ্যানধারণা ও অমূলক সন্দেহরাজি আমাদেরকে সেই খুশি, আনন্দ এবং প্রশান্তি ও প্রবোধও দিতে পারে না যা সত্যিকার প্রেমাস্পদের প্রাণ সঞ্জীবনী বাণী দিতে পারে। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, আমরা কি একটি নিঃসঙ্গ-নিরুপায় বুদ্ধির অনুসারী হয়ে সেসকল ক্ষয়ক্ষতি, লোকসান এবং দুর্ভাগ্য ও মন্দ অদৃষ্টকে মাথা পেতে নেব আর আমাদের অবাধ্য প্রবৃত্তির জন্য সহস্র সহস্র বিপদাপদ ও সমস্যার দ্বার উন্মুক্ত করে দেবো? বিবেকবান মানুষ এ অর্থহীন কথা ভাবতেও পারে না যে, যিনি পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান অর্জনের পিপাসা জাগিয়ে রেখেছেন, তিনি পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের কানায় কানায় ভরা পেয়ালা প্রদানে সংকোচ বোধ করেছেন। যিনি নিজেই হৃদয়সমূহকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করেছেন, তিনিই আবার প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের দ্বার রুদ্ধ করে রেখেছেন! আর খোদাকে চেনার তাবৎ মার্গ নিছক কাল্পনিক প্রয়োজনের জমাখরচে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন! খোদা কি মানুষকে এতই দুর্ভাগা ও হতচ্ছাড়া সৃষ্টি করলেন যে, খোদাকে পাওয়ার সংগ্রামে তার আত্মা যে পূর্ণ প্রশান্তির সন্ধানী, যার জন্য তার হৃদয় ছটফট করে আর যা অর্জনের উদগ্র বাসনা তার অন্তরাত্মায় বিরাজমান, তা অর্জনের ক্ষেত্রে এ পৃথিবীতে পুরো ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যই তার অদৃষ্ট হবে? তোমাদের সহস্র সহস্র মানুষের মাঝে একথা বোঝার মতো আত্মা কী একটিও নেই যে, যে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বার কেবল খোদা তা'লা খুললেই খোলা হয়, তা মানবীয় শক্তির জোরে উন্মুক্ত হতে পারে না? অধিকন্তু যেখানে খোদা নিজেই

বলেন যে, আমি বিদ্যমান ও বর্তমান, সেখানে মানুষের নিছক আনুমানিক চিন্তাধারা কী করে এর সমান হতে পারে? নিঃসন্দেহে খোদার আপন সত্তা সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করা খোদাকে দেখিয়ে দেয়ার মতো বিষয়। কিন্তু মানুষের নিছক অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলার বিষয়টি এমন নয়। এছাড়া যেখানে খোদার বাণী, যা তাঁর বিশেষ সত্তারই প্রমাণ বহন করে আর যা কোনভাবে আমাদের যুক্তিমূলক ধ্যানধারণার সমান হতে পারে না, তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে, বিশ্বাসের পরিপূর্ণতার জন্য কেন তাঁর বাণীর প্রয়োজন নেই? এই স্পষ্ট পার্থক্য প্রত্যক্ষ করা তোমাদের হৃদয়কে কি আদৌ জাগ্রত করে না? আমাদের লেখায় কি একটি কথাও এমন নেই যা তোমাদের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম?

হে মানবমণ্ডলী! এ কথা বোঝা আদৌ কঠিন কিছু নয় যে, মানুষের বুদ্ধি অদৃশ্য বিষয়াদি উদঘাটনের মাধ্যম বা যন্ত্র হতে পারে না, আর তোমাদের মাঝে কে এ কথা অস্বীকার করতে পারে যে, মৃত্যুর পর যা কিছু হতে যাচ্ছে তার সবই অদৃশ্য বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত? দৃষ্টান্তস্বরূপ তোমরা চিন্তা করে দেখ যে, মৃত্যুর সময় মানুষের প্রাণ কীভাবে বের হয় আর কোথায় যায়? কে প্রাণ সাথে নিয়ে যায়, কোন স্থানে রাখা হয়? আর তাকে কোন্ কোন্ পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হতে হয় তা সত্যিকার অর্থে কে জানে? এসব বিষয়ে মানবীয় বুদ্ধি বা বিবেকে, কীভাবে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দিতে পারে? নিশ্চিতভাবে মানুষ সিদ্ধান্ত দিতে পারতো, যদি এর পূর্বে দু-একবার সে মারা যেত আর সে পথগুলো তার জানা থাকত যে পথে খোদা পর্যন্ত পৌঁছত আর সেসকল স্থান সে চিনত যাতে এককাল পর্যন্ত তার বসতি ছিল! কিন্তু এখন নিছক অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া ছাড়া তা আর কিছু নয়। সহস্র সহস্র ধারণা বা সম্ভাবনার কথা হয়ত বলতে পার, কিন্তু যথাস্থানে গিয়ে তো কেউ দেখে নি। তাই এটি স্পষ্ট যে, এমন ভিত্তিহীন ধ্যানধারণার কথা মনে করে তৃপ্তি পাওয়া প্রকৃত তৃপ্তি নয় বরং বালকের প্রবোধ বৈ আর কিছু নয়। যদি তোমরা গবেষকসুলভ দৃষ্টিতে দেখ তাহলে নিজেরাই সাক্ষ্য দেবে যে, মানুষের বিবেকবুদ্ধি ও চেতনাবোধ সে সকল বিষয়াদি নিশ্চিতভাবে আদৌ উদ্‌ঘাটন করতে পারে না আর প্রকৃতিরূপী গ্রন্থের কোনো পৃষ্ঠা সেসব বিষয়ের নিশ্চিত প্রমাণ বহন করে না। দূরের কথা বাদই দিলাম, প্রথম পদক্ষেপেই (এভাবে) বুদ্ধি বুদ্ধিহারা যে, আত্মা কী জিনিস? কীভাবে প্রবেশ করে আর কীভাবে বের হয়? আপাতদৃষ্টিতে কিছু বের হতে বা প্রবেশ

করতে দেখা যায় না। কোনো প্রাণিকে প্রাণবায়ু নির্গত হওয়ার সময় কোনো কাঁচের বাক্সেও যদি আবদ্ধ করে দাও তাহলেও কোন জিনিস বের হতে দেখা যাবে না। আর যদি আবদ্ধ কাঁচের বাক্সে কোনো বস্তুতে পোকা লেগে যায় তখন সেসব প্রাণীর সেখানে কোনো প্রবেশ পথ চোখে পড়ে না। ডিমে এর চেয়েও বড় আশ্চর্যজনক বিষয় দেখা যায়। আত্মা কোন্ পথে উড়ে এসে প্রবেশ করে, আর বাচ্চা ভেতরে মারা যাওয়ার ক্ষেত্রে কোন্ পথে প্রাণ বের হয়, কোনো যুক্তিবাদী এই রহস্য কেবল বুদ্ধির জোরে উদঘাটন করতে পারে কি? যত ইচ্ছা সন্দেহ ও অনুমান লালন কর, কিন্তু শুধু বুদ্ধির জোরে কোনো বাস্তব ও নিশ্চিত কথা জানা যায় না। প্রথম পদক্ষেপেই যখন এই হলো অবস্থা, সেখানে এই দুর্বল বুদ্ধি পারলৌকিক বিষয়ে নিশ্চিত করে কীইবা আবিষ্কার করবে? তোমাদের মাঝে এ কথা বোঝার মতো কি একজন মানুষও নেই? তোমাদের এই করুণ অবস্থা দেখে কি তোমাদের নিজেদের প্রতি কোনো করুণা হয় না? যেখানে জাগতিক ক্ষুধা মেটানোর জন্য তোমাদের পেটে এত হাহাকার যে, তা মেটানোর উদগ্র বাসনায় জল ও স্থলের সহস্র সহস্র মাইল সফর কর, সেখানে কথা হলো, পরকাল কী তোমাদের দৃষ্টিতে কোনো গুরুত্বই রাখে না?

পরিতাপ! তোমরা কেন বোঝো না যে, আত্মার প্রতিটি উৎকণ্ঠা ও অবাধ্য প্রবৃত্তির প্রতিটি রোগের চিকিৎসা করা নিছক নিজের অলীক ধারণা ও অনুমানের জোরে সম্ভব নয়। প্রকৃতির নিয়ম হলো, মানুষ যখন প্রবৃত্তির তাড়না বা আধ্যাত্মিক ব্যাধির শিকার হয়, যেমন ক্রোধের আতিশয্য বা রিপুর প্রবল তাড়না বা কোনো সমস্যা ও শোকে বা কোনো দুঃখ-বেদনায় ক্লিষ্ট হয় বা অন্য কোন দৈহিক বা আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের ফলে শাস্তি পায়, তখন সে সেসব রোগব্যাধি ও বিপত্তি, যা তার জীবন ও আত্মার ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করছে, তা কেবল উপদেশ ও পরামর্শের মাধ্যমে দূরীভূত করতে পারে না, বরং সে সকল আবেগ-উচ্ছ্বাস ও আচ্ছন্নতা এড়ানোর জন্য এমন এক হিতোপদেশদাতার মুখাপেক্ষী থাকে, যে শ্রোতার দৃষ্টিতে প্রতাপান্বিত, মহান ও সত্যবাদী এবং স্বীয় জ্ঞানে সম্পূর্ণ এবং অঙ্গীকার পালনে বিশ্বস্ত আর একইসাথে এসব সমস্যা সমাধানে বা এসব বিষয় পূরণে সামর্থবানও হবে। যার কল্যাণে শ্রোতার হৃদয়ে আশা, ভয় বা স্বস্তির আবহ সৃষ্টি হবে। কেননা একেবারেই জানা ও স্পষ্ট কথা হলো, প্রায় সময় মানুষ পাপকে সত্যিকার অর্থে পাপ মনে করে বা

ধৈর্য ও অবিচলতার পরিপন্থি একটি বিষয়কে অবিচলতার পরিপন্থিই মনে করে, কিন্তু আলস্যের আচ্ছন্নতা বা আকস্মিক দুঃখ-বেদনা এমনভাবে তার হৃদয়ে আঘাত হানে যে, সে পর্দা কেবল তখনই অপসারিত হয় যখন দ্বিতীয় এমন এক ব্যক্তি তাকে বোঝায়, যার মাহাত্ম্য ও সম্মান তার হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকে, তাকে অনুপ্রাণিত করে, ভয় দেখায়, নিশ্চয়তা প্রদান করে, আশ্বস্ত করে বা স্থানকালপাত্রভেদে যা দরকার তা করে। তার কথা প্রভাব বিস্তারের বৈশিষ্ট্যে এমনই বিস্ময়কর হয়ে থাকে যে, তিনি শ্রোতার জানা প্রমাণাদি উপস্থাপন করলেও তা অচলদের সচল, অলসদের চৌকশ, দুর্বলদের দৃঢ় এবং ব্যাকুলচিত্ত লোকদের প্রশান্ত করে তোলে। এ বিষয়গুলো এমন যে, বিবেকবান মানুষ স্বয়ং স্বীকার করে যে, প্রবৃত্তির কাছে পরাজিত অবস্থায় বা অস্থিরতার সময় সে এসবের মুখাপেক্ষী থাকে। বরং যাদের আত্মা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সত্যসন্ধানী হয়ে থাকে আর যাদের হৃদয় পাপের পঙ্কিলতা ও কলুষের প্রতি স্বল্পতম সময়ে বিরাগ প্রকাশ করে, তারা পরাজিত অবস্থায় রোগাক্রান্ত মানুষের ন্যায় সেই সকল চিকিৎসাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে; যেন কোনো খোদাপ্রেমিক মানুষের মুখে প্রেরণা ও ভীতি বা প্রবোধ ও স্বস্তির বাণী শুনে নিজের অভ্যন্তরীণ দ্বিধাদ্বন্দ্ব হতে আরোগ্য লাভ করতে পারে। বস্তুত মানব প্রকৃতিতে নিঃসন্দেহে এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, সে যত বড় আলেম ও বিজ্ঞই হোক না কেন, দৈব-দুর্বিপাক ও রিপুর তাড়নার মুখে অন্যদের কথায় যতটা প্রভাবিত হয়, নিজের কথায় তা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কেউ যখন কোনো দুর্ঘটনায় কবলিত হয় বা কোনো দুঃখজনক ঘটনা ঘটে যায়, তার নিজের একথা অজানা থাকে না যে, এ পৃথিবী কোনো আনন্দ-উল্লাস ও নিরাপদে থাকার মতো স্থান নয়, কোনো স্থায়ী আবাসস্থলও নয়; কিন্তু দুঃখের সময় এই দুর্বল মানুষের ওপর ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা প্রাধান্য বিস্তার করে এবং হৃদয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়।

এমন সময়ে এমন কোনো ব্যক্তি, যে তার দৃষ্টিতে অত্যন্ত পবিত্র, পরিপূর্ণ এবং সম্মানিত; যদি তাকে বোঝান যে, ধৈর্য ধারণ কর আর ধৈর্যশীলদের জন্য খোদার সন্নিধানে বড় বড় পুরস্কার রয়েছে, অধিকন্তু এ পৃথিবী চিরকাল থাকার স্থান নয়– তার কথায় এক বিস্ময়কর প্রভাব পড়ে, যা পতনোন্মুখ মানুষকে রক্ষা করে, অথচ এ কথা সে পূর্বেও জানত। সারকথা হলো, সকল ক্ষেত্রে ও সকল সময়ে নিজের বানানো ধ্যানধারণা হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় না,

বরং প্রায় সময় রিপুর তাড়না বা আধ্যাত্মিক ব্যাধির কারণে বিবেকবুদ্ধি এমনভাবে চাপা পড়ে যায় যে, মানুষের মাঝে চিন্তাভাবনা ও বোঝার শক্তিটুকুও আর অবশিষ্ট থাকে না। তখন সে নিজেকে যে অবস্থায় পায় তা হলো, সে চায় অন্য কোনো ব্যক্তির মুখ থেকে অনুপ্রেরণা ও সাবধানবাণী বা প্রবোধ ও স্বস্তির বাণী উৎসারিত হোক। অতএব এ সকল বিষয়ের ওপর দৃষ্টিপাতে বুদ্ধিমান মানুষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে যে, খোদা তা'লাই তার প্রকৃতিকে এভাবে গঠন করেছেন। প্রকৃতির এরূপ গঠনই এ কথার সাক্ষ্য বহন করে যে, সেই মূর্তিমান প্রজ্ঞা দুর্বল ভিত্তির মানুষকে কেবল তার অনুমান ও ধারণার হাতে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেয়া পছন্দ করেন নি, বরং যে মানের নসিহতকারী ও বক্তাদের কথায় তার শান্তি ও স্বস্তি লাভ হতে পারে আর তার কামনা-বাসনা চাপা পড়তে পারে এবং তার আধ্যাত্মিকতা সংক্রান্ত উৎকণ্ঠা দূরীভূত হতে পারে, সে সব হিতোপদেশদাতা (মুতাকাল্লিম) সৃষ্টি করেছেন এবং যে বাণীর কল্যাণে তার রোগ ব্যাধিও দূর হতে পারে সেই কথা বা বাণী তার জন্য সুলভ করেছেন।

এলহামের আবশ্যকতার প্রমাণ অন্য কোনোভাবে নয়, বরং স্বয়ং খোদার প্রকৃতির নিয়মই তা প্রমাণ করে। এটি কী সত্য নয় যে, পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ, যারা নানা সমস্যা, পাপ ও ঔদাসীন্যের শিকার হয়ে যায়, তারা সদা অন্য কোনো নসিহতকারী ও হিতোপদেশদাতার মাধ্যমে প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে, আর সকল ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের জ্ঞান ও ধ্যানধারণা আদৌ তাদের জন্য যথেষ্ট হয় না! একইসাথে একথাও সত্য যে, বক্তার ব্যক্তিগত মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব শ্রোতার দৃষ্টিতে যতটা গ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হবে, তার কথা ততটাই স্বস্তি ও শান্তি যোগাবে। সে ব্যক্তির প্রতিশ্রুতিই হৃদয়ের প্রশান্তির কারণ হয়ে থাকে, যে শ্রোতার দৃষ্টিতে সত্য প্রতিশ্রুতিদাতা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার সক্ষমতা রাখে। এমন পরিস্থিতিতে এমন স্পষ্ট কথায় কে আপত্তি করতে পারে যে, পারলৌকিক ও অতীন্দ্রিয় বিষয়াদির ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বস্তি, প্রবোধ ও হৃদয়ের প্রশান্তি লাভ হওয়া যা রিপুর তাড়না ও আধ্যাত্মিক ব্যাধি দূরীভূত করার কারণ হবে, তা কেবল খোদার কথা বা বাণীর মাধ্যমেই সম্ভব? এ ছাড়া প্রকৃতির নিয়মে দৃষ্টিপাতে স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভের জন্য এর চেয়ে উত্তম অন্য কোনো মাধ্যম নির্ধারিত হতে পারে না। কোনো ব্যক্তি যখন খোদার বাণীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে আর মাঝখানে যদি বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক বিপত্তি না

থাকে, তাহলে তখন খোদার বাণী তাকে বড় বড় ঘূর্ণাবর্তন থেকে রক্ষা করে। সে রিপুর ভয়াবহ তাড়নার মোকাবিলা করে এবং বহু ভীতিকর ঘটনাবলীর মুখে খোদা তাকে ধৈর্য দান করেন। বুদ্ধিমান মানুষ যখন কোনো সমস্যা বা রিপুর তাড়নার মুখে খোদার বাণীতে (পুরস্কারের) প্রতিশ্রুতি ও সতর্কবাণী খুঁজে পায় বা অন্য কোনো ব্যক্তি যখন তাকে বোঝায় যে, খোদা এমনটি বলেছেন তখন হঠাৎ এর মাধ্যমে এমনভাবে প্রভাবিত হয় যে, সে অনুতাপের পর অনুতাপ করে। খোদার পক্ষ থেকে মানুষের প্রবোধ ও সান্ত্বনা লাভের অনেক বেশি প্রয়োজন দেখা দেয়। অনেক সময় সে এমন ভয়াবহ সমস্যার আবর্তে নিপতিত হয় যে, যদি খোদার বাণী না এসে থাকত আর তাকে স্বীয় শুভসংবাদ–

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ○ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ○ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ○

(সূরা আল বাকারা: ১৫৬-১৫৮)

সম্পর্কে অবহিত না করত, তাহলে সে হতোদ্যম হয়ে হয়ত খোদার সত্তাকেই অস্বীকার করে বসত বা নৈরাশ্যের মাঝে খোদার সাথে পুরো সম্পর্ক ছিন্ন করে বসত বা দুঃখের আতিশয্যে ধ্বংস হয়ে যেত। অনুরূপভাবে প্রবৃত্তির মোহ বা আকর্ষণ এমন যে, এর বিদ্রোহ প্রতিহত করার জন্য খোদার বাণীর প্রয়োজন ছিল। আর পদে পদে মানুষ এমনসব বিষয়ের সম্মুখীন হয় যার সুরাহা কেবল খোদার বাণীই করতে পারে। মানুষ যখন খোদার প্রতি মনোযোগী হতে চায় তখন সেই মনোযোগের পথে শত শত প্রতিবন্ধকতা বাদ সাধে। কখনো এ পৃথিবীর ভোগ-বিলাসের কথা মনে পড়ে আর কখনো সাঙ্গপাঙ্গদের সাহচর্য তাকে পেছনে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস পায়। কখনো সেই পথের কষ্ট-কাঠিন্য তাকে ভয় দেখায়, আবার কখনো পুরোনো অভ্যাস এবং বদ্ধমূল রীতিনীতি তার চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কখনো মিথ্যা মান-সম্মান, কখনো রাজ্য বা রাজত্ব সে পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চায়। কোনো সময় এসব কিছু সম্মিলিতভাবে এক সৈন্য বাহিনীর ন্যায় একস্থানে একত্রিত হয়ে তাকে নিজের

দিকে টানে আর নগদ লাভের মনলোভা দিকগুলো তুলে ধরে। সুতরাং এসবের ঐকমত্য ও জোটবদ্ধ হওয়ার ফলে এমন এক প্রবল অপশক্তি সৃষ্টি হয়ে যায় যে, মানুষের নিজের বানানো ধ্যানধারণা তা প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়, বরং মুহূর্তের জন্যও এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না। এমন যুদ্ধের সময় খোদার বাণীর শক্তিশালী বন্দুক প্রয়োজন যেন শত্রু-সারিকে একই গুলিতে উড়িয়ে দিতে পারে। একতরফা কোনো কাজ চলতে পারে কি? খোদা একটি পাথরের ন্যায় চিরকাল নিশ্চুপ বসে থাকবেন আর বান্দা বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা ও ধৈর্যে ক্রমাগত উন্নতি করতে থাকবে আর নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অবশ্যই কোনো স্রষ্টা থাকা চাই মর্মে একমাত্র ধারণা তাকে স্থায়ীভাবে শক্তি জুগিয়ে ভালোবাসার ক্ষেত্রে ক্রমাগতভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকবে– এটি কীভাবে সম্ভব? কাল্পনিক ধ্যানধারণা কখনো বাস্তব কথাবার্তার বিকল্প হতে পারে না আর কখনো হয়ও নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একজন কপর্দকহীন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি কোন সৎ ধনবান ব্যক্তির পক্ষ হতে প্রতিশ্রুতি লাভ করে যে, আমি যথাসময়ে তোমার সকল ঋণ পরিশোধ করব, অপরদিকে আরেক কপর্দকহীন ঋণী ব্যক্তি যাকে কেউ কোনো প্রতিশ্রুতি দেয় নি; সে নিজ ধারণার বশবর্তী হয়ে আত্মপ্রসাদ নিতে থাকে যে, হয়ত আমারও যথাসময়ে টাকা এসে যাবে, সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, এমন সান্ত্বনা লাভের ক্ষেত্রে উভয়ে সমান হতে পারে কি? মোটেই নয়। এগুলো সব প্রকৃতির নিয়মই বটে। কোন্ ঐশী সত্য প্রকৃতির নিয়মের বাইরে? পরিতাপ সেসব লোকের জন্য যারা প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলার দাবি করতে করতে তা লঙ্ঘন করে অন্যদিকে পালিয়ে গেছে, আর যা বলেছে তার বিরুদ্ধেই কাজ করেছে।

হে ব্রাহ্ম সমাজীরা! যদি ধর্মীয় বিষয়ের প্রতি তোমরা এক অন্তর্দাহ নিয়ে দৃষ্টি না দাও, যদি তোমরা পারত্রিক জীবন সম্পর্কে আদৌ ভ্রুক্ষেপ না কর তাহলে প্রশ্ন হলো, এখন পর্যন্ত জাগতিক বিষয়ে কি তোমাদের সামনে প্রমাণিত হয় নি যে, মানববুদ্ধি একা তোমাদের কোনো জাগতিক বিষয়কে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছায় নি? এ সত্য গ্রহণে তোমাদের কাছে এখনো কোনো অজুহাত দাঁড় করানোর সুযোগ আছে কি যে, অন্য কোনো সাথির যোগদান বা অংশগ্রহণ করা ছাড়া বুদ্ধির সেই যোগ্যতা কখনো ছিল না যে, তা স্বয়ং কোনো কাজ অতি উত্তমভাবে ও উৎকর্ষতার সাথে সমাধা করবে? সত্য করে বলো, এখন পর্যন্ত কি তোমাদের এই অভিজ্ঞতা অর্জন হয় নি যে, যে কাজ নিছক যুক্তি বা

বুদ্ধির ওপর ন্যস্ত হয়েছে তা অনিশ্চিৎ, সন্দেহযুক্ত ও অসম্পূর্ণই রয়ে গেছে। অধিকন্তু যতদিন ঘটনার চিত্র কোনো ঘটনাবেত্তার মাধ্যমে প্রস্তুত হয়ে আসে নি, ততদিন বুদ্ধি ও অনুমানের সকল কাজ অসম্পূর্ণ ও অকেজোই থেকে গেছে? চিরকাল থেকে বিবেকবানদের এ রীতিই চলে আসছে যে, তারা নিজেদের অনুমানভিত্তিক বিষয়াদিকে কখনো অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দৃঢ় করে, কখনো ইতিহাসের মাধ্যমে, কখনো অকুস্থলের চিত্র উপস্থাপনকারী মানচিত্রের মাধ্যমে, আর কোনো কোনো সময় চিঠিপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে, আবার কোনো সময় নিজেদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি এবং ঘ্রাণ ও স্পর্শ-শক্তি ইত্যাদির সাক্ষ্যের মাধ্যমে। ন্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে বল, তোমরা কি আজও তা জানো না? সুতরাং এখন তোমরা নিজেরাই চিন্তা করো, নিজেরাই মনে মনে একটু ভাব আর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখো; যেখানে দৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জাগতিক বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য অন্যান্য সাথির প্রয়োজন দেখা দেয়, সেখানে সেসব বিষয়াদির জন্য এর চেয়ে কত বেশি সাথির প্রয়োজন যা এ পৃথিবীর ধরাছোঁয়া থেকে বহু দূরে, মহা অদৃশ্যের গহ্বরে নিপতিত, সবচেয়ে বেশি প্রচ্ছন্ন ও গুপ্ত? যেখানে নিছক বুদ্ধি এ জগতের সহজ ও সাদামাটা বিষয়াদির জন্যও যথেষ্ট নয়, সেখানে অধিক সূক্ষ্ম ও দুর্জ্ঞেয় পারলৌকিক বিষয়াদি আবিষ্কারের জন্য তা কী করে যথেষ্ট হতে পারে? যেখানে তোমরা নিছক বুদ্ধিকে জগতের ক্ষণস্থায়ী ও তুচ্ছ বিষয়াদির জন্যও নির্ভরযোগ্য বলে মনে করো না যার লাভ-লোকসান ক্ষণস্থায়ী; সেখানে পারলৌকিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে, যার প্রভাব চিরস্থায়ী, যার ভীতি ও আশঙ্কা হলো দুরারোগ্য, সেখানে কেবল এই দুর্বল বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে কেন বসে আছ? এটি কী একথার উৎকৃষ্ট প্রমাণ নয় যে, তোমরা পরকালের ভাবনাকে অবজ্ঞা করছো আর এ জগতরূপী মরা লাশ তোমাদের কাছে বড় সুস্বাদু ও আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে? নতুবা কীভাবে বিশ্বাস করা যেতে পারে যে, যেখানে বদান্যতার মূর্ত প্রতীক (খোদা) এ পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী বিষয়ে মানবের বিবেকবুদ্ধিকে অসহায় ও নিঃসঙ্গ পরিত্যাগ করেন নি, বরং বেশ কিছু উপায় উপকরণের (বা সাথির) মাধ্যমে একে শক্তিশালী করেছেন, সেখানে তাঁর মহান করুণার অনাদি-অনন্ত বৈশিষ্ট্য, পারলৌকিক স্পর্শকাতর ও সূক্ষ্ম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে, যা অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী– কেন হারিয়ে গেল? অর্থাৎ এখানে হতভাগা ও দিশেহারা বুদ্ধিকে উৎকৃষ্টতম সাথির সাহচর্যের মাধ্যমে

শক্তি যোগালেন না আর তাকে এমন সাথি দান করলেন না, যে সাথি সে দেশের আদ্যোপান্ত বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রাখত আর চাক্ষুষ সাক্ষীর ন্যায় সংবাদ দিতে পারত, যার কল্যাণে অনুমান ও অভিজ্ঞতা উভয়টি একসাথে সকল প্রকার কল্যাণের প্রস্রবণ প্রমাণিত হতে পারত এবং সত্য-সন্ধানীকে সেই তত্ত্বজ্ঞানের পরম মার্গে পৌঁছাতে পারতো যা অর্জনের আবেগ-উচ্ছ্বাস তার প্রকৃতিতে অন্তর্নিহিত রাখা হয়েছে? জানি না, কে আপনাদের বিভ্রান্ত করেছে, যে কারণে আপনারা ভাবছেন যে, যুক্তি-বুদ্ধি ও এলহামের মাঝে কিছুটা হলেও পারস্পরিক বিরোধ রয়েছে; যে কারণে উভয়টি সহাবস্থান করতে পারে না? খোদা তোমাদের দৃষ্টি উন্মোচন করুন আর হৃদয়ের পর্দা অপসারণ করুন। তোমরা কী এই সহজ কথাটিও বুঝতে পারো না যে, যেখানে এলহামের কল্যাণে বিবেকবুদ্ধি পূর্ণতা লাভ করে, স্বীয় ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে মানুষ সতর্ক হয়ে যায়, নিজের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক বিশেষ দিক সম্পর্কে নিশ্চিত হয়, হাবুডুবু খাওয়া ও অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি আর নিরর্থক পরিশ্রম, পণ্ডশ্রম ও অর্থহীন কষ্ট থেকে নিস্তার লাভ করে, নিজের সন্দেহযুক্ত ও অনুমান নির্ভর জ্ঞানকে দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তার পর্যায়ে নিয়ে যায় আর নিছক অনুমান থেকে উন্নতি করে বাস্তব সত্তা সম্পর্কে অবহিত হয় এবং স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে- এমন পরিস্থিতিতে প্রশ্ন হলো, এলহাম তার প্রতি অনুগ্রহকারী, সাহায্যকারী ও তত্ত্বাবধায়ক হলো, নাকি তার শত্রু, বৈরী এবং ক্ষতিকারক হলো? এটি কেমন বিদ্বেষ ও অন্ধত্ব যে, এক নিখুঁত তত্ত্বাবধায়ক, যে স্পষ্ট পথ প্রদর্শনের কাজ করছে, তাকে দস্যু আর প্রতিবন্ধক-প্রতিরোধক মনে করা হয়, যে গহ্বর থেকে বের করে তাকে তারা গহ্বরে নিক্ষেপকারী ভাবছে? সারা পৃথিবী জানে আর সকল চক্ষুষ্মান দেখছে এবং চিন্তাশীল প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করছে যে, পৃথিবীতে বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী এমন লক্ষ লক্ষ মানুষ অতিবাহিত হয়েছে আর এখনো আছে যারা যদিও বুদ্ধিরূপী বার্তাবাহকের প্রতি ঈমান এনেছে আর বুদ্ধিমান আখ্যায়িত হয়েছে, বুদ্ধিকে ভালো জিনিস ও প্রথপ্রদর্শক জ্ঞান করতো, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা খোদার সত্তায় অস্বীকারকারীই থেকে যায় এবং অবিশ্বাসী হিসেবেই মারা যায়! কিন্তু এমন একজন মানুষ দেখাও, যে এলহামে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও খোদার অস্তিত্বের অস্বীকারকারীই রয়ে গেছে? সুতরাং খোদার সত্তায় দৃঢ় ঈমান আনার শর্ত যেহেতু এলহাম, তাই এটি স্পষ্ট যে, যেস্থানে শর্ত অনুপস্থিত সেখানে

যার সাথে শর্তের সম্পর্ক সেও অনুপস্থিতই থাকবে। সুতরাং এখন এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, যারা এলহামকে অস্বীকার করে বসেছে তারা জেনেশুনে অবিশ্বাসের পথকে ভালোবেসেছে আর নাস্তিকতারূপী ধর্মের প্রচার-প্রসারই তাদের মনঃপূত হয়েছে। এই নির্বোধরা চিন্তা করে না যে, যেই সত্তা মহা অদৃশ্যের অন্তরালে রয়েছেন, যাকে দেখাও যায় না, আর শুঁকাও যায় না, আর পরীক্ষাও করা যায় না, শ্রবণশক্তিও যদি সেই কামেল সত্তার বাণী শোনা হতে বঞ্চিত ও অনবহিত থেকে যায়, তাহলে যে অস্তিত্বকে দেখা যায় না তাঁর ওপর কীভাবে বিশ্বাস সৃষ্টি হতে পারে? শিল্প দেখে শিল্পীর কোনো ধারণা হৃদয়ে জাগ্রত হলেও প্রশ্ন হলো, সত্যান্বেষী যদি সারাটি জীবন চেষ্টা করেও কখনো সেই শিল্পী বা স্রষ্টাকে নিজ চোখে না দেখে, কখনো তাঁর কথা সম্পর্কে অবহিত না হয় আর তাঁর সম্পর্কে এমন কোনো নিদর্শনও না পায় যা জীবন্ত সত্তার মাঝে থাকা আবশ্যক, তাহলে একদিন তার হৃদয়ে কী এই সন্দেহ জাগ্রত হবে না যে, হয়ত আমার ধারণাই এমন সত্তাকে স্রষ্টা আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে ভুল করেছে? আর হয়ত নাস্তিক ও প্রকৃতি-পূজারিই সত্য হবে যারা বিশ্বের কোনো কোনো উপাদানকে অপর কতকের স্রষ্টা আখ্যা দিয়ে থাকে এবং অন্য কোনো স্রষ্টার প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না। আমি জানি যখন নিছক যুক্তি-পূজারি এক্ষেত্রে স্বীয় ধ্যানধারণার পরিধি ক্রমশ বিস্তৃত করতে থাকবে তখন উল্লিখিত সন্দেহ অবশ্যই তার হৃদয়কে পরিবেষ্টন করবে, কেননা এটি সম্ভব নয় যে, সুগভীর অনুসন্ধান ও তালাশ সত্ত্বেও খোদার সত্তা-সংক্রান্ত নিদর্শন পেতে ব্যর্থ হয়ে আবার এমন কুমন্ত্রণা বা সন্দেহ হতে রক্ষা পাবে। এর কারণ হলো মানুষের প্রকৃতিগত ও স্বভাবজ অভ্যাস হলো, যে জিনিসের অস্তিত্বকে অনুমানভিত্তিক লক্ষণাবলী বা নিদর্শনের ভিত্তিতে আবশ্যক ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করে কিন্তু পুরো অনুসন্ধিৎসা ও সত্যিকার তালাশ সত্ত্বেও এর অস্তিত্বের বাহ্যত ও কার্যত কিছুই জানা যায় না, সেখানে নিজের অনুমান সঠিক হওয়া সম্পর্কে তার সন্দেহ জাগে, বরং অস্বীকারের মনমানসিকতা সৃষ্টি হয়। সেই ধারণার পরিপন্থি ও বিরোধী শত শত ধ্যানধারণা তার হৃদয়ে মাথাচাড়া দেয়। আমরা ও তোমরা অনেক সময় একটি অজানা বিষয়ে অনুমান করি যে, এমন হবে, তেমন হবে, কিন্তু কথা যখন প্রকাশ পায় তখন ভিন্ন কোনো বিষয় সামনে আসে। এসব দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা মানুষকে এ পাঠই দিয়েছে যে, নিছক ধারণার ভিত্তিতে আত্মপ্রসাদ নিয়ে বসে থাকা চরম

নির্বুদ্ধিতার শামিল। সুতরাং যতক্ষণ আনুমানিক ধ্যানধারণার পাশাপাশি বাস্তব সংবাদ লাভ না হবে, ততক্ষণ যুক্তিবুদ্ধির লোকদেখানো সব বিষয়াদি নিছক মরীচিকা বৈ কিছু নয়– যার চূড়ান্ত ফলাফল হলো নাস্তিকতা। অতএব যদি নাস্তিক হতে চাও হতে পারো। নতুবা সন্দেহের করালগ্রাস হতে, যা তোমাদের চেয়ে দৃঢ় সহস্র সহস্র বুদ্ধিমান লোককে এক ঢেউয়েই তলিয়ে দিয়েছে- তা থেকে কেবল তখনই রক্ষা পেতে পারো যদি এলহামের শক্তিশালী হাতলকে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরো। নতুবা এটি কখনো সম্ভব নয় যে, তোমরা কেবল যুক্তি বা বুদ্ধিপ্রসূত চিন্তাধারায় উন্নতি করতে করতে অবশেষে খোদাকে কোনো স্থানে বসা দেখতে পাবে। বরং অবশেষে তোমাদের চিন্তাধারার যদি আদৌ কোনো ফলাফল প্রকাশ পায় তাহলে তা এটিই হবে যে, তোমরা খোদার কোনো নিদর্শন না পেয়ে, জীবিতদের কোনো চিহ্ন থেকে বঞ্চিত দেখে, তাঁকে অনুসন্ধান করে বের করতে ব্যর্থ হয়ে নাস্তিক ভাইদের হাতে হাত মেলাবে।

এই আত্মপ্রতারণার শিকার হয়ো না যে, নিরেট বুদ্ধির (দাসত্বের) পরিণাম যদি নাস্তিকতাই হয়ে থাকে তাহলে কেন এখন পর্যন্ত ব্রাহ্ম সমাজীরা কিছুটা হলেও খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে? কেন তারা সম্পূর্ণরূপে খোদাকে অস্বীকার করে না? এর দুটো কারণ রয়েছে। প্রধানত, নিজেদের ধ্যানধারণায় এখনো তাদের পরিপক্কতা অর্জিত হয় নি। যে সত্তাকে তারা কাল্পনিকভাবে মানে, এখনো তারা সেই কল্পনায় অনড় রয়েছে। বাস্তবে সেই কাল্পনিক সত্তার কোনো অস্তিত্ব আছে কিনা তা উদঘাটনের জন্য দু'পা এগিয়ে অনুসন্ধানের কাজে এখনো আত্মনিয়োজিত করে নি। কিন্তু স্মরণ রেখো, তারা স্বীয় চিন্তাধারায় যখন কিছুটা এগিয়ে যাবে তখন এই অগ্রপদচারণার প্রথম যে প্রভাব পড়বে তা হলো, তাদের হৃদয়ে এই প্রশ্ন জাগবে যে, যেই সত্তাকে আমরা চিরঞ্জীব-জীবনদাতা এবং চিরস্থায়ী-স্থায়িত্বদাতা স্বীকার করি, তিনি কোথায় ও কোনদিকে এবং কোন স্থানে রয়েছেন? যদি তিনি কার্যত বাহ্যিক অস্তিত্ব নিয়ে বিদ্যমান ও বিরাজমান থাকেন তাহলে তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না কেন, কেন সন্ধানীদের জন্য স্বীয় অস্তিত্ব প্রকাশ করেন না? এই সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার ফলে হয়ত তারা প্রকৃত এলহামে ঈমান আনবে আর সন্দেহের ঘূর্ণিপাক থেকে নিজেদের মুক্ত করবে। আর যদি এটি না হয়, চিন্তাধারার কিছুটা উন্নতি হতে দিন, তারপর দেখুন এরা কট্টর নাস্তিক কিনা। তাদের লক্ষ লক্ষ ভাই, যারা নিছক যুক্তি-বুদ্ধির

দাসত্ব করত, তাদের চিন্তাধারার যখন উন্নতি হলো তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে তারা প্রকৃতি-পূজারি ও নাস্তিক হয়েই মরেছে। এরা অভিনব কোনো বুদ্ধি-পূজারি নয় যারা চিন্তাধারায় উন্নতি করে নাস্তিক হবে না বরং খোদার নিবাসের শিশমহল তাদের চোখে পড়বে। নিঃসন্দেহে ধ্যানধারণা উন্নতির পূর্বে বুদ্ধিমানদের ওপর যে প্রভাব পড়েছে কোনোদিন তারাও একই প্রভাবের শিকার হবে, অপেক্ষা শুধু এতটুকু যে, খোদার পুরোপুরি সন্ধান ও তালাশের ক্ষেত্রে এখনো তাদের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে আর এখনো দুনিয়াই তাদের কাছে সুমিষ্ট ও আকর্ষণীয় দেখায় আর দিবারাত্রি জাগতিক লেনদেনেই তারা লিপ্ত, এরই মোহে সমুদ্র বিদীর্ণ করে সুদূরের পানে পাড়ি জমায়। এখনো পরপারের কোনো ধ্যানধারণাই তাদের মাথায় নেই, না সেই রাজাধিরাজের কথা মাথায় আছে। কিন্তু যখন সেই দিন আসবে যাতে তারা নিছক বুদ্ধির মাধ্যমে নিরূপণ করতে চাইবে যে, যদি খোদা থেকে থাকেন তাহলে তিনি কোথায় আর বিরাজমান বস্তু-নিচয়ের ন্যায় তাঁর সত্তা কেন অনুভূত হয় না? তখন এই সিদ্ধান্ত হবে যে, হয়ত সেই মহা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সত্তার কথায় ঈমান আনতে হবে বা এই কাল্পনিক কথাও পরিহার করতে হবে যে, শিল্পের কোনো শিল্পীও থাকা উচিত। দ্বিতীয় কারণ, যা দৃঢ়তা লাভ করলে নিরেট বুদ্ধি-পূজারি শীঘ্রই নাস্তিকতা হতে বিরত হয় তা হলো, ঐশী এলহামের কল্যাণরাজি ও আল্লাহ্‌র ওহীরূপী সূর্যের কিরণরাজি, যা খোদার অস্তিত্বকে সারা বিশ্বজগতে সুপরিচিত করেছে আর যার অবিরাম বর্ষণ লক্ষ লক্ষ খোদাভীরু হৃদয়ে দৃঢ়তার সাথে খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দিয়েছে আর কোটি কোটি হৃদয়ে সুমহান প্রভাব সৃষ্টি করে রেখেছে। যেহেতু এরই দৃঢ় ও আদি সাক্ষ্যের গগনবিদারী ধ্বনির কল্যাণে সকল মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয় ভরে গেছে আর শ্রবণেন্দ্রিয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেই মনোহর ধ্বনিগুলো এমনভাবে বিস্তার লাভ করেছে যে, যুক্তি-বুদ্ধির নামও জানে না আর প্রমাণাদি কাকে বলে তা সম্পর্কেও অবহিত নয়, এমন একজন নির্বোধ ও নিরক্ষর মানুষকে যদি খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় যে, তিনি আছেন কিনা– তাহলে সে এমন প্রশ্নকারীকে চরম নির্বোধ মনে করবে আর খোদার সত্তায় এমন দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করবে যে, যদি সকল বুদ্ধি-পূজারি একদিকে আর তাকে আরেক দিকে রাখা হয়, তাহলে তার বিশ্বাসের পাল্লাই ভারী হবে। অথচ মজার বিষয় হলো, যুক্তিবাদী ও দার্শনিকদের ন্যায় একটি প্রমাণ বা যুক্তিও তার মুখস্ত থাকে না; বরং তার দূরতম কোনো ধারণাও থাকে না যে,

যুক্তি, প্রমাণ, অনুমান ও কিয়াস কাকে বলে। এক কথায়, এ সকল বরকতের কল্যাণেই ব্রাহ্ম সমাজীরাও চরম ভ্রষ্টতার পথ অবলম্বন করা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত কিছুটা হলেও খোদার সত্তায় বিশ্বাসী। খোদার অস্তিত্বের বিদ্যমান সুমহান খ্যাতি ও জনশ্রুতি তাদের ধারণাকে হাবুডুবু খাওয়া থেকে রক্ষা করেছে। সুতরাং কেউ নিজের অভ্যন্তরীণ নোংরামির কারণে খোদার এলহামের জন্য কৃতজ্ঞ না-ও হতে পারে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে তাঁর শক্তিশালী হাত ও শক্তির কল্যাণেই বিশ্বাস ও সততার নৌকা চলমান রয়েছে আর এলহামই খোদাকে চেনার সমুদ্রের নাবিক। যদি নাস্তিক এর কল্যাণরাজির ফলাফল বা প্রভাব সম্পর্কে অনবহিত বা রিক্তহস্ত থেকে যায় তাহলে এটি তাঁর দোষ নয়, বরং নাস্তিক (নিজেই) সে ব্যক্তির ন্যায়, যে প্রকৃতিগতভাবে অন্ধ ও অজ্ঞ বা সে অঙ্গের ন্যায় যা রোগাক্রান্ত এবং কুষ্ঠক্লিষ্ট।

এখানে একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, যারা নিছক বুদ্ধিতে বিশ্বাসী, তারা জ্ঞান, তত্ত্ব ও বিশ্বাসে যেভাবে দুর্বল ঠিক সেভাবেই কর্ম, বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার ক্ষেত্রেও দুর্বল এবং অক্ষম। অধিকন্তু তাদের জামা'ত এমন কোনো দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নি যার মাধ্যমে এই প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে যে, তারাও এই কোটি কোটি পবিত্র লোকের ন্যায় খোদার বিশ্বস্ত ও প্রিয়ভাজন বান্দা, যাদের কল্যাণরাজি পৃথিবীতে এমনভাবে প্রকাশিত ও বিকশিত যে, এদের হিতোপদেশ, নসীহত, দোয়া, দৃষ্টি ও সাহচর্যের প্রভাবে শত শত লোক পবিত্র রীতি অবলম্বনে আর খোদার রঙে রঙিন হয়ে এমনভাবে স্বীয় প্রভুর দিকে আকৃষ্ট হয়েছে যে, তারা এ পৃথিবী এবং এর সর্বসাকুল্য বিষয়াদির প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন থেকে জগতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ-খ্যাতি, অহংকার-গৌরব এবং সম্পদ ও রাজত্বের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে সেই সত্যের পথে পদচারণা করেছেন, যে পথে চলে তাঁদের মধ্যকার শত শত লোকের প্রাণহানি ঘটেছে, সহস্র সহস্র মাথা কাটা পড়েছে, লক্ষ লক্ষ পবিত্র মানুষের রক্তে ভূমি রঞ্জিত হয়েছে; কিন্তু এসব বিপদাপদ সত্ত্বেও তারা এমন আশ্চর্যজনক নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন যে, তারা অন্তরঙ্গ প্রেমিকের ন্যায় হাসিমুখে পায়ে শিকল পরেন, দুঃখ পেয়ে আনন্দিত হন আর পরীক্ষায় পড়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সেই একক সত্তার প্রেমের জন্য দেশান্তরিত হন, সম্মানকে জলাঞ্জলি দিয়ে লাঞ্ছনাকে বরণ করেন, আরাম বিসর্জন দিয়ে সমস্যাকে আমন্ত্রণ জানান, সম্পদের বিপরীতে দারিদ্র্যকে মাথা পেতে নেন, অধিকন্তু সকল সম্পর্ক-বন্ধন ও

আত্মীয়তা ছিন্ন করে দারিদ্র্য ও নির্জনতা-নিঃসঙ্গতা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। রক্ত দিয়ে, স্বজন হারিয়ে ও প্রাণ বিসর্জন দিয়ে খোদার অস্তিত্বের সত্যতাকে মোহরাঙ্কিত করেন। ঐশীবাণী বা ঐশী গ্রন্থের সত্যিকার অনুসরণের কল্যাণে তাঁদের মাঝে সেই বিশেষ জ্যোতি সৃষ্টি হয় যা অন্যদের মাঝে কস্মিনকালেও ছিল না। এমন মানুষ কেবল পূর্বেই ছিল না বরং এমন মনোনীত জামা'ত ইসলামের অনুসারীদের মাঝে সকল যুগে জন্মগ্রহণ করে আর সকল যুগে নিজেদের আলোকিত সত্তার মাধ্যমে বিরোধীদের অভিযুক্ত ও নির্বাক করে এসেছে। তাই অস্বীকারকারীদের সামনে আমাদের এই প্রমাণ একটি সম্পূর্ণ প্রমাণ যে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে কুরআন শরীফ যেমন শ্রেষ্ঠত্বের পরম মার্গে উপনীত করে, একইভাবে কর্মের ক্ষেত্রেও শ্রেষ্ঠত্ব এরই মাধ্যমে অর্জিত হয়। যারা সেই পবিত্র বাণী অনুসরণ করেছে, খোদার পক্ষ থেকে গ্রহণযোগ্যতার লক্ষণাবলী ও জ্যোতি তাদের মাঝে প্রকাশ পেয়ে আসছে এবং এখনো প্রকাশ পায়, কিন্তু অন্যদের মাঝে তা আদৌ প্রকাশ পায় না। অতএব সত্য সন্ধানীর জন্য এই প্রমাণই যথেষ্ট যা সে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারে। অর্থাৎ ঐশী কল্যাণরাজি ও ঐশী নিদর্শনাবলী কেবল কুরআনের খাঁটি অনুসারীদের মাঝেই দেখা যায় আর অন্যসব দল, তারা ব্রাহ্ম, আর্য বা খ্রিষ্টানই হোক না কেন- যারাই সত্যিকার ও পবিত্র এলহাম হতে বিমুখ, তারা সত্যের জ্যোতি থেকে বঞ্চিত ও রিক্তহস্ত। অতএব সকল অস্বীকারকারীকে আশ্বস্ত করার দায়িত্ব আমরাই নিচ্ছি। শর্ত হলো, তাদের আন্তরিকভাবে ইসলাম গ্রহণে সোচ্চার হয়ে পূর্ণ অনুরাগ, অবিচলতা, ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে সত্য সন্ধানের মানসে কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকা। এখনো যদি কেউ অস্বীকার করা থেকে বিরত না হয় তাহলে তার অস্বীকার এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ হবে যে, সে জাগতিকতার মোহে সত্যকে গ্রহণ করতে চায় না। তার পুরো আলোচনা শত্রুতা ও বিদ্বেষভাবাপন্ন, সত্য সন্ধানের উৎস থেকে নয়। এখন হে ব্রাহ্ম বন্ধুগণ! দৃষ্টি চোখ মেলে একটু দেখো, আমাদের এই গবেষণার মাধ্যমে শতভাগ প্রমাণিত হয়ে গেল যে, এলহাম অসম্ভবও নয় আর অবর্তমানও নয় বরং এটি একটি প্রমাণিত সত্য, যা বিবেকের কাছে আবশ্যক ও অবশ্যম্ভাবী এবং অনুসন্ধানে এর অস্তিত্ব স্বীকৃত বা প্রমাণিত। এর অস্তিত্ব বা উপস্থিতি আমরা প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছি। বন্ধুগণ! এখন আপনাদের জন্য আবশ্যক হলো, এই টীকা এবং টীকা পাদটীকা ১, ২ ও ৩ মনোযোগ সহকারে পাঠ করা এবং বারংবার পড়া আর

এরপর খোদাভীতির দাবি অনুসারে সমুজ্জ্বল প্রদীপ পেয়ে অসৎ পন্থার তমসাচ্ছন্ন চিন্তাধারা পরিত্যাগ করা অধিকন্তু 'নিজেরই বুনা কাপড় কীভাবে ছিঁড়ে ফেলি'- মর্মে বিদ্বেষভাবাপন্ন লজ্জাবোধকে হৃদয়ে স্থান না দেয়া! বরং যে ব্যক্তি নিজেকে ন্যায়পরায়ণ মনে করে এখন তার ন্যায়পরায়ণতার প্রমাণ দেয়া উচিত। যে নিজেকে সত্য-সন্ধানী মনে করে, এখন তার সত্য-সন্ধানে বিলম্ব করা উচিত নয়। অবশ্য যে প্রবৃত্তির বশীভূত, এমন সত্য গ্রহণ করা তার জন্য কঠিন হবে যা গ্রহণ করলে তার অহমিকায় আঁচ আসে। কিন্তু হে এমন প্রকৃতির মানুষ, তুইও সেই সর্বশক্তিমান সত্তাকে ভয় কর্, যার কাছে একদিন তোকে হিসাব দিতে হবে। একটু চিন্তা কর যে, যে ব্যক্তি সত্যকে পেয়েও অন্যায় পন্থা পরিত্যাগ করে না আর হঠকারিতামূলকভাবে বিরোধিতা করে, খোদার পবিত্র নবীদের পূত-ব্যক্তিত্বকে নিজের অবাধ্য প্রবৃত্তির আদলে অনুমান করে জাগতিক লিপ্সায় কলুষিত জ্ঞান করে, অথচ খোদার কালাম বা গ্রন্থের বিরোধিতায় নিজেই মিথ্যাবাদী, লাঞ্ছিত ও অপমানিত সাব্যস্ত হচ্ছে, এমন ব্যক্তির শোচনীয় অবস্থা ও দুর্ভাগ্য সম্পর্কে স্বয়ং তার আত্মা সাক্ষী হয়ে যায়, যা তাকে সর্বদা অভিযুক্ত করে। নিঃসন্দেহে খোদার সামনে সে নিজের ঈমানহীনতার ফলাফল দেখবে। কেননা যে ব্যক্তি অতীব প্রখর ও দগ্ধকারী রোদে দণ্ডায়মান, সে ঘন ছায়ার প্রশান্তি পেতে পারে না। অতএব যদিও নসীহত এমন তির নয় যা ধনুক থেকে বের হতেই পার হয়ে যাবে, কিন্তু যে কাজ করার মাঝে স্পষ্টতই জাগতিক লাঞ্ছনা চোখে পড়ে, আর পরকালের দুর্ভাগ্যও যে কারণে টলার নয়, সেকাজ এমন মানুষ কেন করবে যাদের দাবি হলো আমরা বিবেকসম্মত পথ অনুসরণ করতে চাই। বিশেষ করে ব্রাহ্ম সমাজের কিছুসংখ্যক দৃঢ়চেতা ও সুশীল মানুষ, যারা জ্ঞানী ও সুযোগ্য, তাদের প্রজ্ঞাপূর্ণ মনমানসিকতার কাছে আমাদের দৃঢ় আশা রয়েছে যে, তারা আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে সেসকল সত্য বিষয় মেনে নেবেন যার সত্যতা এই টীকায় প্রমাণিত হয়েছে, বরং আমি এ আশা রাখব যে, এমন মানুষ পুরোপুরি এই টীকা পড়ার পূর্বেই প্রভাবান্বিত হবেন এবং সত্য-সঠিক পথের দিশা পেয়ে যাবেন, কেননা বুদ্ধিমান ও সুশীল মানুষ কোনো বিতর্কে নিজেকে অভিযুক্ত হতে দেখে লাঞ্ছিত হওয়ার অপেক্ষায় কালক্ষেপণ করে না, বরং অসম্মানিত হওয়ার পূর্বেই সসম্মানে সত্য গ্রহণ করে সত্য পূজারিদের দৃষ্টিতে মাহাত্ম্যের যোগ্য বলে চিহ্নিত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকৃতিগতভাবে নির্লজ্জ ও লজ্জাবোধ-

বিবর্জিত, তার লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা নিয়ে আদৌ মাথাব্যথা নেই আর লজ্জিত হওয়াকে সে আদৌ ভয় করে না। সত্যিকার অর্থে এমন শ্রেণির মানুষও পৃথিবীতে রয়েছে যারা লজ্জাশীলতার সাথে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করে চরম নির্লজ্জতার সাথে একটি স্পষ্টত মিথ্যা বিষয়ে হঠকারিতাপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করে আর সহস্রবার বোঝালেও হঠকারিতা পরিত্যাগ করে না এবং স্বীয় বক্র পথে চলা থেকে বিরত হয় না। এরা দিন দেখার পরও একে রাত বলতে থাকে আর এ কথার আদৌ ভয় নেই যে, মানুষ তাকে অন্ধ ও দৃষ্টিহীন বলবে। এরাই ভয়াবহ বিদ্বেষের কারণে এবং জ্ঞান ও যোগ্যতার অভাবে লাশের মতো পড়ে আছে, আর সত্যের দিকে বিন্দুমাত্র অগ্রসর হয় না এবং সঠিক ও সৎ পথ অনুসরণ করে না। এদের সকল চালচলন অদ্ভুত, আর সকল কথাই বক্র। তাদের সম্পর্কেই আমরা বারবার লিখছি যে, প্রকৃতিস্থ হোন আর বুদ্ধির দাবি করতে করতে নির্বোধ হয়ে যাবেন না। সেই ব্যক্তি একেবারেই অথর্ব ও হীনমনা আখ্যায়িত হয় যার মুখ পূতপবিত্র লোকদের অবমাননা ও অপমান করার ক্ষেত্রে চরম ধৃষ্ট, কিন্তু সত্য কথা বলার সময় তাদের বাকশক্তি হারিয়ে যায়। যদি এরা কোনো সূক্ষ্ম বিষয় বোঝার চেষ্টা না করত তাহলে আমি ধরে নিতাম যে, তাদের কোনো দোষ নেই, কথা সূক্ষ্ম ছিল, তাই বুঝতে পারে নি; কিন্তু তাদের বিদ্বেষ দেখ! যেসব কথা সামান্য যোগ্যতার মানুষও বুঝতে পারে, তারা তা-ও বুঝতে অস্বীকার করে। নিছক এলহামের বিতর্কেই কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির চিন্তা করা উচিত যে, এ কথা বোঝা কী কোনো কঠিন বিষয় যে, খোদা, যিনি সকল অনুপম গুণে সজ্জিত, তিনি বোবা হতে পারেন না? বরং যেভাবে দেখেন, জানেন ও শোনেন, অনুরূপভাবে কথা বলাও আবশ্যক। কথা বলার বৈশিষ্ট্য যেহেতু বিদ্যমান, তাই এই বৈশিষ্ট্যের কল্যাণরাজি মানবজাতির যোগ্য ব্যক্তিদের ওপর অবতীর্ণ হওয়া উচিত, কারণ খোদার কোনো বৈশিষ্ট্য কল্যাণসাধন হতে বিরত থাকতে পারে না। তিনি যে কল্যাণরাজির উৎসস্থল তা কেবল তাঁর সত্তায় বিরাজমান কতক গুণাবলীর সুবাদে নয় বরং সকল গুণাবলীর নিরিখে মানবজাতির জন্য তিনি আশীর্বাদ। মানুষ যেহেতু প্রবৃত্তির সকল প্রকার আকর্ষণ ও আবেগের হাতে বন্দি আর প্রতিটি মুহূর্তে লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনার প্রতি আকৃষ্ট, তাই সে নিজে শরীয়তের আইন প্রস্তুত ও প্রণয়নকারী হতে পারে না, বরং সেই পবিত্র আইন কেবল তাঁর পক্ষ থেকেই উৎসারিত হতে পারে যিনি নিজ সত্তায় রিপুর তাড়না

ও ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্ত ও পবিত্র– এ কথা বোঝা কি কঠিন? এতে কোনো সন্দেহ আছে কি যে, নিছক বুদ্ধি খোদাকে চেনার ক্ষেত্রে 'আছে' (বা নিশ্চিৎ জ্ঞান)-এর পর্যায়ে আদৌ পৌঁছতে পারে না? মানবহৃদয়ে সহজাতভাবে কি এ বাসনা নেই যে, খোদাকে আবিষ্কারের ক্ষেত্রে যুক্তিভিত্তিক অনুমান থেকে সে সম্মুখে অগ্রসর হবে? প্রকৃত অনুসন্ধিৎসুদের হৃদয় কি এমন বিষয় উদঘাটনের জন্য ব্যাকুল হয় না যার মাধ্যমে সেই জীবন্ত খোদার সত্তা এবং শাস্তি-পুরস্কারের জগৎ সম্পর্কে তাদের পূর্ণ আশ্বাস ও প্রশান্তি লাভ হবে আর তাঁর অস্তিত্ব ও প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে সত্যিকার অর্থে নিশ্চিত হবে? এ বিষয়টি ন্যায় বিচারকদের অজানা থাকতে পারে কি, বাগাড়ম্বরতার কারণে যেই শত শত ধর্মীয় বিতণ্ডা সৃষ্টি হয়েছে, যার কারণ হলো মূলত ভ্রান্ত সব বক্তৃতার ক্ষতিকর প্রভাব; তা কেবল প্রকৃতির আইনের ইঙ্গিত এবং অস্পষ্ট ও কাল্পনিক গ্রন্থের ইশারায় সমাধা হতে পারে না, বরং বক্তৃতা যা কিছু নষ্ট করেছে তার সমাধানও বক্তৃতার মাধ্যমেই হতে পারে? যে কথার মাধ্যমে জীবন হারিয়েছে সে কথা বা বক্তৃতার মাধ্যমেই জীবন লাভ করতে পারে? কিন্তু অপবিত্র বাণী বা উক্তির মোকাবিলায় কথা এমন পবিত্র হওয়া চাই যা হবে খাঁটি সত্য এবং উদ্ভূত হবে খোদার খাঁটি জ্ঞান থেকে। সুতরাং যেখানে এলহামের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি প্রামাণিক সত্য হওয়া সত্ত্বেও কিছু লোক এর সত্যতা অস্বীকার করতে থাকে আর খোদার পবিত্র গ্রন্থাবলীকে মানুষের বানানো বলে মনে করে, সেখানে প্রশ্ন হলো, কী করে ভাবা যেতে পারে যে, এরা আদৌ খোদার ভয় রাখে? আর কীভাবে আশা রাখব যে, এদের মুখ থেকে ন্যায়-নীতিমূলক কথা বের হবে? যারা কোনোভাবে মিথ্যা পরিত্যাগ করতে চায় না, তাদের জন্য আমাদের কিছু বলা বৃথা আর এ গ্রন্থ দেখাও তাদের জন্য অর্থহীন। পরিতাপ! শত শত মানুষ বুদ্ধিমান আখ্যায়িত হয়ে আবার অজ্ঞতার শিকার, চক্ষুষ্মান কিন্তু দেখে না, কানও আছে কিন্তু শোনে না, হৃদয়ও আছে কিন্তু বোঝে না। ব্রাহ্ম সমাজীদের মাঝে এমন মানুষ নেহায়েৎ কম নেই যারা বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করলেও কেবল এটি করেছে যে, খোদার আদি গুণাবলীকে তাঁর সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথক রেখে দিয়েছে, তাঁর নাম রেখেছে বোবা এবং কল্যাণ ও ক্ষমতায় অসম্পূর্ণ। যেখানে তাদের বুদ্ধিমানদের স্বরূপ হলো এই, সেখানে যার বিবেকবুদ্ধি অসম্পূর্ণ সে কি তাদের (অর্থাৎ বুদ্ধিমানদের) দেখে খোদার গুণাবলীর কথা অস্বীকার করে বসবে না? কেননা খোদা যদি কথা বলার শক্তি না রাখেন, তাহলে কেউ কীভাবে বুঝবে যে, তিনি দেখা,

শোনা ও জানার বিষয়ে সর্বশক্তিমান। যদি তাঁর মাঝে কথা বলার বৈশিষ্ট্য না থাকে তাহলে এ কথার কী প্রমাণ আছে যে, (তাঁর মাঝে) অন্যান্য গুণাবলীও বিদ্যমান। বাকশক্তি থাকলেও এর মাধ্যমে যদি কোনো সৃষ্টির কোনো উপকার না হয় তাহলে কি এ ধারণা করা হবে না যে, সেই কৃপাবৃক্ষ স্বীয় সকল শাখাপ্রশাখা অর্থাৎ উৎকৃষ্ট গুণাবলী নিয়ে নিজ সৃষ্টির ওপর ছায়া প্রসারিত করছে না, বরং এর কোনো কোনো শাখা শুষ্ক, যার মাধ্যমে কখনো কারো কোনো উপকার হয় নি। এ হলো ব্রাহ্ম সমাজীদের আত্মপ্রসাদ। এমন হীন ও ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করা সত্ত্বেও এসব মানুষ আবার মনে করে যে, কুরআন শরীফ খোদার বাণী নয় বরং স্বার্থপরতার বশবর্তী হয়ে লেখা হয়েছে, নাঊযুবিল্লাহ্, অথচ তা সকল সত্যের প্রস্রবণ। যেহেতু নোংরা চিন্তাধারা ভালো চারিত্রিক গুণাবলী থেকে বঞ্চিত রাখে, তাই এরাও কুরআন শরীফ সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করে বিভিন্ন প্রকার নোংরামিতে জড়িয়ে গেছে আর বিভিন্ন প্রকারের অবমাননা অব্যাহত রেখেছে; সুস্থকে অসুস্থ আখ্যা দিয়েছে আর নিজেদের ঘরের শোকাবহ অবস্থা সম্পর্কে উদাসীন রয়েছে। পরিতাপ! এরা চিন্তা করে না, যে গ্রন্থ স্বার্থপরতার বশবর্তী হয়ে লেখা হয় তার লক্ষণাবলী কী এমনই হয়ে থাকে যে, তা প্রজ্ঞা, তত্ত্বজ্ঞান, সত্য ও নিগূঢ় সূক্ষ্মতায় সকল গ্রন্থের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত হবে আর মানুষ এর মোকাবিলায় হবে অক্ষম? এমন গ্রন্থকে কি মানুষের মিথ্যাচার বলা উচিত যার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমগ্র মানবজাতি চিন্তা করতে করতে ধ্বংস হয়ে গেলেও কিছুই করে উঠতে পারবে না। এমন পবিত্র, নিষ্পাপ এবং শ্রেষ্ঠতম মানবকে কি রিপুর পূজারি ও স্বার্থপর আখ্যায়িত করা উচিত যিনি বিন্দুমাত্র জাগতিক শিক্ষা লাভ করেন নি, অধিকন্তু নিরক্ষর ও সম্পূর্ণভাবে জ্ঞানহীন হয়েও জ্ঞানীদের স্বীয় জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্বের মাধ্যমে লজ্জিত করেছেন, সকল দার্শনিকের অহংকার ধূলিসাৎ করেছেন আর পথহারাদের খোদার পথ দেখিয়েছেন? যদি কোনো মানুষ এ কাজ করে থাকে তাহলে সে মানুষ নয় বরং খোদাই হলো, যে এ কাজ করে দেখালো এবং যার দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে মানবিক শক্তিনিচয় ব্যর্থ ও অক্ষম। যে পবিত্র নবী কুরআন শরীফ এনেছেন, তিনি যদি নাঊযুবিল্লাহ্ রিপুর পূজারি হয়ে থাকেন, তাহলে সেসকল লোকদের কী নাম রাখব যারা বড় বড় বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞ দার্শনিক, বরং খোদা আখ্যায়িত হয়ে এবং সৃষ্টি পূজারিদের দৃষ্টিতে বিশ্ব প্রতিপালক সেজেও জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্বে তার সমান হতে পারে নি? সমুদ্রের সামনে পানির একটি ফোটার যে মূল্য হয়ে থাকে তাদের কথা বা উক্তি কুরআনের সামনে ততটা

মর্যাদা লাভের যোগ্যতাও অর্জন করে নি। পরিতাপ, এরা মহানবী (সা.)-এর অসম্মান ও মর্যাদাহানি করে একথা ভাবে না যে, এর মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে সমগ্র বিশ্বের পবিত্র ব্যক্তিদেরই অসম্মান করা হয়। কেউ নিজের বুদ্ধি নিয়ে গর্ব করুক বা কোনো নবীর অনুসারী হওয়ার আত্মপ্রসাদই লাভ করুক না কেন, তার জন্য একমাত্র সোজা পথ হলো প্রধানত চেষ্টাসাধনাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়ে কুরআন শরীফে বিধৃত সত্য ও তত্ত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বীয় বুদ্ধিবলে বা স্বীয় ঐশী গ্রন্থ থেকে অনুরূপ প্রজ্ঞাপূর্ণ সত্য বের করে দেখানো– এরপর যা ইচ্ছা বাগাড়ম্বর করতে পারে। কিন্তু এই কার্য সমাধার পূর্বে সে কুরআন শরীফের যেভাবে অসম্মান করে বা হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.) সম্পর্কে যেসব অসম্মানজনক কথা বলে বেড়ায়, তা সত্যিকার অর্থে সেই অথর্ব নির্বোধের ওপর বা তার কোনো নবী ও পুণ্যবানের ওপরই বর্তাবে। কেননা যদি সূর্যের আলোকে অন্ধকার আর অন্ধকারকে আলো আখ্যা দেয়া হয়, তাহলে এরপর আর কোন্ উজ্জ্বল জিনিস থাকবে যাকে আমরা উজ্জ্বল আখ্যা দিতে পারি?

اے سر خود کشیدہ از فرقان　　پا نہادہ بہ لُجّۂ طغیاں

হে সে ব্যক্তি যে কুরআনের প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করেছে, আর বিদ্রোহের গভীর গহ্বরে পা রেখেছে,

بانگ کم کن بہ پیش نور ہُدٰی　　توبہ کن از فسوس و بازیہا

হেদায়েতের জ্যোতির সামনে বড় বড় কথা বলো না, উপহাস ও তিরস্কার থেকে বিরত হও।

ایں چہ چشمے ست کور و سخت کبود　　کافتابے درو چو ذرہ نمود

এই চোখ কতই না অন্ধ ও দুর্ভাগা, যার কাছে সূর্য একটি অণুর মতো দেখায়।

تانگیری کنارہ زیں رہ و خو　　ہست دور از کنار کشتی تو

যতদিন তুমি এই পথ ও এই অভ্যাস পরিত্যাগ না করবে,
তোমার তরি তীর থেকে দূরেই থেকে যাবে।

باخدایت عناد و کیں تاچند　　خندہ و بازیت بدیں تاچند

কতদিন তুমি তোমার খোদার সাথে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করবে? ধর্মের সাথে তোমার হাসিঠাট্টা ও বিদ্রুপ আর কতদিন চলবে?

خویشتن رامکُش بہ ترک حیا جائے گریہ مشو باستہزا

লজ্জাশীলতা পরিত্যাগ করে নিজেকে ধ্বংস করো না, হাসিঠাট্টা করে বিলাপের কারণ হয়ো না।

مہر تاباں چو برفلک رخشید چوں توانی بخاک و خس پوشید

উজ্জ্বল সূর্য যখন আকাশে ঝলমল করে, তুমি একে মাটি ও ঘাস দ্বারা কীভাবে আড়াল করে রাখতে পারো?

شب تواں کرد صد فریب نہاں لیک در روز روشن ایں نتواں

অন্ধকার রাত অনেক প্রতারণাকে গোপন করতে পারে, কিন্তু উজ্জ্বল দিনে এমনটি সম্ভব নয়।

نور فرقاں نہ تافت است چناں کو بماند نہاں زِ دیدہ وراں

কুরআনের আলো এমনভাবে ঝলমল করে না যে, তা দৃষ্টিবানদের দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে।

آں چراغ ہدیٰ ست دنیا را رہبر و رہنما ست دنیا را

সেটি সারা পৃথিবীর জন্য হেদায়েত প্রদীপ, পৃথিবীর জন্য নেতা ও পথপ্রদর্শক।

رحمتے از خداست دنیا را نعمتے از سماست دنیا را

তা খোদার পক্ষ থেকে পৃথিবীর জন্য রহমত, আকাশ হতে পৃথিবীবাসীদের জন্য একটি নেয়ামত।

مخزن راز ہائے ربّانی از خدا آلۂ خدا دانی

ঐশী রহস্যাবলীর ভাণ্ডার, খোদার পক্ষ থেকে খোদাকে চেনার মাধ্যম।

برتر از پایہ بشر بکمال دستگیر قیاس و استدلال

শ্রেষ্ঠত্বে মানুষের মর্যাদা হতে বড় মর্যাদার, আর কিয়াস ও যুক্তির হাতকে দৃঢ়তা দানকারী।

کارسازِ اَتم بعلم و عمل حجتش اعظم و اثر اکمل

জ্ঞান ও কর্মে সর্বোৎকৃষ্ট কার্যবিধায়ক, এর যুক্তিপ্রমাণ সুমহান আর এর কার্যকারিতা ও প্রভাব হলো উৎকৃষ্ট।

ہر کہ بر عظمتش نظر بکشاد بے توقف خدایش آمد یاد

যে-ই এর মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করে, তার তাৎক্ষণিকভাবে খোদা মনে পড়ে।

داں کہ از کبر و کیں ندید آں نور کور ماند و ز نور حق مہجور

যে সেই জ্যোতিকে অহঙ্কার ও বিদ্বেষের কারণে দেখে নি, সে অন্ধই থাকল আর সত্যের জ্যোতি হতে থাকল রিক্তহস্ত।

وہ چہ دارد ازاں یگاں اسرار دل و جانم فدائے آں اسرار

বাহবা! সেই অনন্য খোদার পক্ষ থেকে এতে কতই না মহান রহস্যাবলী অন্তর্নিহিত আছে! আমার অন্তরাত্মা সেই রহস্যের জন্য নিবেদিত।

پُر ز نور جلال حضرت پاک خور تاباں ز اوج حق برخاک

তা পবিত্র খোদার প্রতাপের জ্যোতিতে পরিপূর্ণ। উজ্জ্বল সূর্যও তাঁর সত্তার উচ্চতার সামনে মাটিতে নিপতিত।

وہ چہ دارد خزائن اسرار دل و جانم فدائے آں انوار

বাহবা! তা ঐশী রহস্যের কতই না অনন্য ভাণ্ডার নিজের মাঝে অন্তর্নিহিত রাখে, আমার অন্তরাত্মা সেই সকল জ্যোতির জন্য নিবেদিত।

ہست آئینہ بہر روئے خدا عالمے را کشید سوئے خدا

কুরআন খোদা দর্শনের আয়না, তা এক বিশ্বকে খোদার দিকে আকর্ষণ করেছে।

بے زباناں از و فصیح شدند زِشت رویاں از و صبیح شدند

বোবারা এর কারণে বাগ্মী হয়ে গেছে, কুৎসিত চেহারার মানুষ এর কারণে সুন্দর হয়ে গেছে।

میوہ از روضۂ فنا خوردند واز خود و آرزوئے خود مُردند

তারা আত্মবিলীনতার বাগানের ফল খেয়েছেন, আর তারা অহমিকা ও নিজেদের কামনা-বাসনার দাসত্ব সম্পূর্ণভাবে পরিহার করেছেন।

دست غیبے کشید دامن دل پا بر آورد جذب یار ز گل

একটি অদৃশ্য হাত হৃদয়ের আঁচল ধরেছে, বন্ধুর আকর্ষণ চোরাবালি হতে তাদের পা টেনে বের করেছে।

بود آں جذبۂ کلام خدا کہ دل شاں ربود از دنیا

এটি ঐশী বাণীর আকর্ষণই ছিল, যা তাদের হৃদয়কে জগৎ-বিমুখ করেছে।

سینۂ شاں ز غیر حق پرداخت وازمئے عشق آں یگاں پُر ساخت

তাদের বক্ষকে খোদা ছাড়া অন্যদের কবল হতে মুক্ত করেছে, সেই এক অনন্য সত্তার ভালোবাসার সুরায় ভরে দিয়েছে।

چوں شد آں نورِ پاک شامل شاں تافت از پردہ بدرِ کامل شاں

সেই পবিত্র জ্যোতি যখন তাদের জীবনের অংশ হয়ে গেল, তখন পর্দার অন্তরাল থেকে পূর্ণচন্দ্র চকমক করে উঠল।

دور شد ہر حجاب ظلمانی شد سراسر وجود نورانی

অন্ধকারের সকল পর্দা হতে সে পৃথক হয়ে গেলে, আর সে পুরোটাই জ্যোতির্মণ্ডিত সত্তা হয়ে গেল।

خاطرِ شاں بجذب پنہانی کرد مائل بعشق ربانی

তাদের হৃদয়কে একটি অদৃশ্য আকর্ষণে, খোদার ভালোবাসার প্রতি আকৃষ্ট করেছে।

آں چناں عشق تیز مرکب راند کہ ازاں مشت خاک ہیچ نماند

প্রেম এমন প্রবল বেগে ঘোড়া ছুটিয়েছে যে, মুষ্ঠিভর মাটির কিছুই বাকি থাকে নি।

نے خودی ماند نے ہوا و ہوس اوفتادہ بخاک و خوں سرکس

কোনো অহমিকা অবশিষ্ট থাকল না কোনো কামনা-বাসনাও না, (যেন) কারো মাথা ধুলা ও মাটিতে লুটিয়ে রয়েছে।

عاشقان جلالِ روئے خدا طالبانِ زلالِ جوئے خدا

তারা খোদা তা'লার চেহারার প্রতাপ ও মাহাত্ম্যের প্রেমিক, আর খোদার নহরের স্বচ্ছ পানির সন্ধানী।

پر ز عشق و تہی ز ہر آزے کشت وز ایشاں نخاست آوازے

তারা (খোদার) ভালোবাসায় পরিপূর্ণ আর সকল লোভ-লিপ্সা হতে মুক্ত, প্রেম তাদের খুন করেছে বা মিটিয়ে দিয়েছে কিন্তু তারা টু-শব্দটি পর্যন্ত করে নি।

پاک گشتہ زلوث ہستی خویش   رستہ از بند خود پرستی خویش

স্বীয় সত্তার কলুষ হতে মুক্ত হয়ে গেছে, আর আত্মপূজার বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করেছে।

آنچناں یار در کمند انداخت   کہ نہ دانند بادگر پرداخت

বন্ধু তাদের স্বীয় প্রেমডোরে এমনভাবে আবদ্ধ করেছেন যে, অন্যদেরকে তারা চেনেই না।

قدم خود زدہ براہ عدم   گم بیادش ز فرق تا بقدم

তাঁর স্মরণে আপাদমস্তক নিমজ্জিত হয়ে, আত্মবিলুপ্তির পথে পা উঠিয়েছে।

ذکرِ دلبر غذائے نغز حیات   حاصلِ روزگار و مغزِ حیات

বন্ধুর স্মরণ তাদের জীবনের সুষম খাবার, আর এটিই তাদের জীবনের সারকথা ও জীবনের চালিকাশক্তি।

سوختہ ہر غرض بجز دلدار   دوختہ چشمِ خود زغیر نگار

প্রেমাস্পদ ছাড়া সকল কামনা-বাসনা জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করেছে, প্রেমাস্পদ ছাড়া অন্যদের দেখা থেকে চোখ বন্ধ করে নিয়েছে।

دل و جاں بر رخے فدا کردہ   وصل او اصل مدعا کردہ

একমাত্র চেহারার জন্যই অন্তরাত্মা উৎসর্গ করে রেখেছে, তাঁকে পাওয়াই জীবনের মূল উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে নিয়েছে।

مُردہ و خویشتن فنا کردہ   عشق جوشید و کارہا کردہ

তারা মৃত্যুকে বরণ করেছে আর নিজেদের বিলুপ্ত করেছে, প্রেম উদ্বেলিত হয়েছে আর আশ্চর্যজনক বহু কাজ করে দেখিয়েছে।

از دیار خودی شدند جدا   سیل پُرزور بود بُرد ازجا

তারা আত্মগর্বের বসতি ছেড়ে দিয়েছে, (প্রেমের) বন্যা শক্তিশালী ছিল যা তাদের স্বস্থান থেকে বয়ে নিয়ে গেছে।

لا جرم یافتند نور خدا   چوں خودی رفت شد ظہور خدا

এতে সন্দেহ নেই যে তারা খোদার জ্যোতি লাভ করেছে, যখন অহঙ্কার দূরীভূত হলো তখন খোদার প্রকাশ ঘটলো।

تن چو فرسود دلستاں آمد   دل چو ازدست رفت جاں آمد

যখন দেহ (আমিত্ব) দুর্বল হয়ে গেল প্রেমাস্পদ এসে গেলেন, হৃদয় যখন বেরিয়ে গেল তখন প্রাণ অর্থাৎ খোদা লাভ হলো।

عشق دلبر بروئے شاں بارید   ابر رحمت بکوئے شاں بارید

তাদের চেহারায় প্রেমাস্পদের প্রেম প্রকাশ পেয়েছে, রহমতবারি তাদের গলিতে বর্ষিত হয়েছে।

ہست ایں قوم پاک را جاہے   کہ ندارد جہاں بدو راہے

এ পবিত্র জাতির মর্যাদা এমন, সারা পৃথিবীও সে মর্যাদায় উপনীত হতে পারে না।

دست بہر دعا چو بردارند   مَورِدِ فیض ہائے دادارند

যখন তারা দোয়ার জন্য হাত উঠায়, তখন তারা ঐশী কল্যাণরাজির অবতরণস্থল বা বিকাশস্থল হয়ে যায়।

کشف رازے گر از خدا خواہند   ملہم از حضرت شہنشاہ اند

যদি তারা চায় যে, খোদার পক্ষ থেকে কোন রহস্যাবৃত বিষয় প্রকাশ পাক, তখন তারা রাজাধিরাজ খোদার পক্ষ হতে এলহামপ্রাপ্ত হন।

کس بسر وقت شاں ندارد راہ   کہ نہاں اند در قباب اللہ

তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানা কারো জন্য সম্ভব নয়, কেননা তারা খোদার গম্বুজে আত্মগোপনে আছেন।

گر نماید خدا یکے زاناں   بَرِکابش دَوَند سلطاناں

খোদা তা'লা যদি তাদের মাঝে কাউকে প্রকাশ করে দেন, তাহলে বাদশাহ্‌গণও তার পেছনে ছুটবে।

ایں ہمہ عاشقان آں یکتا   نور یابند از کلام خدا

সেই এক অদ্বিতীয় খোদার এসব প্রেমিক, খোদার বাণী হতেই জ্যোতি অর্জন করে।

گرچہ مستتند از جہاں پنہاں   باز گہہ گہہ ہمی شوند عیاں

যদিও তারা পৃথিবীর দৃষ্টির আড়ালে, তবুও কখনও কখনও তারা প্রকাশিত হয়ে যান।

ہمچو خورشید و مہ بروں آیند غیر را چہرہ نیز بنمایند

তারা সূর্য ও চন্দ্রের মত বেরিয়ে আসেন, আর অন্যদের স্বীয় চেহারার দর্শন দান করেন।

بالخصوص آں زماں کہ باد خزاں باغ مہر و وفا کند ویراں

বিশেষকরে সে যুগে যখন শরতের বাতাস, ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার বাগানকে বিরাণ করে দেয়।

دل بہ بندَد جہاں بدار فنا لب کشاید بمدحت دنیا

পৃথিবীবাসী নশ্বর পৃথিবীকে ভালোবাসে, আর বস্তুজগতের প্রশংসায় মত্ত হয়।

جیفہ را کنند مدح و ثنا واز خداوند جود استغنا

এক লাশের বা শবদেহের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকে, আর উদার খোদার প্রতি ভ্রুক্ষেপহীনতা প্রদর্শন করে।

عاشق زر شوند و دولت و جاہ سرد گردد محبت آں شاہ

ধনসম্পদ সম্মান ও প্রতিপত্তির প্রতি আসক্ত হয়ে যায়, আর সেই বাদশাহ্‌র ভালোবাসা হারিয়ে যায়।

شوکت و شان ایں سرائے زوال خوش نماید بدیدہ جہّال

এই ক্ষণভঙ্গুর সরাইখানার সৌন্দর্য ও মহিমা, অজ্ঞদের দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় মনে হয়।

بر زبانہا شود مقام خدا اندروں پُر شود ز حرص و ہوا

খোদার পদমর্যাদার উল্লেখ কেবল মুখে মুখে থাকে আর ভিতরে থাকে লোভ-লিপ্সা ও কামনায় পরিপূর্ণ।

اندریں روز ہائے چوں شب تار دست گیرد عنایت دادار

এমন দিনে যা গভীর তমসাচ্ছন্ন রাতের ন্যায় হয়ে থাকে, সুবিচারক খোদার দয়া মানুষের হাত ধরে।

مے فرستد بخلق صاحب نور تاشود تیرگی ز نورش دور

তিনি সৃষ্টির প্রতি এক আলোকিত ব্যক্তিকে পাঠান, যেন তার আলো দ্বারা অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায়।

تاز شور و فغان عاشق زار خلق گردد ز خواب خود بیدار

যেন এই অতিশয় আকুল প্রেমিকের ক্রন্দন ও আহাজারির কল্যাণে সৃষ্টি স্বীয় নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়।

تا شناسند مردمان رہ راست تا بدانند منکراں کہ خداست

যেন মানুষ সঠিক পথ চিনতে পারে, আর যেন অস্বীকারকারীরা জানতে পারে যে, খোদা আছেন।

ایں چنیں کس چو رُو نِہد بہ جہاں بر جہاں عظمتش کنند عیاں

এমন মানুষ যখন জগতে প্রকাশিত হন, তখন খোদা পৃথিবীর সামনে তার মাহাত্ম্য প্রকাশ করে দেন।

چوں بباید بہار باز آید موسم لالہ زار باز آید

যখন সে আসে বসন্ত ফিরে আসে, ফুটন্ত ফুলের ঋতু ফিরে আসে।

وقت دیدار یار باز آید بے دلاں را قرار باز آید

তার আগমনের মাধ্যমে বন্ধুর দর্শনের সময় ফিরে আসে, ব্যাকুল প্রেমিকদের হৃদয়ে প্রশান্তি ফিরে আসে।

ماہ روئے نگار باز آید خور بہ نصف النّہار باز آید

প্রেমাস্পদের চন্দ্রতুল্য চেহারা ফিরে আসে,
সূর্য মধ্য আকাশে ফিরে আসে।

باز خندد بہ ناز لالہ و گل باز خیزد ز بلبلان غلغل

টিউলিপ ও গোলাপ গর্বের সাথে আবার হেসে ওঠে,
বুলবুল পুনরায় গেয়ে ওঠে।

دست غیبش بہ پَرْوَرد ز کرم صبح صدقش کند ظہور اتم

তাঁর (অর্থাৎ খোদার) অদৃশ্য হাত অনুগ্রহপূর্বক তাকে প্রতিপালন করে,
তার সত্যতার প্রভাত পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়।

نور الہام ہمچو باد صبا نزدش آرد زغیب خوشبوہا

এলহামের জ্যোতি বসন্তের মৃদুমন্দ বাতাসের ন্যায়, অদৃশ্য হতে তার কাছে সুগন্ধি নিয়ে আসে।

می شود ملہم از امور نہاں زاں سرائیر کہ خاصۂ یزداں

সে অজানা বিষয়ের এলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তি হয়ে যায়, অর্থাৎ সে সকল রহস্যের (বিষয়ে এলহামপ্রাপ্ত হয়) যা কেবল খোদারই বিশেষত্ব।

تا نماید عیاں حقیقت کار تا زند سنگ بر سر انکار

যেন প্রকৃত সত্য স্পষ্ট করে দেখাতে পারে, (এবং) অস্বীকারের মাথা ভেঙে দিতে পারে।

ہمچنیں آں کریم و پاک و قدیر می کند روشنش چو مہر منیر

এভাবে সেই সম্মানিত ও পবিত্র এবং সর্বশক্তিমান খোদা, তাকে উজ্জ্বল সূর্যের ন্যায় আলোকিত করেন।

دیدہا می کند بدو بینا گوشہا می کند بدو شنوا

চোখকে তার কল্যাণে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করে তোলেন, আর কানকে তার মাধ্যমে শ্রবণশক্তি সম্পন্ন করে তোলেন।

ہر کہ آمد بدو بصدق و صفا یابد از وے شفا بحکم خدا

প্রত্যেক ব্যক্তি যে তাঁর কাছে নিষ্ঠা ও নির্মলতা নিয়ে আসে, সে খোদার আদেশে আরোগ্য লাভ করে।

گفت پیغمبر ستودہ صفات از خدائے علیم مخفیات

প্রশসংনীয় গুণাবলীর অধিকারী রসূল, অদৃশ্যে জ্ঞাত সর্বজ্ঞানী খোদার পক্ষ থেকে জ্ঞান লাভ করে বলেছেন,

بر سر ہر صدی بروں آید آنکہ ایں کار را ہمی شاید

প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এমন সত্তা আবির্ভূত হতে থাকবেন যিনি এ কাজের যোগ্য হবেন।

تا شود پاک ملت از بدعات تا بیابند خلق زو برکات

যেন উম্মত বেদাত থেকে পবিত্র হয়ে যায় আর যেন সৃষ্টি তার সত্তা হতে কল্যাণ লাভ করতে পারে।

الغرض ذات اولیاء کرام ہست مخصوص ملّتِ اسلام

বস্তুত আউলিয়া কেরামের সত্তা, ইসলাম ধর্মেরই বিশেষত্ব।

ایں مگو کیں گزاف و لغو و خطاست   تو طلب کن ثبوت آں برماست

একথা বলো না যে, এটি বাজে ও বৃথা এবং ভ্রান্ত ধারণা, তুমি (প্রমাণ) চাও আর এর প্রমাণ উপস্থাপন করার দায়িত্ব আমাদের।

اے یکے ذرۂ ذلیل و خوار   چہ شود عاجز از تواں دادار

হে এক তুচ্ছ ও লাঞ্ছিত বিন্দু! সেই স্রষ্টা (খোদা) তোর চেয়ে অধম ও অক্ষম কীভাবে হতে পারেন?

ہمہ ایں راست ست لافے نیست   امتحاں کن گر اعترافے نیست

এগুলো সব সত্য কথা অত্যুক্তি নয়, বিশ্বাস না হলে যাচাই করে দেখ।

وعدۂ کج بہ طالباں ندہم   کاذبم گر ازو نشاں ندہم

আমি সন্ধানীদের ভ্রান্ত প্রতিশ্রুতি দেই না, যদি এর নিদর্শন উপস্থাপন না করি তাহলে আমি মিথ্যাবাদী।

من خود از بہر ایں نشاں زادم   دیگر از ہر غمے دل آزادم

আমি স্বয়ং এই নিদর্শনের পূর্ণতার জন্য জন্মগ্রহণ করেছি, অন্য সকল দুশ্চিন্তা থেকে আমার হৃদয় মুক্ত।

ایں سعادت چو بود قسمت ما   رفتہ رفتہ رسید نوبت ما

এই সৌভাগ্য যেহেতু আমাদের ভাগ্যে লেখা ছিল তাই ধীরে ধীরে আমাদের পালা এসে গেল।

نعرہ ہا میزنم برآب زلال   ہمچو مادر دواں پئے اطفال

আমি সন্তানদের পেছনে ছোটে, এমন মায়ের ন্যায় স্বচ্ছ পানির (ঝর্ণায়) দাঁড়িয়ে মানুষকে উদাত্ত আহ্বান করছি।

تا مگر تشنگان بادیہ ہا   گردم آیند زیں فغان و صلا

যেন জঙ্গলের পিপাসার্তরা, এই চিৎকার ও আর্তনাদে আমার কাছে এসে যায়।

لیک شرط است عجز و صدق و صفا   آمدن بانیاز و خوفِ خدا

কিন্তু শর্ত হলো বিনয়, নিষ্ঠা ও হৃদয়ের নির্মলতা এবং দীনতা ও খোদাভীতির সাথে আসা।

جستن از غربت و تذلّل دل   و ز خلوص و اطاعت کامل

দীনতা, হৃদয়ের বিনয় এবং নিষ্ঠা ও পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে সন্ধান করা।

گر کنوں ہم کسے بتابد سر   گیرد از راہ عدل راہ دگر

যদি এখনও কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর ন্যায়ের পথ পরিহার করে ভিন্ন পথ অবলম্বন করে।

نے ز ما پرسد و نہ خود داند   نے ز کِیں روئے خود بگرداند

আমাদেরকেও হেদায়েতের পথ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে না, আর নিজেও জানে না এবং বিদ্বেষও পরিহার করে না।

آں نہ انساں کہ کرمکِ دون ست   راندۂ بارگاہ بے چون ست

সে মানুষ নয় বরং হীন কীট, অনুপম-অতুলনীয় খোদার দরবার হতে বিতাড়িত।

سروکارے بحق نمیدارد   لاجرم لعنتش برو بارد

খোদা সম্পর্কে তার কোন মাথা ব্যথা নেই, তাই খোদার অভিশাপ তার ওপর বর্ষিত হওয়া অবধারিত।

حجت مومناں بر اوست تمام   کارِ ما پختہ عذر اُو ہمہ خام

তার বিরুদ্ধে মু'মিনদের যুক্তি পূর্ণতা লাভ করেছে, আমাদের কথা তথা কাজ দৃঢ় আর তার সকল অজুহাত দুর্বল অর্থহীন।

اَیّہا الجامِحون فی الشہوات   اَکثِرُوا ذکرَ ہادمِ اللّذّات

হে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার অন্ধ অনুকরণকারীরা! ভোগবিলাসকে ধ্বংসকারীকে (অর্থাৎ মৃত্যুকে) বেশি বেশি স্মরণ করো।

رفتنی است ایں مقام فنا   دل چہ بندی دریں دو روزہ سرا

এই ক্ষণভঙ্গুর স্থানের একদিন সমাপ্তি ঘটবে, এ দুদিনের আবাসে কেন মন দিয়েছ?

عمر اول ببیں کجا رفت است   رفت و بنگر ز توچہ ہا رفت است

জীবনের প্রথম অংশকে দেখ (তা) কোথায় চলে গেল? চলে গেল! দেখ, তোমার হাত থেকে কী কী হারিয়ে গেল?

پارۂ عمر رفت در خوردی پارہ را بہ سرکشی بردی

জীবনের একটি অংশ শৈশবে কেটে গেছে, আর একটি অংশ তুমি বিদ্রোহের মাঝে কাটিয়ে দিয়েছ।

تازہ رفت و بماند پس خوردہ دشمناں شاد و یار آزردہ

উত্তম অংশ কেটে গেছে, পেছনে রয়ে গেল কেবল উচ্ছিষ্ট, শত্রুরা আনন্দিত আর বন্ধু দুঃখভারাক্রান্ত।

صد چو تو مہجے بخورد زمیں سر ہنوزت بر آسماں ازکیں

তোমার ন্যায় শত শত অহংকারীদের জমি গ্রাস করেছে, কিন্তু এখনও তোমার (অহংকারের) মাথা বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে উঁচুই আছে।

بشنو از وضع عالم گذراں چوں کند از زبانِ حال بیاں

ক্ষণভঙ্গুর পৃথিবীর বাস্তব অবস্থার কথা শোন, কতইনা পরিষ্কারভাবে বাস্তব অবস্থার নিরিখে তা তুলে ধরছে!

کیں جہاں باکسے وفا نکند نکند صبر تا جدا نکند

যে, এ পৃথিবী কারও সাথে বিশ্বস্ততা করে না, আর পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন না করা পর্যন্ত নিবৃত্ত হয় না।

گر بود گوش بشنوی صد آہ از دل مردۂ درون تباہ

যদি তোমার কান থাকে তাহলে শত শত হুতাশ শুনবে, সেই মৃত হৃদয় হতে যার ভেতরটা ধ্বংস হয়ে গেছে।

کہ چرا رُو بتافتم ز خدا دل نہادم در آنچہ گشت جدا

যে কেন আমি খোদা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি, তাতে মন দিয়েছি যে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।

قدر ایں راہ پرس از اموات اے بسا گورہا پُر از حسرات

মৃতদের কাছে এ পথের গুরুত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো, অনেক এমন কবর আছে যা আক্ষেপে পরিপূর্ণ।

جائے آنست کز چنیں جائے از تورّع بروں نہی پائے

যুক্তিযুক্ত হবে যে তুমি এমন স্থান হতে, তাকওয়া ও খোদাভীতির সাথে বের হও বা পা দূরে রাখ।

ہرچہ اندازدت ز یار جدا باش زاں جملہ کاروبار جدا

যে জিনিস তোমাকে বন্ধু হতে বিচ্ছিন্ন করে, তুমি সেসব কাজ হতে পৃথক হয়ে যাও।

آخر اے خیرہ سرکشی تاچند کس ز دلدار بگسلد پیوند

হে অবিবেচক ধৃষ্ট! আর কতদিন তুমি বিদ্রোহ করবে? কেউ বন্ধুর সাথেও কি সম্পর্ক ছিন্ন করে?

روئے دل را بتاب از اغیار باش ہر دم بجستجوئے نگار

অন্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও আর সদা প্রেমাস্পদের সন্ধানে রত থাক।

رو بدوکن کہ رو رخ یارست ہمہ رو ہا فدائے دلدارست

তার দিকেই মুখ ফিরাও, কেননা বন্ধুর চেহারাই দেখার যোগ্য, আর সকল চেহারা বন্ধুর জন্য নিবেদিত।

تو بروں آزِ خود بقا این ست تو در و محو شو لقا این ست

তুমি নিজের আমিত্ব থেকে বেরিয়ে আস কেননা এতেই প্রকৃত জীবন নিহিত, আর তুমি তাতেই (অর্থাৎ খোদাতে) বিলীন হও কেননা এটিই খোদার সাথে সাক্ষাৎ (বইকি)।

ہر کہ غافل ز ذات بیچون ست او نہ دانا کہ سخت مجنون ست

প্রত্যেক ব্যক্তি যে সেই অনন্য সত্তা সম্পর্কে উদাসীন, সে বুদ্ধিমান নয় বরং চরম উন্মাদ।

تابکے رو بتابی از رخ دوست دیگرے را نشاں دہی کہ چو اوست

তুমি কতদিন বন্ধুর চেহারার প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করবে? অন্য কারো পরিচয় বা চিহ্ন বর্ণনা করো যে তাঁর মত হবে।

در دو عالم نظیر یار کجا عاشقاں را بغیر کار کجا

উভয় জগতে বন্ধুর কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার, প্রেমিকদের অন্যের সাথে সম্পর্কইবা কীসের?

چو بدل آتشے ز عشق افروخت دلستاں ماند و غیر او ہمہ سوخت

হৃদয়ে যখন প্রেমাগ্নি জ্বলে উঠল, তখন কেবল প্রেমাস্পদ রয়ে গেল, আর বাকি সবাই জ্বলে ছাই হয়ে গেল।

لیکن این ست بخششِ یزداں تا نہ بخشد یافتن نتواں

কিন্তু এটি খোদার দান, যতক্ষণ তাঁর দয়া না হবে কেউ তা অর্জন করতে পারে না।

آں کساں را عطا شود ز خدا کز کمند خودی شوند رہا

এই মর্যাদা খোদার পক্ষ থেকে তাদের দেয়া হয়, যারা আত্মশ্লাঘার বন্দীদশা থেকে মুক্তিলাভ করে।

زیر حکم کلام حق بروَند و ز فرامین او بروں نشوند

যারা খোদা তা'লার বাণীর অধীনে চলেন আর তাঁর কথার বাইরে যান না বা আদেশ লঙ্ঘন করেন না।

دیگرے را نمے دہند اینجا وَر دہندش ثبوت آں بنما

অন্যদেরকে এই মর্যাদা দেয়া হয় না, যদি কাউকে দেয়া হয়ে থাকে তাহলে এর প্রমাণ উপস্থাপন করো।

غیر را آں وفا و مہر کجا زہد خشک ست غایت عقلا

অন্যের মাঝে সেই বিশ্বস্ততা ও ভালোবাসা কীভাবে থাকতে পারে? (তথাকথিত) বুদ্ধিমানদের চরম প্রাপ্তি হলো, কেবল বাহ্যিক বা প্রাণহীন পরহেজগারী।

عاقلانے کہ برخرد نازاند بے خبر از حقیقت و رازند

(তথাকথিত) বুদ্ধিমান যারা নিজেদের বুদ্ধি নিয়ে গর্ব করে, তারা গূঢ় তত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞ।

ہمچو گوری سپید کردہ بروں اندروں پُر ز خبث گوناگوں

তারা কবরের ন্যায় কেবল বাহিরকে সাদা-শুভ্র করেছে, অথচ তাদের ভেতর বিভিন্ন প্রকার নোংরামীতে পরিপূর্ণ।

مر خدا را چوسنگ دادہ قرار عاجز از نطق و ساکت از گفتار

খোদা তা'লাকে একটি পাথরের ন্যায় জ্ঞান করে বসে আছে, যে কথা বলতে অক্ষম এবং বাকশক্তিহীন।

آں خدائے کہ حیّ و قیّوم است　　نزدِ شاں یک وجودِ موہوم است

সেই খোদা যিনি চিরঞ্জীব জীবনদাতা, চিরস্থায়ী স্থিতিদাতা, তাদের মতে তিনি এক কাল্পনিক সত্তা।

آں حفیظ و قدیر و ربِّ عباد　　نزدِ شاں اوفتادہ ہمچو جماد

সেই নিরাপত্তাদাতা, সর্বশক্তিমান এবং বান্দাদের প্রভু, তাদের দৃষ্টিতে জড়বস্তুর ন্যায় প্রাণহীনভাবে পড়ে আছে।

خود پسنداں بعقل خویش اسیر　　فارغ از حضرت علیم و قدیر

দাম্ভিক, নিজেদের বুদ্ধির হাতে বন্দি, সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান খোদা সম্পর্কে অনবহিত।

آنکہ خود بین و معجب افتاد است　　حضرت اقدسش کجا یاد است

সে ব্যক্তি যে দাম্ভিক ও অহংকারী, পবিত্র খোদার কথা তার কীভাবে স্মরণ থাকতে পারে?

خوئے عشاق عجز ہست و نیاز　　نشنیدیم عشق و کبر انباز

বিনয় ও নম্রতা হলো প্রেমিকদের স্বভাব, আমরা কখনো ভালোবাসা ও অহংকারকে সহাবস্থান করতে দেখি নি বা শুনি নি।

گر بجوئی سوار ایں رہ راست　　اندر آنجا بجوکہ گرد بخاست

যদি তুমি এই সোজা পথের জন্য বাহন সন্ধান করো তাহলে সেখানে সন্ধান করো যেখানে ধুলা উড়ছে।

اندر آنجا بجوکہ زور نماند　　خود نمائی و کبر و شور نماند

সে স্থানে তাঁকে সন্ধান করো যেখানে জোর-জবরদস্তি নেই, আত্মগর্ব ও অহংকার নেই আর অশান্তি ও নৈরাজ্য নেই।

فانیاں را جہانیاں نرسند　　جانیاں را زبانیاں نرسند

বস্তুপূজারি খোদার পথে বিলীন লোকদের মত হতে পারে না, আর নিবেদিতপ্রাণ লোকেরা বড় বড় দাবিকারীদের মত হতে পারেন না।

خلق و عالم ہمہ بشور و شراند　　عشق بازاں بعالم دگر اند

মানুষ ও বিশ্বের সকলেই নৈরাজ্য, অশান্তি ও দুষ্কৃতিতে লিপ্ত, কিন্তু প্রেমিকরা রয়েছে ভিন্ন জগতে।

تا نہ کارِ دلت بجاں برسد چوں پیامت زدلستاں برسد

যতক্ষণ তোমার হৃদয়ের অবস্থা মৃত্যুর পর্যায়ে পৌঁছে না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই বন্ধুর বাণী তোমার কাছে কীভাবে পৌঁছতে পারে?

تا نہ از خود روی جدا گردی تا نہ قربان آشنا گردی

যতক্ষণ তুমি অহংকার পরিহার না করবে, আর যতক্ষণ বন্ধুর জন্য নিবেদিত না হবে।

تا نیائی زنفس خود بیروں تا نہ گردی برائے او مجنوں

যতদিন নিজের প্রবৃত্তির দাসত্ব পরিহার না করবে, যতদিন খোদার জন্য পাগলপারা না হবে।

تا نہ خاکت شود بسان غبار تا نہ گردد غبار تو خوں بار

যতদিন তোমার দেহমাটি (অর্থাৎ অহম) ধুলাসদৃশ না হবে, যতদিন তোমার দেহধুলা হতে রক্ত না ঝরবে।

تا نہ خونت چکد برائے کسے تا نہ جانت شود فدائے کسے

যতদিন কারো জন্য তোমার রক্ত প্রবাহিত না হবে আর যতদিন তোমার প্রাণ কারো খাতিরে নিবেদিত না হবে।

چوں دہندت بکوئے جاناں راہ خود کن از راہ صدق و سوز نگاہ

(ততদিন) কীভাবে তোমাকে প্রিয়জনের গলির পথে পরিচালনা করা যেতে পারে? তুমি নিজেই নিষ্ঠার সাথে ও বিগলিত চিত্তে চিন্তা করো।

نیست ایں عقل مَرکب آں راہ ہوش کن ہوش کن مشو گمراہ

এই বুদ্ধি সে পথের বাহন নয়, বিবেকবুদ্ধি খাটাও, বিবেক খাটাও, পথভ্রষ্ট হয়ো না।

اصل طاعت بود فنا زِ ہوا تو کجا و طریق عشق کجا

প্রকৃত আনুগত্য হলো কামনা-বাসনা হতে পুরোপুরি মুক্ত হওয়া, তুমি কোথায় আর প্রেমের পথ কোথায়!

تو نشستہ بکبر از اصرار کردہ ایماں فدائے استکبار

তুমি হঠকারিতামূলকভাবে আত্মগরিমা নিয়ে বসে আছ ঈমানকে অহংকারের বেদিতে জলাঞ্জলি দিয়ে।

ایں چہ عقل تو ایں چہ دانش و رائے   کہ کنی ہمسری باآں یکتائے

এটি তোমার কেমন বিবেকবুদ্ধি, কেমন প্রজ্ঞা ও দৃষ্টিভঙ্গি যে, তুমি সেই অদ্বিতীয় খোদার সমকক্ষ দাঁড় করাও?

ایں چہ استاد ناقصت آموخت   ایں چہ قہر خدا دوچشمت دوخت

তোমার অথর্ব শিক্ষক তোমাকে এটি কী শিখালো? এটি খোদার কেমন অভিশাপ যা তোমার উভয় চোখ সেলাই করে দিয়েছে?

ایں چہ از فکر خود خطا خوردی   اوّل الدَّنّ دُردی آوردی

নিজেরই ধ্যানধারণার বশবর্তী হয়ে তুমি এ কী ভুল করলে যে, তোমার প্রথম পদক্ষেপই ভ্রান্তিতে পূর্ণ (বা মদের মটকা থেকে প্রথম পেয়ালাই ভরলে তলানির কাদা দিয়ে)।

چوں شود عقل ناقصت چو خدائے   خاک زادی چساں پرد بہ سما

তোমার দুর্বল বুদ্ধি কীভাবে খোদার সমান হতে পারে? মাটির সৃষ্টি বা মানুষ কী করে উড়ে আকাশে যেতে পারে?

آنچہ صد سہو و صد خطا دارد   علم آں پاک از کجا آرد

যে স্বয়ং শত ভুলভ্রান্তিতে নিপতিত, সে কীভাবে বা কোত্থেকে সেই পবিত্র খোদার জ্ঞান আনতে পারে?

سہو کن را ثنا کنی ہیہات   ایں چہ سہو و خطا کنی ہیہات

পরিতাপ! তুমি ভুলভ্রান্তিতে নিপতিত বুদ্ধির প্রশংসা করো, হায়! তুমি এ কেমন ভুল ও ভ্রান্তিতে নিপতিত!

آں چہ لغزد بہر قدم صدبار   چوں ز دریا رساندت بکنار

যে প্রতিটি পদক্ষেপে শত শত বার হোঁচট খায়, সে কীভাবে তোমাকে (মাঝ) দরিয়া থেকে তীরে পৌঁছাতে পারে?

ایں سراب است سوئے آں مشتاب   می نماید زِ دُور چشمۂ آب

এটি মরীচিকা, তড়িঘড়ি করে তার দিকে যেয়ো না, যা দূর থেকে পানির ঝর্ণা মনে হয়।

کشتی تو شکستہ است و خراب   باز افتادہ در تگ گرداب

তোমার নৌকা ভাঙ্গা ও খারাপ অবস্থায় আছে আবার ঘূর্ণিপাকেও পড়েছে।

نازکم کن بریں چنیں کشتی   کم خرام اے دنی بدیں زشتی

এমন নৌকা নিয়ে অহংকার একটু কম করো, হে ইতর! এমন কুৎসিত হয়ে এত অহংকার কোরো না।

نَرَسی تا یقیں ز راہِ قیاس   ہمہ بر ظن و وہم ہست اساس

অনুমানের ডানায় ভর করে তুমি নিশ্চিত বিশ্বাস পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না, এর পুরো ভিত্তিই হলো সন্দেহ ও কুধারণার ওপর।

گر ز فکر و نظر گداز شوی   ایں نہ ممکن کہ اہل راز شوی

তুমি যদি চিন্তা ও প্রণিধানের মাঝে গলেও যাও, তবুও তুমি রহস্য উদ্‌ঘাটনে সক্ষম হবে না।

گر دو صد جانِ تو ز تن بِرَوَد   ایں نہ ممکن کہ شک و ظن برَوَد

যদি তোমার শরীর হতে দুশত প্রাণও বেরিয়ে যায়, তাহলেও সন্দেহ ও ধারণা দূর হওয়া সম্ভব নয়।

ہست داروئے دل کلام خدا   کے شوی مست جز بجام خدا

অন্তরের প্রশান্তির জন্য ঔষধ হলো খোদার বাণী, ঐশী সুধা ছাড়া তুমি কী করে নেশাগ্রস্ত হতে পার?

ہست برغیر راہ آں بستہ   ہمہ ابوابِ آسماں بستہ

তাঁর পথ অন্যদের জন্য বন্ধ, আর ঊর্ধ্বলোকের সকল দ্বার (অন্যদের জন্য) রূদ্ধ।

تانشد مشعلے ز غیب پدید   از شب تار جہل کس نرہید

যতক্ষণ পর্যন্ত অদৃশ্য হতে কোন মশাল না জ্বলবে, কারো অজ্ঞতার অমানিশাপূর্ণ রজনী হতে মুক্তি লাভ হতে পারে না।

باید اینجا ز کبرہا دوری   تو بعقل و قیاس مغروری

এখানে সকল প্রকার অহংকার হতে দূরত্ব বজায় রাখা উচিত, অথচ তুমি বুদ্ধি ও ধারণার বশবর্তী হয়ে অহংকার করছ।

ایں چہ غفلت کہ خوش بدیں کیشی و از خدا ہیچ گہ نیندیشی

এটি কেমন ঔদাসীন্য যে, তুমি এই রীতি নিয়েই সন্তুষ্ট আর খোদাকে তুমি কখনো ভয় করো না?

رو طلب کن وصال یار ز یار تکیہ بر زور خود مکن زنہار

যাও বন্ধুর কাছেই তার সাথে মিলনের প্রত্যাশী হও, আর কখনও নিজ শক্তির ওপর নির্ভর কোরো না।

تانہ گردد نگوں سرت بہ نیاز پردہ از نفس تو نہ گردد باز

যতক্ষণ পর্যন্ত বিনয়ের সাথে তোমার মাথা না ঝুঁকবে, ততক্ষণ তোমার অহমিকার পর্দা দূরীভূত হবে না।

تا نریزد ترا ہمہ پر و بال اندر اینجا پریدن است محال

যতক্ষণ তোমার সকল পাখনা ও চুল খসে না পড়বে, এখানে উড়া অসম্ভব।

ناتوانی ست قوت اینجا ایں چنیں قوتے بیار و بیا

শক্তিহীনতা বা বিনয় হলো এখানকার শক্তি, এমন শক্তি সৃষ্টি করো আর চলে আস।

پردۂ نیست بر رخ دلدار تو ز خود پردہ خودی بردار

প্রেমাস্পদের মুখে কোন নেকাব নেই, তুমি নিজের ওপর থেকে আমিত্বের পর্দা সরাও (তাহলে দেখতে পাবে)।

ہر کہ را دولت ازل شد یار کار او شد تذلّل اندر کار

চিরস্থায়ী সৌভাগ্য যার সাহায্যকারী বন্ধু হয়ে যায়, সকল কাজে বিনয় তার চরিত্র হয়ে যায়।

آں در آمد بہ حضرت بیچوں کہ شد از تنگنائی کبر بروں

সে এক অনন্য খোদার দরবারে এসে যায় যে, অহংকারের সংকীর্ণ গলি থেকে বেরিয়ে আসে।

حق شناسی ز خود روی ناید خود رَوی خود رَوی بیفزاید

অহংকার করে সত্য বা খোদাকে চেনা সম্ভব নয়, আত্মম্ভরিতা আত্মম্ভরিতাকেই বৃদ্ধি করে।

از خودی حالِ خود خراب مکن　　شب پری کار آفتاب مکن

আত্মম্ভরিতার বশবর্তী হয়ে নিজের অবস্থা খারাপ কোরো না, হে বাদুড়! সূর্যের কাজ করতে যেও না।

تا بشر پُر بود باستکبار　　اندرونش تہی بود از یار

যতদিন মানুষ অহংকারে পূর্ণ থাকে, তার হৃদয়ে বন্ধুশূন্য থাকে (অর্থাৎ খোদা প্রবেশ করেন না)।

چوں رسد عجز کس بحدِّ تمام　　شورشِ عشق را رسد ہنگام

যখন কারো বিনয় পরম মার্গে পৌঁছে যায়, তখন প্রেমাতিশয্যের সময় হয়ে থাকে।

اَے کہ چشمت ز کبر پوشیدہ　　چہ کنم تا کشایدت دیدہ

ওহে! তোমার চোখে অহংকার পর্দা লেপন করেছে, আমি কী করতে পারি যেন তোর চোখ খোলে?

گر ترا در دل ست صدق طلب　　خود روی ہا مکن ز ترک ادب

যদি তোমার হৃদয়ে সত্যিকার সন্ধান থেকে থাকে, তাহলে শিষ্টাচার বিসর্জন দিয়ে অহংকার কোরো না।

راز راہ خدا بجو ز خدا　　تو نہَ چوں خدا بجائے خود آ

খোদার পথের রহস্য খোদার কাছে জিজ্ঞেস করো, তুমি খোদার মত নও তাই স্বস্থানে ফিরে এসো বা যা আছ তাই থাকো।

بندہ گانیم بندہ را باید　　کہ کند ہرچہ خواجہ فرماید

আমরা বান্দা, বান্দার উচিত তা করা যার আদেশ মনিব করেন।

منصب بندہ نیست خود رائی　　خود نشستن بکار فرمائی

নিজের মতামতের ওপর জোর দেয়া বান্দার সাজে না, আর নিজেই শাসকের আসনে বসে যাওয়া উচিত নয়।

ہر کہ بر وَفق حکم مشغول است　　برسر اجرت است و مقبول است

যে ব্যক্তি নির্দেশ অনুসারে কাজে রত, সে-ই পারিশ্রমিক পাবে এবং সে-ই গৃহীত হবে।

وانکه بے حکم خود تراشد کار مُزدِ واجب نمی شوَد زنہار

যে ব্যক্তি নির্দেশ ছাড়া নিজেই কাজ করে, তার পারিশ্রমিক (পাওয়া) কখনও আবশ্যক নয়।

ما ضعیفیم و اوفتادہ بخاک خود چہ دانیم راز حضرت پاک

আমরা দুর্বল আর মাটিতে পড়ে আছি, আমরা মহাপবিত্র খোদার রহস্য নিজ থেকে কীভাবে জানতে পারি?

ما ہمہ ہیچ اوست کامل ذات علمِ ما چوں شود چہ او ہیہات

আমরা সবাই অর্থহীন তিনিই কামেল সত্তা, পরিতাপ! আমাদের জ্ঞান তাঁর জ্ঞানের সমান কীভাবে হতে পারে?

ذات بیچوں کہ نام اوست خدا کے خیال خرد رسد آنجا

সেই অনন্য সত্তা যার নাম হলো খোদা, বুদ্ধি কীভাবে তাঁকে আবিস্কার করতে পারে?

آنکہ او آمدست ازبرِ یار او رساند زدلستاں اسرار

যে বন্ধুর (অর্থাৎ খোদার) পক্ষ থেকে আসে কেবল সে-ই প্রেমাস্পদের গোপন রহস্য সম্পর্কে অবহিত করতে পারে।

آنچہ ما فی الضمیر تُست نہاں کے چو تو داندش دگر انساں

তোমার হৃদয়ে যেসব কথা গোপন রয়েছে, তা অন্য মানুষ তোমার মত কীভাবে জানতে পারে?

پس تو ما فی الضمیر آں دادار مثل او چوں بدانی اے غدّار

সুতরাং খোদার হৃদয়ে যে কথা আছে, হে বিশ্বাসঘাতক! কীভাবে তাঁর মত করে তুই জানতে পারিস?

آنکہ چشم آفرید نور دہد آنکہ دل داد اُو سرور دہد

যিনি চোখ সৃষ্টি করেছেন তিনিই আলো দেন, যিনি হৃদয় দিয়েছেন তিনিই আনন্দ দান করেন।

چشم ظاہر بہ بیں کہ چوں زکرم خالقش داد نیرّاعظم

বাহ্যিক চোখকে দেখ যে, কীভাবে দয়াপরবশ হয়ে এর স্রষ্টা এক বিশাল সূর্য দিয়েছেন।

وز برائے مصالح دوراں گاہ پیدا نمود و گاہ نہاں

পৃথিবীর কল্যাণের জন্য কখনো সূর্যের উদয় ঘটান আর কখনো অস্তমিত করেন।

ایں چنیں ست حال چشم دروں آفتابش کلام آں بے چوں

হৃদয়চক্ষুর অবস্থাও একই, এর সূর্য হলো সেই অনন্য খোদার বাণী।

ہوش دار اے بشر کہ عقلِ بشر دارد اندر نظر ہزار خطر

হে মানুষ! বিবেক-বুদ্ধি খাটাও, মানুষের বুদ্ধির চোখে সহস্র সহস্র ঝুঁকি বা দোষ অন্তর্নিহিত আছে।

سرکشیدن طریق شیطانی ست برخلاف سرشتِ انسانی ست

বিদ্রোহ শয়তানের রীতি আর মানবপ্রকৃতির পরিপন্থী কাজ।

تانہ فضلش رہ تو بکشاید صد فضولی بکن چہ کار آید

যতদিন তাঁর অনুগ্রহ তোমার পথ খুলবে না, তুমি শত বৃথা চেষ্টা করলেও তাতে কী লাভ?

در سرائر چہ جائے استنباط شترے چوں خزد بسَمِّ خیاط

সূক্ষ্ম রহস্যাবলীতে অনুমান বা ব্যাখ্যার সুযোগ কোথায়? সূঁচের ছিদ্রে উট কীভাবে প্রবেশ করতে পারে?

تو نہَ باخبر ازاں کوئے تو نہ دانی جمال آں روئے

তুমি সেই গলি সম্পর্কে অবহিত নও, তুমি সেই চেহারার সৌন্দর্য সম্পর্কে জান না।

خبرے زو بمردماں چہ دہی ماہ نادیدہ را نشاں چہ دہی

সুতরাং এর সম্পর্কে মানুষকে কি সংবাদ দিচ্ছ? যেই চন্দ্রকে তুমি দেখ নি এর চিহ্ন কিইবা বর্ণনা করছ?

سخن یار و سینۂ افسردہ جامۂ زندہ است بر مردہ

বন্ধুর কথা বলা আবার বক্ষ সংকুচিত থাকা, এটি মৃতের গায়ে জীবিত ব্যক্তির জামা পরানোর নামান্তর।

گر بری ریگ را بزرگ و بلند جنبش باد خواہدش افگند

বালির (দেয়ালকে) তুমি যত উঁচুই কর না কেন, বাতাসের একটি ঝাপটা একে নীচে ফেলে দিবে।

ہست ما را یکے کہ ہر فیضاں میشود زاں محافظ تن و جاں

আমাদের এক খোদা আছেন, সকল কল্যাণ তাঁর পক্ষ থেকে উৎসারিত যিনি আমাদের দেহ ও আত্মার সুরক্ষাকারী।

آں خدائے کہ آفرید جہاں ہست ہر آفریدہ را نگراں

সেই খোদা যিনি বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন, তিনিই সকল সৃষ্টির তত্ত্বাবধায়ক।

ہرچہ باید برائے مخلوقات از لباس و خوراک و راہ نجات

সৃষ্টির জন্য যা কিছু প্রয়োজন, যেমন পোশাক, খোরাক ও মুক্তির পথ,

خود مہیا کند بمنّت وجود کہ کریم است و قادر است و وَدود

তিনি অনুগ্রহ ও দয়াবশতঃ তা নিজেই সরবরাহ করেন, কেননা তিনি সম্মানিত, সর্বশক্তিমান ও স্নেহশীল।

چشم خود کن بکشت صحرا باز خوشہ با خوشہ ایستادہ بناز

জঙ্গলের ক্ষেতের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাও, (ফসলের) গুচ্ছ একটি অন্যটির পাশাপাশি গর্বভরে দাঁড়িয়ে আছে।

ہمہ از بہر ماست تا بخوریم درد و رنجِ گرسنگی نہ بریم

এ সবকিছু আমাদের জন্য যেন আমরা তা খেতে পারি, আর ক্ষুধার দুঃখ ও বেদনা যেন সইতে না হয়।

آنکہ از بہر چند روزہ حیات ایں قدر کردہ است تائیدات

সেই সত্তা যিনি ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য, এতসব সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

چوں نہ کردی برائے دار بقا نظرے کن بعقل و شرم و حیا

তিনি চিরস্থায়ী নিবাসের জন্য এমনটি কেন করবেন না? সুতরাং বিবেক-বুদ্ধি ও লজ্জাবোধকে কাজে লাগিয়ে একটু ভেবে দেখ।

سنگ افتد بر ایں چنیں فرہنگ   کہ ز صدق است دور صد فرسنگ

এমন বিবেকবুদ্ধি চুলোয় যাক, যা সত্য হতে শত ক্রোশ দূরে পড়ে আছে।

گرکنی سوئے نفس خویش خطاب   کہ چہ سانت گذر شود بجناب

যদি তুমি নিজেকেই জিজ্ঞেস করো যে, সেই দরবারে তুমি কীভাবে যেতে পার?

خود ندائے بیایدت ز دروں   کہ ز تائید حضرت بیچوں

তাহলে তোমার ভেতর হতে আপনাতেই এই আওয়াজ আসবে যে, অনন্য খোদার সাহায্যেই একাজ হতে পারে।

ناید اندر قیاس و فہم کسے   کہ شود کار پیل از مگسے

কোন ব্যক্তির ধারণা ও বোধবুদ্ধির জগতে একথা আসতেই পারে না যে, হাতির কাজ এক মাছির মাধ্যমে হবে।

پس چہ ممکن کہ ذرۂ امکاں   خود کند کار حق بزور و تواں

তাই এটি কীভাবে সম্ভব হতে পারে যে, সৃষ্টির একটি কণা বা বিন্দু নিজ শক্তিবলে নিজেই খোদার কাজ সাধন করবে?

شان دادار پاک را بشناس   و از چنیں کسر شان او بہراس

পবিত্র খোদার মর্যাদা বুঝ, আর তাঁর এমন অসম্মান করাকে ভয় কর।

خویشتن را شریک او سازی   پیش او دم زنی بانبازی

নিজেকে তুমি তাঁর শরীক বানাচ্ছ, আর তাঁর সামনে তাঁর সমকক্ষ হওয়ার দাবি করছ!

ایں چہ عقل است اے بتر ز دواب   ایں چہ برفہم تو فتاد حجاب

হে পশুর চেয়ে অধম! এটি কেমন বুদ্ধি? তোমার বিবেকবুদ্ধির ওপর এটি কেমন পর্দা পড়ে রয়েছে?

گر کسے گویدت باستحقار   کہ دریں شہر چوں تُو ہست ہزار

যদি তোমাকে কেউ তাচ্ছিল্যবশত বলে যে, তোমার মত এ শহরে সহস্র সহস্র মানুষ রয়েছে,

نیستی از کسے بعقل فزوں   باتو ہم پایہ اند مردم دوں

তুমি বুদ্ধির ক্ষেত্রে কারো চেয়ে এগিয়ে নেই, এমনকি তুচ্ছ তুচ্ছ মানুষও তোমার সমপর্যায়ের।

مشتعل میشوی بہ کیں خیزی   در دل آری کہ خون او ریزی

তুমি উত্তেজিত হয়ে যাও এবং ঘৃণাবশত লাফ দিয়ে ওঠ, তুমি মনে মনে তার রক্ত ঝরাতে চাও।

آنچہ برخود روا نمیداری   چوں پسندی بحضرت باری

যেকথা তুমি নিজের জন্য সঠিক বা বৈধ বলে মনে করো না, সেকথা মহাসম্মানিত খোদার জন্য কীভাবে পছন্দ করতে পার?

چوں پسندی کہ کار ساز امور   ابکمے ہست و از سخن معذور

তুমি কীভাবে একথা বিশ্বাস করলে যে, সকল কাজের যিনি কার্যনির্বাহক, তিনি বোবা এবং কথা বলতে অপারগ?

چوں پسندی کہ واہب ہر نور   بخل ورزیدہ باشد است قصور

তুমি কীভাবে একথা গ্রহণ করলে যিনি সকল আলোর উৎস, তিনি কার্পণ্য করেছেন বা অক্ষমতার শিকার হয়েছেন?

چوں پسندی کہ حضرت غیّور   ہست عاجز چو مُردگان قبور

তুমি কীভাবে একথা গ্রহণ করলে যে, আত্মভিমানী খোদা, কবরের মৃত লোকদের ন্যায় অক্ষম?

بہر تعظیم ہست مذہب و دیں   تُف برآں دیں کہ میکند توہیں

ধর্ম ও দ্বীনের উদ্দেশ্য হলো খোদার মাহাত্মের গান গাওয়া, সেই ধর্মের জন্য আক্ষেপ যা তাঁর অসম্মান করে!

آنکہ او خلق را زبانہا داد   خاک را طاقت بیانہا داد

সে খোদা যিনি সৃষ্টিকে ভাষা দিয়েছেন, যিনি মাটিকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন।

چوں بود گنگ و بے زباں ہیہات   شرمت آید زپاک و کامل ذات

আক্ষেপ! তিনি নিজে কীভাবে বোবা ও ভাষাহীন হতে পারেন? তোমার সেই পবিত্র ও উৎকর্ষ সত্তার সামনে লজ্জা করা উচিত।

جامع ہر کمال و عزّ و جلال   چوں بود ناقص اے اسیرِ ضلال

তিনি সকল শ্রেষ্ঠত্ব, সম্মান ও প্রতাপের সমাহার, হে ভ্রষ্টতার হাতে বন্দি! তিনি কীভাবে দুর্বল হতে পারেন?

ہمہ اوصاف او چو گشت عیاں   چوں بماندے تکلّمش پنہاں

যখন তাঁর সকল গুণাবলী প্রকাশ পেয়ে গেছে, সেখানে তাঁর কথা বলা কীভাবে গোপন থাকতে পারে?

دیدہ آخر برائے آں باشد   کہ بدو مَرد راہ داں باشد

চোখের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো মানুষ যেন এর মাধ্যমে পথের জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

وہ چہ ایں چشم ہست و ایں دیدہ   کہ برو آفتاب پوشیدہ

সেই চোখ ও দৃষ্টি বড় অদ্ভুত, যে সূর্যও দেখে না।

گر بدل باشدت خیال خدا   ایں چنیں ناید از تو استغنا

যদি তোমার হৃদয়ে খোদার ধারণা থাকত, তাহলে তোমার পক্ষ থেকে এতটা ঔদাসীন্য প্রকাশ পেতো না।

از دل و جاں طریق او جوئی   و از سر صدق سوئے او پوئی

তুমি মন-প্রাণ দিয়ে তাঁর পথ সন্ধান করতে, আর নিষ্ঠার সাথে তাঁর দিকে ধাবিত হতে।

ہر کرا دل بود بہ دلدارے   خبرش پرسد از خبردارے

যার হৃদয় কোন প্রেমাস্পদের জন্য নিবেদিত, সে অবশ্যই কোন অবহিত ব্যক্তির কাছে তার খবরাখবর জিজ্ঞেস করে।

گر نباشد لقائے محبوبے   جوید از نزد یار مکتوبے

যদি বন্ধুর সাক্ষাৎ লাভ করতে না পারে, তাহলে অন্ততপক্ষে বন্ধুর পত্রেরই প্রত্যাশী হয়ে থাকে।

بے دلآرام نایدش آرام   گہ بَرویش نظر گہے بکلام

প্রেমাস্পদ ছাড়া সে স্বস্তি পায় না, কখনো তার মুখ দেখে আর কখনো তার কথায় কান পেতে রাখে।

آنکه داری به دل محبت او   نایدت صبر جز به صحبت او

সে ব্যক্তি তোমার হৃদয়ে যার ভালোবাসা রয়েছে, তার সাহচর্য ছাড়া তোমার স্থৈর্য থাকতে পারে না।

فرقت او گر اتفاق افتد   در تن و جانِ تو فراق افتد

যদি দৈবক্রমে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও, তাহলে তোমার দেহ হতে প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

دولت از ہجر او کباب شود   چشمت از رفتنش پُر آب شود

তোমার হৃদয় তার বিরহে জ্বলে-পুড়ে কয়লা হয়ে যায়, প্রেমাস্পদের বিরহে তোমার চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

باز چوں آں جمال و آں روئے   شد نصیبِ دوچشم در کوئے

তখন হঠাৎ করে সেই সৌন্দর্য ও সেই চেহারা কোন গলিতে যখন তোমার দুচোখের সামনে এসে যায়,

دست در دامَنَش زنی مجنوں   که ز نادیدنت دلم شد خوں

তুমি উন্মাদের ন্যায় তাঁর আঁচল আঁকড়ে ধর, (আর বল) যে, তোমাকে দেখতে না পেয়ে আমার হৃদয়ে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ ঘটেছে।

ایں محبت به ذرهٔ امکاں   واز دل افگندهٔ خدائے یگاں

সৃষ্টির একটি বিন্দুর প্রতি এত ভালোবাসা! অথচ এক অনন্য খোদাকে হৃদয় হতে বের করে রেখেছ!

لاابالی فتاده زاں یار   فارغی زاں جمال و زاں گفتار

তুমি সেই বন্ধুর বিষয়ে ভ্রুক্ষেপহীন, তাঁর সৌন্দর্য ও তাঁর সাথে কথাবার্তার বিষয়ে তুমি ভ্রুক্ষেপহীন।

مُردگاں را ہمے کشی به کنار   و از دلآرام زندهٔ بیزار

মৃতদের তুমি কোলে টেনে নাও, অথচ জীবিত বন্ধু হতে তুমি অসন্তুষ্ট!

کس شنیدی که قانع ازیارست   عشق و صبر ایں دوکار دشوارست

তুমি কি এমন কোন প্রেমিকের কথা শুনেছ, যে বন্ধুকে পাওয়ার বিষয়ে অল্পে তুষ্টি প্রকাশ করে! প্রেম ও ধৈর্য এই উভয় কাজ অতিব কঠিন।

آنکہ در قعرِ دل فزود آید دیدہ از دیدنش نیا سایَد

যে হৃদয়ের গভীরে অবতরণ করে, চোখ কেবল তাকে দেখে আরাম বা তৃপ্তি পেতে পারে না।

تو دل خود بہ دیگراں دادہ یکسر از یار فارغ افتادہ

তুমি অন্যদের মন দিয়ে দিয়েছ আর বন্ধুর সাথে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক ছিন্ন করে বসে আছ।

ایں بود حال و طور عاشق زار ایں بود قدر دلبر اے مردار

অন্তরঙ্গ বন্ধুর অবস্থা ও রীতিনীতি কি এমনই হয়ে থাকে? হে শবদেহ! বন্ধুর মূল্য কি এটিই?

عاشقاں را بود ز صدق آثار اے سیہ دل ترا بعشق چہ کار

প্রেমিকদের মাঝে নিষ্ঠার লক্ষণাবলী থেকে থাকে, হে কালিমাপূর্ণ হৃদয়! তোমার প্রেমের সাথে কীইবা সম্পর্ক?

تاز توہستی ات بدر نرَوَد تخم شرک از دل تو بر نرَوَد

যতক্ষণ তোমার অহংকার তোমা হতে দূর না হবে ততক্ষণ শিরকের বীজ তোমার হৃদয় হতে বের হবে না।

پائے سعیت بلند تر نرَوَد تا ترا دودِ دل بسر نرَوَد

চেষ্টার ক্ষেত্রে তুমি ওপরে যেতে পারবে না, যতক্ষণ তোমার হৃদয়ের ধূম্র তোমার মাথা পর্যন্ত পৌঁছবে না।

یار پیدا شود دراں ہنگام کہ تو گردی نہاں زخود بہ تمام

বন্ধু তখন আত্মপ্রকাশ করবে যখন তুমি নিজের আমিত্ব হতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয়ে যাবে।

تا نہ سوزی زسوز و غم نرہی تا نمیری ز موت ہم نرہی

যতদিন তুমি জ্বলবে না, প্রদাহ-জ্বালা ও দুঃখ হতে ততদিন মুক্তি পাবে না, যতদিন মরবে না মৃত্যু হতেও নিস্তার পাবে না।

چیست آں ہر زہ جان و تن کہ نسوخت آتش اندر دلے بزن کہ نسوخت

কতই অকেজো ও অর্থহীন সেই দেহ ও প্রাণ যা (প্রেমে) জ্বলে না, এমন হৃদয়ে আগুন লাগিয়ে দাও যা জ্বলে না।

کلبۂ جسم خود بکُن برباد　　چوں نمی گردد از خدا آباد

তোমার দেহের ঝুপড়িকে ধ্বংস করে দাও, যদি তা খোদার মাধ্যমে আবাদ না হয়।

پائے خود را جداکن از تن خویش　　چوں نگیرد رہے صداقت پیش

তোমার দেহ হতে নিজের পা বিচ্ছিন্ন করে ফেল, যদি তা সত্যের পথ অবলম্বন না করে।

ہیچ چیزے چو ذات بیچوں نیست　　جگرے خوں شود کزوخوں نیست

কোন জিনিসই সেই অনন্য সত্তার মত নয়, সে হৃদয় ধ্বংস হোক যা তাঁর প্রেমে রক্তক্ষরণ করে না।

گنجہائے جہاں فدائے نگار　　بہ ز صد گنج خاک پائے نگار

সারা বিশ্বের ধনভাণ্ডার সেই প্রেমাস্পদের জন্য নিবেদিত, প্রেমাস্পদের পদধূলি শত শত ধনভাণ্ডারের চেয়ে শ্রেয়।

ہرچہ از دست او رسد آں بہ　　خار او از ہزار بستاں بہ

যা কিছু তাঁর হাতের মাধ্যমে লাভ হয় তা অতি উত্তম, তাঁর একটি কাঁটা সহস্র বাগান হতে শ্রেয়।

ذلت از بہر او ز عزت بہ　　قلت از بہر او ز کثرت بہ

তাঁর খাতিরে লাঞ্ছনা সহ্য করা সম্মান লাভ করা হতে শ্রেয়, তাঁর জন্য দারিদ্র বরণ করা সম্পদশালী হওয়া হতে শ্রেয়।

مُردن از بہر او حیات مدام　　صد لذائذ فدائے آں آلام

তাঁর সন্তুষ্টির জন্য মৃত্যু বরণ করা চিরস্থায়ী জীবন লাভের নামান্তর, সেসকল কষ্টের সামনে শত শত আনন্দ তুচ্ছ।

اے کہ در کوئے دلستاں گذری　　باوفا باش ور زجاں گذری

হে সে ব্যক্তি যে প্রেমাস্পদের গলি অতিক্রম করছ, প্রাণের বিনিময়ে হলেও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করো।

صادقانے کہ طالب یار اند　　جانفشاناں ز بہر دلدار اند

সেসকল নিষ্ঠাবান ব্যক্তিবর্গ যারা বন্ধুর সন্ধানী, তারা বন্ধুর জন্য জীবন উৎসর্গ করে দেয়।

گر نیابند راہ آں دلبر از غمش جاں کنند زیر و زبر
যদি তারা সেই প্রেমাস্পদ পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা খোলা না পায়, তাহলে তার বেদনায় নিজেদের প্রাণকে ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখে ঠেলে দেয়।

از دلآرام رنگ میدارند و از رہ نام ننگ میدارند
তারা বন্ধুর রঙে রঙিন হয়ে যায়, আর খ্যাতিকে তারা প্রত্যাখ্যান করে।

لذّت خود بدرد می بینند حسن در روئے زرد می بینند
তারা নিজেদের আনন্দ বেদনার মাঝে দেখে, তারা সৌন্দর্য দেখে ফ্যাকাসে চেহারায়।

تو کہ چوں خر بہ گل فرومانی ہمت آں یلاں چہ میدانی
তুমি এমন ব্যক্তি যে গাধার মত কাদায় ফেঁসে আছ, সেসকল বীরদের বীরত্ব সম্পর্কে (তুমি) কীইবা জান?

سہل باشد حکایت از غم وورد داند آں کس کہ رو بغمہا کرد
দুঃখ বেদনার কাহিনী শোনানো সহজ, কিন্তু (এটি) সে-ই জানে, যে দুঃখের অভিজ্ঞতা রাখে।

آفرین خدا بر آں جانے کہ ز خود شد برائے جانانے
সেই প্রাণের ওপর খোদার রহমত বর্ষিত হোক, যে বন্ধুর খাতিরে নিজের আমি-কে বিসর্জন দিয়েছে।

منزل یار خویش کرد بہ دل و از ہواہا رمید صد منزل
হৃদয়ে বন্ধুর ঠিকানা বানিয়েছে আর হীন কামনা-বাসনা হতে শতশত মাইল দূরে চলে গেছে।

از خودی در شد و خدا را یافت گم شد و دست رہنما را یافت
আত্মগর্ব পরিহার করেছে আর খোদাকে পেয়ে গেছে, নিজেকে হারিয়ে পথপ্রদর্শকের হাত লাভ করেছে।

توچہ یابی کہ غافلے زیں راہ و از جلال خدا نۂ آگاہ
সুতরাং তুমি কীইবা পেতে পার যেখানে তুমি এই পথ সম্পর্কেই উদাসীন, আর খোদার প্রতাপ সম্পর্কেও অবহিত নও?

ہمہ کارت بعقلِ خام افتاد ہمہ سعی تو ناتمام افتاد

তোমার সকল কাজ কাঁচা বুদ্ধির সাথে সম্পৃক্ত থেকে গেল আর তোমার সকল চেষ্টা ব্যর্থই থেকে গেল।

ہمچو طوطی ہمیں سخن یادست کہ بشر عاقلست و آزادست

তোতার মত কেবল একথাই মনে আছে যে, মানুষ বুদ্ধিমান ও স্বাধীন।

اے کہ دیوانۂ پئے اموال وہ کہ در کارِ دیں چنیں اہمال

হে সে ব্যক্তি, যে অর্থ ও সম্পদের পিছনে উন্মাদের ন্যায় ছুটছে, পরিতাপ! ধর্মের কাজে এত উদাসীন?

روئے دل را بجانب دیں کن فکر آخر غم نخستیں کن

হৃদয়কে ধর্মমুখী করো আর পরকালের চিন্তাকে নিজের জন্য সবচেয়ে অগ্রগণ্য চিন্তার বিষয় করে নাও।

حصر تو برقیاس در ہمہ حال ہست بر حُمقِ تو یک استدلال

তোমার সর্বাবস্থায় অনুমানের ওপর নির্ভর করা, তোমার অর্বাচিনতারই একটি প্রমাণ বইকি।

تا نہ فرماں رسد باعلانے چوں شود کس مطیع فرمانے

যতক্ষণ প্রকাশ্যে কোনো নির্দেশ না আসবে, ততক্ষণ কীভাবে কেউ নির্দেশ পালনকারী হতে পারে?

تا نہ حکمے شود ظہور پذیر چوں توانی شدن مطیع امیر

যতক্ষণ নির্দেশ জানা না যাবে ততক্ষণ তুমি আদেশদাতার প্রতি কীভাবে আনুগত্য প্রকাশ করতে পারে?

تا نہ گردد کسے ز حق مامور کُفر و ایماں چساں کنند ظہور

যতক্ষণ কোনো ব্যক্তি খোদার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট না হবে, মানুষের বিশ্বাস ও অবিশ্বাস কীভাবে প্রকাশ পেতে পারে?

تا نیاید اشارتے زنگار چہ برآید زدست عاشق زار

যতক্ষণ সেই প্রেমাস্পদের পক্ষ থেকে কোন ইঙ্গিত না আসবে, অন্তরঙ্গ বন্ধুর হাতে কীইবা সাধিত হতে পারে?

فرق در سرکش و مطیع خدا   جز بحکمش چساں شود پیدا

খোদার বিদ্রোহী ও অনুগতদের মাঝে যে পার্থক্য রয়েছে, তাঁর নির্দেশ ছাড়া তা কীভাবে প্রকাশ পেতে পারে?

شرط تعمیل حکم چوں حکم است   پس وجودش بجو نخست اے مست

নির্দেশ মানার যেহেতু পূর্বশর্ত হলো নির্দেশের উপস্থিতি, সুতরাং হে উন্মাদ! প্রথমে নির্দেশটি সন্ধান করো।

ورنہ ایں دعوئِ غلط بگذار   کہ رَوَم زیر حُکم آں دادار

নতুবা এই ভ্রান্ত দাবি পরিহার করো যে, আমি খোদার নির্দেশের অধীনে চলছি।

خود تراشیدن از خودی فرماں   آں نہ حکم خداست اے نادان

হে নির্বোধ! নিজের আত্মম্ভরিতার বশবর্তী হয়ে বানানো (ধর্মীয়) নির্দেশ খোদার নির্দেশ হতে পারে না।

نہ بعرف است و نے بعقل روا   کہ شود ظنّ خویش حکم خدا

প্রচলিত রীতিনীতি ও বিবেকবুদ্ধি তথা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে এটি বৈধ নয় যে, কারও নিজের ধারণা খোদার নির্দেশ বিবেচিত হবে।

حکم او آں بود کہ او فرمود   پس چو فرمود خود نگہ کُن زود

তাঁর নির্দেশ সেটি যা তিনি নিজেই দেন, সুতরাং যখন তিনি নির্দেশ দেন তাৎক্ষণিকভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করো।

کہ ازیں شد ثبوت وحی خدا   شد ضرورت مسلّمش زیں جا

কেননা এ কথার মাধ্যমে খোদার ওহীর প্রমাণ পাওয়া যায়, একই প্রমাণের মাধ্যমে এর আবশ্যকতা প্রমাণিত হয়।

گر دہندت بصیرت دینی   در گمانہا ہلاک خود بینی

যদি তোমার ধর্মীয় অন্তর্দৃষ্টি লাভ হতো তাহলে তুমি ধারণার মাঝে নিজের ধ্বংস দেখতে।

بنگر آخر بعقل و فکر و قیاس   کہ خرد را نہ محکم است اساس

একটু বুদ্ধি-বিবেক, চিন্তা ও অনুমানকে কাজে লাগিয়ে চিন্তা করো যে, বুদ্ধির ভিত্তি দৃঢ় নয়।

تا نباشد رفیق او دگرے نایدش از رہ یقیں خبرے

যতক্ষণ অন্য কেউ তার সাথি না হবে ততক্ষণ নিশ্চিত বিশ্বাসের কোনো সংবাদ তার কাছে আসবে না।

تا نہ بینی بدیدہا جائے یا نہ یابی خبر ز بینائے

যতক্ষণ তুমি কোন স্থান নিজ চোখে না দেখবে বা যে দেখেছে তার কাছে সংবাদ না পাবে,

خود نگوید ترا خرد زنہار کہ چنیں دارد آں مکاں آثار

ততক্ষণ বুদ্ধি একা তোমাকে আদৌ বলবে না যে, এই হলো অমুক স্থানের চিহ্ন।

پس چہ ممکن کہ دم زند بمعاد کہ چنیں اند آں دیار و بلاد

তাহলে এটি কীভাবে সম্ভব হতে পারে যে, (বুদ্ধি) পরকাল সম্পর্কে মুখ খুলবে, সেই দেশ ও স্থান এমন বা এমন।

ایں چہ حمق ست و ایں چہ بے راہی کہ بجہل است لاف آگاہی

এটি কেমন নির্বুদ্ধিতা ও এটি কেমন ভ্রষ্টতা যে, তুমি অজ্ঞ হয়ে জ্ঞানের বুলি আওড়াও।

چوں روی از قیاس خود بر ہے کہ ندیدی بعمر خویش گہے

তুমি শুধু অনুমানের ভিত্তিতে একটি পথে কীভাবে চলতে পার যা তুমি সারা জীবন কখনও দেখ নি।

چوں شد از عالم دگر خبرت مادرت دیدہ بود یا پدرت

তুমি পরজগতের সংবাদ কীভাবে জেনে গেলে, তোমার মা তা দেখেছে নাকি তোমার পিতা?

ور ندیداست کس چہ ساں دانی کم خرام اے دَنی بہ عریانی

কেউ যদি না দেখে থাকে তাহলে তুমি কীভাবে জানতে পারলে? হে নীচ! উলঙ্গ হয়ে এত গর্ব কোরো না।

توکہ داری زِ انبیاء انکار ایں ہمہ کوری است و استکبار

তুই, যে নবীদের অস্বীকার করিস, এসব তোর অন্ধত্ব ও অহংকার।

یک نظر کن بہ فطرت انساں   کہ ندارند جوہرے یکساں

মানবপ্রকৃতির ওপর একটিবার দৃষ্টিপাত কর্, অর্থাৎ তারা সবাই সমান যোগ্যতা রাখে না।

مختلف اوفتاد ہر بشرے   کس بخیرے فزود کس بشرے

প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি হতে ভিন্ন, কেউ পুণ্যে এগিয়ে থাকে কেউ পাপে।

پس چویک بیش و دیگر است کمی   ہم چنیں در قبول فیض ہمی

যেহেতু একজন বেশি অন্যজন কম, তাই ঐশীকৃপা গ্রহণের ক্ষেত্রেও সবাই এমনই।

خود نگہ کن کنوں ز صدق و صفا   کہ چہ ثابت ہمیں شود زیں جا

এখন স্বচ্ছতা ও নিষ্ঠার সাথে নিজেই দেখ যে, এর মাধ্যমে কী প্রমাণ হয়?

شب تاراست و خوف بیش از بیش   از سر خود روی مده سرِ خویش

রাত অন্ধকারাচ্ছন্ন আর ভয় অনেক বেশি, গর্ব করে নিজের প্রাণ বিনষ্ট কোরো না।

پسِ دیوار چوں نمے دانی   چوں بدانی غیوب ربانی

দেয়ালের পেছনে কী আছে তা জান না, তাই ঐশী রহস্যের কথা কীভাবে জানতে পার?

در شگفتم کہ باچنیں نقصاں   ازچہ برعقل مے شوی نازاں

আমি আশ্চর্য হই এত ক্রুটি সত্ত্বেও, তুমি বিবেকবুদ্ধি নিয়ে কেন এত গর্ব করছ?

ایں چہ عقل است وایں چہ معرفت است   اینچہ قہر خدا دو چشمت بست

এটি কেমন বুদ্ধি ও কেমন তত্ত্বজ্ঞান, খোদার এ কেমন ক্রোধ বা শাস্তি যা তোমার দুচোখ বন্ধ করে দিয়েছে?

ایں جہانت چو عید خوش افتاد   واں وعید خدا نداری یاد

এই পৃথিবী তোমার কাছে ঈদের মত পছন্দ হয়ে গেছে, অথচ খোদার শাস্তির প্রতিশ্রুতি তোমার মনে নেই।

بشنو از وحیٔ حق چہ گوید راز   از جناب وحید و بے انباز

খোদার ওহীর প্রতি কর্ণপাত করো যে তা এক-অদ্বিতীয় ও অংশীদারিত্বমুক্ত খোদার পক্ষ থেকে কী রহস্য উন্মোচন করছে?

کاں خِرَدہا کہ در دل عُقَلاست   ہمہ یک ذرۂ ز آتش ماست

অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীদের হৃদয়ে এই যে বুদ্ধি রয়েছে এর পুরোটাই আমাদের অগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র।

آں کلام خدا نہ برفلک است   تا بگوئی کہ ہست دور از دست

খোদার বাণী আকাশে নয় যে, তুমি বলবে তা আমাদের নাগালের বাইরে।

یا بگوئی کہ کار ہست محال   برفلک رفتنم کدام مجال

বা তুমি বলবে যে, এটি অসম্ভব কাজ! আমি আকাশে যাবো– এটা কীভাবে সম্ভব?

نے بزیر زمیں کلام خدا   تابگوئی کہ چوں خزم آنجا

খোদার বাণী মাটির নিচে নয় যে, তুমি বলবে আমি সেখানে কীভাবে প্রবেশ করব?

چوں ز قعر زمیں بروں آرم   خود چنیں طاقتے نمی دارم

মাটির গভীর (বা পাতাল) হতে একে কীভাবে বের করবো? আমি নিজে এমন শক্তি রাখি না।

قطع عُذر تو کردہ داور پاک   نورِ عرش آمداست برسر خاک

পবিত্র খোদা তোমার অজুহাত খণ্ডন করছেন, আরশের জ্যোতি পৃথিবীতে এসে গেছে।

گر ترا رحم آں یگاں بکشد   دولتت سوئے او عناں بکشد

যদি তোমাকে সেই এক-অদ্বিতীয় খোদার রহমত আকর্ষণ করে, তাহলে তোমার সৌভাগ্য তোমাকে তাঁর দিকে নিয়ে যাবে।

اللہ اللہ چہ ریخت از انوار   ہست رشح دگر در آں گفتار

আশ্চর্যের বিষয়, কত অসাধারণ জ্যোতি তা বিচ্ছুরিত করেছে, সেই বাণীতে আরো (বহু) বিবিধ কল্যাণরাজি রয়েছে।

جہل گردد زدیدنش یکسو رو دہد صد کشائشے زاں رو

একে দেখলে অজ্ঞতা দূর হয়ে যায়, এর দর্শনে শতশত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

نور بار آورد تلاوت او عالمے زیر بار منّت او

এর তিলাওয়াত জ্যোতির ফল বয়ে আনে, বিশ্বজগৎ এর অনুগ্রহের কাছে ঋণী।

چشم بد دور ایں چہ ہست جمال ہست یک چشمۂ ز آب زلال

খোদা একে নোংরা চোখ হতে রক্ষা করুন, এই সৌন্দর্য কতইনা অভাবনীয়! এটি যেন স্বচ্ছ ও পবিত্র পানির একটি ঝর্ণা।

تا جہاں رسم دلبری بنہاد کس چو او دلبری ندارد یاد

যখন থেকে পৃথিবীতে প্রেমের ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এমন বন্ধুর কথা কারো কল্পনায়ও আসেনি।

آں شعاعے کزو شداست عیاں کس ندیدہ ز مہر و مہ بجہاں

সেই জ্যোতি যা তা থেকে প্রকাশিত হয়েছে, এই পৃথিবীতে কেউ তা সূর্য ও চন্দ্রেও দেখে নি।

چند برعقل خام نازکنی چہ کنم تا تو دیدہ بازکنی

তুমি আর কতটা নিজের দুর্বল বুদ্ধি নিয়ে অহংকার করতে থাকবে, তোমার চোখ খোলার জন্য আমি আর কী করতে পারি?

نقص خود بنگر و کمال خدا ذِلت خویشتن جلال خدا

তুমি তোমার ত্রুটি দেখ আর অপর দিকে খোদার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি তাকাও, নিজের লাঞ্ছনা দেখ আর পক্ষান্তরে খোদার প্রতাপ দেখ।

از رہ عقل راہ ربّ مجید کس ندید است و کس نخواہد دید

বুদ্ধির জোরে মহাসম্মানিত খোদার পথ কেউ কখনো দেখেও নি আর কেউ দেখবেও না।

اندر آنجا کہ سوختن باید چوں رہے از قیاس بکشاید

এমন স্থান যেখানে জ্বলার প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে কেবল অনুমানের মাধ্যমে কীভাবে রাস্তা খুলতে পারে?

تا نشد وحی حق مدد فرما   تا نیاوُرد بو نسیم صبا

যতক্ষণ খোদার ওহী সাহায্য করে নি, যতক্ষণ বসন্তের বাতাস সুগন্ধি বহন করে আনে নি,

عقل را زاں چمن نہ بود خبر   طائر فکر بود سوختہ پر

ততক্ষণ বুদ্ধি সে বাগান সম্পর্কে অবহিত ছিল না, চিন্তা-প্রণিধানরূপী পাখির পাখনা জ্বলা অবস্থায় ছিল।

آں صبا نکہتے زیار آوُرد   تا خرد نیز رو بکار آورد

সেই বসন্ত বাতাস বন্ধুর পক্ষ থেকে একটি সৌরভ এনেছে, যার ফলে বিবেকবুদ্ধিও কাজ করা আরম্ভ করেছে।

بارہا آب خود نگار آورد   تا نخیل قیاس بار آوُرد

বন্ধু স্বয়ং বারংবার পানি সিঞ্চন করেছেন, যতক্ষণ না অনুমানের বৃক্ষ ফলবহন করেছে।

وقت عیش است و موسم شادی   تو چہ در سوگ و ماتم افتادی

এটি উপভোগ ও আনন্দের ঋতু, তুমি কেন শোক ও হাহুতাশের মাঝে পড়ে আছ।

تند بادے بخواہ از دادار   تا خس و خار تو برد یک بار

খোদা তা'লার কাছে এমন একটি ঝড় যাচনা কর যেন তোমার সব খড়কুটো একেবারেই উড়ে যায়।

در خور و مہ شکے نگیرد راہ   تو ز دلدار خویش دیدہ بخواہ

সূর্য ও চন্দ্র সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না, তুমি তোমার প্রেমাস্পদের কাছে দেখার জন্য দৃষ্টি শক্তি যাচনা কর।

گمرہی تا دمے کہ سرتابی   چوں بجوئی ز صدق دل یابی

তুমি ততদিন পথভ্রষ্ট থাকবে যতদিন বিদ্রোহী থাকবে, যখন নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয় নিয়ে সন্ধান করবে তখন পেয়ে যাবে।

نیستی طالب حقیقت راز   بس ہمیں مشکل است اے ناساز

হে বিবেকবুদ্ধিহীন! তুমি সত্যের রহস্য অন্বেষণকারী নও।

بروجودش ز صنعت استدلال ایں مجاز است نے چو اصل وصال

খোদার সত্তা সম্পর্কে শিল্পের বা সৃষ্টির আলোকে যুক্তি প্রদান করা রূপক বিষয়, খোদার সাক্ষাৎলাভের মূল মাধ্যম নয়।

وصلش از آلۂ مجازی نیست باز کن دیدہ جائے بازی نیست

রূপক মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ হয় না; চোখ খোল! এটি খেলাতামাশা নয়।

گر بر آتش دو صد جگر سوزی نیستت از قیاس پیروزی

যদি তুমি আগুনে দুই শত (বহু) হৃদয়কে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে ফেল, তবুও অনুমানের জোরে সাফল্য লাভ করতে পারবে না।

خبرے نیستت ز جانا نہ مے زنی ہرزہ گام کورانہ

তুমি প্রেমাস্পদের সম্পর্কে কোন জ্ঞানই রাখ না, আর অন্ধের মত বৃথা পদচারণা করছ।

آں یقینے کہ بخشدت دادار چوں قیاس خودت نہد بکنار

যেই বিশ্বাস তোমাকে খোদা দান করেন, তোমার বুদ্ধি কীভাবে তোমার মাঝে তা সৃষ্টি করতে পারে?

آں یکے از دہان دلدارے نکتہ ہائے شنید و اسرارے

এমন একজন যে বন্ধুর মুখে গুঢ় কথা ও রহস্যের কথা শুনে,

و آں دگر از خیال خود بگماں پس کجا باشد ایں دو کس یکساں

আর দ্বিতীয় সে যে, নিজের ধ্যানধারণার বশবর্তী হয়ে কিছু অনুমান করছে! সুতরাং এ দুজন কীভাবে সমান হতে পারে?

اے کہ مغرور راہ مظنونی تو نہ عاقل کہ سخت مجنونی

হে সেই ব্যক্তি যে ধারণার ভিত্তিতে অহংকারে লিপ্ত, তুমি বুদ্ধিমান নও বরং চরম উন্মাদ।

آں خدا را کزوست منّت ہا بشمری زیر منّت عقلاء

সেই খোদা যিনি সকল অনুগ্রহ-অনুকম্পার উৎসস্থল, তুমি তাঁকে বুদ্ধিমানদের অনুগ্রহ-অনুকম্পাভাজন জ্ঞান করছ!

ایں خدائے عجیب در دل تست   کہ چنیں است زار و ماندہ و سُست

এই এক অদ্ভুত খোদা তোমার হৃদয়ে আসন গেড়ে রেখেছে, যে দুর্বল, নিরুপায় ও অলস।

تانہ از عاقلاں مدد ہا یافت   نتوانست سوئے خلق شتافت

যতক্ষণ বুদ্ধিমানদের পক্ষ থেকে সে সাহায্যপ্রাপ্ত হয় নি, ততক্ষণ সে সৃষ্টির দিকে আসতে পারে নি?

کے پسند و خِرد کہ آں اکبر   شہرتے یافت از طُفیلِ بشر

বিবেক একথা কীভাবে মানতে পারে যে, সর্বমহান খোদা সকল খ্যাতি লাভ করেছেন মানুষের সাহায্যে।

شبِ تارست و دشت و بیم دواں   چوں بخوابی بغفلت اے ناداں

অন্ধকার রাত, জঙ্গল এবং হিংস্র জন্তুর ভয়, সুতরাং তুমি কীভাবে ঔদাসীন্যের ঘোরে পড়ে ঘুমাচ্ছ হে নির্বোধ?

خیز و برحال خود نگاہ بکن   خطر راہ بہ بیں و آہ بکن

উঠ আর নিজের অবস্থার ওপর দৃষ্টিপাত কর, পথের বিপদাবলীর ওপর দৃষ্টি রাখ আর আক্ষেপ করো।

خیز و از نفس خود بپرس نشاں   کہ چہ خواہد مراتب عرفاں

উঠ আর নিজের নফসকে বা নিজেকে একথা জিজ্ঞেস করো, তত্ত্বজ্ঞানের কেমন মর্যাদা সে চায়?

مے تپد از برائے رفع حجاب   یا قیاسش بس است در ہر باب

তা কি পর্দা দূরীভূত হওয়ার জন্য ছটফট করছে, নাকি সকল বিষয়ে নিজের অনুমানকেই যথেষ্ট মনে করে?

افلا تبصرون☆ گفت خدا   خیز و در نفس چو تعطّش ہا

☆ وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۭ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ

খোদা বলেছেন আফালা তুবসিরুন, উঠ! আর প্রবৃত্তির পিপাসা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করো।

تو اسیری بصد ہزار خطا ہر خطائے بتر ز اژدرہا

তুমি লক্ষ ভ্রান্তির দাসত্বে শৃঙ্খলিত, প্রতিটি ভুল
অজগর থেকেও ভয়াবহ।

عجب ایں کوری است و بے بصری کہ ازیں کار خام بے خبری

এই অন্ধত্ব ও দৃষ্টিহীনতা বড় আশ্চর্যজনক, অর্থাৎ তুমি এই কাঁচা বিষয়
সম্পর্কেও অজ্ঞ।

سخن راست است نے زخطاست تو نہ فہمی سخن خطا اینجاست

কথা সত্য, মিথ্যা নয়, তুমি কথা বুঝ না
এখানেই ভ্রান্তি।

سِرّ سربستہ و ورائے وراء کہ کشاید بدون وحی خدا

গুপ্ত-প্রচ্ছন্ন এবং মহাপর্দার অন্তরালে আচ্ছন্ন রহস্য, খোদার ওহী ছাড়া কে বা
কী উন্মোচন করতে পারে?

راز ذات نہاں کہ گوید باز جز خدائے کہ ہست مَحرم راز

সেই গোপন সত্তার রহস্য কে উন্মোচন করতে পারে, সেই খোদা ব্যতিত যিনি
গোপনীয়তা সম্পর্কে অবহিত?

مشت خاکے فتادہ است براہ تند بادے بجوید از درگاہ

মানুষ একমুষ্ঠি মাটিমাত্র- যে রাস্তায় পড়ে আছে সে খোদার কাছে একটি
ঝড়ের দাবি করে।

تو نہ فہمی ہنوز ایں سخنم در دلت چوں فرو شوم چہ کنم

তুমি এখনও আমার একথা বুঝ না, আমি তোমার হৃদয়ে কেন প্রবেশ করবো?
আমি কী করব?

اے دریغا کہ دل ز درد گداخت درد مارا مخاطبے نشناخت

হায়! আমাদের হৃদয় দুঃখ-বেদনার আতিশয্যে জ্বলে গেল, কিন্তু আমাদের
ব্যথাকে তবুও সম্বোধিত ব্যক্তি বুঝলো না।

اے خورِ روئے یار زود برآ کہ دل آزرد از شب یلدا

হে বন্ধুর মুখের সূর্য! তাড়াতাড়ি উদিত হও, কেননা দীর্ঘ অন্ধকার রাতের
কারণে হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত।

یک نگاہے بس است در دیں ہا کاش دیدے کسے ز خوف خدا

ধর্মীয় বিষয়ে এক দৃষ্টিই যথেষ্ট,
হায়! যদি খোদাভীতির সাথে কেউ দেখত।

آشکار است کفر و ایماں ہم گفتمت آشکار و پنہاں ہم

অবিশ্বাস স্পষ্ট বিষয় আর বিশ্বাসও, একথা আমি তোমাকে তা প্রকাশ্যেও বলেছি আর গোপনেও।

ترک خوف خدا و بدعملی ایں دو چیز اند تخم تیرہ دلی

খোদাভীতি ছেড়ে দেয়া আর অপকর্ম করা, এই দুটো জিনিস কালো হৃদয়ের জন্য বীজস্বরূপ।

ورنہ روئے نگار نیست نہاں ہر حجابے ز تست اے بیجاں

নতুবা বন্ধুর চেহারা গোপন নয়, হে মৃত-হৃদয়! সকল পর্দা তোমার নিজেরই সৃষ্ট।

از رگ جاں قریب تر یارست ہرزہ از تو درازی کار است

বন্ধু জীবনশিরারও অধিক নিকটে, তোমার অর্থহীন কার্যকলাপই কাজকে দীর্ঘ করেছে।

ہر کہ برخواست از خودی یکبار خود نشیند بکار او دادار

যে সম্পূর্ণভাবে আত্মম্ভরিতা পরিহার করে, খোদা স্বয়ং তার কাজ নিজের হাতে নেন।

حیّ و قیّوم و قادر ست نگار تو مپندار مردہ اے مردار

সেই বন্ধু হলেন চিরঞ্জীব জীবনদাতা, চিরস্থায়ী স্থায়িত্বদাতা এবং সর্বশক্তিমান;
হে আধ্যাত্মিকভাবে মৃত ব্যক্তি! তুমি তাকে মৃত মনে কোরো না।

میل رفتن گرست جانب یار جانب صدق را عزیز بدار

যদি তোমার বন্ধুর দিকে যাওয়ার আগ্রহ থাকে, তাহলে সততার প্রতি আকর্ষণকে প্রিয়জ্ঞান করো।

در شکے ہست خیز و تجربہ کن تا شکوکت بر آورم از بُن

যদি কোন সন্দেহ থাকে তাহলে ওঠো এবং পরীক্ষা কর, যেন আমি মূল থেকে তোমার সন্দেহকে দূর করে দিতে পারি।

گر خرد پاک از خطا بودے ہر خرد مند باخدا بودے

যদি বুদ্ধি ভ্রান্তি-মুক্ত হতো, তাহলে সকল বুদ্ধিমান খোদাপ্রেমিক হয়ে যেতো।

کس نرست از ذہول و سہو و خطا جز خداوند عالم الاشیاء

কেউ ভুলভ্রান্তি হতে মুক্ত নয়, সর্বজ্ঞানী সম্মানিত খোদা ছাড়া।

نظرے کن زروئے استقرا گر کسے رستہ است بازنما

যুক্তি ও অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করো, কেউ এসব কথা থেকে মুক্ত থাকলে তুমিই বলে দাও।

ورنہ باز آ زِ شورش و انکار جیفۂ کذب را مخور زنہار

নতুবা বিশৃঙ্খলা ও অস্বীকার করা হতে বিরত হও, আর মিথ্যার পচা-গলা লাশকে আদৌ ভক্ষণ কোরো না।

آخرت باخدا فتد سروکار خود نگہ کن بترس زاں دادار

অবশেষে তোমাকে খোদার সামনে উপস্থিত হতে হবে, তুমি নিজেই ভাবো আর সেই ন্যায়বিচারক খোদাকে ভয় করো।

در خرابات اوفتاد دلے خودبخود چوں بروں شود زگلے

যে হৃদয় মদের আস্তানায় পড়ে রয়েছে, সে নিজেই সেই চোরাবালি হতে কীভাবে বের হতে সক্ষম?

رو بہ باطل نہادۂ باز آ دل بہ بد روئے دادۂ باز آ

তুমি মিথ্যার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছ, বিরত হও; এক কুৎসিত চেহারার প্রেমে মত্ত হয়েছ, বিরত হও।

در مزابل فتادۂ باز آ ایں کجا ایستادۂ باز آ

তুমি আস্তাকুড়ে পড়ে রয়েছ, ফিরে আস; কোথায় দাঁড়িয়ে আছ? অনুশোচনা করো।

آخر اے لافِ زن ز عقل و خرد ہوش کُن پامَنہِ بروں از حدّ

হে সেই ব্যক্তি যে বিবেকবুদ্ধির বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছ! কিছুটা হলেও বিবেক খাটাও আর পা সীমার বাইরে রেখো না।

دم زدن در خیالہائے محال ہست شوریدہ مَشرَبی و ضلال

অসম্ভব বিষয়াদির দাবি করা উন্মাদনা ও ভ্রষ্টতা।

ہر کہ رخت افگند بویرانہ می نماید بتر زِ دیوانہ

যে ব্যক্তি বিরাণভূমিতে আপন-নিবাস গড়ে, সে উন্মাদের চেয়েও অধম।

چوں چنیں سرزنی ز راہ صواب چہ نہ دانی کہ آخر است حساب

তুমি পুণ্যের পথ বা সঠিক পথকে কেন এভাবে অস্বীকার করো?
তুমি কি জান না অবশেষে হিসাব দিতে হবে?

پائے تو لنگ منزل تو دراز تر سَمت چوں رَسی ازیں تگ وتاز

তোমার পা ল্যাংড়া আর তোমার গন্তব্য দূরে, দৌঁড়-ঝাপ করে তোমার গন্তব্যে পৌঁছার বিষয়ে আমি শঙ্কিত।

خود چنیں است فطرت انساں کہ چو بیند کہ مشکل است گراں

মানবপ্রকৃতি হলো যখন সে দেখে যে, সমস্যা বড় কঠিন,

اول از زور و تاب و طاقت خویش می کند سعی و جہد بیش از بیش

প্রথমে নিজের শক্তিসামর্থ্য ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করে সর্বোচ্চ চেষ্টা সাধনা ও পরিশ্রম করে।

تا مگر کار بستہ بکشاید زیر بار سپاس کس ناید

যেন এভাবে থেমে থাকা কাজ আরম্ভ হয়ে যায়, আর যেন সে কারো অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী না হয়।

چوں بہ بیند کہ کار رفت از دست رسن اختیار رفت از دست

যখন দেখে যে, কাজ তার শক্তির বাইরে চলে গেছে আর নিয়ন্ত্রণের রজ্জু হাত থেকে ফসকে গেছে,

رو نہد سوئے کوچۂ یاراں مددے جوید از مددگاراں

তখন নিজের বন্ধুদের গলির দিকে মুখ করে, আর সাহায্যকারীদের কাছে সাহায্য যাচনা করে।

زور دست برادراں جوید نزد ہر کارداں ہمی پوید

নিজের ভাইদের হাতের শক্তি সন্ধান করে, সকল জ্ঞানীর কাছে ছুটে যায়।

چوں بماند زہر طرف ناچار نالد آخر بدرگہِ دادار

যখন সবদিক থেকে নিরাশ হয়ে যায়, অবশেষে খোদার কাছে কাঁদে।

نعرہ ہا میزند بحضرت پاک و از تضرع جبیں نہد برخاک

পবিত্র খোদার দরবারে আহাজারি করে আর কাকুতিমিনতির সাথে কপাল মাটিতে ঠেকায়।

در خود بندد و بگرید زار کاے کشایندۂ رہِ دشوار

নিজের দ্বার বন্ধ করে বড় কাকুতি-মিনতির সাথে ক্রন্দন করে যে,
হে সমস্যার সমাধানকারী!

گنہ من بہ بخش و پردہ بہ پوش تانہ دشمن زند بشادی جوش

আমার পাপ ক্ষমা করো আর দুর্বলতা ঢেকে রাখ
যেন শত্রু অতি আনন্দিত না হয়।

چوں چنیں فطرت بشر افتاد زاں سہ گونہ صفت کہ کردم یاد

যেখানে মানুষের প্রকৃতি এমনই, অর্থাৎ তার মাঝে সেই তিনটি বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান যার কথা আমি উল্লেখ করেছি।

آں حکیمش ز لطف بے پایاں حسب فطرت بداد ہم ساماں

প্রজ্ঞাবান সেই সত্তা অনন্ত দয়ার সাথে, তাকে তার প্রকৃতি অনুসারে সব উপকরণ দান করেছেন।

ازپئے جہد خویش عقلش داد راہ فکر و قیاس و خوض کشاد

নিজের চেষ্টা-সাধনার জন্য খোদা তাকে বুদ্ধি দিয়েছেন, প্রণিধান, যুক্তি ও ভাবনার পথ তার জন্য উন্মোচন করেছেন।

و از پئے کار با ہمیں امداد رحم در قلب یک دگر بنہاد

আর পারস্পরিক সাহায্যের জন্য পরস্পরের হৃদয়ে দয়ামায়া সৃষ্টি করেছেন।

از شعوب و قبائل و اقوام کرد کار نظام و ربط تمام

দল, গোত্র ও জাতি বানিয়ে তিনি একটি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন আর সম্পর্ককে পরিপূর্ণতা দিয়েছেন।

و از پئے حاجت فیوض خدا کرد الہام را ز رحم عطا

আর ঐশী কল্যাণধারার দাবি পূরণের জন্য, খোদা নিজ করুণায় এলহাম দান করেছেন।

تا رَسَد کار آدمی بکمال تا میسر شود ہمہ آمال

যেন মানুষের কর্ম উৎকর্ষতার পর্যায়ে পৌঁছে, যেন সকল বাসনা পূর্ণ হয়।

تا بحدِّ یقین رسد تعلیم زاں دوگونہ شود رہ تفہیم

যেন শিক্ষা দৃঢ় বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছে যায়, আর বুঝার পথ যেন এর মাধ্যমে দ্বিগুণ প্রশস্ত হয়ে যায়।

زاں دوگونہ مناہج تلقیں می کشاید رہ حصول یقیں

উপদেশের এই দুটো পথের কল্যাণে দৃঢ় বিশ্বাস অর্জনের পথ খুলে যায়।

ہر طبیعت بحسب فہم و خیال می براید بداں زچاہ ضلال

সকল প্রকৃতি নিজের বোধ-বুদ্ধি ও ধারণানুসারে এর মাধ্যমে ভ্রষ্টতার কূপ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে।

غرض آں میل فطرتے کہ خدا کرد در فطرت بشر پیدا

মোটকথা সেই প্রকৃতিগত প্রবণতা, যা খোদা তা'লা মানুষের প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।

آں ہمی خواست وحی ربّانی نظرے کن بغور تا دانی

তাও ঐশী এলহাম যাচনা করছিল, তুমি গভীরভাবে চিন্তা করো যেন বুঝতে পার।

فطرتت چوں فتادہ است چناں چوں کشی سر ز فطرت اے ناداں

তোমার প্রকৃতিই যেখানে এমন, তাই হে নির্বোধ কেন প্রকৃতি হতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ?

اقتضائے طبیعتِ انساں کہ نہاد ست ایزد منّان

মানবপ্রকৃতির দাবি যা অনুগ্রহশীল খোদা তার প্রকৃতিতে অন্তর্নিহিত রেখেছেন।

گہ بشر را کشد بسوئے قیاس تا نہد کار را بعقل اساس

কখনো কখনো সে মানুষকে অনুমানের দিকে আকৃষ্ট করে, যেন সে কাজের ভিত্তি যুক্তির ওপর রাখে।

گاہ دیگر کشد بمنقولات تا بیار آمد از بیان ثقات

কখনো কখনো (সেই দাবি তাকে) আকর্ষণ করে রেওয়ায়েতের দিকে যেন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গের কথার ভিত্তিতে সে মনের শান্তি পেতে পারে।

زینکہ آرام قلب و اطمینان جز باخبار صادقاں نتواں

কেননা হৃদয়ের আরাম ও প্রশান্তি সত্যবাদীদের ঘটনাবলী ছাড়া লাভ হতে পারে না।

نیز چوں واجب است در تعلیم کہ بقدر خرد بوَد تفہیم

এছাড়া শিক্ষার জন্য যেহেতু আবশ্যক হলো (ছাত্রের) বুদ্ধি অনুসারে শেখানো বা বোঝানো;

لا جرم راہ کشادہ اند دوتا تا رَسَد ہر طبیعتے بخدا

তাই নিঃসন্দেহে দুটো পথ খুলে দেয়া হয়েছে যেন সকল প্রকৃতির মানুষ খোদা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।

تا ذکی و غبی و اشرف و دون رہ بیابند سوئے آں بیچون

যেন বুদ্ধিমান, নির্বোধ, ভদ্র ও ইতর সেই অনন্য খোদা পর্যন্ত (পৌঁছার) পথ পায়।

دیگر ایں است نیز ہم برہان بر ضرورات وحی آں رحمان

সেই রহমানের ওহীর আবশ্যকতার স্বপক্ষে আরও একটি প্রমাণ এটিও,

کہ چنیں شہرت خدائے یگان ہرگز از جہد عقلہا نتواں

অর্থাৎ অনন্য খোদার যে এতটা প্রসিদ্ধি বা পরিচিতি, কেবল বুদ্ধির জোরে তা সম্ভব ছিল না।

گر نہ گفتے خدا اَنَا الْمَوْجُوْد   چوں فتادے جہاں برش بسجود

যদি খোদা নিজেই না বলতেন যে, আমি বিদ্যমান, তাহলে সারা বিশ্ব তাঁর সামনে কেন সেজদাবনত হতো?

ایں ہمہ شور ہستی آں یار   کہ ازو عالم ست عاشق زار

সেই বন্ধুর সত্তা সম্পর্কে এই যে হইচই, তা দেখে মনে হয় সারা পৃথিবী তাঁর অন্তরঙ্গ প্রেমিক।

خود بیِنداخت آں خدائے جہاں   نہ بشر کرد بر سرش احساں

এই (হইচই) সেই বিশ্ব-প্রতিপালক নিজেই সৃষ্টি করেছেন, মানুষ তাঁর প্রতি কোন অনুগ্রহ করেনি।

اے دریغ ایں چہ آدمی زادند   کز خدا درخودی بیفتادند

পরিতাপ! এরা কেমন মানুষ যে, খোদাকে ছেড়ে আত্মম্ভরিতায় নিমগ্ন হয়েছে?

عقل چوں شد چو فیض وحی نہ بود   دیدہ را زِ آفتاب ہست وجود

যখন ওহীর কল্যাণধারাই ছিল না সেখানে বুদ্ধি কেত্থেকে এসে গেল? সূর্যের কারণেই চোখের অস্তিত্ব বা চোখ দেখতে পায়।

او اگر نورِ خود نہ بخشیدے   چشم ما خود بخود چساں دیدے

যদি তা (অর্থাৎ সূর্য) নিজের আলো না দিত তাহলে আমাদের চোখ নিজ থেকে কীভাবে দেখতে সক্ষম হতো?

بلبل از فیض گل سخن آموخت   منکر ازوے ہماں کہ چشم بدوخت

ফুলের কল্যাণে বুলবুলি কথা বলতে শিখেছে, এটিকে কেবল সেই অস্বীকার করতে পারে, যে চোখ বন্ধ করে রাখে।

ہمہ عالم گواہ آلائش   اَ بلَہَ منکر ز وحی و القائش

সারা পৃথিবী তাঁর (অর্থাৎ খোদার) নেয়ামতের সাক্ষী, কিন্তু নির্বোধ তাঁর ওহী ও এলকার অস্বীকারকারী।

مہر پاکاں بجان خود بنشاں   تا شوی جان من ہم از پاکاں

নিজ হৃদয়ে পবিত্রদের ভালোবাসাকে আসীন কর, যেন, হে আমার প্রিয়, তুমিও পবিত্রদের অন্তর্ভুক্ত হতে পার?

این خرد جمله خلق میدارند ناز کم کن که چوں تو بسیار اند

এই বুদ্ধি পুরো সৃষ্টিরই রয়েছে, একটু কম দম্ভ করো, তোমার মত অনেকেই রয়েছে।

چارهٔ ما بغیر یار کجا ما کجائیم و عقل زار کجا

বন্ধু ছাড়া আমাদের কীভাবে চলতে পারে, আমাদের গুরুত্বইবা কি আর আমাদের দুর্বল বুদ্ধিইবা কোন্ কাজের।

زہر فرقت چشی و ناکامی باز منکر ز وحی و الہامی

তুমি বিরহের বিষ সেবন করছ আর (তুমি) ব্যর্থ,
তা সত্ত্বেও ওহী ও এলহামকে অস্বীকার করছ।

جان تو برلب از نخوردن آب باز از آبِ زندگی رو تاب

পানি পান না করার কারণে প্রাণ তোমার ওষ্ঠাগত,
তবুও জীবনসুধার প্রতি এই বিমুখতা!

کور ہستی و کِیں بدیدہ وراں وہ چہ داری شقاوت و خسران

তুমি নিজে অন্ধ কিন্তু দৃষ্টিবানদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো,
তোমার দুর্ভাগ্য ও ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য পরিতাপ!

داروئے دردِ دِل نہ فطنتِ ماست آں بدار الشفائے وحی خداست

হৃদয়ের বেদনার ঔষধ আমাদের বুদ্ধি নয়, তা খোদার ওহীর আরোগ্য নিকেতনে নিহিত।

نشود عین زر تصور زر زر ہمانست کوفتد بہ نظر

স্বর্ণের ধারণা কখনও স্বর্ণে পরিণত হয় না, স্বর্ণ তাই যা চোখের সামনে দেখা যায়।

ہست برعقل منّت الہام کہ ازو پخت ہر تصوّرِ خام

বুদ্ধির ওপর এলহামের অনুগ্রহ হলো, এর কারণে সকল দুর্বল ধারণা দৃঢ়তা লাভ করেছে।

آں گماں برد و ایں نمود فراز   آں نہاں گفت و ایں کشود آں راز

সেটি কেবল ধারণা করে আর এটি প্রকাশ্যে দেখিয়ে দেয়, সেটি গোপনে কথা বলে আর এটি সেই রহস্য প্রকাশ করে।

آں فرو ریخت ایں بکف بسپرد   آں طمع داد و ایں بجا آورد

সে (অর্থাৎ বুদ্ধি) ফেলে দিয়েছে এ (অর্থাৎ এলহাম) হাতে দিয়েছে, সে প্রলুব্ধ করেছে আর এ বাস্তবে দিয়েছে।

آنکہ بشکست ہر بتِ دلِ ما   ہست وحیٔ خدائے بے ہمتا

তা, যা আমাদের হৃদয়ের সকল প্রতিমা চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে তা সে খোদার ওহীই তো যার কোন সমকক্ষ নেই।

آنکہ مارا رُخِ نگار نمود   ہست الہام آں خدائے ودود

তা, যা আমাদেরকে প্রেমাস্পদের চেহারা দেখিয়েছে, তা সেই স্নেহশীল খোদার এলহামই।

آنکہ داد از یقین دل جامے   ہست گفتار آں دلارامے

তা, যা আমাদেরকে আন্তরিক বিশ্বাসের পেয়ালা পান করিয়েছে, তা সেই প্রেমাস্পদের কথোপকথনইতো।

وصل دلدار و مستی از جامش   ہمہ حاصل شدہ ز الہامش

বন্ধুর সাক্ষাৎ লাভ আর তার পানপাত্রের মাধ্যমে নেশাগ্রস্ত হওয়া, এর সবই তাঁর এলহামের মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছে।

وصل آں یار اصل ہر کامیست   وانکہ زیں اصل غافل آں خامیست

সেই বন্ধুর সাথে সম্পর্কবন্ধনই সকল কাজের মূল, যে এই মূল সম্পর্কে উদাসীন সে অপক্ক।

بے عطیّات ما ہمہ بے زاد   بے عنایات ما ہمہ برباد

তাঁর দান ছাড়া আমরা সবাই নিঃস্ব, আর তাঁর দান ছাড়া আমরা সবাই ধ্বংসপ্রাপ্ত।

এখানে আমরা এ কথা লেখাও যুক্তিযুক্ত মনে করি যে, ঐশী বাণীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের লেখা উল্লিখিত বক্তব্য যাতে লাহোরের ব্রাহ্মসমাজীদের উচ্চপদস্থ এক কর্মকর্তা পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রি স্বজাতির ওপর কোন প্রভাব ফেলতে না পারে সে উদ্দেশ্যে তিনি এ সত্যের বিরুদ্ধে কিছুটা বাধা সৃষ্টির প্রয়াস নেয়। তিনি এ বিষয়ে যথেষ্ট হাত-পা ছুঁড়েছেন আর প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে একটি পর্যালোচনাও লিখেছেন। কিন্তু প্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে যে, 'সত্যের জয় চিরদিনই হয়'। সে অনুসারে সত্যের সূর্যকে কেউ গোপন করলেও তা গোপন থাকতে পারে না। তাই বুদ্ধিমানদের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, পণ্ডিত সাহেবের সকল চেষ্টার এছাড়া আর কোন ফলই বের হয় নি যে, পণ্ডিত সাহেব সত্য গ্রহণের প্রতি কিছুটা ঘৃণাই পোষণ করেন। যাহোক, যদিও পণ্ডিত সাহেবের এই লেখা আদৌ এমন নয় যা খণ্ডনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে, বরং আমাদের পূর্বের প্রবন্ধ পাঠ করাই এর খণ্ডনের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু পাছে পণ্ডিত সাহেব যাতে কোন আক্ষেপ না করেন বা তার কতক সাথি আমাদের নীরবতাকে দুর্বলতা ভাবার আত্মপ্রসাদে যেন নিমগ্ন না হয় তা ভেবে পণ্ডিত সাহেবের লেখা যতই গুরুত্বহীন হোক না কেন বিচারকদের সামনে এর স্বরূপ তুলে ধরা আমাদের কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে।

অতএব স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, পণ্ডিত সাহেব আমাদের উপস্থাপিত যুক্তিপ্রমাণের প্রত্যুত্তরে তার পর্যালোচনায় একথার ওপর জোর দিয়েছেন যে, যে দৃষ্টিকোণ থেকে ঐশী গ্রন্থকে এলহামী মানা হয়, যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা অসম্ভব ও অগ্রহণযোগ্য আর প্রকৃতিবাদীদের আইনের পরিপন্থি হওয়ার কারণে তা আদৌ সঠিক নয়! অর্থাৎ পণ্ডিত সাহেবের ভদ্র দৃষ্টিতে সে এলহামের আদৌ কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না যাকে ঐশীবাণী বলা হয়, যা কেবল প্রজ্ঞাময় ও অদৃশ্যে জ্ঞাত খোদার পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ হয় এবং যা তাঁর পবিত্র সত্তার ন্যায় সম্পূর্ণরূপে সকল সন্দেহ-সংশয় ও ভুলভ্রান্তি হতে মুক্ত হয়ে থাকে। অধিকন্তু খোদার বাণীতে যে, সকল সর্বোৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত তা সেসকল গুণে সুসজ্জিত হয়ে থাকে, অর্থাৎ যেভাবে খোদা অদৃশ্যে জ্ঞাত, সেই বাণীও অদৃশ্যের সংবাদসংবলিত হয়ে থাকে। যেভাবে খোদা প্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞানী, সেই বাণীও প্রজ্ঞা এবং জ্ঞানসংবলিত হয়ে থাকে। যেভাবে খোদা ভুলভ্রান্তি, মিথ্যা বলা ও ভুলে যাওয়া এবং বিস্মৃত হওয়া থেকে

পবিত্র, সেই বাণীও সেসব বিষয় হতে পবিত্র হয়ে থাকে এবং এতে মানবীয় ধ্যানধারণারও কোন হস্তক্ষেপ থাকে না। এছাড়া কোন প্রকার পবিত্রতা ও শুচিতা অর্জন করে বা অন্য কোন কৌশল ও পরিকল্পনা করে সেই এলহামের দ্বার নিজের জন্য নিজেই খুলে দিবে এবং অদৃশ্য জ্যোতি, গুপ্ত বিষয়াদি ও স্বর্গীয় রহস্যাবলী সম্পর্কে যখন ইচ্ছা নিজেই জেনে যাবে তা মানুষের সাধ্যের বাইরে। কেননা যদি এমনটি সম্ভব হতো তাহলে মানুষও খোদার মতো প্রতিটি অণু-পরমাণুর জ্ঞান রাখত এবং কোন কিছু তার দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারত না। এছাড়া যেসব তথ্যের মাধ্যমে তার সম্মান প্রকাশ পায় এবং তার বিপদাবলী দূর হয় সেসকল তথ্য সে নিজেই পূত ও পবিত্র হওয়ার কারণে অর্জন করে নিত এবং কখনো কোনোভাবে দুঃখ ও কষ্ট তাকে স্পর্শ করতে পারতো না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, পণ্ডিত সাহেব ঐশী বাণী সম্পর্কে নিজের তাবৎ অস্বীকৃতি ও হঠকারিতা সত্ত্বেও আমাদের সেসকল যুক্তি ও প্রমাণকে খণ্ডন করে দেখাননি যা ঐশী বাণীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সুনিশ্চিত ও মোক্ষম; বরং সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাতই করেন নি। এটি স্পষ্ট যে, যেখানে আমরা ঐশী বাণীর প্রয়োজনীয়তা এবং এর অস্তিত্বের সত্যতা সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রমাণাদি লিপিবদ্ধ করেছি, বরং দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু এলহামও উপস্থাপন করেছিলাম। এমন পরিস্থিতিতে পণ্ডিত সাহেব যদি সত্যের সন্ধানী ও সত্যভাষী হয়ে বিতর্ক করতেন তাহলে তার জন্য আমাদের প্রমাণাদি খণ্ডন করে দেখানো ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

অধিকন্তু আমরা নিজ গ্রন্থে এলহামের আবশ্যকতা ও এলহামের অস্তিত্বের যে প্রমাণ উপস্থাপন করেছি সেই প্রমাণকে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রমাণের মাধ্যমে তার খণ্ডন ও নিশ্চিহ্ন করা উচিত ছিল। কিন্তু পণ্ডিত সাহেব খুব ভালোভাবে জানেন যে, এই অধম এ কথা ব্যাখ্যা করে উপর্যুপরি দুবার দুটি রেজিস্ট্রি পত্র পাঠিয়েছে যে, খোদা অবশ্যই নিজে কিছুসংখ্যক বান্দার সাথে বাক্যালাপ ও কথোপকথন করে থাকেন আর তাঁর বিশেষ বাণীর মাধ্যমে এমন জিনিস ও এমন জ্ঞান সম্পর্কে নিজের বিশেষ বান্দাদের অবহিত করেন যার সুমহান মর্যাদা পর্যন্ত সেই চিন্তাধারা পৌঁছুতে পারে না যার উদ্দেশ্য ও উৎস হলো মানুষের সীমাবদ্ধ ধ্যানধারণা। এই ঐশী রীতি সম্পর্কে তাঁর অন্তরে যদি কোন দ্বিধা থাকে তাহলে কয়েকদিন নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সাথে এই অধমের কাছে অবস্থান করে সেই সত্য যা তাঁর দৃষ্টিতে অসম্ভব এবং প্রকৃতির নিয়মের

পরিপন্থি তা স্বচক্ষে দেখে নিক। এরপর সত্যবাদীদের রীতি অনুসারে সে পথ অবলম্বন করা উচিত যা অবলম্বন করা সত্যবাদীর সত্যবাদিতা ও অভ্যন্তরীণ স্বচ্ছতার শর্ত। কিন্তু পরিতাপ! পণ্ডিত সাহেব সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন সত্ত্বেও প্রকৃত সন্ন্যাসীর প্রথম লক্ষণকেই সত্য সন্ধানীদের ন্যায় গ্রহণ বা অবলম্বন করেননি, বরং এর উত্তরে নিজের পত্রে কুরআন শরীফ সম্পর্কে এমন কিছু শব্দ লিখেছেন যা একজন সত্যিকার খোদাভীরুর কলম থেকে আদৌ বের হতে পারে না। মনে হয় পণ্ডিত সাহেব ঐশী সত্যকে কেবল অস্বীকারই করেন না বরং এর প্রতি তার শত্রুতাও রয়েছে। নতুবা যেখানে খোদার উক্তির সত্যতা ও এর অস্তিত্বের পক্ষে যৌক্তিক ও বাস্তব সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে একটি মহান প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সকল প্রকার কুমন্ত্রণার মূল উৎপাটন করা হয়েছে, অধিকন্তু সকল প্রকার আশ্বাস ও নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য এই অধম সদা প্রস্তুত, সেখানে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও শত্রুতা ছাড়া আর কী কারণ থাকতে পারে যা পণ্ডিত সাহেবকে সত্য গ্রহণে বিরত রাখে? এখন এটিও দেখুন! আমাদের গবেষণার বিপরীতে পণ্ডিত সাহেব কী কী আপত্তি উত্থাপন করেন? সর্বপ্রথম তিনি যা বলেন তা হলো, ব্রাহ্মণরা এলহামে বিশ্বাস করে কিন্তু কেবল এর আসল অর্থে আর ততটা যতটা প্রকৃতিগত রীতির সাথে তা সম্পর্কযুক্ত। প্রকৃতিগত রীতির ব্যাখ্যা তিনি এভাবে করেছেন যে, তা কোনো নির্দিষ্ট উক্তি বা কথা নয় যা অলৌকিক বিষয় হিসেবে কোনো মানুষের হৃদয়ে অবতীর্ণ হবে আর এমন সব বিষয়সংবলিত হবে যা মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে, বরং তা কেবল সাধারণ চিন্তাধারা যা মর্যাদানুসারে খোদার পক্ষ থেকে মানুষের হৃদয়ে জাগ্রত হয়েই থাকে। কেননা খোদার আত্মা পরম উৎকৃষ্ট, হাজের-নাজের (সর্বত্র বিরাজমান, সর্বদ্রষ্টা) এবং সকল কারণের আদি কারণ হওয়ার সুবাদে প্রতিটি কণা এবং ধার্মিক মানুষের মাঝে কাজ করে থাকে।

অতএব যে ব্যক্তি যতটা খোদার নেয়ামত ও তাঁর নৈকট্যের ক্ষুৎপিপাসা রাখে, অভ্যন্তরীণ জীবনকে যতটা পবিত্র রাখে যতটা খোদার কাছে আত্মসমর্পণ করে, যতটা ঈমান ও বোঝার শক্তিকে স্বচ্ছ রাখে ততটাই সে এই প্রকৃতিগত কল্যাণ থেকে লাভবান হয়। এই কল্যাণের সূচনা সেদিন হয়ে যায় যেদিন মানুষের জন্ম হয়। এটি অভ্যন্তরীণ এলহাম যা মানুষের আত্মায় হয়। তাই মানুষের আত্মা খোদার জীবন্ত এলহামী গ্রন্থ। এরপর বলেন, যেহেতু মানুষের সাথে রিপুও লেগেই আছে, তাই মানুষের হৃদয়ে যেসকল চিন্তাভাবনার উদয়

হয় যার নাম ব্রাহ্মণদের দৃষ্টিতে এলহাম বা এলকা তা পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য নয়, বরং ব্রাহ্মণরা এই সকল চিন্তাধারার সত্যায়নের জন্য যা সত্য-মিথ্যার যেকোনোটি হতে পারে, নৈতিক শক্তিগুলোকে মাপকাঠি আখ্যা দিয়ে থাকে। অধিকন্তু যে শক্তির মাধ্যমে এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাকে আকল বা বুদ্ধি বলে; এটি পণ্ডিত সাহেবের বক্তব্যের সারকথা। স্পষ্টতই পণ্ডিত সাহেবের সেসব বক্তব্যের এই অর্থই প্রকাশ পায় যে, যেসকল বিষয়ের নাম পণ্ডিত সাহেব ও তার ভাইয়েরা এলহাম রাখেন তা কেবল সাধারণ চিন্তাধারা যা সাধারণ মানুষের হৃদয়ে সচরাচর বিরাজ করে আর পণ্ডিত সাহেবের স্বীকারোক্তি অনুসারে তা ভুলভ্রান্তির আশংকা থেকেও মুক্ত নয়। কিন্তু ঐশী গ্রন্থাবলীতে যে এলহামকে খোদার বাণী, আল্লাহ্‌র ওহী ও মহাসম্মানিত খোদার সাথে কথোপকথন আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে সেই জ্যোতি সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন বিষয় যা মানবীয় চিন্তাধারা ও শক্তিসামর্থ্যের ঊর্ধ্বে এবং অতীব মহান। সেই স্বর্গীয় জ্যোতি হলো একটি অদৃশ্য ধ্বনি যাতে মানবীয় চিন্তাধারার কোন ভূমিকা নেই। সে সম্পর্কে পণ্ডিত সাহেব এই বিশ্বাস রাখেন যে, যেহেতু তা প্রকৃতির পরিপন্থি এবং অলৌকিক বিষয়, তাই তা অসম্ভব। খোদা কোনো মানবের প্রতি আপন কোনো বাণী অবতীর্ণ করবেন, তা কোনোভাবে বৈধ নয়। বরং এলহাম সেসকল ধ্যানধারণার নাম যা সচরাচর কোনোকিছু জন্ম নেয়ার আদলে মানব-হৃদয়ে জাগ্রত হয়ে থাকে, যা কখনো সত্য, কখনো মিথ্যা, কখনো সঠিক, কখনো ভ্রান্ত আর কখনো পবিত্র বা কখনো অপবিত্র হয়ে থাকে। সেসবে এমন কোন বিশেষত্ব থাকে না যা মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে, বরং তা মানুষের শক্তির গণ্ডির ভিতর সৃষ্টি হয়, মানব প্রকৃতি হলো এর উৎস।

কিন্তু পরিতাপ! এ কয়েকটি লাইন লিখতে গিয়ে পণ্ডিত সাহেব অনর্থক নিজের সময় নষ্ট করেছেন। পণ্ডিত সাহেব যদি এ লেখাটি কলমস্থ করার পূর্বেই এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা ২১২, ২১৩, ২১৪ ও ২১৫ (অর্থাৎ মূল উর্দু বইয়ের –অনুবাদক) কিছুটা মনোযোগ সহকারে পাঠ করতেন তাহলে তাঁর সামনে স্পষ্ট হয়ে যেতো যে, এ ধরনের চিন্তাধারা খোদার বাণী আখ্যায়িত হয় না। এসব ধ্যানধারণা হলো 'আল্লাহ্‌র সৃষ্টি' যা মানব প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। খোদার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ খোদার বাণী খোদার নির্দেশ যা খোদার দান এবং একটি ঐশী বিষয়। খোদা যেভাবে স্বীয় সত্তায় ভুলে যাওয়া, ভুল করা, মিথ্যা, অপ্রয়োজনীয় বিষয়াদি, সকল দুর্বলতা ও হীন কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত,

অনুরূপভাবে তাঁর বাণী সকল ভুলভ্রান্তি, মিথ্যা ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় এবং সকল প্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি ও হীন কথাবার্তা থেকে মুক্ত হওয়া আবশ্যক। কেননা যে বাণী পবিত্র ও সর্বোৎকৃষ্ট উৎস হতে উদ্ভূত এর জন্য আদৌ বৈধ নয় যে, এতে কোন প্রকার অপবিত্রতা বা ত্রুটি বিদ্যমান থাকবে। সেই বাণীর সেসব শ্রেষ্ঠত্বে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়া আবশ্যক যা সর্বশক্তিমান, সর্বোৎকৃষ্ট, পবিত্র ও অদৃশ্যে জ্ঞাত সত্তার বাণীতে বিদ্যমান থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু পণ্ডিত সাহেব নিজেই স্বীকার করেন, যে বিষয়ের নাম তিনি এলহাম রেখেছেন তা আদৌ সন্দেহ, ভুলভ্রান্তি, দুর্বলতা এবং অযোগ্যতার কলুষ থেকে মুক্ত নয়, বরং তাঁর বক্তব্যের সারকথা হলো, তার এলহাম সদা মানুষকে অবিশ্বাস ও ঈমানহীনতায় নিপতিত করে আসছে।

যেমন, তিনি প্রথম যুগের লোকদের কখনো এটি বলেছেন যে, তাদের খোদা হলো বৃক্ষ আর কখনো খোদা বানিয়েছেন পাহাড়পর্বতকে, কখনো তুফানকে, কখনো পানিকে, কখনো অগ্নিকে, কখনো নক্ষত্ররাজিকে, কখনো চাঁদকে, আবার কখনো খোদা বানিয়ে বসেছেন সূর্যকে। বস্তুতঃ এভাবে বিভিন্ন খোদার প্রতি তাদের আবর্তিত ও প্রত্যাবর্তিত করতে থাকেন আর যুক্তিবুদ্ধিও সেই এলহামের সত্যায়ন করা অব্যাহত রাখে! অবশেষে দীর্ঘকালের অবসানে যেন অল্প কিছুকাল পূর্বেই এলহাম ও বুদ্ধি প্রকৃত খোদার খবর পেল। কিন্তু আমরা বলবো যেখানে ইতিপূর্বে সহস্র সহস্রবার পণ্ডিত সাহেবের পিতা-পিতামহের কাল্পনিক এলহাম ও তাঁদের বুদ্ধি বিভিন্ন প্রকার প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়েছে আর খোদাকে চেনার ক্ষেত্রে এক জিনিসকে ভিন্ন জিনিস ধরে নিয়েছে, সেখানে পণ্ডিত সাহেব এখন কী করে নিশ্চিত হতে পারেন যে, তাঁর কাল্পনিক এলহাম ও আনুমানিক কথাবার্তা ভুলভ্রান্তি হতে মুক্ত রয়েছে? এটি কি সম্ভব নয় যে, এতেও কিছুটা প্রতারণার মিশ্রণ থাকতে পারে? যেখানে পণ্ডিত সাহেবের কাল্পনিক এলহাম যুগের সূচনা থেকে সদা ভুলভ্রান্তিতে নিমজ্জিত অবস্থায় চলে আসছে, সেখানে এর বিশ্বাসইবা কী থাকল? বস্তুত পণ্ডিত সাহেবের এলহামের স্বরূপ ভালোভাবে জানা হয়ে গেছে আর তাঁর স্বীকারোক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, তিনি কেবল ভিত্তিহীন ধ্যানধারণার নাম এলহাম রেখেছেন। এখন জানা কথা, যে বিষয়ের ওপর প্রায়সময় মিথ্যারই প্রাধান্য থাকে তা সত্য বোঝার মাধ্যম বা উপায় কীভাবে পরিগণিত হতে পারে? মানুষের নিজেরই ধ্যানধারণা, যার নাম পণ্ডিত সাহেবের কথা

অনুসারে ‘এলহাম’ তা মানুষকে কী করে ভুলভ্রান্তি হতে রক্ষা করতে পারে? সেই তমসাচ্ছন্ন ধ্যানধারণা কীভাবে তাকে সকল অন্ধকার থেকে বের করে পূর্ণ বিশ্বাসের আলো পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে? পণ্ডিত সাহেবের কথা অনুসারে এসব অগোছালো ধ্যানধারণা অগোছালো হয়েও এলহাম হিসেবে পরিচিত আর পবিত্র যুগ হিসেবে পরিচিত প্রারম্ভিক যুগে এমন লোকদের দ্বারা পাথরের পূজা করিয়েছে এবং চন্দ্র ও সূর্যকে তাদের দৃষ্টিতে খোদা সাব্যস্ত করেছে। বলা যায়, পণ্ডিত সাহেবের স্বীকারোক্তি অনুসারে যারা এলহামের কল্যাণরাজিতে সর্বপ্রথম সিক্ত হয়েছে ও এলহামপ্রাপ্তদের সভাপতি বা শিরোমণি ছিল, অধিকন্তু খোদা সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞান লাভের সবচেয়ে বেশি ক্ষুৎপিপাসা রাখত, যারা আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে নিজেদের কোন খোদা নিযুক্ত করার বাসনা রাখত আর নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনকে অনেক পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখত, কেননা তখনো পৃথিবীতে পাপের প্রসার হয় নি আর যুগ ছিল সাধুতার, তারা নিজেদের খোদার হাতে সোপর্দ করার মনমানসিকতা রাখত, সে কারণেই নিজে থেকে তাদের হৃদয়ে এক আন্দোলন বা ঔৎসুক্য জাগে যে, এসো! নিজেদের জন্য কোন খোদা নিযুক্তি করি– কোথাও যেন খোদাশূন্য না থেকে যাই। ঈমান ও ব্যুৎপত্তি ছিল স্বচ্ছ, সেকারণেই তো একটি সূক্ষ্ম কথা তাদের মাথায় আসে আর বসে বসেই খোদার সন্ধান আরম্ভ করে দেয়।

সুতরাং পণ্ডিত সাহেবের কথা অনুসারে এমন পবিত্র মানুষ, যারা পরমেশ্বরের প্রজ্ঞাপূর্ণ সৃষ্টির প্রথম নমুনা ছিল আর আধুনিক যুগের হরেক রকম বিদ্বেষ ও দূষণ হতে যারা মুক্ত এবং আন্তরিক প্রেরণার সাথে বিশ্বস্রষ্টার সন্ধানে যারা মগ্ন ছিল, নিজেদের নতুন জন্ম এবং স্রষ্টার নতুন কাজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যারা রাখত, তাদের এলহাম ও বুদ্ধির শ্রী দেখুন! তারা পাথর ও পাহাড়ের পূজা আরম্ভ করে দেয় আর চন্দ্র-সূর্য, অগ্নি ও বাতাসকে স্বীয় স্রষ্টা ভেবে বসে! তাহলে পণ্ডিত সাহেবের এমন এলহাম ও বুদ্ধি যা সূচনাতেই অন্যদের সর্বস্ব কেড়ে নেয় তা কী করে অন্যদের প্রকৃতিকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পারে যারা ঔদাসীন্য ও শত শত অমানিশার যুগে জন্মগ্রহণ করেছে? কেননা এরা যে শ্রেণির প্রজাতি, এর নতুন সৃজন সম্পর্কেই তারা কোন জ্ঞান রাখে না। এছাড়া জগৎ প্রেমের আতিশয্য ও বিভিন্ন প্রকার নৈরাজ্যে লিপ্ত হয়ে এরা জীবনকে পবিত্র রাখে না এবং খোদার নৈকট্য লাভের ক্ষুৎপিপাসাও তাদের নেই, বরং

তারা জাগতিক শাসকদের নৈকট্যের কাঙাল। অতএব পবিত্র যুগে যেখানে পণ্ডিত সাহেবের কাল্পনিক এলহামের এমন প্রভাব পড়েছে যে, সৃষ্টিকে মানুষ খোদা ভেবে বসেছে, সেখানে এই তমসাচ্ছন্ন যুগে মানুষ খোদাকেই অস্বীকার করে বসবে– এটিই এমন এলহামের আবশ্যকীয় ফলাফল হওয়া উচিত। বস্তুত পণ্ডিত সাহেব যে এমন কল্পনার নাম এলহাম রাখেন, যার ফলে তার নিজের স্বীকারোক্তি অনুসারে আদি থেকেই ভুলভ্রান্তি হয়ে আসছে তা পণ্ডিত সাহেবের নিছক ধারণা বা এভাবেও বলতে পার যে, তাঁর কাল্পনিক এলহাম সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা ও ভ্রান্ত। যদিও মানবীয় চিন্তাধারার আদি কারণও আল্লাহ্ তালাই আর খোদা-ই হৃদয়ে কথা সঞ্চার করেন এবং বিবেকবুদ্ধিকে সঠিক খাতে পরিচালিত করেন।

কিন্তু সেই এলহাম যা সত্যিকার অর্থে খোদার পবিত্র বাণী এবং তাঁর শব্দ ও ওহী হয়ে থাকে তা মানুষের স্বভাবজ ও সাধারণ চিন্তাধারার অতীত এবং ঊর্ধ্বে, তা মহাসম্মানিত খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এবং তাঁর ইচ্ছায় উৎকৃষ্ট মানবের হৃদয়ে অবতীর্ণ হয় আর খোদার বাণী হওয়ার সুবাদে ঐশী কল্যাণরাজিতে সুরভিত হয়, খোদার শক্তি বা কুদরত নিজের সাথে রাখে এবং খোদার পবিত্র সত্তা নিজের মাঝে ধারণ করে। **লা রাইবা ফীহ্** (অর্থাৎ এতে কোনো সন্দেহ নেই) হওয়া এর সত্তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে। যেভাবে সৌরভ আতরের অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে একইভাবে তা খোদার অস্তিত্বের সুদৃঢ় ও অকাট্য প্রমাণও হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষের নিছক নিজের ধারণা সেই মর্যাদা লাভ করতে পারে না। কেননা মানুষের মাঝে সৃষ্টিগত দুর্বলতা রয়েছে আর মানবীয় চিন্তাধারায় সেই দুর্বলতার প্রাধান্য বিরাজমান। সর্বশক্তিমানের ঝর্ণাধারা হতে যা উৎসারিত হয় তা ভিন্ন বিষয় আর যা কিছু মানব প্রকৃতির সৃষ্ট তা ভিন্ন বিষয়। পণ্ডিত সাহেবের উচিত হবে ৩য় খণ্ডের ২১২-২১৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পুনরায় দেখা যেন তিনি খোদার বাণী ও মানুষের চিন্তাধারার পার্থক্য বুঝতে পারেন। বুদ্ধি নিয়ে পণ্ডিত সাহেবের বারংবার গর্ব করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অযথা। আমরা সেই তৃতীয় খণ্ডে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করেছি যে, শিল্প আদৌ প্রমাণ করে না শিল্পের স্রষ্টা বিদ্যমান বা বর্তমান, বরং তার অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে এবং সেটিও কেবল অনুমানসর্বস্ব। কিন্তু খোদার গ্রন্থ কেবল তার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে না, বরং তা তাঁর অস্তিত্ব বা উপস্থিতিকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে। এছাড়া সৃষ্টি বা শিল্পের প্রতি দৃষ্টিপাতে

খোদা যে অনাদি অনন্ত তা প্রমাণিত হয় না। কেননা সৃষ্টি স্বয়ং অনাদি অনন্ত ও প্রাচীন নয়, তাই এটি কীভাবে অন্যের অনাদি ও অনন্ত হওয়া প্রমাণ করতে পারে? নুতন সৃষ্টি, যা নিজেই সদ্যজাত, তা খোদা তা'লার অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা কেবল ততটা প্রমাণ করবে যতটা হলো সেই নবজাত বস্তু বা সৃষ্টির সীমা-পরিসীমা। এছাড়া নতুন বা কিছুকাল পূর্বের কোন সৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্বজগতের অস্তিত্বলাভের পূর্বে খোদা তা'লা আদি থেকে চিরবিরাজমান ছিলেন কিনা তা প্রমাণিত হয় না।

সুতরাং খোদার সত্তা সম্পর্কে সৃষ্টির মাধ্যমে যে জ্ঞান লাভ করা হয় তা অতীব সংকীর্ণ, বিপর্যস্ত ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান যা মানুষকে সন্দেহের ঘূর্ণাবর্ত থেকে আদৌ মুক্তি দিতে পারে না, অজ্ঞতার অমানিশা ও অন্ধকার থেকে মুক্ত করে না বরং বিভিন্ন প্রকার অনিশ্চয়তার মাঝে ঠেলে দেয়। তই কেবল যৌক্তিক জ্ঞানই যাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু ছিল তাদের পরিণাম কখনো শুভ হয় নি আর স্বীয় বিশ্বাসে তারা অনেক অমানিশা ও অন্ধকারকেও যোগ করেছে। মানুষ যদি বিদ্বেষ ও হঠকারিতা সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে আর সত্যের প্রকৃত অনুসন্ধিৎসা নিয়ে সত্যিকার অর্থে ঐশী তত্ত্বের ক্ষুৎপিপাসার সাথে নিবিষ্টমনে চিন্তা করে যে, খোদার অস্তিত্ব, তাঁর সর্বময় ক্ষমতা এবং সকল উৎকৃষ্ট গুণাবলীর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস অর্জনের জন্য আর পরকাল ও শাস্তি-পুরস্কারের বিষয়কে নিশ্চিত ও আবশ্যকীয় জ্ঞান হিসেবে জানার জন্য আমার আর কী কী তত্ত্বজ্ঞান-ভাণ্ডার প্রয়োজন? তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে অনুমানভিত্তিক জ্ঞানের ওপর ভর করে স্থায়ী প্রশান্তি ও সুখ অর্জন করতে পারব নাকি মহাসম্মানিত ও দয়ালু খোদা আমার জন্য অন্য কোনো পথও রেখেছেন? আমার তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণতার জন্য তিনি কি অন্য কোনো পথ রাখেন নি? আমাকে কি কেবল আমার ধ্যানধারণার ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন? তিনি কি এতটা করুণা প্রদর্শনেও দ্বিধাদ্বন্দ্ব করেন যে, যেখানে আমি নিজের দুর্বল পায়ে ভর করে পৌঁছতে পারি না, তিনি স্বীয় ঐশী শক্তির সুবাদে আমাকে সেখানে পৌঁছে দিবেন? যেসব সূক্ষ্ম জিনিস আমি নিজের দুর্বল চোখে দেখতে পাই না তা তিনি স্বীয় গভীর দৃষ্টির কল্যাণে নিজেই দেখিয়ে দিবেন? আমার হৃদয়ে এক সাগর পিপাসা জাগিয়ে তত্ত্বজ্ঞান শূন্যতার দুর্গন্ধে দূষিত একটি তুচ্ছ ফোঁটার মাঝে আমাকে সীমিত রাখবেন– এটি কি সম্ভব? তাঁর বদান্যতা, উদারতা, করুণা এবং শক্তির কি এটিই দাবি? দুর্বল

বান্দা নিজে হাত-পা ছুঁড়ে খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন ধারণা নিজ হৃদয়ে যতটা প্রতিষ্ঠা করবে তার তত্ত্বজ্ঞানকে তিনি সেখানেই সীমাবদ্ধ করে দিবেন এবং উপাস্য বা মা'বুদের বিশেষ শক্তিবলে তাকে ঐশী তত্ত্বজ্ঞানের জগতে ভ্রমণ করাবেন না তাঁর সর্বশক্তিমান হওয়ার দৌড় কি এতটুকুই? সত্যান্বেষী নিজের হৃদয়কে এমন প্রশ্ন করে অবশ্যই এই দৃঢ় উত্তরই পাবে যে, নিঃসন্দেহে খোদার সীমাহীন দানের এটিই দাবি হওয়া উচিত অর্থাৎ, তিনি আপন দুর্বল বান্দাদের নিজেই সাহায্য করবেন, পথহারাদের পথের দিশা দেবেন, দুর্বলকে শক্তি যোগাবেন। খোদা তা'লা সর্বশক্তিমান, ক্ষমতাবান, দয়ালু, কৃপাময়, চিরঞ্জীব-জীবনদাতা এবং চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতা হয়ে চিরতরে নীরব থাকবেন আর অজ্ঞ ও অন্ধ বান্দা তাঁর সন্ধানে হোঁচট খেতে থাকবে– এটি কি সম্ভব?

ناتواناں را کجا تاب و تواں تانشاں یابند خود زاں بے نشاں

দুর্বলদের মাঝে এই শক্তিসামর্থ্য কীভাবে থাকতে পারে যে, তারা নিজেরাই সেই অচেনা-অজানা সত্তাকে খুঁজে বের করবে?

عقلِ کوراں رہنما جوید براہ رہبری از دانشِ کوراں مخواہ

অন্ধদের বোধ-বুদ্ধি স্বয়ং পথ চলার জন্য পথপ্রদর্শক সন্ধান করে, তুমি অন্ধদের বুদ্ধিমত্তার কাছে পথের দিশা নিতে যেয়ো না।

عقلِ ما ازبہرِ زاری و بکاست دفعِ آزار جہالت از خداست

আমাদের বিবেক-বুদ্ধি কেবল কান্নাকাটি ও আহাজারির জন্য, আর অজ্ঞতার দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করার কাজটি খোদার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

عقلِ طفل است ایں کہ گرید زار زار شِیر جز مادر نیاید زینہار

বাচ্চার বুদ্ধি কেবল এতটুকু যে, সে অঝোরে কান্নাকাটি করে, কিন্তু মা ছাড়া কখনো দুধ পাওয়া যায় না।

সুতরাং হে দর্শকেরা! এ বিষয়ে ন্যায়পরায়ণতার সাথে চিন্তা কর আর গভীর মনোনিবেশ কর, সাবধান থাক, কোনো প্রতারকের ধোঁকায় পড়বে না। নিজেদের হৃদয়কে জিজ্ঞেস করো যে, তা কতটা বিশ্বাসে সমৃদ্ধ হওয়ার বাসনা রাখে? তোমাদের নিজেদের হীন ধ্যানধারণা কি তোমাদের হৃদয়কে পুরোপুরি

প্রবোধ ও প্রশান্তি দিতে পারে? তোমাদের আত্মায় কি এ বাসনা জাগে না যে, তোমরা পৃথিবীতেই পূর্ণ বিশ্বাস অর্জন করবে এবং অন্ধত্ব থেকে মুক্তি লাভ করবে? সত্যি করে বল, তোমরা কি চাও না যে, তোমাদের মধ্যকার অমানিশা ও অনিশ্চয়তা দূর হোক এবং তোমাদের হৃদয়ের সকল সন্দেহ দূরীভূত হোক যা তোমরা প্রকাশও করতে পার না? সুতরাং যদি ঐশী তত্ত্বের জন্য কিছুটা উচ্ছ্বাস ও আন্তরিকতা থাকে তাহলে নিশ্চিত জেনো, এ পৃথিবীতে খোদার নিয়ম হলো, তিনি সবকিছু আবিষ্কার ও অর্জনের জন্য কোনো না কোনো বস্তুকে মাধ্যম নির্ধারণ করেছেন। বুদ্ধির কাজ কেবল এতটুকু যে, তা সেই উপকরণ বা যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে, কিন্তু স্বয়ং বুদ্ধি সেই যন্ত্রের কাজ করতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বুদ্ধি আটা পেষার জন্য চাকতির প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে, কিন্তু বুদ্ধি নিজেই সেই চাকতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে আর আটা পেশা আরম্ভ করবে– বিষয়টি এমন নয়! একইভাবে আজ পর্যন্ত শত শত মাধ্যম বা যন্ত্রকে বুদ্ধি পথ দেখিয়েছে কিন্তু কাজ সেটিই হয়েছে যা সেই যন্ত্র সাধন করেছে। অপরদিকে যে কাজের জন্য কোনো যন্ত্র-মাধ্যম ছিল না সেখানে বুদ্ধি ছিল বুদ্ধিহারা।

সুতরাং পৃথিবীর সকল কাজে দৃষ্টিপাত করে দেখ! বুদ্ধির বা বিবেকের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা হলো কোন কাজ সমাধা করার জন্য কেবল কোন মাধ্যম বা যন্ত্রের কথা হৃদয়ে উদিত হওয়া। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বুদ্ধি ভাবে যে, নদী পার হওয়ার জন্য কোনো যন্ত্র বা মাধ্যমের প্রয়োজন, তখন নৌকার আকৃতি তার মানসপটে স্থান করে নেয় আর নৌকা বানানোর জন্য একটি বস্তুও হস্তগত হয় যা নদীতে চলে কিন্তু ডোবে না। সুতরাং এই বস্তু হস্তগত হওয়ার কল্যাণে নৌকা তৈরি হয়ে গেল। অনুরূপভাবে সহস্র সহস্র অন্য যন্ত্রও রয়েছে যার ভিত্তিতে জগতের কাজকর্ম চলছে আর সর্বত্র বিবেক বা বুদ্ধির দায়িত্ব কেবল এতটা যে, তা মাধ্যম বা যন্ত্রের প্রয়োজন প্রমাণ করে এবং বলে যে, এমন যন্ত্র থাকা উচিত। সেটি স্বয়ং অভীষ্ট যন্ত্র বা মাধ্যমের কাজ দিতে পারবে– এমন নয়। এখন স্মরণ রাখা উচিত, সুস্থ বিবেক এ কথা স্পষ্টতই বোঝে যে, পারলৌকিক জগতের ঘটনাবলী ও জগতস্রষ্টার অস্তিত্ব আর সেই স্রষ্টার পছন্দ-অপছন্দ, শাস্তি-পুরস্কারের অবস্থা-প্রকৃতি এবং আত্মার স্থায়ীত্ব ও অস্তিত্বের নিশ্চিত অবস্থা উদ্‌ঘাটন করা এমন এক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় যে, স্বর্গীয় মাধ্যম ছাড়া সঠিক ও নিশ্চিতভাবে তা আদৌ জানা সম্ভব নয়। যেভাবে যুক্তিবুদ্ধি পৃথিবীর

উত্তম ব্যবস্থাপনার জন্য সহস্র সহস্র যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করেছে, একইভাবে এখানেও সুস্থ বিবেক সেই অদেখা জগতের ঠিকানা নিশ্চিতভাবে আবিষ্কারের জন্য এক স্বর্গীয় যন্ত্র বা মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে যেন সেই সর্বশক্তিমান খোদার সত্তাকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়, যাকে চেনার ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ তথাকথিত বুদ্ধিমান মানুষ প্রতারিত হয়েছে। অনুরূপভাবে শাস্তি পুরস্কারের জগতও যেন নিশ্চিতভাবে চেনা যায় যাতে সত্যান্বেষী ধারণা থেকে উন্নতি করে এ পৃথিবীতেই মহাসম্মানিত খোদা ও তাঁর অনুপম গুণাবলী এবং পরকালকে নিশ্চিত জ্ঞানের চোখে দেখার সুযোগ লাভ করেন। সেই যন্ত্র বা মাধ্যম যা এই মহান বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছায় তা হলো খোদার বাণী, যার কল্যাণে মানুষ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে খোদার সত্তা ও তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট গুণাবলী এবং শাস্তি-পুরস্কারের জগৎকে বুঝে যায়। খোদা তা'লা লক্ষ লক্ষ মানুষকে তত্ত্বজ্ঞানের এই পর্যায়ে পৌঁছিয়ে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, খোদাকে চেনার এই মাধ্যম সত্যিই পৃথিবীতে বিদ্যমান।

অধিকন্তু যে ব্যক্তি এই স্বর্গীয় মাধ্যম থেকে আলো অর্জন করে না সে সেই অন্ধের ন্যায় যে এমন একটি রাস্তায় হাঁটে যাতে বিভিন্ন স্থানে পরিখা আর সর্বত্র বড় বড় গর্ত বিরাজমান। সে আদৌ জানে না– নিরাপদ পথ কোথায়, কিছুই জানে না যে, মুক্তির পথ কোনটি, আদৌ জানে না যে, পা ওঠানোর পরিণাম কী হবে। নিজেও দেখে না আর কোনো পথপ্রদর্শকের সাথেও সম্পৃক্ত নয় আর এটিও জানে না যে, অবশেষে কোথায় গিয়ে পৌঁছুবে। এছাড়া যে উদ্দেশ্যে সে পা উঠিয়েছে তা যে নিশ্চিতভাবে অর্জিত হবে এই বিশ্বাসও নেই, বরং তার চোখও অন্ধ আর হৃদয়ও। আরেকটি সন্দেহ বা কুমন্ত্রণা যা পণ্ডিত সাহেবের হৃদয়ে জাগে তা হল, ঐশীগ্রন্থ কোনো মানবের জন্য তার ঈমানের ভিত্তি হতে পারে না। কেন ভিত্তি হতে পারে না? এর যুক্তিস্বরূপ তিনি এটি লিখেছেন যে, এলহামী গ্রন্থ মানার পূর্বে খোদার ওপর ঈমান আনা আবশ্যক। সকল পয়গম্বর ও ঋষি, যাদের ওপর খোদার বাণী অবতীর্ণ হয়েছে তারা ঐশী বাণীর ওপর ঈমান আনার পূর্বে যিনি কালাম বা বাণী অবতীর্ণ করেছেন তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন। কেননা কোনো কথার ওপর ঈমান আনার পূর্বে যিনি কথা বলেন তাঁকে মানা আবশ্যক। তাই স্পষ্ট যে, নবীরা বাণী অবতারণকারীর অস্তিত্বে বিশ্বাস সেই কালাম বা বাণীর মাধ্যমে অর্জন করেন নি, বরং সেই বাণী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই নিজেদের ফিতরত বা প্রকৃতিগত সাক্ষ্যের মাধ্যমে

সেই দৃঢ় বিশ্বাস লব্ধ ছিল। ঐশী বাণীর অপ্রয়োজনীয় হওয়ার পক্ষে পণ্ডিত সাহেব যেন স্বীয় বুদ্ধির পূর্ণ নির্যাস হিসেবে এই প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন! কিন্তু চিন্তা করলে সকল বিবেকবানের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এটি নিছক সন্দেহ যা সত্য সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়ার কারণে পণ্ডিত সাহেবের হৃদয়ে দানা বেঁধেছে আর তা হলো, পণ্ডিত সাহেব নিম্নে উল্লিখিত উভয় বিষয়কে দুটো বিরোধী বিষয়ের সমাহার মনে করেন। অর্থাৎ অজ্ঞ বান্দার ওপর খোদার বাণী অবতীর্ণ হবে যে খোদার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে অনবহিত আর একইসাথে সেই সর্বশক্তিমান খোদা সেই পবিত্র বাণীর মাধ্যমে স্বীয় সত্তা সম্পর্কে নিজেই অবহিত করবেন– এ দুটো বিষয় পণ্ডিত সাহেবের দৃষ্টিতে দুটো বিপরীত কথা যা যুগপৎ ঘটতে পারে না। অথচ এই উভয় কথার এক স্থানে সমবেত হওয়া কোনো বিবেকবানের মতে দুটো বিপরীত কথার সমবেত হওয়া বলে গণ্য হতে পারে না। যেখানে মানুষ স্বীয় কথার মাধ্যমে অন্য লোকদের নিজ অস্তিত্বের জানান দিতে পারে সেখানে খোদার জন্য কেন সেই সংবাদ প্রদান অসম্ভব হবে? পণ্ডিত সাহেবের মতে কি খোদা স্বীয় উৎকর্ষ ও ক্ষমতাপূর্ণ কথা বা বাণীর মাধ্যমে নিজের সত্তা সম্পর্কে সংবাদ দেয়ার ক্ষমতা রাখেন না যা খোদার বিভিন্ন ঐশী বিকাশের ওপর নির্ভরশীল? যদি পণ্ডিত সাহেবের হৃদয়ে এই সন্দেহ জাগে যে, যত নবী এসেছেন তাঁরা নিঃসন্দেহে ঐশী বাণী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই খোদার সত্তায় দৃঢ় বিশ্বাস রাখতেন, তাই প্রমাণিত হলো যে, সেই বিশ্বাস তাদের প্রকৃতি ও বুদ্ধির জোরে অর্জিত! অতএব স্পষ্ট হওয়া উচিত এসকল কুমন্ত্রণা সঠিক প্রণিধানের অভাবে দেখা দিয়েছে।

কেননা এই বিশ্বাসের কারণ কোনোভাবে শুধু বুদ্ধি ও প্রকৃতি হতে পারে না। নবীরা বিচ্ছিন্ন কোন জঙ্গলে জন্মগ্রহণ করেন নি যে কারণে হয়ত বলা যেতে পারে যে, তাঁরা এলহাম লাভের পূর্বে শ্রুতির মাধ্যমেও খোদার নাম শোনেন নি যার ভিত্তি এলহামের ওপর চলে আসছে, বরং কেবল নিজেদের প্রকৃতি ও বুদ্ধির জোরে খোদার সত্তায় বিশ্বাস রাখতেন। বরং স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, খোদার অস্তিত্ব পৃথিবীতে পরিচিতি লাভ করেছে সেই ঐশী বাণীর মাধ্যমে যা যুগের প্রারম্ভে হযরত আদমের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আদমের পর যত নবী কালক্রমে যুগের সংশোধনের জন্য আসতে থাকেন, তাদেরকে ওহী লাভের পূর্বে খোদার সত্তার কথা স্মরণ করিয়েছে সেই শ্রুতিনির্ভর পরম্পরা

যার ভিত রচিত হয় হযরত আদমের গ্রন্থের মাধ্যমে। সুতরাং সেই শ্রুতিনির্ভর পরম্পরাই ছিল যা নবীদের সোচ্চার ও উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনাপূর্ণ প্রকৃতি তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করে নিয়েছিল। এরপর খোদা স্বীয় বিশেষ বাণীর মাধ্যমে তাদেরকে বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞানের সুমহান সব মর্যাদায় উপনীত করেন আর সেই ত্রুটি ও ঘাটতির সুরাহা করেন যা কেবল শ্রুত পরম্পরার অনুসরণে দেখা দিয়েছিল। আমরা পূর্বেও লিখে এসেছি যে, খোদার সত্তার পরিচিতি শ্রুতির মাধ্যমে চলে আসছে আর শ্রুতধারার ভিত্তি ছিল সেই এলহাম যা প্রথমদিকে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আদি পিতা হযরত আদমের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। একথা অতি স্পষ্ট যে, প্রথমদিকে এর মাধ্যমেই সর্বশক্তিমান খোদার সত্তা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয় আর এখনো এর স্থায়ী কার্যকারিতা বা সক্ষমতা রয়েছে।

সুতরাং সেই স্থায়ী সক্ষমতা বিদ্যমান কেবল ঐশী বাণী বা খোদার কথায়– এটিই এর যথেষ্ট প্রমাণ। কেননা ঐশী বাণীতে এখনো এই সক্ষমতা পরীক্ষিত ও বিদ্যমান যে, তা গুপ্ত ও প্রচ্ছন্ন বিষয়াদি সম্পর্কে যেভাবে চায় সেভাবে সঠিক সংবাদ দিতে পারে এবং অতীতের সংবাদও প্রকাশ করতে পারে, খোদার অদৃশ্য সত্তার সঠিক নিদর্শন প্রকাশ করতে পারে, নিজের অলৌকিক রীতির মাধ্যমে এ সম্পর্কে বিশ্বাসও সৃষ্টি করতে পারে, অধিকন্তু পারলৌকিক জগতের তত্ত্ব ও অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিতও করতে পারে, যেভাবে এ যুগে এলহামপ্রাপ্তদের সত্য অভিজ্ঞতা একথার সত্যায়ন করছে। কিন্তু বুদ্ধিতে এই অমূল্য রত্ন বা বৈশিষ্ট্য নেই। একথা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, নবজাত শিশুকে 'শুনে শেখার রীতি' থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত রেখে কেবল তার বিবেকের কাছে খোদাকে চেনার বিষয়টি যদি ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে সে খোদার সত্তা, তাঁর পরম উৎকৃষ্ট গুণাবলী এবং শাস্তি ও পুরস্কারের জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অনবহিত থাকে। সুতরাং প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ করার অলৌকিক শক্তি শুধু ঐশী বাণীতেই প্রমাণিত, যুক্তিবুদ্ধিতে নয়। তাই সকল বুদ্ধিমানকে মানতে হয় যে, ঈমান ও ধর্মের ভিত্তি হলো ঐশী বাণী, নিছক বুদ্ধিপ্রসূত চিন্তাধারা এর ভিত্তি হতে পারে না। যদিও মানুষের বুদ্ধিশক্তি রয়েছে, কিন্তু সেই শক্তি ঐশী বাণী বা খোদার উক্তির পথনির্দেশনা ছাড়া অকেজো। যেমন, চোখে দেখার শক্তি আছে, কিন্তু সূর্য ছাড়া তা অকার্যকর। যেভাবে সূর্যের আলো স্বীয় অস্তিত্বেরও জানান দেয় আবার সূর্যের অস্তিত্বের

দিকেও পথনির্দেশ করে অনুরূপভাবে খোদার বাণী আপন আলোর সত্যতা ও অনন্যতার মাধ্যমে প্রমাণ করে যে, তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আর খোদার অস্তিত্বের প্রতিও তা নিশ্চিত পথনির্দেশকারী।

পুনরায় পণ্ডিত সাহেব 'ধরম জীবন' পত্রিকার ১৮৮৩ সনের জানুয়ারির সংখ্যায় এই দাবি করে বসেছেন যে, বুদ্ধিমান মানুষ এমন গ্রন্থ সংকলন করতে পারে যা উৎকর্ষতায় কুরআনের ন্যায় বা সমধিক মহান। এখন যেহেতু পণ্ডিত সাহেবও বুদ্ধিমান বরং স্বজাতির এক সংস্কারক হবার দাবি করেন, তাই এমন গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করে এই দাবি প্রমাণ করে দেখানোর দায়িত্ব তাঁর। যেভাবে কুরআন শরীফ অতি সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সকল সত্য তত্ত্ব ও সূক্ষ্ম তথ্যের সমাহার আর যেভাবে কুরআন শরীফ সত্য, প্রজ্ঞা ও সততার সকল দাবি পূরণ করে বাগ্মিতা এবং প্রাঞ্জলতার মহান মানে উপনীত, যেভাবে কুরআন শরীফ সুমহান সব ভবিষ্যদ্বাণী ও অদৃশ্যের সংবাদে পরিপূর্ণ আর যেভাবে কুরআন শরীফ স্বীয় পবিত্র প্রভাবের কল্যাণে সত্য সন্ধানীদের হৃদয়কে পবিত্র করে স্বর্গীয় জ্যোতিতে আলোকিত করে এবং তাদের মাঝে সেই বিশেষ জ্যোতি সঞ্চার করে যা অন্যান্য গ্রন্থে দেখা যায় না, যেমনটি কিনা আমাদের গ্রন্থে আমরা প্রমাণ করেছি আর উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছি, ঠিক এভাবে এবং এমন মহিমাসম্পন্ন কোনো গ্রন্থ লিখে উপস্থাপন করুন।

ندارد کسے باتو ناگفتہ کار و لیکن چو گفتی دلیلش بیار

তুমি কথা না বললে তোমার সম্পর্কে কারো কোনো মাথা ব্যথা ছিল না, কিন্তু
এখন যেহেতু তুমি কথা বলেছ তাই তুমিই এর প্রমাণ উপস্থাপন করো।

কিন্তু আমরা পণ্ডিত সাহেবের সামনে একথা স্পষ্ট করে বলছি যে, কোনো মানুষের জন্য উল্লিখিত বিষয়াদি বা বৈশিষ্ট্যাবলী নিজের কথা বা রচনায় সৃষ্টি করা আদৌ সম্ভব নয় যা মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে। অপরদিকে খোদার বাণীতে এসকল বিষয় একত্রিত হওয়া কেবল বৈধই নয় বরং আবশ্যক। কেননা যেভাবে খোদা অনন্য ও অতুলনীয়, অনুরূপভাবে যে বস্তু তাঁর পক্ষ থেকে উৎসারিত তা-ও অনন্য ও অতুলনীয় হওয়া চাই যার জুড়ি বা যার মত কিছু প্রদর্শনে মানুষ হবে অক্ষম। সুতরাং কুরআন শরীফ যে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্বে অনন্য হওয়ার দাবি করেছে এটি কোনো অযথা দাবি নয় বরং এটি প্রকৃতির সেই শাশ্বত নিয়ম যার অনুসরণ করাই হলো মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক আর যা

এড়িয়ে চলা নির্বুদ্ধিতার শামিল। একটু ভেবেচিন্তে ন্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেই বলুন, প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে খোদার বাণীর অনন্য হওয়া আবশ্যক কিনা? আপনার দৃষ্টিতে যদি আবশ্যক না হয় আর খোদার কাজে অন্যদের অংশীদারিত্ব বৈধ হয় তাহলে সোজা একথা বলেন না কেন যে, খোদা যে এক ও অদ্বিতীয় তাতেই আমাদের সন্দেহ রয়েছে? আপনি কি এই স্পষ্ট কথা বুঝতে পারেন না যে, খোদার একত্ববাদ ততক্ষণ অটুট ও সত্য যতক্ষণ তাঁর সকল গুণাবলী অন্যের অংশীদারিত্বের বাইরে থাকবে। যদি খোদার কথার মর্যাদা এটিই হয়, অর্থাৎ মানুষও যদি খোদার মতো বাণী বানাতে সক্ষম হয়, তাহলে খোদার স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে গেল! অর্থাৎ খোদার পুরো রহস্য প্রকাশ পেয়ে গেল!* এখানে আমরা এখন সাধারণ মানুষের কল্যাণার্থে সাধারণ ও সর্বজনীন নিয়ম হিসেবে একথা বলে দিতে চাই যে, ঐশীবাণী বা গ্রন্থের সেই মান কোন্‌টি, যে মানে কোনো কালাম বা বাণী উপনীত হলে তা সেই গুণ বা বৈশিষ্ট্যসংবলিত হয়ে যায় যার সুবাদে বলা যায় যে, তা খোদার পক্ষ থেকে? এরপর দৃষ্টান্তস্বরূপ কুরআন শরীফের কোনো সূরা উদ্ধৃত করে প্রমাণ করে দেখাব যে, অনন্যতার সকল দিক, যা সাধারণ ও সর্বজনীন নিয়মকানুনে উল্লেখ করা হয়েছে তা এই সূরায় পুরোপুরি ও পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। কিন্তু এরপরও যদি কেউ অনন্যতার সেই কারণগুলো গ্রহণ করতে না চায় তাহলে বিকল্প বাণী বা কালাম উপস্থাপন করে তাতে সেসকল অনন্যতার বৈশিষ্ট্যগুলো প্রমাণের দায়িত্ব তার ওপরই বর্তাবে।

সুতরাং স্পষ্ট হওয়া উচিত, কোনো বাণী বা গ্রন্থ যদি সেসব জিনিসের কোনো একটির সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য রাখে, যেসব জিনিস খোদার পক্ষ থেকে উৎসারিত এবং তাঁর সর্বশক্তিমান হাতের শিল্প অর্থাৎ তাতে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক বিস্ময়াবলীর সেভাবে সমাহার ঘটে যা খোদার কোনো সৃষ্টিতে সমবেত থাকে তাহলে এমন ক্ষেত্রে বলা হবে যে, সেই কালাম বা গ্রন্থ এমন মর্যাদায় উপনীত যার দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে মানবীয় শক্তি অক্ষম, কেননা যে বস্তুর অনন্যতা ও খোদার পক্ষ থেকে উৎসারিত হওয়া সাধারণ ও বিশিষ্টজন, সবার মতে একটি স্বীকৃত ও গৃহীত বিষয়, যাতে কারো কোনো মতভেদ ও বিতণ্ডা নেই, এর অনন্যতার দিকগুলোতে কোনো বস্তুর পূর্ণ অংশীদারিত্ব প্রমাণিত হওয়া

*** টীকা:** পাদটীকা নম্বর তিন (৩) এই পুস্তকের ২৬৯ পৃষ্ঠায় দেয়া আছে। অনুগ্রহপূর্বক সেখান থেকে পড়ে নিন। –অনুবাদক

নিঃসন্দেহে এ বিষয়কে প্রমাণ করে যে, সে বস্তুও অনন্য। যেমন কোনো বস্তু যদি ১০ গজবিশিষ্ট কোনো বস্তুর সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য রাখে তাহলে সে বস্তু সম্পর্কেও সঠিক ও সুনিশ্চিত এবং আবশ্যকীয় জ্ঞান অর্জন হবে যে, সেটিও ১০ গজ বিশিষ্ট।

এখন আমরা খোদার বিভিন্ন শিল্প বা সৃষ্টির মাঝে একটি অতি সূক্ষ্ম ও সুন্দর সৃষ্টি গোলাপ ফুলকে উদাহরণ হিসেবে নিয়ে এর সেসব বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিস্ময়কর দিকগুলো লিপিবদ্ধ করছি যার সুবাদে তা এত উন্নত পর্যায়ের সৃষ্টি হিসেবে স্বীকৃত যে, মানবীয় শক্তি-বৃত্তি এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে অক্ষম। এরপর একথা প্রমাণ করে দেখাব, সূরা ফাতিহার বিস্ময়াবলী ও শ্রেষ্ঠত্ব এসব বিস্ময়াবলীর সমমানের বরং এর বিস্ময়াবলীর পাল্লা আরো ভারী। এই দৃষ্টান্ত বেছে নেয়ার কারণ হিসেবে যা কাজ করেছে তা হল, একবার এই অধম দিব্যদর্শনে একটি পাতায় সূরা ফাতিহা লিপিবদ্ধ দেখি, যা ছিল অধমের হাতে। আর সেটি এমন সুন্দর ও চিত্তাকর্ষকরূপে বিরাজমান ছিল যে, যে কাগজে সূরা ফাতিহা লিপিবদ্ধ ছিল তা যেন লাল ও মোলায়েম গোলাপ ফুলে এতটা পরিপূর্ণ ছিল যা সত্যিই বর্ণনাতীত। অধম এই সূরার কোনো আয়াত পাঠ করতেই বহু গোলাপ ফুল একটি প্রাণোদ্দীপক ধ্বনির সাথে উড়ে ওপরের দিকে যায় আর সেই ফুল অত্যন্ত সুন্দর, বড় বড়, দৃষ্টিনন্দন ও সতেজ এবং সুগন্ধিযুক্ত, যার ঊর্ধ্বে আরোহণের সময় অন্তরাত্মা যারপরনাই সুরভিত হয়ে যায় আর এমন এক নেশা উদ্দীপক আবহ সৃষ্টি করে যা স্বীয় অতুলনীয় সুখবর আকর্ষণে এ পৃথিবী এবং এর সমুদয় জিনিসের প্রতি চরম ঘৃণা সৃষ্টি করে। এই দিব্যদর্শনের ফলে বোঝা গেল যে, সূরা ফাতিহার সাথে গোলাপ ফুলের একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্য রয়েছে এবং এই সামঞ্জস্যের নিরিখে এই উপমা বেছে নেয়া হয়েছে। অতএব গোলাপ ফুলে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ যে বিস্ময়কর দিকগুলো বিদ্যমান তা প্রথমে দৃষ্টান্তস্বরূপ লিপিবদ্ধ করা, এরপর এর মোকাবিলায় সূরা ফাতিহার বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক বিস্ময়াবলী লিপিবদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত মনে হলো, যেন ন্যায়পরায়ণ পাঠক গোলাপের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গুণাগুণ সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। অর্থাৎ যেসব গুণের দৃষ্টিকোণ থেকে সাধারণত গোলাপের ন্যায় কোন কিছু উপস্থাপন অসম্ভব (মনে করা হয়েছে) অনুরূপ গুণাবলী, বরং এর চেয়ে অধিক মহান গুণাবলী সূরা ফাতিহায় বিদ্যমান। এছাড়া এই উপমা লিপিবদ্ধ করার আরেকটি উদ্দেশ্য হলো দিব্যদর্শনের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতটিকে বাস্তবে রূপ দেয়া। অতএব স্মরণ

রাখা উচিত, প্রত্যেক বিবেকবানের মতে এ বিষয়টি নিঃসংকোচে ও নির্দ্বিধায় একটি প্রমাণিত বিষয় যে, খোদার বিভিন্ন সৃষ্ট বস্তুর মাঝে গোলাপ ফুলও এমন উন্নত বৈশিষ্ট্যাবলী বা গুণাবলী নিজের মাঝে ধারণ করে যার দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে মানুষ অক্ষম। সেসব গুণাবলী বা সৌন্দর্য দুধরনের। একটি এর বাহ্যিক রূপে বিদ্যমান। যেমন এর রং দেখতে খুবই সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন। এর সৌরভ প্রশান্তিকর ও চিত্তাকর্ষক। এর বাহ্যিক গঠনে রয়েছে নিখুঁত মসৃণতা, সতেজতা, কোমলতা, স্পর্শকাতরতা ও স্বচ্ছতা। এছাড়া সেসব বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অভ্যন্তরীণভাবে প্রজ্ঞার মূর্তপ্রতীক খোদা তাতে সৃষ্টি করে রেখেছেন, অর্থাৎ সেসব বিশেষত্ব, যা এর নির্যাসে প্রচ্ছন্ন রয়েছে তা হলো তা হৃদয়কে সঞ্জীবিত করে আর শক্তি জোগায় এবং পলাগ্নি (বাইল) হ্রাস করে। সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও আত্মাকে শক্তিশালী করে, অধিকন্তু পিতম্বর ও তরল শ্লেষ্মার জন্য জোলাপ হিসেবে কাজ করে। অনুরূপভাবে পেট, যকৃৎ, বৃক্ক, পাকস্থলী, জরায়ু এবং ফুসফুসকেও শক্তি জুগিয়ে থাকে আর হিষ্টেরিয়া, মূর্ছারোগ ও হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতার জন্য অত্যন্ত হিতকর। এছাড়া আরো অনেক দৈহিক ব্যাধির জন্য এটি উপকারী।

সুতরাং এই উভয় প্রকার বৈশিষ্ট্যের নিরিখে এর সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস হলো, তা উৎকৃষ্টতার এমন মানে অবস্থিত যে, কোনো মানুষের পক্ষে এমন ফুল বানানো সম্ভব নয় যা এই ফুলের ন্যায় রঙের ক্ষেত্রে দেখতে সুন্দর, সৌরভে চিত্তাকর্ষক, অত্যন্ত সতেজ, অধিকন্তু কোমল, নাযুক ও পরিষ্কার; কিন্তু তা সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণভাবে সেসকল বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ যা গোলাপ ফুলে বিদ্যমান। যদি এই প্রশ্ন করা হয় যে, গোলাপ ফুল সম্পর্কে কেন এমন বিশ্বাস পোষণ করা হবে যে, কোনো মানবীয় শক্তি তা বানাতে সক্ষম নয়? কোনো মানুষের পক্ষে এর মত কিছু বানানো কেন বৈধ হবে না? এতে বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত যেসব গুণাবলী রয়েছে তা কৃত্রিম কোনো ফুলে সৃষ্টি করা কেন অসম্ভব? তাহলে এ প্রশ্নের উত্তর হলো, এমন ফুল বানানো কার্যত অসম্ভব। আজ পর্যন্ত কোনো জ্ঞানী ও দার্শনিক কোনো কৌশলকে কাজে লাগিয়ে এমন ঔষধ উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয় নি যেসবের পরস্পর মিশ্রণে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে গোলাপ ফুলের আকৃতি ও প্রকৃতি সৃষ্টি হবে। এখন বুঝতে হবে যে, অনন্যতার এই দিকগুলোই সূরা ফাতিহায় বরং কুরআন শরীফের সবচেয়ে ছোট্ট সূরায়ও বিদ্যমান যা হবে ৪ আয়াত থেকেও কম। প্রথমে বাহ্যিক গঠনে দৃষ্টিপাত করে

দেখ! শব্দসমষ্টি বা বাক্যের সৌন্দর্য, বর্ণনার নান্দনিকতা, উন্নত শব্দচয়ন ও ভাষায় পরম সাবলীলতা, কোমলতা ও গতিময়তা, ঔজ্জ্বল্য ও কমনীয়তা ইত্যাদি সুন্দর রচনার আবশ্যকীয় অনুষঙ্গগুলো কত আকর্ষণীয়ভাবে সতত পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করে চলেছে। এটি এমন এক ঔজ্জ্বল্য যার অধিক কল্পনাই করা যায় না, এর শব্দগুলো ক্রূরতা এবং দুর্বোধ্যতার জটিলতা থেকে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র ও মুক্ত। এর প্রতিটি বাক্য অত্যন্ত বাগ্মিতাপূর্ণ ও প্রাঞ্জল আর এর প্রতিটি শব্দ বিন্যস্ত হয়েছে যথাস্থানে। আর সকল এমন উপকরণ যার সুবাদে রচনার আকর্ষণ ও আবেদন বৃদ্ধি পায় আর বাক্যের সুষমা ও সৌন্দর্য প্রকাশ পায়, তার সবই এতে বিদ্যমান। সুন্দর বক্তৃতা বা উপস্থাপনায় যতটা বাক্যালঙ্কার ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনার মনোরম দিক মনমস্তিষ্কে জাগ্রত হতে পারে তা পূর্ণমাত্রায় তাতে বিদ্যমান ও দৃশ্যমান। আর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্য যতটা যাদুকরী বক্তব্যের প্রয়োজন তার পুরোটাই এটি ধারণ করে। রূপকের ব্যবহারে বাগ্মিতা আর জাদুকরী বক্তব্যে শ্রেষ্ঠত্বের পাশাপাশি সত্য ও সততার সৌরভেও তা পরিপূর্ণ। এতে এমন কোনো অতিরঞ্জন নেই যাতে মিথ্যার লেশমাত্র থাকতে পারে। বাক্য বা আয়াতে এমন কোনো কারুকার্য বা ভূষণ নেই যাতে কবিদের ন্যায় মিথ্যাচার, নিরর্থক কথা ও বাগাড়ম্বরের নোংরামি ও এর দুর্গন্ধ হতে সাহায্য নেয়া হয়ে থাকবে।

সুতরাং কবিদের কথা বা কাব্য যেখানে মিথ্যা, হাসি-তামাশা ও অত্যুক্তির দুর্গন্ধে ভরা থাকে, সেখানে এই বাণী সত্য ও সততার নান্দনিক সৌরভে সমৃদ্ধ। অধিকন্তু এই সৌরভের সাথে রয়েছে সাবলীল বর্ণনা ও শব্দসম্ভারের উন্নত মান আর বাক্যে পুষ্পময়তা ও স্বচ্ছতার এমন সমাহার ঘটেছে যেভাবে গোলাপ ফুলের ঘ্রাণের সাথে এর সুন্দর রং ও ঔজ্জ্বল্য একাকার হয়ে থাকে। এসব সৌন্দর্য হলো বাহ্যিকতার নিরিখে আর অভ্যন্তরীণভাবে এতে অর্থাৎ সূরা ফাতিহায় যে বৈশিষ্ট্যাবলী রয়েছে তা হলো এটি অনেক ভয়াবহ আধ্যাত্মিক ব্যাধির চিকিৎসা বা নিরাময়ের মাধ্যম। জ্ঞান ও কর্মশক্তির পূর্ণতার জন্য এতে বহু উপকরণ রয়েছে আর এটি চরম বিকৃতি ও বিপথগামিতার সংশোধন করে। অনেক মহান তত্ত্ব এবং সূক্ষ্ম ও সুন্দর আধ্যাত্মিক রহস্যাবলী এতে বিধৃত রয়েছে যা ছিল জ্ঞানী ও দার্শনিকদের দৃষ্টিতে প্রচ্ছন্ন। তা পাঠে পুণ্যের পথযাত্রীর হৃদয়ে বিশ্বাসের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সন্দেহ-সংশয় ও ভ্রষ্টতার ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ হয় আর বহু উন্নতমানের সত্য ও অতি সূক্ষ্ম সত্য ও

গূঢ়তত্ত্ব যা মানুষের যুক্তিবুদ্ধির পরিপূর্ণতার জন্য আবশ্যক তা এর আশিসময় বিষয়বস্তুতে কানায় কানায় পরিপূর্ণ। জানাকথা যে, এসব শ্রেষ্ঠত্ব এমন যে, গোলাপের উৎকর্ষের ন্যায় মানুষের রচনায় সেসবের সমাহার ঘটাও অসম্ভব মনে হয়। অধিকন্তু এই অক্ষমতা ও অসম্ভাব্যতা কেবল তাত্ত্বিক নয় বরং নিশ্চিত ও প্রকাশ্য। কেননা খোদা তা'লা প্রকৃত প্রয়োজনের সময় স্বীয় প্রাঞ্জল ও বাগ্মিতাপূর্ণ গ্রন্থে যেসকল মহান সূক্ষ্ম রহস্য ও তত্ত্বাবলী বর্ণনা করে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন আর অত্যন্ত স্পর্শকাতর শর্তাবলীর সাথে উভয় দিক অর্থাৎ প্রকাশ্য ও সুপ্ত শ্রেষ্ঠত্বকে মহান মার্গে পৌঁছে দিয়েছেন, অর্থাৎ প্রধানত এমন আবশ্যকীয় সুমহান তত্ত্বাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন যার চিহ্ন পূর্ববর্তী শিক্ষা থেকে হারিয়ে ও মুছে গিয়েছিল এবং কোন জ্ঞানী বা দার্শনিক এসব মহান তত্ত্বজ্ঞানে উপনীত হয় নি।

অধিকন্তু এ সকল তত্ত্বাবলী বৃথা বা অপ্রয়োজনীয়ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় নি, বরং হুবহু সেসময় ও সেযুগে তা বর্ণনা করেছেন যখন সমসাময়িক যুগের অবস্থার সংশোধনের জন্য তা বর্ণনা করা অত্যাবশ্যক ছিল, অন্যথায় যুগের ধ্বংস ছিল অনিবার্য। আর সেসকল মহান তত্ত্ব দুর্বল বা অসম্পূর্ণরূপে লেখা হয় নি বরং মাত্রা ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তা উৎকর্ষে উপনীত ছিল। কোনো বুদ্ধিমানের বুদ্ধিবৃত্তি এমন কোনো ধর্মীয় সত্য উপস্থাপন করতে পারবে না যা এর বাইরে রয়ে গেছে। কোনো মিথ্যা পূজারির এমন কোনো দ্বিধা ও সন্দেহ নেই যার এতে নিরসন করা হয় নি। এসব সত্য ও সূক্ষ্ম বিষয়াদির বন্দোবস্ত করার পাশাপাশি যা সত্যিকারের প্রয়োজন পূর্ণ করার সাথে সম্পৃক্ত, বাগ্মিতা ও আলঙ্কারিকতার সেই সকল সুমহান উৎকর্ষ এমনভাবে প্রদর্শন করাও আবশ্যক যার বেশি কল্পনাই করা যায় না। আর এটি অনেক বড় একটি কাজ যা স্পষ্টতই মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে। কিন্তু মানুষ এতটাই অপরিপক্ক ও অকুশলী যে, যদি তুচ্ছ ও অকেজো বিষয়াদিকে, যা মহান সত্যের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না, কোনো কারুকার্যখচিত ও বাগ্মিতাপূর্ণ বাক্যে সত্য প্রকাশ ও সত্য কথনের দাবির নিরিখে লিখতে চায় তাহলে তা-ও তার জন্য সম্ভব নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সব বুদ্ধিমান মানুষের কাছে একথা একেবারেই স্পষ্ট যে, একজন দোকানদার যে উচ্চমানের কবি ও লেখক, প্রতিদিন বিভিন্ন ক্রেতা ও ব্যবসায়ীর সাথে তার যেসব কথাবার্তা হয় তা যদি অতি প্রাঞ্জল ও অলংকৃত বাক্যে প্রকাশ করতে চায়, আবার স্থানকালপাত্রভেদে যেমন কথা বলা উচিত তা-ই করে। যেমন,

যেখানে কম কথা বলা উচিত সেখানে কম বলে আর যেখানে বেশি মাথা খাটানো যুক্তিযুক্ত সেখানে বেশি কথা বলে, যখন তার ও তার কোনো ক্রেতার মাঝে কোনো বিতর্ক হয় তখন বক্তব্যের সেই রীতি অনুসরণ করে যার ফলে সেই তর্ক নিজের স্বার্থের অনুকূলে করতে পারে বা দৃষ্টান্তস্বরূপ একজন বিচারক, যার কাজ হলো উভয় পক্ষ ও সাক্ষীদের বিবৃতি যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা আর মামলার সত্যাসত্য যাচাইয়ের শর্ত ও বিতর্কিত বিষয়ের তদন্তের জন্য যথার্থতার দাবির নিরিখে প্রশ্নের স্থানে প্রশ্ন আর উত্তরের স্থানে উত্তর লিপিবদ্ধ করা আর যেখানে আইনগত দিকগুলো বর্ণনা করা আবশ্যক হয়ে থাকে তা যথাযথভাবে আইনের দাবি অনুসারে বর্ণনা করা এবং যেখানে পূর্ণ ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ঘটনা স্পষ্ট করা জরুরি সেখানে তা ধারাবাহিকভাবে ও সঠিকভাবে প্রকাশ করা আর এরপর নিজের সত্য মতামত এবং সেই মতামতের সমর্থনে যে যুক্তি ও কারণ রয়েছে তা সঠিকভাবে বর্ণনা করা, এসব অনুষঙ্গের পাশাপাশি বাগ্মিতা ও প্রাঞ্জলতার সেই মহান স্তরে তার কথা উন্নীত থাকা উচিত যার চেয়ে উত্তম কথা বলা যেন কোনো মানুষের জন্য সম্ভব না হয়। অতএব এমন বাগ্মিতা পরম মার্গে পৌঁছানো স্পষ্টতই তার জন্য অসম্ভব।

সুতরাং এ হলো মানুষের বাগ্মিতার চিত্র। অত্যুক্তি করা এবং অপ্রয়োজনীয় ও নীচ কথাবার্তা বলা ছাড়া তারা প্রথম পদক্ষেপই ওঠাতে পারে না। আর মিথ্যা বলা, ক্রীড়াকৌতুক বা হাসিতামাশা ছাড়া মানুষ কিছুই বলতে পারে না আর কিছু বললেও অসম্পূর্ণ। নাক থাকলে কান নেই আর কান থাকলে চোখ খুঁজে পাওয়া যায় না। সত্য বললে বাগ্মিতা হারিয়ে যায়, বাগ্মিতার পেছনে ছুটলে মিথ্যা ও অপলাপের স্তুপের পর স্তুপ একত্রিত করে নেয়। পেঁয়াজের মত কেবল খোলস-সর্বস্ব, সার বলতে কিছু নেই। সুতরাং যেখানে সুস্থ বিবেক স্পষ্ট এ রায় প্রদান করে যে, অকেজো ও তুচ্ছ বিষয়াদি আর সাধারণ ঘটনাবলীকে প্রকৃত প্রয়োজন এবং সততার দাবির নিরিখে মোহনীয় ও অলঙ্কারময় বাক্যে বর্ণনা করা সম্ভব নয়, সেখানে একথা বোঝা কত সহজ যে, সুমহান তত্ত্বাবলীকে প্রকৃত প্রয়োজনের দাবির নিরিখে পুষ্পিত ও বাগ্মিতাপূর্ণ বাক্যে বর্ণনা করা সম্পূর্ণভাবে অলৌকিক ও মানবীয় শক্তির ঊর্ধের বিষয় যা থেকে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার কথা কল্পনাই করা যায় না। অধিকন্তু গোলাপ ফুলের সাথে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে সাদৃশ্য রাখে এমন কোনো ফুল বানানো যেভাবে সচরাচর অসম্ভব, অনুরূপভাবে এটিও অসম্ভব। কেননা যেখানে তুচ্ছ বিষয়েও সত্য

অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় আর সুস্থ প্রকৃতি স্বীকার করে যে, মানুষ নিজের কোনো প্রয়োজনীয় ও পরম সত্য কথাকে, যদি অত্যন্ত সঠিক ও সবচেয়ে যুক্তিযুক্তভাবে সমাধা করতে চায় তাহলে তার বাক্যসম্ভার সর্বত্র নিজগুণেই ভারসাম্যপূর্ণ, সুগঠিত, বাগ্মিতাপূর্ণ ও অলংকারময় বরং বাগ্মিতা ও অলঙ্কারিতার উন্নতমানে থাকবে– একথা অসম্ভব। হোক সে কথা কোনো ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত বা আদালতের তদন্ত সংক্রান্ত, তাই এমন বক্তব্য যা সততা ও সত্যের আবশ্যকীয় দাবি পূরণ করার পাশাপাশি তত্ত্ব এবং সুমহান সত্যে সমৃদ্ধ আর সত্যিকারের প্রয়োজনে উৎসারিত, অধিকন্তু সকল ঐশী বা ধর্মীয় সত্যকে পরিবেষ্টন করে থাকবে এবং সমসাময়িক অবস্থার সংশোধন ও সত্যের অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপনের দায়িত্ব পালন এবং বিরোধীদের অভিযুক্ত করার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র অবহেলা করবে না, মুনাযিরা ও বিতর্কের সকল দিকের প্রতি থাকবে যথাযথভাবে যত্নবান আর সকল গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিপ্রমাণ প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরের সমাহার হবে– এটি কীভাবে হতে পারে যে, এসব অতি জটিল সমস্যা সত্ত্বেও, যা প্রথম স্তর থেকে শত শতগুণ বেশি জটিল, এমন বাগ্মিতা ও বাক্যালংকারে সজ্জিত হয়ে কোনো মানবের রচনায় কী করে তার সমাবেশ ঘটতে পারে আবার একই সাথে সেই অলংকারও হবে অনন্য প্রকৃতির, অধিকন্তু সেই বিষয়কে এর চেয়ে বেশি গভীর ভাষায় বর্ণনা করা হবে অসম্ভব?

এগুলো হলো সেসব দিক যা সূরা ফাতিহা ও কুরআন শরীফে বিদ্যমান আর তা এমনভাবে বিদ্যমান যার সাথে গোলাপ ফুলের অনন্যতার পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে। কিন্তু সূরা ফাতিহা ও কুরআনের এমন একটি মহান বিশেষত্বও রয়েছে যা এই পবিত্র বাণীরই বিশেষত্ব আর তা হলো, এটি মনোযোগ ও আন্তরিকতার সাথে পাঠ করা হৃদয়কে পবিত্র করে, অমানিশার পর্দা অপসারিত করে আর বক্ষ প্রশস্ত করে এবং সত্যান্বেষীকে মহাসম্মানিত খোদার প্রতি আকর্ষণ করে এমন জ্যোতি ও নিদর্শনাবলীর অবতরণস্থলে পরিণত করে যা এক-অদ্বিতীয় খোদার নৈকট্যপ্রাপ্তদের মাঝে থাকা বাঞ্ছনীয় আর মানুষ অন্য কোনো কৌশল ও পরিকল্পনার জোরে তা আদৌ অর্জন করতে পারে না। এই আধ্যাত্মিক প্রভাব বা কার্যকারিতার প্রমাণও আমরা এ গ্রন্থে প্রদান করেছি। আর যদি কোনো সত্যান্বেষী থেকে থাকে তাহলে আমরা সামনাসামনি বসে তাকে আশ্বস্ত করতে পারি আর সর্বদা নিত্যনতুন প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত রয়েছি। এছাড়া একথাও ভালোভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, নিজ ভাষার

ক্ষেত্রে কুরআন শরীফের অনন্য ও অতুলনীয় হওয়া কেবল যৌক্তিক প্রমাণাদির মাঝেই সীমাবদ্ধ নয় বরং সুদীর্ঘ সময়ের সঠিক অভিজ্ঞতাও এর সমর্থক এবং সত্যায়নকারী। কেননা যদিও কুরআন শরীফ অনবরত ১৩০০ বছর ধরে স্বীয় গুণাবলী উপস্থাপনের মাধ্যমে هل من معارض (অর্থাৎ কোন প্রতিদ্বন্দ্বী আছে কি?) রূপী ডঙ্কা বাজিয়ে মানুষকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ময়দানে আহ্বান করছে আর সারা বিশ্বকে গগনবিদারী ধ্বনিতে বলছে যে, তা আপন বাহ্যিক রূপ ও অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যে অনন্য ও অতুলনীয় এবং কোনো জ্বিন ও মানুষের কাছে এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মোকাবিলা করার শক্তি নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন মানুষ এর সামনে দাঁড়ানোর সাহস দেখায় নি বরং এর ন্যূনতম একটি সূরা যেমন সূরা ফাতিহার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের সামনেও দাঁড়াতে পারে নি।

সুতরাং দেখ! এর চেয়ে বেশি স্পষ্ট ও পরিষ্কার নিদর্শন আর কী হবে যে, যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এই পবিত্র বাণী যে মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে তা প্রমাণিত আর দীর্ঘ অভিজ্ঞতাও এর নিদর্শনমূলক মর্যাদার অনুকূলে সাক্ষ্য দেয়? এই উভয় প্রকার সাক্ষ্য যা বুদ্ধিবৃত্তি ও সুদীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রমাণিত সত্যের মর্যাদা লাভ করেছে তা যদি কারো কাছে গ্রহণযোগ্য না হয় আর স্বীয় জ্ঞান ও কৌশল নিয়ে যদি কেউ গর্বিত হয়ে থাকে বা পৃথিবীর এমন কোনো মানুষের রচনাশৈলীতে প্রভাবিত হয়ে মনে করে যে, কুরআনের ন্যায় কোনো গ্রন্থ বা রচনা সে লিখতে পারে তাহলে আমরা প্রতিশ্রুতি অনুসারে সূরা ফাতিহার কিছু পরম সত্য তথ্য ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব উপস্থাপন করছি। সেক্ষেত্রে তার উচিত হবে সূরা ফাতিহার এসকল বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যের বিপরীতে স্বীয় কোনো রচনা উপস্থাপন করা। কিন্তু সূরা ফাতিহার সুমহান সত্য-তত্ত্ব বিশদভাবে বর্ণনা করার পূর্বে আমার বক্তব্য দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কা না করে পুনরায় বলছি যে, প্রতিদ্বন্দ্বীর একথা ভালোভাবে স্মরণ রাখা উচিত, যেমনটি আমি লিখে এসেছি যে, সূরা ফাতিহায় পুরো কুরআনের ন্যায় দুপ্রকার সৌন্দর্য বিদ্যমান, একটি বাহ্যিক অপরটি আধ্যাত্মিক বা অভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক সৌন্দর্য হলো, যেমনটি বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, এর বাক্য বা আয়াতে এমন পুষ্পময়তা, ঔজ্জ্বল্য, সংবেদনশীলতা, সৌন্দর্য (শোভা), মসৃণতা, আলংকারিকতা, মাধুর্য এবং বক্তব্যের সৌকর্য ও বিন্যাসের সৌন্দর্য বিদ্যমান যে, এসকল অর্থ এর চেয়ে উত্তম বা এর সমপর্যায়ের অন্য কোনো বাগ্মিতাপূর্ণ বাক্যগুচ্ছে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সারা পৃথিবীর প্রবন্ধকার ও

কবিরাও যদি সর্বসম্মতভাবে এর বিষয়বস্তু নিয়ে নিজেদের মতো করে সূরা ফাতিহার বাক্যগুলোর ন্যায় বা এর চেয়ে উত্তম কোনো বাগ্মিতাপূর্ণ বাক্যে তা লিখতে চায় তাহলে তা লেখা তাদের জন্য অসম্ভব। কেননা ১৩০০ বছর ধরে কুরআন করীম সারা বিশ্বের সামনে স্বীয় অনন্যতার দাবি উপস্থাপন করে আসছে। যদি সম্ভব হতো তাহলে অবশ্যই কোনো বিরুদ্ধবাদী এর মোকাবিলা করে দেখাত, কিন্তু এমন দাবির প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার মাধ্যমে সকল বিরোধীর লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা আর কুরআন শরীফের শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান প্রমাণিত হয়। কোনো বিরোধীর গত ১৩০০ বছর ধরে এভাবে কুরআনের বাক্যের সমমানের দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে অক্ষমতা আর সেসকল লাঞ্ছনা, লজ্জা ও অভিশাপকে হজম করা যা মিথ্যাবাদী ও নির্বাকদের ওপর বর্তায় তা একথারই স্পষ্ট প্রমাণ যে, সত্যিকার অর্থে তাদের জ্ঞানশক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যর্থ হয়েছে। যদি কেউ একথা স্বীকার না করে তাহলে সে নিজে বা কোনো সাহায্যকারীর সাহায্য নিয়ে কুরআনের সমমানের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করার দায়িত্ব তার ওপর বর্তাবে। যেমন, সূরা ফাতিহার বিষয়বস্তু নিয়ে অন্য কোনো বাগ্মিতাপূর্ণ বাক্য বানিয়ে দেখাক যা পরম বাগ্মিতা ও আলঙ্কারিতায় এর সমমানের হবে। আর যতক্ষণ এমনটি করবে না ততক্ষণ সেই প্রমাণ যা বিরোধীদের ১৩০০ বছর নীরব নির্বাক থাকার কারণে সত্যবাদীদের হাতে এসেছে তা কোন অর্থে বিশ্বাসের দিক থেকে দুর্বল হতে পারে না, বরং বিরোধীদের শত শত বছরের নীরবতা ও নির্বাক থাকা প্রমাণের সেই উৎকৃষ্ট মর্যাদা একে দান করেছে, যে মর্যাদা গোলাপ ফুল ইত্যাদির অনন্যতার ক্ষেত্রে অর্জিত হয় নি। কেননা এ পৃথিবীর জ্ঞানীগুণী ও শিল্পকারদের অন্য কোনো বিষয়ে এমনভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য বা অনুরূপ বিষয় উপস্থাপনের প্রেরণা যোগানো হয় নি আর এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে ব্যর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে কখনো তাদের এই ভয় দেখানো হয় নি যে, তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার ধ্বংসের মুখোমুখি করা হবে।

সুতরাং জানাকথা হলো, যে স্পষ্টতা, ঔজ্জ্বল্য ও প্রভার সাথে কুরআনের প্রভাব বিস্তারশক্তি ও বাগ্মিতা মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে হওয়া প্রমাণিত, সেভাবে গোলাপের শোভা, সৌন্দর্য ইত্যাদির অনন্য হওয়া আদৌ প্রমাণিত হয় না। সুতরাং এ তো গেলো সূরা ফাতিহা ও পুরো কুরআনের বাহ্যিক সৌন্দর্যের বিবরণ যার মাধ্যমে এর অনন্যতা এবং এর মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে হওয়া বিরোধীদের অক্ষমতার কারণে প্রমাণিত হয়ে গেছে। এখন আমরা পুনরায়

অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যাবলী ও সৌন্দর্যের বিষয় উল্লেখ করছি যেন চিন্তাশীলদের অন্তরে তা ভালোভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায়।

সুতরাং স্মরণ রাখা উচিত, যেভাবে প্রজ্ঞার মূর্ত প্রতীক খোদা তা'লা গোলাপে মানবদেহের জন্য বিভিন্ন প্রকার উপকারিতা অন্তর্নিহিত রেখেছেন, যেমন তা হৃদয়কে শক্তি জোগায়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও আত্মাকে শক্তিশালী করে, এছাড়াও আরো বেশকিছু রোগের জন্য উপকারী, অনুরূপভাবে খোদা তা'লা পুরো কুরআনের ন্যায় সূরা ফাতেহায় আধ্যাত্মিক রোগীদের জন্য নিরাময় অন্তর্নিহিত রেখেছেন এবং তাতে অভ্যন্তরীণ রোগব্যাধির সেই নিরাময় বিদ্যমান যা এ ছাড়া অন্য কোথাও আদৌ দেখা যায় নি। কেননা এতে সেসকল পরম সত্যের সমাহার ঘটেছে যা ধরাপৃষ্ঠ হতে হারিয়ে গিয়েছিল আর পৃথিবীতে যার নামগন্ধও অবশিষ্ট ছিল না। সুতরাং সেই পবিত্র বাণী পৃথিবীতে বৃথা ও নিরর্থক উদ্দেশ্যে আসে নি বরং সেই স্বর্গীয় জ্যোতি তখন বিকশিত ও প্রকাশিত হয়েছে যখন পৃথিবীর জন্য তা একান্ত আবশ্যক ছিল আর সে শিক্ষামালা নিয়ে এসেছে, পৃথিবীর সংশোধনের জন্য ভূপৃষ্ঠে যার বিস্তার ঘটানো একান্ত আবশ্যক ছিল। বস্তুত যেসব পবিত্র শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন ছিল, সত্যের যেসব তত্ত্ব প্রসার ও প্রচারের যারপরনাই আবশ্যকতা ছিল সেসব আবশ্যকীয় ও অনস্বীকার্য শাশ্বত ঐশী সত্যকে যথাসময় ও একান্ত প্রয়োজনের মুহূর্তে খোদা তা'লা এক অনন্য বাগ্মিতা ও আলংকারিকতায় সমৃদ্ধ করে বর্ণনা করেছেন। আর এ ব্যবস্থার পাশাপাশি ভ্রষ্টদের হেদায়েত ও সমসাময়িক যুগের সংশোধনের নিরিখে যা বর্ণনা করা আবশ্যক ছিল এর এক বিন্দুও বাদ দেন নি এবং অনাবশ্যক, অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত যা কিছু ছিল তা কোনো বাক্যে স্থান পায় নি। বস্তুত উন্নত মানের তত্ত্ব হওয়ার সুবাদে তার যে মহান মর্যাদা রয়েছে তা হলো সেই জ্যোতি ও পবিত্র সত্য আরো একটি অতি উন্নত পর্যায়ের মাহাত্ম্য ও আশিস (নিজের মাঝে) অন্তর্নিহিত রাখে আর তা হলো, এসব বৈশিষ্ট্য নিরর্থক এবং অকারণে প্রকাশ করা হয় নি বরং যত ধরনের অমানিশা ধরাপৃষ্ঠে বিস্তৃত ছিল আর কর্ম, জ্ঞান ও বিশ্বাসজনিত বিষয়ে যুগের অবস্থার ক্ষেত্রে যেরূপ অজ্ঞতা ও নৈরাজ্য আধিপত্য বিস্তার করেছিল সেসব নৈরাজ্যের প্রত্যেক শ্রেণির বিপরীতে পুরো শৌর্যবীর্য কাজে লাগিয়ে সকল অন্ধকার বিমোচন ও আলোর প্রসারের জন্য একান্ত যথাযথ ও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কৃপাবারির ন্যায় সেসকল সত্য পৃথিবীতে প্রকাশ করা হয়েছে। সত্যিকার অর্থে

সেই কৃপাবারিই ছিল যা চরম তৃষ্ণার্তদের প্রাণ রক্ষার জন্য আকাশ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। পৃথিবীর আধ্যাত্মিক জীবন নির্ভরশীল ছিল সেই আধ্যাত্মিক সুধা নাযিল হওয়ার ওপর আর এর তিল পরিমাণও এমন ছিল না যা যুগে বিরাজমান কোনো ব্যাধির মহৌষধ প্রমাণিত হয় নি। অধিকন্তু শত শত বছর চিরাচরিত ভ্রষ্টতায় নিপতিত থেকে বর্তমান যুগের অবস্থা একথা প্রমাণ করেছিল যে, সেই আলো অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া নিছক নিজের যোগ্যতাবলে তা সেসকল রোগ হতে নিরাময় লাভ করতে পারে না এবং স্বীয় অন্ধকারও নিজ শক্তিবলে দূরীভূত করতে পারে না, বরং তা একটি স্বর্গীয় জ্যোতির মুখাপেক্ষী যা স্বীয় সত্যের কিরণে পৃথিবীকে আলোকিত করবে আর তাদের দেখাবে যারা কখনো দেখে নি এবং তাদের বোঝাবে যারা কখনো বুঝে নি। এই স্বর্গীয় জ্যোতি পৃথিবীতে এসে কেবল এমন আবশ্যকীয় সত্য তত্ত্ব উপস্থাপনের কাজই করে নি যার নামগন্ধও ধরাপৃষ্ঠে অবশিষ্ট ছিল না, বরং স্বীয় আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যের জোরে অগণিত বক্ষে সত্য ও প্রজ্ঞার সে সকল মূল্যবান মণিমুক্তা সঞ্চার করেছে এবং বহু হৃদয়কে স্বীয় মোহনীয় চেহারার প্রতি আকৃষ্ট করেছে। এছাড়া নিজের শক্তিশালী প্রভাব বা কার্যকারিতার জোরে অনেককে জ্ঞান ও কর্মের মহান মানে উপনীত করেছে।

এখন এ উভয় প্রকার সৌন্দর্য যা সূরা ফাতিহা ও পুরো কুরআনে বিদ্যমান তা ঐশী বাণীর অনন্যতা প্রমাণের ক্ষেত্রে এমন সমুজ্জ্বল প্রমাণ, যেমনটি কিনা গোলাপে বিদ্যমান সেসকল বৈশিষ্ট্য, যা সবার দৃষ্টিতে মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে বলে স্বীকৃত, বরং সত্য কথা হলো, স্পষ্টতই এসকল বৈশিষ্ট্য যতটা অসাধারণ ও মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে, সেই মানের বৈশিষ্ট্যাবলী গোলাপে আদৌ দেখা যায় না। এসকল বৈশিষ্ট্যের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব এবং অনন্যতা তখন প্রকাশ পায় যখন মানুষ সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলোর কথা স্মৃতিপটে জাগ্রত করবে আর এর সামগ্রিক রূপ-গঠন-গড়ন ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তা ও প্রণিধান করবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রধানত ধরুন, একটি গ্রন্থের বা বাণীর বাক্যমালা এতটা বাগ্মিতাপূর্ণ, আলংকারময়, মসৃণ, সুমিষ্ট, সাবলীল, দৃষ্টিনন্দন এবং পুষ্পিত হওয়া উচিত যেন কোনো মানুষ নিজের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণতা ও উৎকর্ষতার মানে সজ্জিত করে সেসকল অর্থসম্বলিত এমন বাক্যমালা যদি গঠন করতে চায় যা এই বাগ্মিতাপূর্ণ গ্রন্থে বিদ্যমান, সেই মানবীয় বাক্য বা উক্তির পক্ষে আলংকারিকতা ও পুষ্পময়তার সেই মানে পৌঁছা যেন আদৌ সম্ভব না হয়।

একইসাথে এই দ্বিতীয় চিত্র হৃদয়ে জাগ্রত করলে, অর্থাৎ এই বাক্যের বিষয়বস্তু এমন সত্য এবং সূক্ষ্ম তথ্য ও তত্ত্বসম্বলিত হওয়া চাই যা হবে সত্যিকার অর্থে অতি উন্নত মানের সত্য। আর কোনো বাক্য, কোনো শব্দ ও অক্ষর যেন এমন না হয় যার ভিত্তিমূলে প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্য থাকবে না। একইসাথে যদি ধারণার জগতে এই তৃতীয় চিত্র আনা হয় যে, সেই সকল সত্য এমন হওয়া উচিত, বর্তমান যুগের অবস্থা হবে যার একান্ত মুখাপেক্ষী। অনুরূপভাবে যদি এই চতুর্থ ধারণা পোষণ করা হয় যে, সেসব সত্য এতটা অনন্য ও অতুলনীয় হওয়া উচিত, যেন কোনো বিজ্ঞ ও দার্শনিক এমন না থাকে যে নিজের চিন্তা ও মননের জোরে সেসব আবিষ্কার করে থাকবে। আবার এই পঞ্চম ধারণা করলে অর্থাৎ যে যুগে সেসব সত্য প্রকাশিত হয়েছে তা এক নুতন আশীর্বাদস্বরূপ প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয় আর তা প্রকাশ হওয়ার পূর্বে এই সরল ও সঠিক পথ সম্পর্কে সেযুগের লোকদের সম্পূর্ণভাবে অনবহিত থাকা বাঞ্ছনীয়।

একইসাথে যদি এই ষষ্ঠ ধারণা পোষণ করা হয় যে, সেই বাণীতে একপ্রকার ঐশী কল্যাণ প্রমাণিত হওয়া উচিত যেন এর অনুসরণে সত্যান্বেষীদের খোদা তা'লার সাথে একটি সত্যিকার বন্ধন এবং ভালোবাসা সৃষ্টি হয় আর এর মাঝে যেন সেই জ্যোতি প্রজ্জ্বল হয় যা খোদার প্রিয়দের মাঝে সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। এসব চিত্র সম্মিলিতভাবে এমন একটি আবহের অবতারণা করে যে, সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি কালবিলম্ব না করে নির্দ্বিধায় অকপটে স্বীকার করবে যে, মানবীয় রচনা বা উক্তির পক্ষে এমন উৎকৃষ্ট মর্যাদা-সংবলিত হওয়া কঠিন ও অসম্ভব, বরং অলৌকিক বিষয়। নিঃসন্দেহে এসব বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্বকে সম্মিলিতরূপে দেখলে এর মাঝে একটি প্রতাপান্বিত রূপ চোখে পড়ে যা বুদ্ধিমানদের এই নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, মানবীয় শক্তির বলে এই পুরো বিষয় সাধিত হওয়ার ধারণা অযৌক্তিক ও অকল্পনীয় এবং এমন বিস্ময়কর রূপ গোলাপ ফুলেও আদৌ পরিদৃষ্ট হয় না। এর কারণ হলো, কুরআন শরীফে একটি বর্ধিত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান অর্থাৎ এর উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলী প্রমাণের দিক থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট যা প্রকৃতপক্ষে এর অনন্যতার ভিত্তি। এ কারণেই প্রতিদ্বন্দ্বী বা বিরোধীরা যখন জানতে পারে যে, এর একটি অক্ষরও এমন স্থানে রাখা হয় নি যা প্রজ্ঞা ও যুক্তির পরিপন্থি এবং এর একটি বাক্যও এমন নয় যা যুগের সংশোধনের জন্য আবশ্যকীয় নয়, এছাড়া ভাষার আলংকারিকতার পরম পরাকাষ্ঠাও দেখুন! এর এক বাক্যবিশিষ্ট কোনো

আয়াতকে পরিবর্তন করে সেই স্থানে দ্বিতীয় কোন বাক্য লেখা যাবে, এমনটিও কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় এসব প্রকাশ্য শ্রেষ্ঠত্ব অবলোকনে প্রতিদ্বন্দ্বীর মনে গভীর প্রভাব পড়ে। অবশ্য কোনো নির্বোধ ব্যক্তি, যে এসব বিষয়ে কখনো চিন্তাই করে নি সে নির্বুদ্ধিতার কারণে হয়ত প্রশ্ন করবে যে, এসব গুণাবলী যে সূরা ফাতিহা ও পুরো কুরআনের ক্ষেত্রেই সত্য– এর প্রমাণ কী? তাই স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, একথার স্পষ্ট প্রমাণ হলো, যারা কুরআন শরীফের অনন্য শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে ভেবেছে এবং এর বাক্যাবলীকে এমন উন্নত মানের বাগ্মিতা ও প্রাঞ্জলতার পর্যায়ে পেয়েছে, তারা এর অনুরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়েছে। এছাড়া এর সূক্ষ্ম ও সত্য তত্ত্বকে এমন উন্নতমানে পেয়েছে যে, কোন যুগে এর দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে নি।

অধিকন্তু তারা এতে সেসব বিস্ময়কর প্রভাব পর্যবেক্ষণ করেছে যা মানবীয় বাণীতে আদৌ দেখা যায় না। এছাড়া এতে যে পবিত্র বৈশিষ্ট্য দেখেছে তা হলো, তা খেলার ছলে ও বৃথা কথাবার্তা হিসেবে অবতরণ করে নি বরং সত্যিকার প্রয়োজনে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তারা এসব শ্রেষ্ঠত্ব পর্যবেক্ষণ করে অবলীলায় এর অদ্বিতীয় মাহাত্ম্য স্বীকার করেছে। তাদের মাঝে যারা জনমদুর্ভাগা হওয়ার কারণে ঈমানের ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত, তাদের অন্তরেও এই অনন্য বাণীর ত্রাস ও প্রতাপ ভর করে, ফলে তারাও হতবাক ও দিশেহারা হয়ে বলে ওঠে, এটিতো স্পষ্ট জাদু। এছাড়া একথার মাধ্যমেও কুরআন শরীফের অনন্য ও অতুলনীয় হওয়া সম্পর্কে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির একটি শক্তিশালী প্রমাণ লাভ হয় এবং একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ হাতে আসে, অর্থাৎ যদিও ১৩০০ বছর ধরে কুরআন শরীফ নিজেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য সর্বাত্মকভাবে বিরোধীদের আত্মাভিমান জাগ্রত করে আসছে আর নিরুত্তর ও নির্বাক থেকেও যারা বিরোধিতা ও অস্বীকারে অনড় থাকে তাদের নাম দুষ্কৃতকারী, নোংরা, অভিশপ্ত ও জাহান্নামী রাখে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরোধীরা নপুংশক ও হিজড়াদের ন্যায় নির্লজ্জতার চরম ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এই পুরো লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং অপমান-অসম্মানকেই বরণ করে নিয়েছে। আর তারা নিজেদের নাম মিথ্যাবাদী, ইতর, নির্লজ্জ, নোংরা, অপবিত্র, দুষ্কৃতকারী, বেঈমান ও জাহান্নামী রাখা শিরোধার্য করে নিয়েছে অথচ ছোট্ট একটি সূরারও মোকাবিলা করতে পারে নি। এছাড়া সেসব ঔৎকর্ষ, বৈশিষ্ট্যাবলী ও মাহাত্ম্য এবং সত্যে কোনো ত্রুটিও দেখাতে পারে নি যা খোদার বাণী বা কুরআন

উপস্থাপন করেছে। অথচ অস্বীকারের ক্ষেত্রে আমাদের বিরোধীদের জন্য আবশ্যক ছিল এবং এখনো আবশ্যক যেন তারা যদি নিজেদের অবিশ্বাস ও ঈমানহীনতাকে ছাড়তে না চায় তাহলে কুরআনের কোনো সূরার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা আর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাদের সামনে এমন কোনো বাণী নিয়ে আসা যাতে সেসকল বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ঔৎকর্ষ বিদ্যমান থাকবে যা কুরআন শরীফের সবচেয়ে ছোট্ট সূরায়ও বিদ্যমান।

অর্থাৎ এর বাক্যাবলী সত্য, সততা এবং সত্যিকার প্রয়োজন মেটানোর আবশ্যকীয় অনুষঙ্গের বৈশিষ্ট্যে সজ্জিত হয়ে আলংকারিকতার এমন মহান পর্যায়ে থাকা আবশ্যক যেখানে কোনো মানুষের জন্য সেই অর্থ অন্য এমন কোনো বাগ্মিতাপূর্ণ বাক্যে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে না, অধিকন্তু এর বিষয়বস্তু উন্নতমানের সত্যসংবলিত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং সেসব সত্য যেন অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয়ভাবে লেখা না হয় বরং যেন একান্ত প্রয়োজনে তা লেখা আবশ্যক হয়েছে বলে বিবেচিত হয়। এর পাশাপাশি সেসব সত্য এমন হওয়া বাঞ্ছনীয়, যা প্রকাশের পূর্বে সারা পৃথিবী সে সম্পর্কে থাকবে অনবহিত আর এর আত্মপ্রকাশ একটি নতুন নেয়ামতসদৃশ গণ্য হবে। এসব গুণের সাথে তাতে এক আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যও বিরাজমান থাকা উচিত, অর্থাৎ কুরআনের মতো এতে সেসকল প্রকাশ্য কার্যকারিতাও থাকা আবশ্যক যার প্রমাণ আমরা এ গ্রন্থে দিয়েছি এবং এর নিত্যনতুন নিদর্শন সকল যুগে দেখাতে প্রস্তুত। যতক্ষণ কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন না করবে ততক্ষণ তার ব্যর্থতা কুরআন শরীফের অনন্যতাই প্রমাণ করবে। কুরআন শরীফের অনন্যতার যে দিকগুলো এখানে লেখা হয়েছে এটি আমরা অল্প করে ও স্বল্প পরিসরে লিপিবদ্ধ করেছি। আমরা যদি কুরআন শরীফে বিদ্যমান অন্যসব সৌন্দর্য ও গুণাবলীকেও দৃষ্টান্ত দাবি করতে গিয়ে আবশ্যকীয় শর্ত নির্ধারণ করি, যেমন আমাদের বিরোধীদের যদি বলি যে, যেভাবে কুরআন শরীফ সকল ধর্মীয় তত্ত্ব ও সত্যকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে এবং কোন ধর্মীয় সত্য এর আয়ত্তের বাইরে নয়, যেভাবে তা শত শত অদৃশ্য বিষয়াদি ও ভবিষ্যদ্বাণীকে পরিবেষ্টন করে আর ভবিষ্যদ্বাণীও এমন ক্ষমতার পরিচায়ক যাতে স্বীয় সম্মান ও শত্রুর অসম্মান, স্বীয় উন্নতি ও শত্রুর অবনতি, স্বীয় বিজয় আর শত্রুর পরাজয় দেখা যায়; এই সকল বৈশিষ্ট্য পেছনে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলীর পাশাপাশি স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক রচনায় উপস্থাপন করে দেখাক তবে এই শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধীদের জন্য আসবে ধ্বংসের পর

ধ্বংস এবং উপর্যুপরি মৃত্যু। কিন্তু যেহেতু ইতঃপূর্বে কুরআনের যেসব বৈশিষ্ট্য লেখা হয়েছে তা অন্ধ হৃদয়ের অধিকারী শত্রুকে অভিযুক্ত, নির্বাক ও ব্যর্থ করার জন্য যথেষ্ট আর এতেই আমাদের বিরোধীদের অবস্থা এমন হবে যার ফলস্বরূপ তারা লাশের চেয়েও শোচনীয় অবস্থায় অধঃপতিত হবে। তাই দৃষ্টান্ত দাবি করার জন্য কুরআন শরীফের সকল সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করা অনাবশ্যক। এছাড়া সকল বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব লিপিবদ্ধ করলে বইয়ের কলেবর অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই বিষধর প্রাণী হত্যা করার জন্য পর্যাপ্ত অস্ত্র মনে করে এতটুকুই উপস্থাপন করা হচ্ছে।

এখন সকল প্রকার ছাড় দিয়ে ও বোঝা কমিয়ে বিরোধীদের কাছে যদিও কুরআন শরীফের সবচেয়ে ছোট্ট একটি সূরার দৃষ্টান্ত তলব করা হচ্ছে, কিন্তু সকল জ্ঞানী ব্যক্তির সামনে স্পষ্ট যে, লেলিহান লালসা, চরম শত্রুতা এবং ভয়াবহ বিরোধিতা ও শত্রুতা সত্ত্বেও বিরোধীরা মোকাবিলা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে শুরু থেকেই ব্যর্থ হয়ে আসছে আর এখনো অক্ষম আর কারো টু শব্দটি করারও জো নেই। যদিও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যর্থ হওয়া তাদেরকে লাঞ্ছিতই প্রমাণ করে, দোযখী আখ্যায়িত করে, তাদের কাফের ও ঈমানহীন উপাধী দেয়, তাদের নাম নির্লজ্জ ও বেহায়া রাখে, কিন্তু তা সত্ত্বেও লাশের মতো তাদের মুখ থেকে কোন শব্দ বের হয় না। সুতরাং নিরুত্তর থাকার সকল লাঞ্ছনা মাথা পেতে নেয়া এবং সকল লজ্জাকর নাম নিজের জন্য বরণ করা, চরম নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনাকে শিরোধার্য করা একথার অকাট্য প্রমাণ যে, সত্যের এই সূর্যের সামনে এসকল ইতর বাদুড়দের এক দণ্ডও দাঁড়ানোর শক্তি নেই। কাজেই যেখানে সেই সত্যের সূর্যের এত প্রখর আলো চতুর্দিক থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে যার সামনে আমাদের বাদুড়-প্রকৃতির শত্রু অন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সেখানে এটি ঘৃণ্য অহংকার ও চরম অজ্ঞতা বইকি যে, গোলাপের গুণাবলীকে যা কুরআনের সৌন্দর্যরাজির মোকাবিলায় দুর্বল, ক্ষীণ, অর্থহীন ও প্রমাণহীন, অনন্যতার এমন পর্যায়ে জ্ঞান করা হবে যে, মানবীয় শক্তি তার দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে অক্ষম কিন্তু সেই উন্নত পর্যায়ের গুণাবলী যা গোলাপ ফুলের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্টাবলী থেকে বহুগুণে উৎকৃষ্ট ও শ্রেয় এবং প্রমাণের ক্ষেত্রে দৃঢ়, সেটি সম্পর্কে ধারণা করা হবে যে, মানুষ তা বানাতে সক্ষম! অথচ যেখানে মানুষের মাঝে একটি গোলাপ ফুলের দৃষ্টান্ত উপস্থাপনেরও সামর্থ্য নেই যা এক মুহূর্ত সতেজ ও আকর্ষণীয় দেখালে পরের মুহূর্তে নিস্তেজ হয়ে

একেবারেই নেতিয়ে যায়, বাসি ও কুৎসিত রূপ ধারণ করে, অধিকন্তু এর দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্য হারিয়ে যায়, এর পাপড়িগুলো একটি অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝরে যায়, সেখানে এমন সত্যিকার ফুলের মোকাবিলা করা কী করে সম্ভব যার ভাগ্যে চিরস্থায়ী বাদশাহ চিরবসন্ত নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং যাকে চিরতরে ঝরার প্রতিকূল বাতাসের ছোঁয়া থেকে সুরক্ষিত রেখেছেন, যার সজীবতা, মসৃণতা এবং সৌন্দর্য ও শোভায় কখনো তারতম্য ঘটে না। এছাড়া বিমর্ষতা ও বিবর্ণতা কখনো এর পবিত্র সত্তায় অনুপ্রবেশ করে না, বরং যতই পুরোনো হয় ততই এর সতেজতা ও শ্যামলরূপ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে আর এর বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যাবলী অধিক হারে প্রকাশিত হতে থাকে এবং এর সত্য তত্ত্ব ও সূক্ষ্ম তথ্য মানুষের সামনে ব্যাপকহারে প্রকাশিত হয়। সুতরাং এমন সত্যিকার ফুলের সুমহান শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা অস্বীকার করা চরম অভ্যন্তরীণ অন্ধত্ব নয় কি? যাহোক, যদি কেউ এমন অন্ধ হয়ে থাকে, অর্থাৎ নিজের অদূরদর্শিতার কারণে এসব সৌন্দর্যের মাহাত্ম্য না বুঝে তাহলে আমি ঐশী বাণীর অনন্যতার যে প্রমাণ দিয়েছি, যেভাবে আমি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই পবিত্র বাণীর মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে হওয়া প্রমাণ করেছি, তারাও সেসকল কুরআনী শ্রেষ্ঠত্বের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করুক। কোনো মানুষের কথায় অনুরূপ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করুক ঐশী বাণীতে যার উপস্থিতি আমি প্রমাণ করেছি। এখন অকাট্য প্রমাণ হিসেবে সূরা ফাতিহার কিছু সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও সত্য তথ্য নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। কিন্তু প্রথমে সূরা ফাতিহা লিখে তারপর এর সুমহান তত্ত্বকথা লেখা আরম্ভ করব। সূরা ফাতিহা হলো–

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ○ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ○ الرَّحۡمٰنِ
الرَّحِیۡمِ ○ مٰلِكِ یَوۡمِ الدِّیۡنِ ○ اِیَّاكَ نَعۡبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسۡتَعِیۡنُ ○
اِہۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ ○ صِرَاطَ الَّذِیۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَیۡہِمۡ ۬ۙ غَیۡرِ
الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَیۡہِمۡ وَ لَا الضَّآلِّیۡنَ ○

(সূরা আল ফাতিহা: ১-৭)

এ সূরার তফসীর নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে যাতে এই সূরায় বিধৃত তত্ত্ব ও সত্য তথ্য দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছুটা উপস্থাপিত হবে। بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ উল্লিখিত সূরার এটি প্রথম আয়াত আর কুরআন শরীফের অন্যান্য সূরায়ও তা অন্তর্ভুক্ত

হয়েছে। কুরআন শরীফের আরো একটি স্থানে এই আয়াত রয়েছে। কুরআন শরীফে যত ব্যাপকভাবে এই আয়াতের পুনরাবৃত্তি দেখা যায় অন্য কোন আয়াতের ততটা পুনরাবৃত্তি দেখা যায় না। ইসলাম ধর্মে প্রতিষ্ঠিত রীতি হলো এমন প্রতিটি কাজ যার উদ্দেশ্য কল্যাণ ও আশিস সন্ধান করা তার প্রারম্ভে আশিস ও সাহায্য যাচনার মাধ্যম হিসেবে এই আয়াতই পঠিত হয়। তাই এই আয়াত শত্রু-মিত্র ও ছোটোবড়ো সবার মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এমনকি কোনো ব্যক্তি কুরআনের সকল আয়াত সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অনবহিত থাকলেও গভীরভাবে আশা করা যায় যে, সে এই আয়াত সম্পর্কে আদৌ অনবহিত থাকবে না।

এখন এই আয়াত যেসব পরিপূর্ণ ও উৎকৃষ্ট সত্যসংবলিত তা শুনে নেয়া উচিত। অতএব সেগুলোর একটি হলো– এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য আর তা হলো দুর্বল ও অজ্ঞ বান্দাদের এই তত্ত্বজ্ঞানের কথা শিক্ষা দেয়া যে, ‘ওয়াজিবুল ওজুদ’ (অর্থাৎ চিরস্থায়ী আবশ্যকীয় সত্তা)-এর সবচেয়ে বড় নাম বা ইসমে আযম হলো ‘আল্লাহ্’, যা কুরআনের ঐশী পরিভাষা অনুসারে সকল শ্রেষ্ঠতম গুণের সমাহার এবং সকল ইতরতা হতে পবিত্র, চিরসত্য উপাস্য, এক ও অদ্বিতীয় এবং সকল কল্যাণের উৎসস্থল সত্তার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই ইসমে আযমের বা সুমহান নামের বহু গুণের মাঝে যে দুটো গুণ বিসমিল্লাহ্-তে উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো রহমানিয়্যত ও রহিমিয়্যত। ঐশী গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়া, এর জ্যোতি এবং কল্যাণরাজি প্রকাশ পাওয়া সেই দুই বৈশিষ্ট্যেরই ফল। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, খোদার পবিত্র বাণী বা গ্রন্থ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া এবং বান্দাদের সে সম্পর্কে অবহিত করা হলো রহমানিয়্যত বৈশিষ্ট্যের দাবি, কারণ রহমানিয়্যত বৈশিষ্ট্যের বিশেষত্ব হলো (পরবর্তীতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা হবে) তা কোনো কর্মীর কর্ম ছাড়াই শুধু ঐশী দান ও বদান্যতার গুণে প্রকাশিত হয়। যেমন, খোদা তা'লা সূর্য, চন্দ্র, পানি, বাতাস ইত্যাদি বান্দাদের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এই উদারতা ও বদান্যতার পুরোটাই রহমানিয়্যত বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টিকোণ থেকে। কোনো ব্যক্তি এই দাবি করতে পারবে না যে, এই বস্তু আমার কোন কর্মের ফসলস্বরূপ সৃষ্টি করা হয়েছে। একইভাবে খোদার কালাম বা গ্রন্থ, যা বান্দাদের সংশোধন ও পথপ্রদর্শনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে সেটিও এই বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টিকোণ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে

এই দাবি করতে পারে, আমার কোন কর্ম, কোন চেষ্টা বা কোন অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার প্রতিদানস্বরূপ শরীয়তসংবলিত খোদার পবিত্র বাণী অবতীর্ণ হয়েছে। যদিও এ কারণেই আজ পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ অতিবাহিত হয়েছে যারা বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক পবিত্রতার এবং সাধনা (জোহদ) ও ইবাদতের মাঝে জীবনযাপনের দাবিদার ছিল, কিন্তু খোদার পবিত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বা বাণী যা তাঁর অবশ্যকরণীয় নির্দেশাবলী ও শিক্ষামালা পৃথিবীতে নিয়ে এসেছে আর তাঁর ইচ্ছা সম্পর্কে সৃষ্টিকে অবহিত করেছে তা সেই বিশেষ সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে যখন এর অবতরণের প্রয়োজন ছিল। অবশ্য খোদার পবিত্র বাণী সেসব লোকের ওপর নাযিল হওয়া আবশ্যক যারা পবিত্রতা ও অভ্যন্তরীণ শুচিতায় মহান মর্যাদা রাখেন। কেননা পবিত্র সত্তার নোংরা ব্যক্তির সাথে কোন সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য নেই। কিন্তু সর্বত্র পবিত্রতা ও অভ্যন্তরীণ শুচিতাই ঐশী বাণী বা গ্রন্থ নাযিল হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় শর্ত হবে তা আদৌ আবশ্যক নয়, বরং খোদার সত্য শরিয়ত ও শিক্ষার অবতরণ সত্যিকার প্রয়োজনে হয়ে থাকে।

সুতরাং যেখানেই সত্যিকার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং যুগের সংশোধনের জন্য ঐশী বাণী অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক মনে হয়েছে প্রজ্ঞার মূর্ত প্রতীক খোদা সেযুগে গ্রন্থ বা বাণী অবতীর্ণ করেছেন। অন্য কোন যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষও যদি তাকওয়া ও পবিত্রতার গুণে গুণান্বিত থাকে আর তারা যতই পবিত্র ও অভ্যন্তরীণভাবে পরিচ্ছন্ন হোক না কেন তাদের প্রতি খোদার সেই মহিমামণ্ডিত বাণী অবতীর্ণ হয় না যা ঐশী সত্য শরীয়তসংবলিত হবে। অবশ্য কিছু সংখ্যক পবিত্রাত্মা মানুষের সাথে মহা সম্মানিত খোদার কথোপকথন ও বাক্যালাপ হয়ে যায় আর সেটিও তখন হয় যখন ঐশী প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে সত্যিকার অর্থে সেসব কথোপকথনের কোন প্রয়োজন দেখা দেয়। এই উভয় প্রকার প্রয়োজনের মাঝে পার্থক্য হলো, সত্য শরীয়ত অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন তখন দেখা দেয় যখন পৃথিবীর মানুষ ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তির কারণে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় আর তাদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য একটি নতুন শরিয়তের প্রয়োজন দেখা দেয় যা তাদের সমসাময়িক ব্যাধির যথাযথভাবে নিরাময় করতে পারে, তাদের মধ্যকার অমানিশা ও অন্ধকারকে নিজের উৎকৃষ্ট ও নিরাময়ী বর্ণনার জ্যোতিতে পুরোপুরি দূরীভূত করতে পারে, অধিকন্তু যুগের নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির জন্য যেমন চিকিৎসার

প্রয়োজন অনুরূপ চিকিৎসা যেন স্বীয় জোরালো বক্তৃতার মাধ্যমে করতে সক্ষম হয়। কিন্তু আউলিয়াউল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র বন্ধুদের সাথে যে বাক্যালাপ ও কথোপকথন হয় তার জন্য খুব সম্ভব এই মহান প্রয়োজন দেখা দেয়া আবশ্যক নয়, বরং অনেক সময় সেই বাক্যালাপের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে সেই ওলীর (অর্থাৎ খোদার বন্ধুর) মনকে কোনো সমস্যা ও কষ্টের সময় ধৈর্য ও অবিচলতার পোশাকে সজ্জিত করা বা কোনো দুঃখ ও কষ্টের আধিক্যের সময় তাকে কোন শুভসংবাদ প্রদান করা। কিন্তু নবী ও রসূলদের প্রতি খোদা তা'লার যে সর্বোৎকৃষ্ট ও পবিত্র বাণী অবতীর্ণ হয় তা যেভাবে আমরা এখনই উল্লেখ করেছি, কেবল সেই সত্য প্রয়োজন দেখা দিলেই অবতীর্ণ হয় যখন খোদার সৃষ্টির জন্য তা নাযিল হওয়ার একান্ত প্রয়োজন দেখা দেয়। বস্তুত সত্যিকারের প্রয়োজনই ঐশী বাণী অবতীর্ণ হওয়ার আসল কারণ। যেভাবে তোমরা দেখে থাক, যখন পুরো রাত অন্ধকারে ডুবে যায় বা অমাবস্যা হয়, কোনো আলো অবশিষ্ট থাকে না তখনই তোমরা বুঝতে পার যে, এখন নতুন মাসের আগমন সন্নিকট। একইভাবে যখন ভ্রষ্টতার অমানিশা পৃথিবীতে ভয়ংকরভাবে ছেয়ে যায় তখন সুস্থ বিবেক সেই আধ্যাত্মিক চন্দ্র উদিত হওয়াকে খুবই নিকটবর্তী মনে করে। অনুরূপভাবে যখন অনাবৃষ্টির কারণে মানুষ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয় তখন বুদ্ধিমান মানুষ নিশ্চিত হয় যে, অচিরেই রহমতবারি বর্ষিত হতে যাচ্ছে। যেভাবে খোদা প্রাকৃতিক নিয়মেও কিছু মাস বর্ষাকালের জন্য নির্ধারিত রেখেছেন, অর্থাৎ সেসব মাসে যে বৃষ্টি বর্ষিত হয় তার অর্থ এটি করা হয় না যে, এ মাসগুলোতে মানুষ বেশি পুণ্যকর্ম করে আর অন্যান্য মাসে অনাচার ও পাপাচারে লিপ্ত থাকে। বরং এটি বোঝা উচিত যে, এগুলো সেই মাস যাতে কৃষকদের বৃষ্টির প্রয়োজন আর যেসব মাসে বৃষ্টি হওয়া সারা বছরের সতেজতার কারণ হয়ে থাকে। একইভাবে ঐশী বাণী বা গ্রন্থ কোনো ব্যক্তির পবিত্রতা ও তাকওয়ার কারণে অবতীর্ণ হয় না, অর্থাৎ কোন ব্যক্তির পরম পবিত্রতা ও অভ্যন্তরীণভাবে পরিচ্ছন্নতা বা সততার জন্য ক্ষুৎপিপাসা সেই গ্রন্থ অবতরণের কারণ হতে পারে না। বরং যেভাবে বেশ কয়েকবার লিখে এসেছি যে, ঐশী বাণী নাযিল হওয়ার আসল কারণ হয়ে থাকে সত্যিকারের প্রয়োজন। অর্থাৎ পৃথিবীতে বিরাজমান অন্ধকার ও অমানিশা একটি স্বর্গীয় আলোকে হাতছানি দিয়ে ডাকে যেন সেই আলো

অবতীর্ণ হয়ে অন্ধকারকে দূরীভূত করতে পারে। সেদিকেই খোদা তা'লা স্বীয় পবিত্র বাণী বা গ্রন্থে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করেছেন–

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

(সূরা আল ক্বদরঃ ২)

এই লাইলাতুল কদর স্বীয় সুখ্যাত ও সুবিদিত অর্থের নিরিখে একটি মহান রাত। কিন্তু কুরআনের ইঙ্গিত হতে এটিও বোঝা যায় যে, পৃথিবীর অমানিশা কবলিত অবস্থাও নিজের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যে লাইলাতুল কদরের মর্যাদা রাখে এবং সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে নিষ্ঠা, ধৈর্য, তাকওয়া ও ইবাদত খোদার দৃষ্টিতে গভীর মূল্য রাখে। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থাই ছিল যা মহানবী (সা.)-এর যুগে চরম পর্যায়ে পৌঁছে এক মহান আলো অবতরণের দাবি করছিল। অধিকন্তু সেই অমানিশাকে দেখে এবং অন্ধকারে নিমজ্জিত বান্দাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে রহমানিয়্যত বৈশিষ্ট্য উথলে ওঠে আর স্বর্গীয় আশিসরাজি মর্ত্যের প্রতি স্নেহদৃষ্টি দান করে। সুতরাং সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা পৃথিবীর জন্য কল্যাণ বয়ে আনে আর পৃথিবীও তা থেকে এক মহান কৃপার ভাগ পায়, অর্থাৎ একজন সর্বমহান মানব ও রসূলদের নেতা পৃথিবীকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য এসেছেন যার সমতুল্য কেউ সৃষ্টি হয় নি আর হবেও না। তিনি পৃথিবীর হেদায়েতের জন্য এসেছেন এবং পৃথিবীর জন্য সেই সমুজ্জ্বল গ্রন্থ এনেছেন যার দৃষ্টান্ত কখনো কোনো চোখ দেখে নি।

অতএব এটি খোদার অপার করুণার এক সুমহান বহিঃপ্রকাশ যে, তিনি অন্ধকার ও অমানিশার সময় এমন মহান জ্যোতি অবতীর্ণ করেছেন যার নাম ফুরকান আর যা সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করে থাকে এবং যেটি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত ও মিথ্যাকে নিশ্চিহ্ন করে দেখিয়েছে। এটি তখন পৃথিবীতে এসেছে যখন পৃথিবী একপ্রকার আধ্যাত্মিক মৃত্যুর শিকার ছিল এবং জল ও স্থলে ভয়াবহ এক নৈরাজ্য বিরাজমান ছিল। সুতরাং এটি অবতীর্ণ হয়ে সেই কার্য সাধন করে দেখিয়েছে যেদিকে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা ইঙ্গিত করে বলেছেন–

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

(সূরা আল হাদীদঃ ১৮)

অর্থাৎ পৃথিবী মৃত্যুর শিকারে পরিণত হয়েছিল, এখন খোদা এটিকে নতুনভাবে জীবিত করছেন। এখন একথা ভালোভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, পৃথিবীকে

জীবিত করার জন্য যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তা রহমানিয়্যত বৈশিষ্ট্যের উচ্ছ্বাসে হয়েছে। একই বৈশিষ্ট্য কখনো আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থে উদ্বেলিত হয়ে দুর্ভিক্ষ কবলিতদের পরিচর্যা করে আর শুষ্ক ভূমিতে রহমতবারি বর্ষণ করে। আবার সেই বৈশিষ্ট্যই কখনো আধ্যাত্মিকভাবে উচ্ছ্বাসিত হয়ে সেসব ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্তদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে, যারা ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তির কবলে পড়ে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। আর যা আধ্যাত্মিক জীবনের উৎস সত্য ও সততারূপী রসদ তাদের কাছে থাকে না। সুতরাং দয়ার মূর্তপ্রতীক রহমান খোদা যেভাবে প্রয়োজনের সময় তাকে দৈহিক খাবার দান করেন, অনুরূপভাবে তিনি স্বীয় রহমতের দাবি মোতাবেক সত্যিকারের প্রয়োজনে আধ্যাত্মিক খোরাকও সরবরাহ করেন। অবশ্য এটি সত্যকথা যে, খোদার বাণী সেসব মনোনীত ব্যক্তিবর্গের প্রতি অবতীর্ণ হয় যাদের প্রতি খোদা সন্তুষ্ট হন। আর তাদের সাথে তিনি বাক্যালাপ ও কথোপকথন করেন যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। কিন্তু একথা আদৌ ঠিক নয় যে, যার প্রতি খোদা সন্তুষ্ট তার প্রতি সত্যিকারের কোনো প্রয়োজন ছাড়াই অনর্থক ঐশী গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়ে যাবে বা খোদা প্রকৃত প্রয়োজন ছাড়াই কারো প্রকৃতিগত পবিত্রতার কারণে সবসময় তার সাথে অবধারিতভাবে কথা বলতে থাকবেন, বরং খোদার গ্রন্থ তখন অবতীর্ণ হয় যখন সত্যিকার অর্থে এর অবতরণের প্রয়োজন দেখা দেয়। সুতরাং সারকথা হলো, আল্লাহ্‌র ওহী অবতীর্ণ হওয়ার আসল কারণ হলো তাঁর রহমানিয়্যত, কোনো কর্মীর কর্ম নয়। এটি অতি সত্য একটি কথা যা সম্পর্কে আমাদের বিরোধী ব্রাহ্ম প্রমুখরা অনবহিত।

এরপর বোঝা উচিত যে, কোন ব্যক্তির ঐশী বাণীর কল্যাণে কল্যাণমণ্ডিত হওয়া এবং এর কল্যাণ ও জ্যোতি থেকে লাভবান হয়ে গন্তব্যে পৌঁছা আর স্বীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টার সুফল লাভ করা রহীমিয়্যত বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে সংঘটিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে রহমানিয়্যতের কথা বলার পর খোদা তা'লা রহীমিয়্যতের বিবরণ দিয়েছেন যেন স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ঐশী বাণীর যে প্রভাব মানব হৃদয়ে পড়ে থাকে তা বাড়ে রহীমিয়্যত বৈশিষ্ট্যের কল্যাণে। কোনো ব্যক্তি যতটা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ব্যাধি-বিপত্তি থেকে মুক্ত হয়, কারো হৃদয়ে যতটা নিষ্ঠা ও সততা সৃষ্টি হয়, কেউ আনুগত্যের ক্ষেত্রে যতটা চেষ্টা-সাধনাকে নিয়োজিত করে তার হৃদয়ে ঐশী বাণীর ততটাই প্রভাব পড়ে এবং সে এর জ্যোতি থেকে সে অনুপাতে লাভবান হয় এবং খোদার প্রিয়ভাজন ব্যক্তিদের

বিশেষ লক্ষণাবলী তার মাঝে সৃষ্টি হয়ে যায়। দ্বিতীয় সত্য যা বিসমিল্লাহ্-তে অন্তর্নিহিত রাখা হয়েছে তা হলো, এই আয়াত কুরআন শরীফ আরম্ভ করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এটি পড়ার উদ্দেশ্য হলো পরমোৎকৃষ্ট গুণাবলীর আধার সেই সত্তার সাহায্য যাচনা করা যার গুণাবলীর একটি হলো রহমান। তিনি সত্যান্বেষীর জন্য একান্ত কৃপা ও অনুগ্রহবশত কল্যাণ, আশিস ও হেদায়েতের উপকরণ সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি রহীম অর্থাৎ চেষ্টা-সাধনাকারীদের প্রচেষ্টা বৃথা যেতে দেন না, বরং তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের উত্তম ফলাফল প্রকাশ করেন এবং তাদের পরিশ্রমের ফল তাদের দান করেন। রহমান ও রহীম এমন দুটি বৈশিষ্ট্য যা ব্যতিরেকে জাগতিক হোক বা আধ্যাত্মিক কোনো কাজই সমাধা হতে পারে না। যদি ভেবে দেখ তাহলে বুঝা যাবে যে, পৃথিবীর সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করার জন্য এই উভয় বৈশিষ্ট্য সব সময় ও প্রতিটি মুহূর্তে কার্যে নিয়োজিত রয়েছে। খোদার রহমানিয়্যত তখন থেকে প্রকাশমান রয়েছে যখন মানুষের জন্মও হয় নি।

সুতরাং সেই রহমানিয়্যত মানুষের জন্য এমন সব মহান উপকরণ সৃষ্টি করে যা মানুষের শক্তির ঊর্ধ্বে আর যা সে চেষ্টা-সাধনা ও কৌশলের মাধ্যমে কোনভাবে অর্জন করতে পারে না এবং সেসব উপকরণ কোনো কর্মের প্রতিফল হিসেবে দেয়া হয় না, বরং কৃপা ও অনুগ্রহস্বরূপ দেয়া হয়ে থাকে; যেমন নবীদের আগমন, ঐশী গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়া, বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া, সূর্য, চন্দ্র, বাতাস, মেঘমালা ইত্যাদির স্বীয় কাজে লেগে থাকা আর স্বয়ং হরেক রকম শক্তিসামর্থ্যে ভূষিত ও সম্মানিত হয়ে মানুষের এ পৃথিবীতে আসা আর সুস্থতা, নিরাপত্তা, অবকাশ এবং দীর্ঘজীবন লাভ করা। এককথায় এগুলো সেসব বিষয় যা রহমানিয়্যত বৈশিষ্ট্যের কল্যাণে প্রকাশ পায়। অনুরূপভাবে খোদার রহীমিয়্যত তখন আত্মপ্রকাশ করে যখন মানুষ সকল সামর্থ্য লাভের পর খোদা প্রদত্ত সকল শক্তিসামর্থ্যকে কোনো কার্য সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে এবং যতটা শক্তিসামর্থ্য রয়েছে তা ব্যয় করে। বিনিময়ে ঐশী রীতি হলো, তিনি তার চেষ্টা-প্রচেষ্টা বৃথা যেতে দেন না, বরং সেসব প্রচেষ্টার সুন্দর ও সুমহান ফলাফল প্রকাশ করেন। সুতরাং এটি একান্তই তাঁর রহীমিয়্যত যে, মানুষের প্রাণহীন প্রচেষ্টায় তিনি প্রাণ সঞ্চার করেন। এখন জানা আবশ্যক যে, উল্লিখিত আয়াত শেখানোর উদ্দেশ্য হলো কুরআন আরম্ভ করার সময় সকল অনুপম গুণাবলীর আধার খোদা তা'লার রহমানিয়্যত ও রহীমিয়্যত গুণাবলী

থেকে যেন সাহায্য ও কল্যাণ যাচনা করা হয়। রহমানিয়্যত বৈশিষ্ট্য থেকে কল্যাণ যাচনার উদ্দেশ্য হলো সেই পরিপূর্ণ সত্তা যেন স্বীয় রহমানিয়্যতের কল্যাণে সেসব উপকরণকে নিছক স্নেহ ও অনুগ্রহবশত সরবারহ করেন যা ঐশী বাণীর অনুবর্তীতায় চেষ্টা-সাধনার পূর্বে আবশ্যক হয়ে থাকে। যেমন- দীর্ঘজীবন লাভ, অবকাশ এবং সময় বের করতে পারা, কাজের প্রতি আকর্ষণ, শক্তি ও সামর্থ্য বহাল হওয়া, এমন কোনো বিষয় সামনে না আসা যা স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে। এমন কোনো প্রতিবন্ধকতা দেখা না দেয়া যা মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ার পথে বাদ সাধতে পারে, এককথায় সকল প্রকার সুযোগ প্রদত্ত হওয়া। এসব বিষয়াদি রহমানিয়্যতের মাধ্যমে অর্জিত হয়। আর রহীমিয়্যত বৈশিষ্ট্য হতে বরকত যাচনা করার উদ্দেশ্য হলো, সেই কামেল সত্তা যেন স্বীয় রহীমিয়্যতের সুবাদে মানুষের প্রচেষ্টার উত্তম ফলাফল প্রকাশ করেন, মানুষের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়া থেকে রক্ষা করেন আর তার চেষ্টা-সাধনা ও সংগ্রামের পর তার কাজকে আশিসমণ্ডিত করেন।

সুতরাং এভাবে খোদা তা'লার উভয় গুণাবলী অর্থাৎ রহমানিয়্যত ও রহীমিয়্যতের মাধ্যমে ঐশী গ্রন্থ আরম্ভ করার সময়, বরং সকল মর্যাদাপূর্ণ কাজের প্রারম্ভে আশিস ও সাহায্য যাচনা করা একটি অতি উন্নতমানের সত্য, যার মাধ্যমে একত্ববাদের গূঢ়জ্ঞান মানুষের অর্জন হয় আর নিজের অজ্ঞতা, জ্ঞানহীনতা, নির্বুদ্ধিতা, পথভ্রষ্টতা, অক্ষমতা ও লাঞ্ছনা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে কল্যাণের উৎস (অর্থাৎ খোদার) মাহাত্ম্য ও প্রতাপের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, অধিকন্তু নিজেকে সম্পূর্ণভাবে কাঙাল, দীনহীন, তুচ্ছ ও অর্থহীন মনে করে সর্বশক্তিমান খোদার কাছে তাঁর রহমানিয়্যত ও রহীমিয়্যতের কল্যাণরাজি যাচনা করে। যদিও খোদা তা'লার এসব গুণাবলী স্বত-ই আপন কাজে নিয়োজিত রয়েছে, কিন্তু নিরঙ্কুশ প্রজ্ঞা খোদা তা'লার সত্তা আদি হতেই মানুষের জন্য প্রকৃতির এই বিধান নির্ধারণ করে রেখেছেন যে, সফলতা লাভের ক্ষেত্রে দোয়া ও সাহায্য যাচনার বিরাট ভূমিকা রয়েছে। যারা নিজেদের কাজের জন্য আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে দোয়া করে আর তাদের দোয়া আন্তরিকতার যথাযথ মানে পৌঁছে যায় তখন ঐশী কল্যাণধারা তাদের সমস্যা নিরসনের প্রতি মনোযোগী হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি, যে নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন আর স্বীয় ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে সজাগ, সে অতিরিক্ত স্বাধীনতা ও অহংকারের সাথে কোনো কাজে হাত দেয় না, বরং (খোদার) সত্যিকার দাসত্ব তাকে বুঝায় যে,

খোদা তা'লা যিনি নিরঙ্কুশ নিয়ন্তা, তাঁর কাছে সাহায্য যাচনা করা উচিত। সত্যিকার দাসত্বের এই প্রেরণা ও উচ্ছ্বাস প্রত্যেক এমন হৃদয়ে বিরাজমান যা স্বীয় প্রকৃতিগত সততা ও সরলতার ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত এবং স্বীয় দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত। সুতরাং সত্যবাদী মানুষ যার আত্মায় কখনো কোনো প্রকার অহংকার ও আত্মশ্লাঘা স্থান করতে পারে নি, যে নিজের দুর্বল, তুচ্ছ ও অর্থহীন সত্তা সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত আর যে নিজেকে কোন কাজের যোগ্য মনে করে না এবং নিজের মাঝে কোনো শক্তি ও সামর্থ্য আছে বলে মনে করে না, সে যখন কোনো কাজ আরম্ভ করে তখন অকৃত্রিমভাবে তার দুর্বল আত্মা স্বর্গীয় শক্তি লাভের জন্য আকুতি মিনতি করে। খোদার সর্বশক্তিমান সত্তা প্রতিটি মুহূর্তে সকল শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতাপের সাথে তার চোখের সামনে থাকে। সকল কাজ সমাধার জন্য তাঁর রহমানিয়্যত ও রহীমিয়্যত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে তার চোখে পড়ে। সুতরাং সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের অসম্পূর্ণ ও অকর্মণ্য শক্তি প্রকাশের পূর্বে দোয়ার মাধ্যমে ঐশী সাহায্য যাচনা করে। সুতরাং এই বিনয় ও নম্রতার কারণে সে খোদার শক্তি হতে শক্তি আর সামর্থ্য হতে সামর্থ্য এবং জ্ঞান হতে জ্ঞান লাভের এবং নিজের লক্ষ্য অর্জনের যোগ্য হয়ে ওঠে।

এ কথার প্রমাণস্বরূপ কৃত্রিম কোনো যুক্তি বা দর্শন ভিত্তিক প্রমাণের প্রয়োজন নেই, বরং সকল মানবাত্মায় তা বোঝার যোগ্যতা নিহিত রয়েছে। এছাড়া সত্যিকার তত্ত্বজ্ঞানীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এর সত্যতা সম্পর্কে পরম্পরাগতভাবে সাক্ষ্য দিয়ে আসছে। বান্দার খোদার কাছে সাহায্য চাওয়া এমন কোন বিষয় নয় যা নিরর্থক ও কৃত্রিম হবে বা কেবল ভিত্তিহীন ধ্যানধারণার ওপর নির্ভরশীল হবে অথচ এর কোনো যৌক্তিক ফলাফল বের হবে না। বরং সম্মানিত খোদা, যিনি বিশ্ব জগতের স্থায়িত্বদাতা, যাঁকে অবলম্বন করে সত্যিকার অর্থে এই বিশ্বজগৎ চলছে তাঁর চিরন্তন রীতি অনুসারে আদিকাল থেকে এ সত্য চলে আসছে যে, যারা নিজেদের তুচ্ছ ও ছোট মনে করে নিজ কর্মে তাঁর সহায়তা চায় এবং তাঁর নাম নিয়ে নিজেদের কাজ আরম্ভ করে তাদের তিনি নিজের সাহায্য ও সমর্থনে সম্মানিত করেন। তারা যখন সত্যিকার বিনয় ও (প্রভুর) দাসত্ব করার চেতনা নিয়ে খোদামুখী হয়ে যায় তখন তারা তাঁর সাহায্য লাভ করে। এককথায় সকল মহান কাজের প্রারম্ভে সেই 'কল্যাণের উৎস'– এর নামে সাহায্য যাচনা করা যিনি রহমান ও রহীম, এটি সুগভীর শ্রদ্ধাবোধ, দাসত্ব বা বশ্যতা, আত্মবিলুপ্তি এবং দীনতার পন্থা বৈ-কী।

এটি এমন এক আবশ্যকীয় রীতি যা হলো মানুষের ব্যবহারিক একত্ববাদের প্রথম সোপান যা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণের ফলে মানুষ শিশুসুলভ বিনয় অবলম্বন করে সেসব অহংকার থেকে মুক্ত হয়ে যায় যাতে পৃথিবীর অহংকারী বুদ্ধিজীবীদের হৃদয় পরিপূর্ণ থাকে। এছাড়া নিজেদের দুর্বলতার মুখে ঐশী সাহায্যের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে সেই তত্ত্বজ্ঞান থেকে অংশ লাভ করে যা খোদাভক্তদের দেয়া হয়ে থাকে। আর নিঃসন্দেহে মানুষ যতটা এই রীতিকে আবশ্যকীয় মনে করে আর যতটা এটি অনুসরণ করা নিশ্চিত করে নেয়, যতটা এটিকে পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে নিজের ধ্বংস নিহিত বলে জ্ঞান করে, সে অনুপাতে তার 'এক খোদায় বিশ্বাস' স্বচ্ছ হয়ে যায়, অহংকার ও আত্মশ্লাঘার কলুষ হতে সে ততটা মুক্ত হয়ে যায় এবং সে অনুপাতে কৃত্রিমতার কালিমা তার মুখাবয়ব থেকে অপসারিত হতে থাকে, সরলতা ও অকপটতার জ্যোতি তার চেহারায় ঝলমল করে। সুতরাং এটি সেই সত্য যা ধীরে ধীরে মানুষকে আল্লাহ্‌র সত্তায় বিলীনতার পর্যায়ে পৌঁছায়। এমনকি সে দেখে যে, আমার কিছুই আমার নিজের নয়, বরং সবকিছু আমি খোদা থেকে পাই। যেখানেই কেউ এই রীতি অনুসরণ করে সেখানে প্রথমবারেই তার একত্ববাদের সৌরভ লাভ হওয়া শুরু হয়ে যায় এবং মন-মস্তিষ্কও সুরভিত হওয়া আরম্ভ হয়, তবে যদি ঘ্রাণশক্তিতে কোন ত্রুটি থাকে সেকথা ভিন্ন।

কিন্তু এই পরম সত্যের অনুসরণ ও অনুগমনের জন্য সত্যান্বেষীর নিজের তুচ্ছ ও অর্থহীন হওয়াটা স্বীকার করে নিতে হয় আর আল্লাহ্ তা'লা যে সবকিছুর সার্বিক নিয়ন্তা এবং কল্যাণের চূড়ান্ত উৎস, সেই সাক্ষ্য দিতে হয়। এ দুটো বিষয় এমন, যা সত্য সন্ধানীদের লক্ষ্য হয়ে থাকে আর ফানা বা বিলীনতার মর্যাদা লাভের জন্য একটি আবশ্যকীয় শর্ত। এই আবশ্যকীয় শর্তটি বোঝার জন্য এই উদাহরণই যথেষ্ট যে, বৃষ্টি সমগ্র ভূমণ্ডলে বর্ষিত হলেও তা কেবল তাকেই সিক্ত করে যে বর্ষণের কাল ও স্থানে এসে দাঁড়ায়। একইভাবে যারা যাচনা করে কেবল তারাই পায় এবং তাদেরই লাভ হয় যারা সন্ধান করে। যারা কোন কাজ আরম্ভ করার সময় খোদা তা'লার ওপর ভরসা করে না বরং নিজেদের দক্ষতা, বুদ্ধি বা শক্তির ওপর নির্ভর করে তারা সেই নিরঙ্কুশ ক্ষমতাধর সত্তাকে আদৌ শনাক্ত করে না যিনি আপন স্থায়িত্ব ও স্থিতি দানের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বজগতকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। তাদের ঈমান সেই শুষ্ক শাখার ন্যায় হয়ে থাকে যার কোন সম্পর্ক সতেজ ও সবুজ বৃক্ষের সাথে নেই

আর তা এতটা শুকিয়ে গেছে যে, আপন বৃক্ষের সতেজতা ও ফল-ফুল থেকে আদৌ কোনো অংশ লাভের শক্তি রাখে না, কেবল একটি বাহ্যিক যোগসূত্র ছাড়া আর সম্পর্ক নেই যা বাতাসের মৃদু কম্পনে বা কোনো ব্যক্তির অল্প ঝাঁকিতেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। সুতরাং শুষ্ক দার্শনিকদের ঈমান এমনই যারা মহাবিশ্বের চিরস্থায়ী ও স্থায়িত্বদাতা খোদার সাহায্য ও সহায়তার প্রতি দৃষ্টি রাখে না এবং তারা সার্বক্ষণিকভাবে ও সর্বাবস্থায় কল্যাণের উৎস আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী তা তারা স্বীকার করে না। সুতরাং এসব মানুষ সত্যিকার একত্ববাদ থেকে সেভাবে বিমুখ বা দূরে পড়ে আছে যেভাবে আলো থেকে অন্ধকার দূরে রয়েছে। তারা বুঝেই না যে, নিজেদেরকে তুচ্ছ ও অর্থহীন মনে করে সর্বশক্তিমানের মহান শক্তির নিয়ন্ত্রণে এসে যাওয়া, খোদার দাসত্ব বরণের যত স্তর রয়েছে সেগুলোর অন্তিম স্তর এবং একত্ববাদের পরম মার্গ, যা থেকে পূর্ণ আত্মবিলুপ্তির প্রস্রবণ সতত সবেগে উৎসারিত হয় আর মানুষ স্বীয় প্রবৃত্তি বা রিপুর কামনা-বাসনা থেকে পূর্ণ মুক্তি লাভ করে আর নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে খোদার শক্তি ও নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাস স্থাপন করে। এখানে সেসব শুষ্ক দার্শনিকদের এ কথাকেও অদৌ গুরুত্ব দেয়া উচিত নয় যারা বলে যে, কোনো কাজ আরম্ভ করার পূর্বে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য যাচনার প্রয়োজন কী? খোদা আমাদের প্রকৃতিতে পূর্বেই শক্তি দিয়ে রেখেছেন, সুতরাং এ সকল শক্তির বর্তমানে পুনরায় খোদার কাছে শক্তি যাচনা করা চর্বিতচর্বণের নামান্তর! আমাদের উত্তর হলো, এটি সন্দেহাতীত সত্য যে, খোদা তা'লা কোনো কোনো কাজ করার জন্য আমাদের কিছু শক্তিও দান করেছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই বিশ্ব ব্যবস্থাপকের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ আমাদের ওপর হতে উঠে যায় নি আর তিনি আমাদের ছেড়ে পৃথক হয়ে যান নি। স্বীয় সহায়তা প্রদান হতে আমাদের পৃথক করতে চান নি, নিজের অনন্ত কল্যাণরাজি হতে আমাদের বঞ্চিত করা পছন্দ করেন নি। আমাদের যা কিছু তিনি দিয়েছেন তা একটি সীমিত বিষয় আর যা তাঁর কাছে চাওয়া হয় তার কোন শেষ নেই। এ ছাড়া যেসব কাজ করা আমাদের সামর্থ্যের বাইরে তা অর্জনের জন্য আমাদের আদৌ কোনো শক্তি দেয়া হয় নি।

এখন যদি একটু ভেবে দেখ! আর নিজের দার্শনিক দার্শনিক ভাবকে কাজে লাগাও তাহলে প্রকাশ পাবে যে, কোনো শক্তিই পূর্ণমাত্রায় আমাদের হস্তগত হয় নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের দৈহিক শক্তি নির্ভর করে আমাদের সুস্থতার ওপর। আর আমাদের সুস্থতা এমন অনেক উপকরণের ওপর নির্ভরশীল যার

কিছু স্বর্গীয় কিছু পার্থিব আর এর পুরোটাই হলো আমাদের শক্তির বাইরে। এটি একটি সাদামাটা কথা যা আমি সাধারণ মানুষের বোধবুদ্ধিকে সামনে রেখে বললাম। কিন্তু সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বের স্থায়িত্বদাতা। সকল কারণের আদি কারণ হওয়ার সুবাদে তিনি আমাদের যতটা ভেতর-বাহির, আমাদের প্রথম-শেষ, ওপর-নিচ, ডান-বাম, হৃদয় ও প্রাণ আর আমাদের আত্মার সকল শক্তিকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন, তা এমন এক নিগূঢ় সূক্ষ্ম বিষয় যার গভীরে অবগাহন করা মানববুদ্ধির পক্ষে অসম্ভব এবং তা বোঝানোর এখানে প্রয়োজনও নেই।

কেননা ওপরে আমরা যতটা লিখেছি ততটুকুই বিরুদ্ধবাদীকে অভিযুক্ত করা ও তার মুখ বন্ধ করার জন্য যথেষ্ট। এককথায় নিজের সকল শক্তিসামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে নিরাপত্তা যাচনা করাই হলো বিশ্ব ব্যবস্থাপকের পক্ষ থেকে কল্যাণ লাভের রীতি। এই রীতি কোনো নতুন রীতি নয় বরং এটি সেই রীতি যা আদিকাল থেকে আদম সন্তানের প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে চলে আসছে। যে ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে বন্দেগী করতে চায় সে এই পথই অবলম্বন করে। আর যে ব্যক্তি খোদার কল্যাণরাজির সন্ধানী সে এ পথেই পদচারণা করে। যে করুণাবারিতে সিক্ত হতে চায় সে এসব আদি নিয়মকানুন মেনে চলে। এসব আইন নতুন কিছু নয়। খ্রিষ্টানদের (নুতন) ঈশ্বরের ন্যায় এগুলো নতুন আবিষ্কৃত কোন কথা নয়। বরং এটি খোদার একটি সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত রীতি যা আদিকাল থেকে চলে আসছে এবং ঐশী বিধান যা চিরপ্রবহমান, যার সত্যতা অজস্র অভিজ্ঞতার দর্পনে সকল সত্য সন্ধানীর সামনে স্পষ্ট আর কেনই বা হবে না? সকল বিবেকবান মানুষ বুঝতে পারে যে, আমরা কেমন দুর্বলতা ও অক্ষমতার মাঝে নিপতিত রয়েছি আর খোদার সাহায্য না থাকলে জীবন কতই না অকর্মণ্য ও অর্থহীন হয়ে যেত! যদি এক পূর্ণ নিয়ন্তা সত্তা প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি ক্ষণে আমাদের তত্ত্বাবধান না করেন আর তাঁর দয়া ও করুণা আমাদের কার্যবিধান না করে তাহলে আমাদের সব কাজ ভেস্তে যেত, বরং আমরা নিজেরাই নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে অগ্রসর হতাম। সুতরাং নিজের কার্যাবলীকে, বিশেষকরে আসমানী গ্রন্থাবলীকে, যা সকল মহান কাজ থেকে অধিকতর সূক্ষ্ম ও সুন্দর, আশিস ও সাহায্য যাচনার উদ্দেশ্যে দয়ালু ও কৃপাময় সর্বশক্তিমান খোদার নামে আরম্ভ করা এমন একটি স্বাভাবিক বিষয় যে, আমরা অবলীলায় এর প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকি। কেননা সত্যিকার অর্থে সকল কল্যাণ

এভাবেই লাভ হতে পারে যে, সেই সত্তা, যিনি নিরঙ্কুশ নিয়ন্তা ও সকল কারণের আদি কারণ আর সকল কল্যাণের উৎস, যার নাম কুরআনের পরিভাষায় আল্লাহ্, তিনি প্রথমে স্বয়ং স্নেহপরবশ হয়ে আপন রহমানিয়্যত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করবেন আর চেষ্টা-সাধনার পূর্বেই মানুষের যা কিছু প্রয়োজন তা কোনো কর্ম ছাড়াই সম্পূর্ণভাবে নিজের বদান্যতা ও অনুগ্রহের মাধ্যমে প্রকাশ করবেন। খোদা যখন রহমানিয়্যতের সাথে সম্পর্কযুক্ত আপন কর্ম পুরোপুরি ও উৎকৃষ্টরূপে সম্পাদনের কাজ শেষ করেন আর সামর্থ্যপ্রাপ্ত হয়ে মানুষ যখন নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করে যথাসাধ্য পরিশ্রম ও চেষ্টা-সাধনা করে তখন খোদার দ্বিতীয় কাজ হলো স্বীয় রহীমিয়্যত বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করা। আর বান্দা যতটা পরিশ্রম ও চেষ্টা-সাধনা করেছে তার জন্য ভালো ফলাফল প্রকাশ করা এবং তার পরিশ্রমকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়া হতে রক্ষা করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো। এই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে, যে সন্ধান করে সে পেয়ে যায়, যে যাচনা করে তাকে দেয়া হয়, যে কড়া নাড়ে তার জন্য (দরজা) খোলা হয়, অর্থাৎ খোদা তা'লা স্বীয় রহীমিয়্যত বৈশিষ্ট্যের কল্যাণে কারো পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা ভেস্তে যেতে দেন না।

অবশেষে একদিন সে খোদার সন্ধানী বা অনুগত বান্দায় পরিণত হয়। এককথায়, এ সত্য বিষয়গুলো এত স্পষ্ট যে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বয়ং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এর সত্যতা নিরূপণ করতে পারে আর কোন মানুষ এমন নেই যার সামনে এসব স্পষ্ট ও প্রকাশ্য সত্য বিষয়াদি গোপন থাকবে, শর্ত হলো কেবল কিছুটা বুদ্ধিমত্তা। অবশ্য একথা সেসব সাধারণ লোকের সামনে স্পষ্ট হয় না যাদের দৃষ্টি হৃদয়ের কঠোরতা ও ঔদাসীন্যের কারণে কেবল প্রচলিত ও সাধারণ উপকরণের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে আর যে সত্তা সেসকল উপকরণের নিয়ন্তা, তাঁর সূক্ষ্ম ও নিখুঁত নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান থাকে না। মানুষের প্রতিটি দেহকে সুবিন্যস্ত সুসজ্জিত করার জন্য সহস্র সহস্র বরং অগণিত এমন জাগতিক ও স্বর্গীয় উপকরণের প্রয়োজন রয়েছে যা হস্তগত হওয়া কোনোভাবেই মানুষের নিয়ন্ত্রণে বা সাধ্যের ভেতরে নেই, বরং সর্বোৎকৃষ্ট সকল গুণের সমাহার এবং এক-অদ্বিতীয় সত্তাই এসবের ওপর সকল অর্থে নিয়ন্ত্রণ রাখেন, যিনি আকাশের মহা উচ্চতা থেকে আরম্ভ করে পাতাল পর্যন্ত যাবতীয় উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু যারা বুদ্ধিমান তারা একথা অনায়াসে বরং অতি স্পষ্টভাবে বুঝে আর যারা এর চেয়েও বেশি বুদ্ধিমান এবং অভিজ্ঞতা রাখে তারা এ বিষয়ে

অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ সন্দেহ করা বা প্রশ্ন করা যে, এই সাহায্য চাওয়া কোনো কোনো সময়ে কেন লাভজনক হয় না বরং ক্ষতিকর হয়ে থাকে আর কেন খোদার রহমানিয়্যত ও রহীমিয়্যত সব ক্ষেত্রে সাহায্য যাচনার প্রত্যুত্তরে প্রকাশ পায় না? অতএম এই সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে এক সত্যকে ভুল বুঝার কারণে। কেননা খোদা তা'লা সেসব দোয়া অবশ্যই গ্রহণ করেন যা আন্তরিকভাবে করা হয়। যারা সাহায্য যাচনা করে, তিনি যেভাবে যথাযথ মনে করেন তাদের সাহায্য করে থাকেন। কিন্তু কোনো কোনো সময় এমনও হয় যে, মানুষের সাহায্য চাওয়া ও দোয়ায় আন্তরিকতা থাকে না এবং মানুষ একান্ত আন্তরিক বিনয়ের সাথে খোদার সাহায্য যাচনা করে না, অধিকন্তু তার আধ্যাত্মিক অবস্থাও সঠিক থাকে না, বরং সে মৌখিকভাবে দোয়ায় রত থাকলেও হৃদয়ে বিরাজ করে ঔদাসীন্য বা লোকদেখানো ভাব অথবা কোনো কোনো সময় এমনও হয় যে, খোদা তার দোয়া গ্রহণ করেন ঠিকই তবে আপন পরম প্রজ্ঞার ভিত্তিতে যা যুক্তিযুক্ত ও যথাযথ মনে করেন তা দান করেন; কিন্তু নির্বোধ মানুষ খোদার সেই সুপ্ত স্নেহ ও ভালোবাসা শনাক্ত করতে পারে না বরং নিজের অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্যের কারণে অভিযোগ-অনুযোগ আরম্ভ করে দেয় আর এই আয়াতের বিষয়বস্তু বুঝে না–

عَسٰۤى اَنۡ تَكۡرَهُوۡا شَيۡـًٔـا وَّهُوَ خَيۡرٌ لَّـكُمۡ ۚ وَعَسٰۤى اَنۡ تُحِبُّوۡا شَيۡـًٔـا وَّهُوَ شَرٌّ لَّـكُمۡؕ وَاللّٰهُ يَعۡلَمُ وَاَنۡتُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ

(সূরা আর বাকারা, ২:২১৭)

অর্থাৎ তোমরা কোনো জিনিসকে মন্দ মনে করতে পার কিন্তু সত্যিকার অর্থে তোমাদের জন্য তা উত্তম আর তোমরা কোনো জিনিসকে সঠিক মনে করতে পার কিন্তু কার্যত তা তোমাদের জন্য মন্দ খোদা তা'লা বিষয়ের স্বরূপ জানেন আর তোমরা জান না। এখন আমাদের এই পুরো বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ কত মহান একটি সত্য, যাতে সত্যিকার তৌহীদ বোঝা, দাসত্ব (অর্থাৎ খোদার প্রকৃত বান্দা হওয়া) ও নিষ্ঠায় উন্নতি করার অতি উন্নত উপকরণ রয়েছে যার দৃষ্টান্ত অন্য কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না। আর যদি কারো দৃষ্টিতে পাওয়া গিয়ে থাকে তাহলে তার উচিত অন্যান্য সত্যের পাশাপাশি আমরা নিম্নে যেসব সত্য লিপিবদ্ধ করছি তা (অন্য গ্রন্থ হতে) বের করে দেখানো।

এখানে কোনো কোনো অদূরদর্শী ও নির্বোধ শত্রু বিসমিল্লাহ্-র আলংকারিকতা ও বাগ্মিতা সম্পর্কে একটি আপত্তি উত্থাপন করেছে। এসব আপত্তিকারীর মাঝে একজন হলো পাদ্রি এমাদ উদ্দীন, যে স্বীয় গ্রন্থ 'হিদায়াতুল মুসলিমীন'-এ নিম্নলিখিত আপত্তি লিপিবদ্ধ করেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি অমৃতসরের উকিল বাবা নারায়ণ সিং, যিনি পাদ্রির আপত্তিকে সত্য মনে করে অন্তরে লালিত শত্রুতার বশবর্তী হয়ে সেই নিরর্থক আপত্তি নিজের 'বিদ্যিয়া প্রকাশক' পত্রিকায় উল্লেখ করেছে। তাই আমরা এই আপত্তিটি এর খণ্ডনসহ উপস্থাপন করা যুক্তিযুক্ত মনে করি যেন ন্যায়বিদরা বুঝতে পারেন যে, বিদ্বেষের আতিশয্য আমাদের বিরোধীদেরকে অভ্যন্তরীণ অন্ধত্ব ও দৃষ্টিহীনতার এমন ভয়াবহ পর্যায়ে ঠেলে দিয়েছে যে, যা অতি উজ্জ্বল আলো তা তাদের কাছে অন্ধকার মনে হয়, যা অতি উন্নতমানের সুগন্ধি তাকে তারা দুর্গন্ধ মনে করে। সুতরাং স্মরণ রাখা উচিত যে, বিসমিল্লাহ্-র বাগ্মিতা সম্পর্কে উল্লিখিত ব্যক্তিরা যে আপত্তি করেছে তা হলো বিসমিল্লাহ্-তে রহমান ও রহীম যেভাবে ব্যবহার হয়েছে তা ভাষার বাগ্মিতার পরিপন্থি। যদি ধারাবিন্যাস 'রহীমুর রহমান' হতো তাহলে তা বাগ্মিতাপূর্ণ ও সঠিক বিন্যাস হতো, কারণ খোদার নাম রহমান সেই রহমতের নিরিখে যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিদ্যমান এবং সর্বজনীন! তুলনার দৃষ্টিকোণ থেকে 'রহীম' শব্দ সেই রহমতের জন্য ব্যবহার হয় যা মাত্রায় স্বল্প কিন্তু বিশেষ হয়ে থাকে। বাগ্মিতার দাবি হলো স্বল্প থেকে বেশিতে যাওয়া, বেশি হতে স্বল্পের দিকে নয়।

এ হলো আপত্তি, যা এই উভয়েই চোখ বন্ধ করে সেই বাণীর বিরুদ্ধে উত্থাপন করেছে যে বাণীর বাগ্মিতার কথা আরবের সকল ভাষাবিদ কঠিন শত্রুতা সত্ত্বেও স্বীকার করেছে আর তাদের মাঝে বড় বড় কবিরাও রয়েছে। বরং বড় বড় শত্রু এই বাণীর সুমহান মর্যাদায় হতবাক ছিল এবং তাদের অধিকাংশ, যারা বাগ্মিতাপূর্ণ ও আলংকারিক ভাষার রীতিকে ভালোভাবে জানত ও বুঝত, ভাষা বা বক্তৃতার রীতি ও রুচি সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত ছিল আর ছিল ন্যায়পরায়ণ, তারা কুরআনের ভাষা বিন্যাসকে মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে দেখে, এক মহান নিদর্শন জ্ঞান করে ঈমান এনেছে। তাদের সাক্ষ্য কুরআন শরীফের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত রয়েছে। যাদের হৃদয়ের চোখ অন্ধ ছিল, যদিও তারা ঈমান আনে নি কিন্তু নির্বাক ও বিস্ময়াভিভূত হয়ে তাদেরকেও বলতে হয়েছে যে, এটি অনেক বড় জাদু যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব নয়। এই মর্মে তাদের

বিবৃতি কুরআন শরীফের বেশ কয়েক স্থানে বিদ্যমান। এখন এই নিদর্শনমূলক বিন্যাসে অলংকৃত বাণী বা গ্রন্থের বিরুদ্ধে এমনসব মানুষ আপত্তি করা আরম্ভ করেছে যাদের মাঝে অন্যতম সে ব্যক্তি যার ভাষাশৈলী ও আলঙ্কারিকতায় সমৃদ্ধ আরবীর দুটি লাইনও লেখার যোগ্যতা নেই।

দৈবচক্রে কোনো (আরবী) ভাষাভাষীর সাথে যদি তার কথা হয় তাহলে সে বড়জোর ভাঙা ভাঙা, অসংলগ্ন, বিচ্ছিন্ন এবং ভুল কিছু বাক্য ছাড়া আর কিছুই বলতে পারে না। যদি কারো সন্দেহ থাকে পরীক্ষা করে দেখুক। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো সে, যে আরবী ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বরং ফার্সীও ভালো করে জানে না। পরিতাপ, প্রথমোক্ত খ্রিষ্টান এই খবরও রাখে না যে, ইউরোপের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি, যিনি তার জ্যেষ্ঠ ও অগ্রজ, যার কথা পোর্ট সাহেব প্রমুখ ইংরেজরাও উল্লেখ করেছেন, তিনি স্বয়ং কুরআন শরীফের সুমহান বাগ্মিতার কথা স্বীকার করেছেন। তাছাড়া একথা নিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিবেকবান মানুষের চিন্তা করা উচিত যে, একটি গ্রন্থ যা স্বয়ং এক স্বভাষাভাষীর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, অধিকন্তু এর পরম বাগ্মিতা সম্পর্কে সকল আরবী ভাষাবিদ বরং 'সাবা মুয়াল্লাকা-র কবিদের মতো মানুষও মতৈক্যে পৌঁছেছেন; সেখানে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, এমন স্বীকৃত ও প্রমাণিত ধর্মীয় সাহিত্যকে কোনো নির্বোধ অনারব এবং ভাষাজ্ঞানহীন এমন ব্যক্তির অস্বীকার কীভাবে আপত্তিকর গণ্য হতে পারে, যে কোনো কিছু রচনার বা গঠনের যোগ্যতাও রাখে না আর আরবীর ভাষাজ্ঞানেও দক্ষতা অর্জন করে নি, এমনকি সাধারণ কোনো আরবের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও কথা বলতে অপারগ? সত্যিকার অর্থে এধরনের মানুষ যারা নিজেদের যোগ্যতার গণ্ডির বাইরে গিয়ে কথা বলে, কার্যত তারা নিজেদের বুদ্ধিহীনতারই পরিচয় দেয় আর বুঝে না যে, ভাষাভাষীদের সাক্ষ্যের পরিপন্থি এবং খ্যাতনামা কবিদের সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা সত্যিকার অর্থে নিজের অজ্ঞতা ও গর্দভসুলভ আচরণ প্রদর্শন করা ছাড়া আর কিছু নয়। পাদ্রি এমাদ উদ্দীন কোন আরবী ভাষী মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোন জাগতিক বা ধর্মীয় বিষয়ে আমাদের সামনে এক-আধ ঘণ্টা কথা বলে দেখাক যেন মানুষের সামনে প্রধানত এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সে সাদামাটা আরবীতে আরবদের বাগধারা ও তাদের রীতি-রুচি অনুসারে কথা বলতে জানে কি জানে না। কেননা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, সে পারে না। আমরা নিশ্চিতভাবে জানি, যদি আমরা কোনো আরবকে তার সামনে কথা বলার জন্য দাঁড় করাই তাহলে সে

আরবদের মতো তাদের অভিরুচি অনুসারে একটি ছোট কাহিনীও শুনাতে পারবে না বরং অজ্ঞতার চোরাবালিতেই আবদ্ধ থেকে যাবে। যদি কারো সন্দেহ থাকে তাহলে দোহাই তার, সে পরীক্ষা করে দেখে নিক! যদি পাদ্রি এমাদ উদ্দীন সাহেব আমাদের অনুরোধ করেন তাহলে কোনো আরবী ভাষাভাষীর ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আমরা নেবো এবং কোনো নির্ধারিত তারিখে একটি জলসা করবো যাতে কিছু সংখ্যক যোগ্য হিন্দু ধর্মাবলম্বী থাকবে আর থাকবে কিছু সংখ্যক মুসলমান মৌলভী। এমাদ উদ্দীন সাহেবের জন্য আবশ্যক হবে নিজের সাথে কিছুসংখ্যক খ্রিষ্টান ভাইকে নিয়ে আসা আর সবার সামনে প্রথমে এমাদ উদ্দীন সাহেবকে নির্দিষ্ট কোনো কাহিনী আরবী ভাষায় শোনাতে হবে যা সম্পর্কে তখনই তাকে অবহিত করা হবে। এরপর বিচারকরা যদি এই মতামত দেন যে, এমাদ উদ্দীন সাহেব একান্ত আরবদের রুচি অনুসারে উন্নত ও সূক্ষ্ম সুন্দর ভাষায় বক্তৃতা করেছেন তাহলে আমরা মেনে নিব যে, এমাদ উদ্দীনের কোন মাতৃভাষাভাষীর (অর্থাৎ আরবের) সমালোচনা করা তেমন কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয় বরং তখনই তাকে ৫০ রুপি নগদ প্রদান করা হবে।

কিন্তু এমাদ উদ্দীন যদি বাগ্মিতাপূর্ণ প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করার পরিবর্তে নিজের ভারসাম্যহীন ও অগোছালো কথার দুর্গন্ধ ছড়ানো আরম্ভ করে বা নিজের লাঞ্ছনা ও অযোগ্যতার ভয়ে কোনো পত্রিকার মাধ্যমে এই সংবাদও না দেয় যে, আমি এমন মোকাবিলার জন্য উপস্থিত তাহলে এ ছাড়া আমরা আর কী বলব যে, لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ অধিকন্তু একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, এমাদ উদ্দীন সাহেব যদি দ্বিতীয়বারও জন্মগ্রহণ করেন তাহলেও তিনি এমন কারো মোকাবিলা করতে পারবেন না যার মাতৃভাষা আরবী। এছাড়া যেখানে তিনি আরবদের সামনে কথা বলতে পারবেন না আর তাৎক্ষণিকভাবে বোবা হতে প্রস্তুত, সেখানে খ্রিষ্টান ও আর্যদের এমন বোধবুদ্ধির জন্য হাজারবার আক্ষেপ এবং দু-হাজার অভিসম্পাত, যারা এমন নির্বোধের রচনার ওপর নির্ভর করে সেই অনন্য গ্রন্থের আলঙ্কারিকতা সম্পর্কে আপত্তি করে যা আরবদের শিরোমণির প্রতি অবতীর্ণ হয়ে আরবের সকল বাগ্মী ও বাকপটু লোকের কাছ থেকে স্বীয় মাহাত্ম্যের স্বীকৃতি আদায় করেছে, যা অবতীর্ণ হওয়ার পর মক্কার অর্থাৎ কা'বা শরীফের দ্বার হতে 'সাবা মুয়াল্লাকা' নামিয়ে ফেলা হয়েছিল। উল্লিখিত মুয়াল্লাকা'র কবিদের মধ্যে যারাই তখন জীবিত ছিল তারা কালক্ষেপণ না করে তাৎক্ষণিকভাবে সেই গ্রন্থে ঈমান এনেছে। আর

দ্বিতীয় অক্ষেপ হলো, এই নির্বোধ খ্রিষ্টান আজ পর্যন্ত এটিও জানে না যে, সর্বত্র নির্বিচারে স্বল্পকে বেশির ওপর প্রধান্য দিতে থাকার মাঝেই সত্যিকার বাগ্মিতা সীমাবদ্ধ নয় বরং আলঙ্কারিকতা ও প্রাঞ্জলতা হলো, নিজের বক্তব্য ও বাণী বাস্তব পরিস্থিতি ও যথার্থ সময়ের দাবিসম্মত হওয়া। এখানেও রহমানকে রহীমের ওপর অগ্রগণ্য করে আয়াতকে বাস্তব পরিস্থিতি ও অনুপম বিন্যাসের দর্পনে রূপ দেয়া হয়েছে। এই স্বাভাবিক বিন্যাসের বিশদ বিবরণ সূরা ফাতিহার পরবর্তী আয়াতগুলোতে আসবে। এখন আমরা আলোচ্য সূরার অন্যান্য আয়াতগুলো সম্পর্কে বিশদভাবে লিখছি আর তা হলো আলহামদুলিল্লাহ্, সকল প্রশংসা পরম উৎকৃষ্ট গুণাবলীর সমাহার সেই সত্য উপাস্য সত্তার বলেই প্রমাণিত, যার নাম হলো আল্লাহ্। আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, কুরআনের পরিভাষায় ‘আল্লাহ্’ সেই সর্ব-সম্পূর্ণ সত্তার নাম যিনি সত্য উপাস্য এবং সকল উৎকৃষ্ট গুণাবলীর সমাহার আর সকল হীনতা থেকে মুক্ত, এক-অদ্বিতীয় এবং সকল কল্যাণরাজির উৎসস্থল, কেননা খোদা তা'লা স্বীয় পবিত্র বাণী কুরআন শরীফে নিজের নাম ‘আল্লাহ্’কে অবশিষ্ট সকল সুন্দর নাম ও গুণাবলীর আধার বা বিশেষণ আখ্যায়িত করেছেন আর কোন স্থানে অন্য কোন নামকে এই মর্যাদা দেন নি।

সুতরাং ‘আল্লাহ্’ নামটি পরম সুন্দর বৈশিষ্ট্যাবলীর মাধ্যমে বিশিষ্ট হওয়ার সুবাদে সেসব গুণাবলীর নির্দেশক বা প্রমাণ বহন করে যার আধার তিনিই। যেহেতু তিনি সকল সুন্দর নাম ও গুণাবলীতে বিশেষিত, তাই এর অর্থ দাঁড়ালো তা (অর্থাৎ আল্লাহ্ শব্দ) সকল গুণাবলীর সমন্বয়ে গঠিত বা তাতে সকল গুণাবলী অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আলহাম্‌দুলিল্লাহ্-র সারকথা এটি বের হলো যে, সকল প্রকার প্রশংসা বাহ্যিক হোক বা অভ্যন্তরীণ, ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে হোক বা প্রকৃতির বিস্ময়কর দিকগুলোর নিরিখেই হোক, সব আল্লাহ্‌রই বিশেষত্ব আর এতে অন্য কেউ অংশীদার নয়। এ ছাড়া যতটা সত্য ও সঠিক স্তুতি ও সর্বসম্পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্বের কথা কোনো বিবেকবান ভাবতে পারে বা কোনো চিন্তাবিদের মাথায় তার প্রণিধানশক্তি জাগ্রত করতে পারে, সেসব গুণাবলী ও সৌন্দর্য খোদা তা'লার মাঝে বিদ্যমান। এমন কোনো যোগ্যতা বা সৌন্দর্য নেই যে সম্পর্কে বিবেক সাক্ষ্য দেবে আর আল্লাহ্ তা'লা দুর্ভাগা মানুষের ন্যায় তা থেকে রিক্ত ও বঞ্চিত থাকবেন। বরং কোনো বুদ্ধিমানের যুক্তিবুদ্ধি এমন কোনো গুণ বা সৌন্দর্য দেখাতে পারবে না যা খোদার সত্তায়

পাওয়া যায় না। সৌন্দর্য ও গুণাবলী সম্পর্কে মানুষ সর্বোচ্চ যে ধারণা রাখতে পারে এর সবই তাঁর সত্তায় বিদ্যমান। আর স্বীয় সত্তা, গুণাবলী ও প্রশংসারাজিতে সকল অর্থে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন এবং সকল প্রকার হীনতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। এখন দেখ, এটি এমন একটি সত্য যার মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যা ধর্ম প্রকাশ পেয়ে যায়। কেননা সব ধর্ম নিয়ে ভাবলে জানা যাবে যে, ইসলাম ছাড়া পৃথিবীতে এমন কোনো ধর্ম নেই যা খোদা তা'লাকে সকল দুর্বলতা থেকে মুক্ত ও সকল প্রশংসায় সজ্জিত মনে করে। সাধারণ হিন্দুরা নিজেদের দেব-দেবীকে বিশ্বের প্রতিপালন ব্যবস্থায় অংশীদার মনে করে, খোদার কাজে তাদেরকে স্থায়ীভাবে হস্তক্ষেপকারী আখ্যা দিয়ে থাকে। বরং হিন্দুরা মনে করে যে, দেবতারা খোদার ইচ্ছায় পরিবর্তন আনয়নকারী এবং তাঁর নিয়তি বা তকদীরকে ওলটপালটকারী। এছাড়া হিন্দুরা অনেক মানুষ ও জীবজন্তু সম্পর্কে বরং কতক অপবিত্র ও আবর্জনাখোর প্রাণী যেমন শূকর ইত্যাদি সম্পর্কেও মনে করে যে, কোনো যুগে তাদের পরমেশ্বর জন্মান্তরে এমন সব কায়ায় জন্মগ্রহণ করে সেসকল নোংরামি ও দূষণে দূষিত হয়ে আসছে যা এসব প্রাণীর বাস্তব অবস্থার মাঝে দৃশ্যমান।

এ ছাড়া সেসব প্রাণীর ন্যায় ক্ষুৎপিপাসা, ব্যথা-বেদনা, ভয়ভীতি, রোগব্যাধি, মৃত্যু, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অক্ষমতা ও শক্তিহীনতার শিকার হয়ে আসছে। জানাকথা যে, এসস্ত বিশ্বাস খোদার গুণাবলীতে কলঙ্ক লেপন করে, যা তাঁর অনাদি-অনন্ত সম্মান ও প্রতাপের হানি ঘটায়। আর্য সমাজী, যারা তাদের ধর্মীয় ভাই আর যারা বেদ হুবহু অনুসরণ করে বলে আত্মপ্রসাদ নেয়; তারা খোদা তা'লাকে তাঁর স্রষ্টার পদ থেকেই অব্যাহতি দেয় আর বলে, সব আত্মা খোদার সর্বসম্পূর্ণ সত্তার ন্যায় আবশ্যকীয়রূপে বিদ্যমান ও সত্যিকার অস্তিত্বসহ চিরবিরাজমান, অধিকন্তু তারা সৃষ্ট নয়! অথচ সুস্থ বিবেক এ কথাকে খোদার পরিষ্কার ত্রুটি মনে করে যে, তিনি বিশ্বের সর্বাধিপতি আখ্যায়িত হয়েও কোনো বস্তুর লালন-পালনকারী ও স্রষ্টা হবেন না অধিকন্তু পৃথিবীর অস্তিত্ব তাকে অবলম্বন করে হবে না, বরং স্বীয় অস্তিত্বে আবশ্যকতার কারণে সেগুলো বিদ্যমান! সুস্থ বিবেকের কাছে এই উভয় প্রশ্ন যখন রাখা হয় যে, সর্বশক্তিমান খোদার পূর্ণ প্রশংসার দৃষ্টিকোণ থেকে একথা কি বেশি সঠিক ও বেশি যুক্তিযুক্ত যে, তিনি স্বয়ং স্বীয় পূর্ণ শক্তির মাধ্যমে পুরো সৃষ্টিকে দৃশ্যপটে এনে তাদের সবার প্রতিপালক ও স্রষ্টা হবেন, পুরো বিশ্ব-ব্যবস্থা তাঁরই প্রতিপালন গণ্ডিতে

সীমাবদ্ধ থাকবে আর স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা তাঁরই সর্বোৎকৃষ্ট সত্তায় থাকবে, অধিকন্তু জীবন মৃত্যুর দুর্বলতা থেকে তিনি মুক্ত থাকবেন; নাকি এসব কথা তার মহিমাসম্মত হবে যে, তার নিয়ন্ত্রণে যত সৃষ্টি রয়েছে তা তাঁর সৃষ্টি নয় আর তাদের অস্তিত্বও তাঁকে অবলম্বন করে নয়? নিজেদের অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্বের জন্য এসব তাঁর মুখাপেক্ষী নয় আর তিনি তাদের স্রষ্টাও নন, প্রতিপালকও নন! অধিকন্তু স্রষ্টাসুলভ বৈশিষ্ট্যাবলী এবং শক্তি তাঁর মাঝে পাওয়াও যায় না; জন্ম-মৃত্যুর দুর্বলতা থেকেও তিনি পবিত্র নন? সুতরাং যুক্তি-বিবেক আদৌ এই সিদ্ধান্ত দেয় না যে, যিনি বিশ্বের সর্বাধিপতি তিনি বিশ্বস্রষ্টা নন আর আত্মা ও দেহে সহস্র সহস্র যেসব প্রজ্ঞাপূর্ণ গুণাবলী বিদ্যমান তা নিজ গুণেই বিদ্যমান এর কোন স্রষ্টা নেই! খোদা, যিনি এসবের মালিক হওয়ার দাবি করেন তিনি কাল্পনিক মালিক! অধিকন্তু বিবেক এ কথাও বলে না যে, তাঁকে সৃষ্টিকর্মে অক্ষম মনে করা উচিত বা শক্তিহীন ও দুর্বল আখ্যায়িত করা উচিত অথবা নোংরামি ও আবর্জনা ভক্ষণের মতো হীন ও নোংরা অভ্যাস তাঁর প্রতি আরোপ করা উচিত কিংবা মৃত্যু, ব্যথা-বেদনা, দুঃখ, জ্ঞানশূন্যতা ও অজ্ঞতা তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করা উচিত! বরং এই স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে যে, এসব ইতরতা ও ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে খোদা তা'লার মুক্ত হওয়া আবশ্যক এবং তাঁর মাঝে পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব থাকা বাঞ্ছনীয়, অধিকন্তু পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব পূর্ণ ক্ষমতার সাথে সম্পর্কযুক্ত ও শর্তসাপেক্ষ। যেখানে খোদার মাঝে পূর্ণ শক্তি নেই আর তিনি কোনো কিছু সৃষ্টিও করতে পারেন নি, নিজের সত্তাকেও সকল প্রকার দুর্বলতা থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন সেখানে তাঁর মাঝে পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্বও থাকল না। পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্বও যেখানে রইল না সেখানে সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বসম্পূর্ণ স্তুতি হতেও তিনি বঞ্চিত ও হতভাগাই থেকে গেলেন! এ হলো হিন্দু ও আর্যদের চিত্র।

অপরদিকে খ্রিষ্টানরা খোদার যে প্রতাপ ও মহিমা প্রকাশ করছে তা এমন এক বিষয় যা কেবলমাত্র একটি প্রশ্নের মাধ্যমেই বিবেকবান মানুষ বুঝতে পারবে। অর্থাৎ কোন বুদ্ধিমান মানুষকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, সেই পরম উৎকৃষ্ট, প্রাচুর্যশীল-প্রাচুর্যদাতা, পরবিমুখ ও আদি সত্তা সম্পর্কে একথা ভাবা কি বৈধ হতে পারে যে, যদিও তিনি তাঁর সকল মহান কাজে, যা আদিকাল থেকে করে আসছেন, একাই যথেষ্ট, কোনো পিতা ও পুত্রের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেই সারা বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, নিজেই সকল আত্মা ও দেহকে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সকল শক্তি দান করেছেন, নিজেই সমগ্র বিশ্ব জগতের সুরক্ষা

বিধানকারী, স্থায়িত্ব ও স্থিতি দানকারী এবং সত্যিকার পরিকল্পনাকারী, বরং সেসবের অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই যা কিছু তাদের জীবনের জন্য আবশ্যক ছিল সবকিছুই স্বীয় রহমানিয়্যত বৈশিষ্ট্যের কল্যাণে প্রকাশ করেছেন, কোনো কর্মীর কৃতকর্ম ছাড়াই চন্দ্র-সূর্য, অগণিত গ্রহ-নক্ষত্র, ভূমণ্ডল এবং এতে বিদ্যমান সহস্র সহস্র নিয়ামত মানবজাতির জন্য একান্ত কৃপা ও বদান্যতায় সৃষ্টি করেছেন আর এসব কাজে কোনো সন্তানের মুখাপেক্ষী হন নি, কিন্তু সেই সর্বসম্পূর্ণ খোদা-ই শেষ যুগে স্বীয় সকল প্রতাপ ও ক্ষমতার প্রায় পুরোটাই হারিয়ে মুক্তি ও ক্ষমার জন্য পুত্রের মুখাপেক্ষী হবেন! আবার পুত্রও এমন দুর্বল যে, পিতার সাথে তার কোনো সামঞ্জস্য নেই। পিতার মতো সে আকাশের কোনো অংশ বা কোন ভূখণ্ড সৃষ্টি করে নি যার মাধ্যমে হয়ত তার খোদা হওয়া ও উপাস্য হওয়া প্রমাণিত হতে পারত। বরং মার্কের ৮ম অধ্যায়ের ১২তম শ্লোকে তার দুর্বল অবস্থার চিত্র এভাবে অঙ্কন করা হয়েছে যে, সে তার আন্তরিক আক্ষেপের সাথে বলল, “এ যুগের মানুষ কেন নিদর্শন চায়? আমি তোমাদের সত্য বলছি যে, এযুগের মানুষকে কোন নিদর্শন দেখানো হবে না”। তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সময়েও ইহুদিরা বলেছিল যে, এখন যদি সে আমাদের চোখের সামনে জীবিত হয়ে ওঠে তাহলে আমরা ঈমান আনব, কিন্তু সে তাদের জীবিত হয়ে দেখায় নি আর নিজের খোদা হওয়ার ও পূর্ণ ক্ষমতাধর হওয়ার বিন্দুমাত্র স্বাক্ষর রাখে নি। কিছু নিদর্শন দেখিয়ে থাকলেও যা দেখিয়েছে তা ইতঃপূর্বে অন্যান্য নবীরা অজস্র ধারায় প্রদর্শন করেছেন, বরং সে যুগে একটি চৌবাচ্চার পানি থেকে অনুরূপ নিদর্শন প্রকাশ পেত (যোহন, পঞ্চম অধ্যায়)।

এককথায় সে নিজের ঈশ্বর হওয়ার প্রমাণ হিসেবে কিছুই দেখাতে পারে নি যেভাবে উল্লিখিত আয়াতে স্বয়ং তাঁর উক্তি রয়েছে, বরং একজন অবলা নারীর পেট হতে জন্মগ্রহণ করে (খ্রিষ্টানদের কথা অনুসারে) জীবনের সেই লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অক্ষমতা ও অসম্মান দেখেছে যা মানুষের মাঝে কেবল সে দেখে যে চরম হতভাগা ও হতচ্ছাড়া হয়ে থাকে। এরপর দীর্ঘকাল জঠরের অন্ধকারে আবদ্ধ থেকে আর প্রস্রাবের নোংরা নির্গমন পথে জন্মগ্রহণ করে, সকল প্রকার কলুষিত অবস্থাকে শিরোধার্য করেছে। মানবীয় কদর্যতা ও অক্ষমতার এমন কোনো কলুষ অবশিষ্ট থাকে নি যাতে পিতাকে দুর্নামকারী সেই সন্তান জড়ায় নি। এছাড়া সে নিজের অজ্ঞতা, জ্ঞানহীনতা ও শক্তিহীনতা, অধিকন্তু নিজের কিতাবে নিজেই পুণ্যবান না হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। এছাড়া যেখানে

সেই দুর্বল বান্দা, যাকে অকারণে খোদার পুত্র আখ্যা দেয়া হয়েছে, কোনো কোনো মহান নবী হতে জ্ঞানগত ও কর্মের শ্রেষ্ঠত্বেও পিছিয়ে ছিল এবং তাঁর শিক্ষাও যেখানে একটি অসম্পূর্ণ শিক্ষা ছিল যা মূসার শিক্ষার একটি শাখামাত্র, সেখানে নিজ সত্তায় সদা সর্বসম্পূর্ণ এবং স্বনির্ভর ও সর্বশক্তিমান হয়ে অবশেষে এমন দুর্বল ছেলের মুখাপেক্ষী হলেন যে, নিজের সকল প্রতাপ ও সম্মানকে একবারেই বিসর্জন দিলেন! অনাদি, অনন্ত ও সর্বশক্তিমান খোদার ওপর এই অপবাদ আরোপ করা কীভাবে বৈধ হতে পারে? আমি আদৌ ভাবতে পারি না যে, কোনো বুদ্ধিমান সেই কামেল সর্বসম্পূর্ণ সত্তা সম্পর্কে এমন অসম্মানকে বৈধ মনে করবে যিনি সকল শ্রেষ্ঠ গুণের সমাহার। জানাকথা যে, ইবনে মরিয়মের ঘটনাবলীকে যদি অত্যুক্তি ও বাজে প্রশংসাবলী থেকে পৃথক করে নেয়া হয় তাহলে বিভিন্ন ইঞ্জিল থেকে এর বাস্তব অবস্থা সংক্রান্ত যে সারবস্তু সামনে আসে তা হলো, সে একজন অক্ষম, দুর্বল ও ক্রটিবিচ্যুতিপূর্ণ বান্দা, অর্থাৎ বান্দা যেমনটি হয়ে থাকে আর হযরত মূসার অধীনস্থ নবীদেরই একজন নবী ছিল মাত্র। সে সেই বুযূর্গ ও মহান রসূলের একজন অনুসারী ও উত্তরসূরী ছিল কিন্তু নিজে আদৌ পুণ্যের সেই মানে পৌঁছতে সক্ষম হয় নি। অর্থাৎ তার শিক্ষা এক মহান শিক্ষার শাখা ছিল, স্থায়ী শিক্ষা ছিল না। সে স্বয়ং বিভিন্ন ইঞ্জিলে স্বীকার করেছে, আমি নেকও নই, অদৃশ্যের জ্ঞানও রাখি না আর সর্বশক্তিমানও নই বরং এক দুর্বল বান্দা। এছাড়া ইঞ্জিলের বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, সে গ্রেফতার হওয়ার পূর্ববর্তী রাতে বেশ কয়েকবার নিরাপত্তার জন্য দোয়া করেছে আর চাইতো যে, তার দোয়া গৃহীত হোক। কিন্তু তার সে দোয়া গৃহীত হয় নি। যেভাবে দুর্বল বান্দার পরীক্ষা হয়ে থাকে, তাকেও শয়তান দ্বারা সেভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় বোঝা যায় যে, সে সকল অর্থে অক্ষম ছিল। জানা নির্গমন পথে জন্মগ্রহণ করে, যা আবর্জনার নির্গমনস্থল। সুদীর্ঘকাল ক্ষুৎপিপাসা, ব্যথা-বেদনা ও রোগ-বালাইয়ের পীড়া সহ্য করেছে।

একবারের কথা, সে ক্ষুধায় অতিষ্ঠ হয়ে একটি ডুমুর গাছের নীচে যায়, কিন্তু গাছ যেহেতু ডুমুরশূন্য ছিল তাই বঞ্চিতই রইল আর নিজের খাওয়ার জন্য দু-চারটি ডুমুর সৃষ্টি করাও তার সাধ্যে কুলোয় নি। এককথায় দীর্ঘকাল এমনসব আবর্জনার মাঝে থেকে এহেন দুঃখ-বেদনা সহ্য করে খ্রিষ্টানদের ভাষ্য অনুসারে পটল তোলে আর এ পৃথিবী থেকে উত্থিত হয়! এখন আমি জিজ্ঞেস

করছি যে, সর্বশক্তিমান খোদার সত্তায় কি এমনই ত্রুটিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য থেকে থাকে? এমন দোষত্রুটি ও দুর্বলতায় পরিপূর্ণ হওয়ার কারণেই কি তিনি **কুদ্দূস** (পবিত্র) ও প্রতাপান্বিত আখ্যা পান? একই মা অর্থাৎ মরিয়মের জঠর থেকে ৫টি বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে একজন খোদার পুত্র বরং খোদা হয়ে গেলো আর যে ৪ জন বাকি থাকলো, সেই হতভাগারা ঈশ্বরত্ব থেকে কোনো অংশই পেল না– এটি কি সম্ভব? মানুষের গর্ভ থেকে নিয়ম অনুসারে মানব-সন্তান জন্মগ্রহণ করে আর গাধার পেট থেকে গাধারই জন্ম হয়। কিন্তু এর বিপরীতে যদি কোন সৃষ্টের গর্ভ থেকে খোদাও জন্মগ্রহণ করতে পারে তাহলে যুক্তির দাবি হলো, তার গর্ভ থেকে অন্য কোনো সৃষ্টের জন্ম না হওয়া, বরং যত সন্তানের জন্ম হয় সবার খোদা হয়ে যাওয়া উচিত যেন সেই পবিত্র জঠর সৃষ্টির অংশীদারিত্ব থেকে মুক্ত থাকে আর যেন তা শুধু ঈশ্বর সৃষ্টির একটি খনি হিসেবেই কাজ করে। সুতরাং উল্লিখিত মাপকাঠি অনুসারে হযরত মসীহ্‌র ভাইদেরও ঈশ্বরত্ব থেকে কিছুটা হলেও অংশ পাওয়া আবশ্যক ছিল আর এই ৫জনের মা তো ঈশ্বরের ঈশ্বর আখ্যায়িত হতে পারতেন, কেননা এ ৫জন আধ্যাত্মিক ও দৈহিক শক্তির ক্ষেত্রে তার মাধ্যমেই কল্যাণমণ্ডিত। খ্রিষ্টানরা মরিয়ম-তনয়ের অযথা ও অকারণ প্রশংসা করতে গিয়ে বহু মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর দুর্বলতা গোপন করতে পারে নি আর তাঁর ত্রুটিবিচ্যুতি ও কলুষের কথা নিজেরাই স্বীকার করে তাকে আবার অনর্থক খোদার পুত্র আখ্যায়িত করেছে। এমনিতে খ্রিষ্টান ও ইহুদীরা তাদের অভিনব গ্রন্থাদির দৃষ্টিকোণ থেকে সকলেই খোদার পুত্র, কিন্তু এক শ্লোকের দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেরাই খোদা।

আমরা যা লক্ষ্য করি তা হলো, বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা প্রতারণা ও মিথ্যার ক্ষেত্রে এদের চেয়ে ভালো প্রমাণিত হয়েছে, কেননা তারা বুদ্ধকে খোদা আখ্যায়িত করে তাঁর সম্পর্কে কখনো বলে নি যে, তিনি নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন নির্গমন পথে জন্মগ্রহণ করেছেন বা কোনো প্রকার আবর্জনা ভক্ষণ করেছেন, বরং বুদ্ধ সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস হলো, তিনি মুখ-গহ্বরের পথে জন্মগ্রহণ করেছেন। পরিতাপ যে, খ্রিষ্টানরা বহু প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু মসীহ্‌কে মুখ-পথে জন্ম দেয়া এবং নিজেদের খোদাকে প্রস্রাব ও অপবিত্রতা থেকে বাঁচানোর প্রতারণার কথা তাদের মাথায় আসে নি। অধিকন্তু তার ওপর মৃত্যু না চাপানোর কথাও এদের মাথায় আসে নি, কেননা খোদা বলতে যা

বোঝায়, মৃত্যু সম্পূর্ণরূপে এর পরিপন্থি। আর এই কথাও মনে পড়ে নি যে, যেখানে মরিয়মের পুত্র ইঞ্জিলে স্বীকার করেছেন যে, আমি পুণ্যবানও নই, নিরঙ্কুশ বুদ্ধিমানও নই আর নিজের ইচ্ছায় আসি নি এবং অদৃশ্যের জ্ঞানও রাখি না, অধিকন্তু সর্বশক্তিমানও নই আর দোয়া গৃহীত হওয়ার বিষয়টিও আমার হাতে নেই, বরং আমি কেবল এক দুর্বল বান্দা ও দীনহীন আদমসন্তান, বিশ্বপ্রতিপ্রালক সর্বাধিপতি কর্তৃক প্রেরিত হয়ে এসেছি, সেখানে এসব কথা ইঞ্জিল থেকে বের করে দেয়া উচিত।

এখন সারকথা হলো আলহামদুলিল্লাহ্-র বিষয়বস্তুতে যে অসাধারণ সত্য অন্তর্নিহিত রয়েছে তা পাক ও পবিত্র ধর্ম ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে আদৌ পাওয়া যায় না। কিন্তু যদি ব্রাহ্মরা বলে যে, উল্লিখিত সত্যে তারাও বিশ্বাসী তাহলে স্মর্তব্য যে, তারা স্বীয় বিবৃতি প্রদানে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে, কেননা এই রচনায় আমি লিখে এসেছি যে, ব্রাহ্মদের বিশ্বাস হলো, খোদা বোবা, বাক্যালাপ ও কথা বলার আদৌ শক্তি রাখেন না এবং নিজের জ্ঞান 'এলকা' (অর্থাৎ অন্যের হৃদয়ে সঞ্চার) ও এলহাম করতে অক্ষম। আর সত্যিকার ও সর্বোৎকৃষ্ট হেদায়েতদাতার মাঝে পরম উৎকৃষ্ট যেসব গুণ থাকা উচিত, তাঁকে সেসব গুণ থেকে বঞ্চিত মনে করে, বরং খোদা তা'লা সম্পর্কে এতটা ঈমান রাখাও তাদের ভাগ্যে জোটে নি যে, স্বীয় অস্তিত্ব ও উপাস্যরূপী সত্তাকে তিনি স্বীয় ইচ্ছা ও ক্ষমতাবলে পৃথিবীতে প্রকাশ করেছেন। পক্ষান্তরে তারা বলে যে, খোদা এক লাশ বা পাথরের ন্যায় কোন নিভৃত কোণে পড়েছিল। বুদ্ধিমানরা নিজেরা চেষ্টা করে তাকে উদ্ধার করেছে এবং তার ঈশ্বরত্বকে পৃথিবীতে পরিচিত করেছে। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে, তারাও তাদের অন্যান্য ভাইয়ের ন্যায় খোদার পরম প্রশংসারাজির অস্বীকারকারী, বরং যে সকল স্তুতির বরাতে তাঁকে স্মরণ করা উচিত সেসব স্তুতি নিজেদের প্রতি আরোপ করে رب العٰلمين الرحمٰن الرحيم مٰلك يوم الدين এখানে সূরা ফাতিহায় খোদা তা'লা নিজের চারটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ–
رب العٰلمين۔ الرحمٰن۔ الرحيم۔ مٰلك يوم الدين আর এই চারটি বৈশিষ্ট্যের মাঝে 'রাব্বুল আলামীন-কে সর্বাগ্রে রেখেছেন, এরপর রহমান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, তারপর রহীম বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, সবশেষে মালিক ইয়াউমিদ দ্বীন বৈশিষ্ট্যকে এনেছেন। খোদা তা'লা কেন এই রীতি অবলম্বন করেছেন তা বুঝতে হবে। এতে যে রহস্য নিহিত তা হলো, এই চারটি বৈশিষ্ট্যের এটিই

স্বাভাবিক বিন্যাস। বাস্তবে এই ধারাবাহিকতা নিয়েই এই বৈশিষ্ট্যাবলী প্রকাশ পায়। এর বিশদ বিবরণ হলো, পৃথিবীতে ঐশী কল্যাণরাজি চারভাবে বিদ্যমান, চিন্তা ও প্রণিধানে প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তি তা বুঝতে পারে। প্রথম কল্যাণধারার নাম হলো 'ফয়যানে আ-আম' বা সর্বাধিক সর্বজনীন কল্যাণধারা। এটি সেই নিরঙ্কুশ কল্যাণধারা যা জীব ও জড়ে পার্থক্য না করে নভোমণ্ডল হতে ভূমণ্ডল পর্যন্ত সবকিছুর ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিরাজমান রয়েছে। এই কল্যাণরাজির মাধ্যমেই প্রত্যেক বস্তুর অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব লাভ করা এবং অস্তিত্বের পরম মার্গে উপনীত হওয়া। জীব হোক বা জড়, কোনো সৃষ্টিই এর বাইরে নয়। এরই মাধ্যমে সকল রূহ ও বস্তুর অস্তিত্ব সামনে এসেছে এবং আসে আর সকল বস্তু লালিত-পালিত হয়েছে ও হয়। এই কল্যাণধারাই সমগ্র বিশ্বজগতের প্রাণ। যদি এটি এক মুহূর্তের জন্য থেমে যায় তাহলে সমগ্র বিশ্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এটি যদি না থাকত তাহলে সৃষ্টির কিছুই টিকে থাকত না। কুরআন শরীফে এরই নাম রবুবিয়্যত। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই কুরআন শরীফে খোদার নাম রাব্বুল আলামীন। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন–

وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ

(সূরা আল আন'আম: ১৬৫)

অর্থাৎ খোদা সকল বস্তুর রব্ব বা প্রতিপালক। বিশ্বের কোনো বস্তু তাঁর রবুবিয়্যতের আওতার বাইরে নয়। সুতরাং খোদা তা'লা কুরআনে সকল কল্যাণময় গুণের মধ্য থেকে রব্বুল আলামীন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন এবং বলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

(সূরা আল ফাতিহা: ২)

এটি বলার কারণ হলো, সকল কল্যাণময় বৈশিষ্ট্যের মাঝে রবুবিয়্যত বৈশিষ্ট্যই প্রকৃতিগতভাবে প্রাধান্য রাখে, অর্থাৎ প্রকাশ পাওয়ার দিক থেকেও প্রথমে প্রকাশ পায় আর সকল কল্যাণময় গুণের মাঝে সবচেয়ে বেশি সর্বজনীন এটিই। কেননা জড় হোক বা জীব, সবকিছুকে ঘিরেই এর কর্মপরিধি। এরপর দ্বিতীয় প্রকার কল্যাণ, যা দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে তা হলো সাধারণ কল্যাণধারা। এতে এবং সর্বাধিক বিরাজমান (অর্থাৎ ফয়যানে আ-আম) কল্যাণরাজির ভেতর পার্থক্য হলো সর্বাধিক বিস্তৃত (ফয়যানে আ-আম)

কল্যাণরাজি এক সর্বজনীন প্রতিপালনকে বলা হয় আর এর মাধ্যমেই সমগ্র বিশ্বজগতের প্রকাশ, বিকাশ ও অস্তিত্ব লাভ হয়েছে। এই কল্যাণধারা যার নাম হলো, সর্বব্যাপী বা সর্বজনীন কল্যাণধারা। এটি একটি বিশেষ ও স্থায়ী দান যা জীবজগতের অবস্থার নিরিখে তাদেরই জন্য নিবেদিত, অর্থাৎ প্রাণীকুলের প্রতি সম্মানিত খোদার যে একটি বিশেষ দৃষ্টি রয়েছে তার নাম হলো সর্বজনীন কল্যাণধারা বা ফয়যানে আম। এই কল্যাণময়তার সংজ্ঞা হলো, এটি কারো কোনো যোগ্যতা ও অধিকার ছাড়াই সকল জীবজগতের জন্য তাদের প্রয়োজন অনুসারে প্রবহমান রয়েছে এবং এটি কারো কোনো কর্মের প্রতিদান নয়। এই কল্যাণধারার কল্যাণময়তায় সকল প্রাণীকে জীবন্ত, জাগ্রত, পানাহার রত, বিপদাপদ থেকে মুক্ত থাকতে আর তাদের প্রয়োজন পূরণ হতে দেখা যায়। জীবনের জন্য সকল আবশ্যকীয় জীবনোপকরণ, যা কোনো জীবের নিজের অস্তিত্ব ও তার স্বপ্রজাতির অস্তিত্বের নিশ্চয়তার জন্য প্রয়োজন তা বিদ্যমান ও বিরাজমান হিসেবে চোখে পড়ে।

এসব সেই কল্যাণেরই নিদর্শন যে, প্রাণী বা জীবের দৈহিক প্রতিপালনের জন্য যা কিছু আবশ্যক তার সবই দেয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি যেসব প্রাণীর দৈহিক প্রতিপালনের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণেরও প্রয়োজন, অর্থাৎ যারা আধ্যাত্মিক উন্নতির সামর্থ্য রাখে তাদের জন্য সৃষ্টির আদি হতে একান্ত প্রয়োজনের সময় ঐশী বাণী অবতীর্ণ হয়ে আসছে। এককথায় কল্যাণপ্রবাহ 'রহমানিয়্যতের' মাধ্যমে মানুষ তার কোটি কোটি প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। যেমন জীবন ধারণের জন্য ভূপৃষ্ঠ, আলোর জন্য চন্দ্র-সূর্য, শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য বাতাস, পান করার জন্য পানি, খাওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকার আহার্য আর রোগ-বালাইয়ের চিকিৎসার জন্য লক্ষ লক্ষ প্রকার ঔষধ, পরিধানের জন্য বিভিন্ন প্রকার পোশাক এবং হেদায়েত বা সঠিক পথের দিশা লাভের জন্য রয়েছে ঐশী গ্রন্থাদি। কেউ এই দাবি করতে পারবে না যে, এসব আমার কর্মের ফলে সৃষ্টি হয়েছে আর কোন পূর্বজন্মে আমিই কোন পুণ্যকর্ম করেছি যার প্রতিদান হিসেবে খোদা তা'লা আদম সন্তানদের অগণিত নিয়ামত দান করেছেন। তাই প্রমাণিত হলো, এই কল্যাণরাজি যা সহস্র সহস্রভাবে জীবকুলের জন্য প্রকাশিত হচ্ছে তা কোনো যোগ্যতার বলে নয়, কোনো কর্মের বিনিময়ে নয়, কেবল ঐশী রহমতের একটি উচ্ছ্বাস ও আতিশয্যমাত্র যেন সকল প্রাণী নিজস্ব প্রকৃতিগত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয় এবং তার প্রকৃতিতে যেসকল চাহিদা সৃষ্টি

করা হয়েছে তা পূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং এই কল্যাণপ্রবাহের ক্ষেত্রে অনাদি-অনন্ত দানের ভূমিকা হলো মানুষ ও সকল জীবজগতের চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা করা আর তাদের জন্য যা আবশ্যকীয় ও অনাবশ্যকীয় সবকিছুর ওপর দৃষ্টি রাখা যেন মানুষ ধ্বংস হয়ে না যায় আর তাদের সক্ষমতা ও যোগ্যতা যেন সুপ্ত না থেকে যায়। এই কল্যাণ সাধনের বৈশিষ্ট্য খোদার সত্তায় বিদ্যমান থাকা প্রকৃতির নিয়ম প্রত্যক্ষ করে অতি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। কেননা কোনো বুদ্ধিমানের এতে দ্বিরুক্তি নেই যে, চন্দ্র, সূর্য, ভূমি এবং মৌল উপাদান ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়াদি যাদের কেন্দ্র করে সকল প্রাণীকুলের জীবন তা এই কল্যাণধারার সুবাদেই বিদ্যমান। মানুষ-পশু, মু'মিন-কাফির, পাপী-পুণ্যবান সকল জীব বিনা ব্যতিক্রমে নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে এই সকল কল্যাণধারা হতে লাভবান হচ্ছে। কোনো প্রাণী তা থেকে বঞ্চিত নয়। কুরআন শরীফে এই কল্যাণধারার নাম হলো রহমানিয়্যত।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে সূরা ফাতিহায় খোদার নাম রাব্বুল আলামীনের পর রহমান এসেছে। যেমন তিনি বলেছেন,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ○ الرَّحْمٰنِ ...

(সূরা আল ফাতিহা: ২-৩)

এই বৈশিষ্ট্যের দিকেই কুরআন শরীফের অন্য বহু স্থানে ইঙ্গিত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সেসবের মাঝে একটি হলো,

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ ۚ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا○ تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّ جَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّ قَمَرًا مُّنِيْرًا ○ وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا○ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا○

(সূরা আল ফুরকান: ৬১-৬৪)

অর্থাৎ অবিশ্বাসী, বেদ্বীন ও নাস্তিকদের যখন বলা হয় যে, তোমরা রহমান-কে সেজদা কর, তখন তারা রহমানের নামের প্রতি ঘৃণাভরে অস্বীকারের ভঙ্গিতে প্রশ্ন করে যে, রহমান কাকে বলে? (উত্তরস্বরূপ আল্লাহ্ তা'লা বলেন,)

'রহমান' অশেষ কল্যাণের আধার ও স্থায়ী কল্যাণরাজির উৎস সেই সত্তা, যিনি আকাশে গ্রহনক্ষত্রের কক্ষপথ বানিয়েছেন। গ্রহনক্ষত্রের আবর্তনস্থলে সূর্য ও চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন যা সাধারণভাবে সকল সৃষ্টিকে কাফের-মু'মিনের পার্থক্য না করেই আলো দান করে। এই রহমান খোদাই তোমাদের জন্য অর্থাৎ সমগ্র আদম সন্তানের জন্য দিন-রাত সৃষ্টি করেছেন, যা পালাক্রমে আসে, যেন তত্ত্বসন্ধানী মানুষ প্রজ্ঞার এই সূক্ষ্ম দিকগুলো থেকে লাভবান হতে পারে এবং অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্যের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। আর যে ব্যক্তি নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায় তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। রহমানের সত্যিকার পূজারি তারা, যারা পৃথিবীতে বিনয় ও নম্রতার মাঝে জীবন কাটায় আর অজ্ঞরা যখন তাদের সাথে কঠোর আচরণ করে তখন তারা প্রত্যুত্তরে শান্তিপূর্ণ ও দয়ার্দ্রভাবে কথা বলে, অর্থাৎ কঠোরতার পরিবর্তে কোমলতা প্রদর্শন করে আর গালির পরিবর্তে দোয়া করে। অধিকন্তু তারা রহমান খোদার রঙে রঙিন হয়ে থাকে, কেননা রহমান খোদাও পুণ্যকর্মশীল ও পাপাচারীর তারতম্য না করে স্বীয় সব বান্দাকে সূর্য ও চন্দ্র এবং ভূমি ও অপরাপর অগণিত নেয়ামত দ্বারা উপকৃত করে থাকেন। সুতরাং এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তা'লা ভালোভাবে স্পষ্ট করেছেন যে, রহমান শব্দ এই অর্থে বলা হয় যে, তাঁর মহাবিস্তৃত রহমত মোটের ওপর সকল ভালোমন্দকে পরিবেষ্টন করে আছে। যেমন, অন্য এক স্থানেও এই সর্বজনীন রহমতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِۦ مَنۡ أَشَآءُۖ وَرَحۡمَتِي وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٖۚ

(সূরা আল আ'রাফ: ১৫৭)

অর্থাৎ আমি আমার শাস্তি তাকে দেব যাকে শাস্তিযোগ্য মনে করব আর আমার রহমত সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। অন্যত্র তিনি বলেন–

قُلۡ مَن يَكۡلَؤُكُم بِٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحۡمَٰنِ

(সূরা আল আম্বিয়া: ৪৩)

অর্থাৎ সেই অবাধ্য ও কাফেরদের বলে দাও যে, যদি খোদার মাঝে রহমানিয়্যত বৈশিষ্ট্য না থাকত, তাহলে তোমাদের জন্য তাঁর শাস্তি এড়ানো সম্ভব হতো না। অর্থাৎ তাঁর রহমানিয়্যত গুণের সুবাদেই তিনি কাফের ও ঈমানহীনদের অবকাশ দেন এবং তাড়াতাড়ি পাকড়াও করেন না। অন্যত্র এই রহমানিয়্যতের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন–

اَوَلَمۡ یَرَوۡا اِلَی الطَّیۡرِ فَوۡقَهُمۡ صٰٓفّٰتٍ وَّ یَقۡبِضۡنَ ۘ مَا یُمۡسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحۡمٰنُ

(সূরা আল মূলক: ২০)

অর্থাৎ এরা কি নিজেদের মাথার ওপর উড়ন্ত পাখিগুলো দেখে নি, তারা কখনো ডানা প্রসারিত করে রাখে আবার কখনো তা সংকুচিত করে নেয়, রহমান খোদাই তাদেরকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করেন, অর্থাৎ রহমানিয়্যতরূপী কল্যাণধারা সমগ্র জীবজগতকে এমনভাবে পরিবেষ্টন করছে যে, মূল্যমানে যা এক পয়সায় দু-তিনটি পাওয়া যেতে পারে সেই পাখিও এই কল্যাণধারার সুবিস্তৃত সমুদ্রে সানন্দে প্রসন্নচিত্তে সন্তরণরত। আর যেহেতু রবুবিয়্যতের পর সেই কল্যাণধারারই স্থান, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ্ তা'লা সূরা ফাতিহায় রাব্বুল আলামীন বৈশিষ্ট্য উল্লেখের পর নিজের রহমান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, যেন এসবের স্বাভাবিক ধারাবিন্যাস বজায় থাকে।

কল্যাণধারার তৃতীয় প্রকার হলো বিশেষ কল্যাণধারা। এর মাঝে এবং সাধারণ কল্যাণধারার মাঝে পার্থক্য হলো, গণ বা সাধারণ কল্যাণধারা থেকে আশিসমণ্ডিত ব্যক্তির জন্য কল্যাণলাভের উদ্দেশ্যে নিজ জীবনে পবিত্র পরিবর্তন আনা, অমানিশার পর্দা হতে নিজের প্রবৃত্তিকে বাইরে আনা অথবা কোনোপ্রকার সংগ্রাম ও সাধনা করা আবশ্যক নয়। বরং সেই কল্যাণধারায়, যেভাবে আমরা এখন বর্ণনা করে এসেছি, খোদা তা'লা নিজেই সকল জীবের চাহিদা পূরণ করেন, নিজের স্বভাব-প্রকৃতি অনুসারে সে যেগুলোর মুখাপেক্ষী। কিন্তু বিশেষ কল্যাণধারায় সংগ্রাম, চেষ্টা-সাধনা, আত্মশুদ্ধি, দোয়া, কাকুতি-মিনতি ও খোদার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা আর স্থানকালপাত্রভেদে অন্য সকল প্রকার সংগ্রাম ও সাধনা হলো পূর্বশর্ত। এ কল্যাণধারা সে-ই লাভ করে– যে সন্ধান করে। তার ওপরই অবতীর্ণ হয়, যে এর জন্য সাধনা করে। প্রকৃতির নিয়মের প্রতি দৃষ্টিপাতে এই কল্যাণধারার অস্তিত্ব প্রমাণিত। কারণ একথা অতি স্পষ্ট যে, খোদার পথে চেষ্টা-সাধনাকারী আর উদাসীন ব্যক্তি সমান হতে পারে না। নিঃসন্দেহে আন্তরিক সততা নিয়ে খোদার পথে যারা চেষ্টা-সাধনা করে এবং সকল প্রকার অন্ধকার ও ফ্যাসাদ এড়িয়ে চলে, সেই বিশেষ রহমত তাদেরই লাভ হয়। এই কল্যাণধারার নিরিখে কুরআন শরীফে খোদা তা'লার নাম হলো রহীম। আর রহীমিয়্যত বৈশিষ্ট্যের এই মর্যাদা বিশেষ

ও শর্তসাপেক্ষ হওয়ার কারণে, মর্যাদায় রহমানিয়্যতের পরে রয়েছে। খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রথমে রহমানিয়্যত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে, এরপর প্রকাশিত হয়েছে রহীমিয়্যত। সুতরাং এই স্বাভাবিক ধারাবিন্যাসের দৃষ্টিকোণ থেকে সূরা ফাতিহায় রহীমিয়্যতকে রহমানিয়্যতের পরে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলেছেন, **আর রহমান আর রহীম**। রহীমিয়্যত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কুরআন শরীফের বেশ কয়েক স্থানে রয়েছে, যেমন একস্থানে বলেন–

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا

(সূরা আল আহযাব: ৪৪)

অর্থাৎ খোদার রহীমিয়্যত কেবল বিশ্বাসীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কাফের বা ঈমানহীন ও বিদ্রোহীরা কল্যাণমণ্ডিত হয় না।

এখানে স্মর্তব্য যে, খোদা তা'লা কত আশ্চর্যজনকভাবে রহীমিয়্যত বৈশিষ্ট্যকে বিশেষভাবে মু'মিনের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন কিন্তু রহমানিয়্যতকে কোথাও মু'মিনের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করেননি আর কোন স্থানে বলেননি যে, كان بالمؤمنين رحمنًا বরং সৃষ্টির প্রতি রহমত বা দয়ার যে অংশ বিশেষভাবে মু'মিনের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেটিকে সর্বত্র রহীমিয়্যত বৈশিষ্ট্যে উল্লেখ করেছেন। আবার অন্যত্র বলেছেন–

اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

(সূরা আল আ'রাফ: ৫৭)

অর্থাৎ খোদার রহমত তাদের সন্নিকটে যারা পুণ্যকর্মশীল। পুনরায় অন্যত্র বলেছেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

(সূরা আল বাকারা: ২১৯)

অর্থাৎ যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে খোদার জন্য স্বদেশ বা রিপুপূজার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এবং খোদার পথে চেষ্টা-সাধনা করেছে তারা খোদার রহীমিয়্যতে ধন্য হওয়ার আশা রাখতে পারে আর খোদা ক্ষমাশীল ও দয়ালু অর্থাৎ তাঁর রহীমিয়্যতের কল্যাণধারা অবশ্যই তাদের লাভ হয়ে যায় যারা এর যোগ্য। কেউ এমন নেই যে তাঁকে সন্ধান করেছে কিন্তু পায় নি।

عاشق کہ شد کہ یار بحالش نظر نہ کرد   اے خواجہ درد نیست و گرنہ طبیب ہست

সে কেমন প্রেমিক যার প্রতি প্রেমাস্পদ দেখেই না,
হে সম্মানিত ব্যক্তি (জনাব)! ব্যথাই নেই নতুবা ডাক্তার তো আছে।

কল্যাণের চতুর্থ ধারা হলো 'আখাস' বা সবচেয়ে বিশেষ বা সর্ববিশেষ অথবা সবচেয়ে বিরল কল্যাণধারা। এটি সেই কল্যাণধারা যা কেবল শ্রম ও চেষ্টা-সাধনার ফলে লাভ হতে পারে না বরং এর প্রকাশ ও আবির্ভাবের জন্য প্রথম শর্ত হলো এই উপকরণস্থল (অর্থাৎ পৃথিবী) যা একটি সংকীর্ণ ও তমসাচ্ছন্ন স্থান, তা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হওয়া ও হারিয়ে যাওয়া, আর গতানুগতিক বা জানা উপকরণের সংমিশ্রণ বা ভূমিকা ছাড়াই মহা সম্মানিত, এক ও অদ্বিতীয় খোদার পূর্ণ শক্তির অতি স্পষ্টভাবে স্বীয় পূর্ণ চমক বা ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করা। কেননা এই শেষ কল্যাণধারায়, যা সকল কল্যাণধারার শীর্ষদেশ, পূর্ববর্তী সব কল্যাণধারার তুলনায় যুক্তির নিরিখে যে বাড়তি ও শ্রেষ্ঠত্ব ভাবা যায় তা হলো, এই কল্যাণধারা অতি স্পষ্ট ও পরিষ্কার হওয়া বাঞ্ছনীয় আর কোন সন্দেহ ও অপ্রকাশিত দিক এবং ত্রুটি যেন এতে না থাকে। অর্থাৎ কল্যাণ সাধনকারীর সচেতন কল্যাণ সাধনে কোন সন্দেহ যেন অবশিষ্ট না থাকে আর কল্যাণধারার সত্যিকার কল্যাণ এবং খাঁটি ও কামেল রহমত হওয়ার বিষয়েও যেন কোন দ্বিরুক্তির সুযোগ না থাকে, বরং যে আদি সর্বাধিপতির পক্ষ থেকে কল্যাণধারা অবতীর্ণ হয়েছে তাঁর বদান্যতা ও পুরস্কার-প্রদান দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। অধিকন্তু কল্যাণপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাসের ন্যায় এই বিষয় যেন দেখা ও অনুভূত বিষয় হয়ে যায় যে, সত্যিকার অর্থে সেই রাজাধিরাজই স্বীয় ইচ্ছা, দৃষ্টি ও বিশেষ শক্তির মাধ্যমে তাকে এক মহান নেয়ামত ও অনেক বড় আনন্দ দান করছেন।

সত্যিকার অর্থে **কোনো প্রকার পরীক্ষাস্বরূপ নয় বরং** তার স্বীয় পুণ্যকর্মের **একটি সম্পূর্ণ এবং স্থায়ী প্রতিদান লাভ হচ্ছে যা অতি স্বচ্ছ, অতীব উন্নত, খুবই পছন্দনীয় ও অত্যন্ত সুপ্রিয়। এমন সর্বোৎকৃষ্ট ও সবচেয়ে পরিপূর্ণ, স্থায়ী ও সবচেয়ে মহান এবং সমুজ্জ্বল কল্যাণধারার মাধ্যমে কল্যাণমণ্ডিত হওয়া নির্ভর করে বান্দার এই ত্রুটিপূর্ণ, ঘোলাটে, দূষিত, সংকীর্ণ, আবদ্ধ, ক্ষণস্থায়ী এবং সন্দেহ-সংশয়পূর্ণ জগৎসংসার থেকে পরজগতের প্রতি যাত্রার ওপর। কেননা এই কল্যাণধারা সুমহান ঐশী বিকাশের প্রকাশস্থল, যেসবের শর্ত হলো– সত্যিকার অনুগ্রহশীল খোদার সৌন্দর্য দিবালোকের মত স্পষ্ট ও**

অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় হিসেবে পরিদৃষ্ট হওয়া। যাতে দর্শন-পর্যবেক্ষণ, প্রকাশ-বিকাশ ও বিশ্বাসের কোনো দিকই বাদ না পড়ে। প্রচলিত বা গতানুগতিক উপকরণের কোনো পর্দা যেন মাঝে অন্তরায় না হয় এবং পরম উৎকৃষ্ট তত্ত্বজ্ঞানের সকল সূক্ষ্মতম দিকও যেন অন্তর্নিহিত শক্তির স্তর থেকে কর্মের রূপ পরিগ্রহ করে। এছাড়া কল্যাণধারাও এমনভাবে সুপ্রকাশিত ও সুবিদিত সত্য হওয়া বাঞ্ছনীয় যা সম্পর্কে খোদা স্বয়ং প্রকাশ করে থাকবেন যে, এটি সকল পরীক্ষা ও বিপদাপদের জঞ্জাল থেকে মুক্ত। অধিকন্তু এই কল্যাণধারায় সেই সুমহান ও পূর্ণমানের স্বাদ-আনন্দ থাকা বাঞ্ছনীয় যার পবিত্র ও সর্বোৎকৃষ্ট রূপ মানুষের মনমস্তিষ্ক, ভেতর-বাহির, মন-প্রাণ এবং সকল প্রকার আত্মিক ও দৈহিক শক্তির ওপর এতটা পূর্ণ ও স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ রাখবে যে, বিবেকবুদ্ধি, ধ্যানধারণা ও চিন্তাভাবনার দৃষ্টিকোণ থেকে এর চেয়ে বেশি ভাবাই যায় না। এ বিশ্ব, যা অসার ও অসম্পূর্ণ, বাহ্যরূপে কলুষিত, নশ্বর, অবস্থানগত দিক থেকে অস্পষ্ট ও স্থান-কালের নিরিখে সংকীর্ণ- তা এসব মহান বিকাশ, স্বচ্ছ জ্যোতি ও স্থায়ী দানকে ধারণ করতে পারে না। আর সেই অনুপম, পরিপূর্ণ ও স্থায়ী কিরণের সংকুলান তাতে হতে পারে না, বরং তা প্রকাশিত হবার জন্য একটি ভিন্ন জগতের প্রয়োজন যা প্রচলিত উপকরণের অন্ধকারাচ্ছন্নতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র হবে, যা হবে এক-অদ্বিতীয় ও প্রতাপান্বিত সত্তার পরিপূর্ণ ও প্রকৃত এবং খাঁটি শক্তির বহিঃপ্রকাশস্থল। অবশ্য এই আখাস বা সর্ববিশেষ কল্যাণধারা থেকে সেসকল পূর্ণ মানবের ইহজগতেই কিছুটা অংশ লাভ হয় যারা সত্যের পথে পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে পদচারণা করেন এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের তারা পুরোপুরি খোদার দরবারে সমর্পণ করেন। কেননা তাঁরা মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। যদিও তাঁরা বাহ্যত এ পৃথিবীতেই অবস্থান করেন কিন্তু মূলত থাকেন পরজগতে।

অতএব যেহেতু তাঁরা পার্থিব উপায়-উপকরণের সাথে হৃদয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করে নেন আর মানবীয় কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করেন, খোদা ছাড়া অন্য সবার দিক থেকে পুরোপুরি মুখ ফিরিয়ে সেই অলৌকিক রীতি অবলম্বন করেন, তাই মহা সম্মানিত খোদাও তাঁদের সাথে এমনই ব্যবহার করেন আর অলৌকিকভাবে তাঁদের ওপর সেই বিশেষ জ্যোতি প্রকাশ করেন যা অন্যদের ক্ষেত্রে মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশ পেতে পারে না। বস্তুত উপরোল্লিখিত বিষয়াদির কারণে তাঁরা এ পৃথিবীতেও সবিশেষ বা অসাধারণ কল্যাণের জ্যোতি থেকে

কিছু অংশ লাভ করেন। এ কল্যাণধারা সকল কল্যাণধারার মাঝে বিশেষ মর্যাদা রাখে এবং সকল কল্যাণধারার চূড়া। এ মার্গ অর্জনকারী মহাপুণ্যের ভাগী হয়ে থাকে এবং স্থায়ী স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে, যা সকল আনন্দের উৎসস্থল; যে ব্যক্তি এটি থেকে বঞ্চিত থাকল সে অনন্ত জাহান্নামে নিপতিত হলো। এই কল্যাণের নিরিখে খোদা তা'লা কুরআন শরীফে নিজের নাম 'মালিক ইয়াউমিদ্দীন' রেখেছেন। শাস্তি-পুরস্কার বলতে সেই পূর্ণ শাস্তি বা পুরস্কার বোঝায় যার বিস্তারিত বিবরণ কুরআন শরীফে লিপিবদ্ধ রয়েছে। 'দ্বীন' শব্দে আলিফ-লাম যুক্ত করা হয়েছে যেন এই অর্থ প্রকাশ পায় যে, প্রতিদান বলতে সেই পূর্ণ প্রতিদান বুঝায় যার বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে আর সেই পূর্ণ শাস্তি-পুরস্কার মালিকিয়্যতের পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ছাড়া সম্ভব নয় যার জন্য উপকরণের ভিতকে চূর্ণবিচূর্ণ করা আবশ্যক। যেমন, এর প্রতিই ইঙ্গিত করে অন্যত্র বলেছেন–

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ؕ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

(সূরা আল মু'মিন: ১৭)

অর্থাৎ সেদিন ঐশী প্রতিপালনের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ রবুবিয়্যত কোন স্বাভাবিক ও সাধারণ উপকরণ বা মাধ্যম ছাড়া নিজ গুণেই বিকশিত হবে আর এটিই দেখা যাবে আর অনুভূত হবে যে, মহা সম্মানিত স্রষ্টার মহান শক্তি ও পরম ক্ষমতা ছাড়া বাকি সবকিছুই তুচ্ছ। তখন সকল আরাম ও আনন্দ আর শাস্তি ও পুরস্কার স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে খোদার হাতে বলে পরিদৃষ্ট হবে আর মধ্যবর্তী কোনো পর্দা বা প্রতিবন্ধকতা (অবশিষ্ট) থাকবে না এবং কোনোপ্রকার সন্দেহের অবকাশও থাকবে না। তখন যারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য পৃথিবীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল তারা নিজেদেরকে পূর্ণ-সৌভাগ্যের মাঝে পাবে, যা তাদের দেহ-প্রাণ ও ভেতর-বাহিরে ছেয়ে যাবে এবং তাদের অস্তিত্বের এমন কোনো অংশ থাকবে না যা এই মহা সৌভাগ্য লাভ করা থেকে বঞ্চিত থাকবে। এখানে মালিকি ইয়াউমিদ্দীন শব্দে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, সেদিন আরাম ও শাস্তি আর আনন্দ ও বেদনার যা কিছু আদম সন্তানগণ মুখোমুখি হবে তার মূল উৎস হবে আল্লাহ্ তা'লার সত্তা। শাস্তি বা পুরস্কার সংক্রান্ত বিষয়ের মালিক সত্যিকার অর্থে তিনিই হবেন, অর্থাৎ তাঁর সাথে সম্পৃক্ততা বা বিচ্ছিন্নতা স্থায়ী সৌভাগ্য বা স্থায়ী দুর্ভাগ্যের কারণ হবে। অনুরূপভাবে যারা তাঁর সত্তায় ঈমান এনেছিল এবং একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিল এবং তাঁর একনিষ্ঠ ভালোবাসায়

নিজেদের হৃদয়কে রঙিন করে নিয়েছিল তাদের ওপর সেই কামিল সত্তার করুণার জ্যোতি পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে অবতীর্ণ হবে। অপরদিকে যাদের খোদার ওপর ঈমান ও তাঁর ভালোবাসা অর্জিত হয় নি তারা এই আনন্দ ও প্রশান্তি হতে বঞ্চিত থেকে যাবে এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিতে নিপতিত হবে। এই হলো চার প্রকার কল্যাণধারা, যা আমরা বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করেছি। এখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে, রহমান বৈশিষ্ট্যকে রহীম বৈশিষ্ট্যের ওপর অগ্রগণ্য করা একান্ত আবশ্যক এবং এটিই উৎকৃষ্ট বাগ্মিতার দাবি; কেননা প্রকৃতিরূপী গ্রন্থে দৃষ্টিপাতে প্রথমে খোদা তা'লার সার্বজনীন রবুবিয়্যত বা প্রতিপালনের ওপর দৃষ্টি পড়ে, এরপর তাঁর রহমানিয়্যতের (অপার করুণার) প্রতি, অতঃপর তাঁর রহীমিয়্যতের প্রতি, এরপর তাঁর মালেক ইয়াউমিদ্দীন (অর্থাৎ শাস্তি-পুরস্কার দিবসের মালিক) হওয়ার দিকে। এরই নাম হলো পূর্ণ-বাগ্মিতা বা প্রাঞ্জলতা অর্থাৎ প্রকৃতিরূপী গ্রন্থে যে ধারাবাহিকতা বিদ্যমান থাকে এলহামী গ্রন্থের ধারাবাহিকতায়ও তা বজায় থাকা বাঞ্ছনীয়; কেননা খোদার বাণী বা কুরআনে প্রকৃতিগত ধারাবিন্যাসকে পাল্টে দেয়া যেন প্রকৃতির নিয়মকে পরিবর্তন করে দেয়ার শামিল এবং স্বাভাবিক ব্যবস্থাকে পাল্টে দেয়া বইকি। বাগ্মিতাপূর্ণ বাণীর জন্য অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হলো, বাণী বা এলহামের ব্যবস্থা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের সাথে এমনভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত যেন তা তারই প্রতিফলিত ছবি হিসেবে প্রতিভাত হয়। আর যে বিষয়টি প্রকৃতিগতভাবে ও ঘটার দিক থেকে অগ্রগণ্য, সেটি প্রথমেই রাখা উচিত। সুতরাং উল্লিখিত আয়াতের সুমহান বাগ্মিতা ও আলংকারিকতা হলো, পরম প্রাঞ্জলতা ও সুন্দর বাচনভঙ্গী সত্ত্বেও সত্যিকার বিন্যাসের যথাযথ চিত্র অঙ্কন করে দেখিয়ে দিয়েছে আর বর্ণনায় সেই রীতিই অবলম্বন করেছে– যা বিশ্ব ব্যবস্থায় পরিষ্কারভাবে চক্ষুষ্মান প্রত্যেক ব্যক্তির চোখে পড়ছে। কি যে, যেই ধারাবাহিকতায় ঐশী কল্যাণরাজি প্রকৃতিরূপী গ্রন্থে বিদ্যমান সেই একই ধারাবাহিকতা এলহামী গ্রন্থেও বিদ্যমান থাকবে? এটি অত্যন্ত সোজা ও সরল পন্থা নয়। সুতরাং এমন উন্নত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ ধারাবিন্যাস সম্পর্কে আপত্তি করা সত্যিকার অর্থে সেসব অন্ধের কাজ যাদের বাহ্যিক দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি দু'টিই পুরোপুরি লোপ পেয়েছে।

چشم بد اندیش کہ برکندہ باد   عیب نماید ہنرش در نظر

দুরভিসন্ধিবাজের চোখ উপড়ে ফেলা উচিত,
যোগ্যতা ও দক্ষতা তার কাছে দোষ মনে হয়।

এখন আমরা পুনরায় বক্তৃতা বা কথার পুনরাবৃত্তি করে একথার উল্লেখ করতে চাই যে, খোদা তা'লা উল্লিখিত সূরায় 'রাব্বুল আলামীন' বৈশিষ্ট্য থেকে আরম্ভ করে মালিকি ইয়াউমিদ্দীন পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। কুরআনের ব্যাখ্যা অনুসারে এগুলো চারটি সুমহান সত্য যা এখানে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা যুক্তিযুক্ত। প্রথম সত্য হলো, খোদা তা'লা রাব্বুল আলামীন অর্থাৎ বিশ্বে যাকিছু আছে সবকিছুর প্রতিপালক ও সর্বাধিপতি। যা কিছু বিশ্বে প্রকাশিত হয়েছে ও চোখে পড়ে বা অনুভব করা যায় অথবা বিবেকবুদ্ধি যা আয়ত্ত করতে পারে, এর সবকিছুই সৃষ্ট বা মাখলুক। স্রষ্টার অস্তিত্ব ছাড়া কোন বস্তুরই সত্যিকার (অর্থে কোন) অস্তিত্ব নেই। এককথায় বিশ্বজগৎ, এর প্রতিটি উপাদানসহ সৃষ্ট এবং খোদার সৃষ্টি। বিশ্ব জগতের বিভিন্ন উপাদান বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের কোন একটি বস্তুও এমন নেই যা খোদার সৃষ্টি নয়। খোদা তা'লা স্বীয় পূর্ণ রবুবিয়্যতের মাধ্যমে বিশ্ব জগতের প্রতিটি কণার ওপর নিয়ন্ত্রণ ও রাজত্ব করছেন আর তাঁর রবুবিয়্যত (লালন-পালন) সদা কর্মে নিয়োজিত। এমন নয় যে, খোদা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করে, এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নির্বিকার বসে আছেন আর একে প্রকৃতির নিয়মের হাতে এমনভাবে সোপর্দ করেছেন যে, স্বয়ং কোন কাজে হস্তক্ষেপ করেন না!

যেভাবে কোন মেশিন নির্মিত হওয়ার পর প্রস্তুতকারীর সাথে এর আর কোনো সম্পর্ক থাকে না, অনুরূপভাবে শিল্প যেন সত্যিকার শিল্পীর সাথে সম্পর্কহীন হয়ে পড়েছে! সত্য কথা হলো, সেই বিশ্বপ্রতিপালক সারা বিশ্বের ওপর অবিরত স্বীয় নিখুঁত প্রতিপালনের পানি সিঞ্চন করে চলেছেন আর তাঁর রবুবিয়্যতের বারিধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে সমগ্র বিশ্বের ওপর বর্ষিত হয়ে চলেছে। এমন কোন মুহূর্ত নেই যা তাঁর কল্যাণরাজির পেয়ালা থেকে বঞ্চিত থাকবে বরং বিশ্বকে সৃষ্টি করার পরেও সত্যিকার অর্থে বিন্দুমাত্র তারতম্য ছাড়াই বিশ্বের জন্য কল্যাণের সেই উৎসের অবিকল সেভাবেই প্রয়োজন রয়েছে, যেভাবে কোনো কিছু সৃষ্টির পূর্বে ছিল। যেভাবে পৃথিবী স্বীয় অস্তিত্ব লাভ ও প্রকাশ-বিকাশের জন্য তাঁর রবুবিয়্যতের মুখাপেক্ষী ছিল, একইভাবে স্বীয় অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের জন্যও তাঁর রবুবিয়্যতের মুখাপেক্ষী। তিনি প্রতিটি মুহূর্তেই বিশ্বজগতকে নিয়ন্ত্রণ করছেন আর পৃথিবীর প্রতিটি বিন্দু তাঁর কল্যাণেই সতেজ ও সক্রিয়। তিনি স্বীয় ইচ্ছা ও পছন্দ মোতাবেক প্রতিটি বস্তু প্রতিপালন করছেন। অনিচ্ছায় বা অপরিকল্পিতভাবে কোনা কিছুর

প্রতিপালনের কারণ তিনি নন। এককথায় কুরআনের সেসকল আয়াত অনুসারে যার সারাংশ আমরা বর্ণনা করছি, সেই শাশ্বত সত্যের উদ্দেশ্য হলো এটি স্পষ্ট করা যে, বিশ্বে যা কিছু দেখা যায় সবকিছুই সৃষ্ট এবং নিজ সকল উৎকর্ষতা ও অবস্থা-ব্যবস্থায় সার্বক্ষণিকভাবে খোদা তা'লার রবুবিয়্যত বা প্রতিপালনের মুখাপেক্ষী। এমন কোনো আধ্যাত্মিক বা দৈহিক শ্রেষ্ঠত্ব নেই যা কোনো সৃষ্টি সেই চূড়ান্ত ও পরম নিয়ন্তার বিশেষ ইচ্ছা ছাড়া নিজগুণে অর্জন করতে পারে। অধিকন্তু এই পবিত্র বাণীর ব্যাখ্যা অনুসারে এই সত্য এবং সেসকল সত্যের মাঝে এ অর্থও দৃষ্টিতে রাখা হয়েছে যে, খোদা তা'লার মাঝে যে রাব্বুল আলামীন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যাবলী বিদ্যমান, তা তাঁর এক-অদ্বিতীয় সত্তারই বিশেষত্ব, অন্য কেউ এতে তাঁর অংশীদার নয়। যেমন এই সূরার প্রথম বাক্যে অর্থাৎ আলহামদু লিল্লাহ্'-তে এই কথা বর্ণিত হয়েছে যে, সকল প্রশংসা খোদারই বিশেষত্ব। দ্বিতীয় সত্য হলো, রহমান, যা রাব্বুল আলামীনের পরে বর্ণনা করা হয়েছে। যেভাবে আমরা পূর্বেও বর্ণনা করে এসেছি, রহমানের অর্থ হলো, যত জীব-জগৎ রয়েছে তা সচেতন হোক বা অচেতন, পাপী হোক বা পুণ্যবান, এ সবের স্থায়িত্ব এবং ব্যক্তি ও শ্রেণির অস্তিত্বের নিশ্চয়তা ও এসবের পরিপূর্ণতার জন্য স্বীয় সর্বজনীন করুণা ও রহমতের দৃষ্টিকোণ থেকে খোদা তা'লা সকল প্রকার প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করেছেন এবং সব সময় করে থাকেন। এটি নিছক একটি দান যা কোন ব্যক্তির কর্মের ওপর নির্ভরশীল নয়। তৃতীয় সত্য, রহীম যা রহমানের পর উল্লিখিত হয়েছে। যার অর্থ হলো খোদা তা'লা কর্মশীলদের চেষ্টা-সাধনার পর বিশেষ রহমতের দাবি অনুসারে উত্তম ফলাফল প্রকাশ করেন। তওবাকারীদের পাপ ক্ষমা করেন, যাচনাকারীদের দান করেন। যারা কড়া নাড়ে তাদের জন্য দুয়ার খোলেন। চতুর্থ সত্য যা সূরা ফাতিহায় উল্লিখিত রয়েছে তা হলো, মালিকি ইয়াউমিদ্দীন অর্থাৎ পরম উৎকৃষ্ট ও পরিপূর্ণ শাস্তি-পুরস্কার, যা সকল প্রকার পরীক্ষা, বিপদাপদ, উপকরণ, ঔদাসীন্য ও প্রতারণার হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত এবং সকল প্রকার পঙ্কিলতা, কলুষ, সন্দেহ-সংশয় ও ত্রুটিবিচ্যুতির ঊর্ধ্বে এবং মহান ঐশী বিকাশের নিদর্শন।

এর মালিকও সেই নিরঙ্কুশ ক্ষমতাধর আল্লাহ্ তা'লা। দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, তিনি স্বীয় পরিপূর্ণ প্রতিদান বা পুরস্কার প্রকাশে আদৌ অক্ষম নন। এই মহান সত্য প্রকাশের পেছনে মহা সম্মানিত খোদার উদ্দেশ্য হলো, নিম্নে বিশদভাবে লিখিত বিষয়টি অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়ের মতো সবার কাছে স্পষ্ট

করা। প্রথম কথা হলো, শাস্তি ও পুরস্কার একটি বাস্তব ও নিশ্চিত সত্যবিষয়, যা প্রকৃত মালিকের পক্ষ থেকে তাঁর বিশেষ ইচ্ছায় বান্দাদের ওপর বর্তায়। প্রধানত তা এমনভাবে পৃথিবীতে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়, কেননা এ পৃথিবীতে এ কথা সাধারণ মানুষের সামনে প্রকাশ পায় না যে, ভালো-মন্দ ও সুখ-দুঃখ, যা কিছুর মানুষ সম্মুখীন হচ্ছে, তা কেন এবং কার নির্দেশে ও কার কর্তৃত্বাধীনে হচ্ছে! তাদের মাঝে কারো কানে এই ধ্বনি আসে না যে, সে নিজ কর্মের প্রতিফল লাভ করছে। অপরদিকে কারো সামনে পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও অনুভূত বিষয় হিসেবে প্রকাশ পায় না যে, সে যে কষ্ট পাচ্ছে তা সত্যিকার অর্থে তার কৃতকর্মেরই পরিণাম। দ্বিতীয়ত, এই সত্যের মাধ্যমে এ কথা স্পষ্ট করা উদ্দেশ্য যে, প্রচলিত বা সাধারণ উপকরণ বলতে কিছু নেই বরং সত্যিকার অধিকর্তা হলেন খোদা তা'লা। তিনিই একমাত্র মহান সত্তা যিনি যাবতীয় কল্যাণের উৎস এবং শাস্তি-পুরস্কারের মালিক।

তৃতীয়ত, পরম সৌভাগ্য ও চরম দুর্ভাগ্য বলতে কী বোঝায়– এই সত্যের মাধ্যমে সেটিও প্রকাশ করা হলো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সেই মহা সাফল্যপূর্ণ অবস্থার নাম মহা সৌভাগ্য যখন আলো, আনন্দ এবং স্বাদ ও প্রশান্তি মানুষের ভেতর-বাহির ও কায়-মনে ছেয়ে যায় এবং কোন অঙ্গ ও শক্তি এর বাইরে থাকে না। আর মহা দুর্ভাগ্য সেই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি যা অবাধ্যতা, অপবিত্রতা এবং দূরত্বের কারণে হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হয়ে দেহের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে, আর এমন মনে হয় যেন পুরো সত্তা অগ্নি ও জাহান্নামে নিপতিত। এই অসাধারণ বিকাশ এই পৃথিবীতে ঘটতে পারে না, কেননা এই সংকীর্ণ-সংকুচিত ও কলুষিত জগৎ, যা উপকরণের অন্তরালে আত্মগোপন করে একটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে, তা এর প্রকাশ ও বিকাশ ধারণের ক্ষমতা রাখে না। বরং এই জগতের ওপর রাজত্ব করছে পরীক্ষা ও সমস্যা। এর সুখ ও দুঃখ দুটোই ক্ষণস্থায়ী ও অসম্পূর্ণ। এছাড়া এ পৃথিবীতে মানুষের ওপর যা কিছু নিপতিত হয় তা উপকরণের আবরণে আচ্ছাদিত, যার কারণে শাস্তি বা পুরস্কারদাতা মালিকের চেহারা পর্দার আড়ালে ও আচ্ছন্ন রয়েছে। অতএব এটি শতভাগ, পুরোপুরি ও আক্ষরিকভাবে শাস্তি-পুরস্কার দিবস হতে পারে না, বরং সত্যিকার, খাঁটি ও সম্পূর্ণ শাস্তি-পুরস্কার দিবস বা ইয়ামুদ্দীন সেই জগতে হবে যা এই পৃথিবীর সমাপ্তির পর আসবে। আর সেই জগতই বিভিন্ন জ্যোতির্বিকাশের মহান দৃষ্টান্ত হবে এবং তা প্রতাপ ও সৌন্দর্য পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হবার জায়গা। আর যেহেতু এই ইহজগত স্বীয় (প্রকৃত) অবস্থার

নিরিখে শাস্তি বা পুরস্কারস্থল নয় বরং পরীক্ষাগার, তাই স্বাচ্ছন্দ্য-অস্বাচ্ছন্দ্য, কষ্ট ও আরাম, সুখ-দুঃখ যা এ পৃথিবীতেই মানুষের ওপর নিপতিত হয়। তা খোদার সুনিশ্চিত সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির প্রমাণ বহন করে না। যেমন কারো সম্পদশালী হয়ে যাওয়া একথার নিশ্চিত প্রমাণ বহন করে না যে, খোদা তা'লা তার প্রতি সন্তুষ্ট আর কারো নিঃস্ব ও সহায়-সম্বলহারা হয়ে যাওয়াও একথার প্রমাণ বহন করে না যে, খোদা তা'লা তার প্রতি অসন্তুষ্ট, বরং উভয়ভাবে তা পরীক্ষা, যেন সম্পদশালীকে তার সম্পদ দ্বারা আর দরিদ্রকে তার দারিদ্র্যের মাধ্যমে পরীক্ষা করা যায়। এ হলো চারটি শাশ্বত, সত্য কুরআনে যার বিশদ বিবরণ রয়েছে। কুরআন শরীফ পাঠে জানা যাবে যে, এই সকল সত্যের বিশদ বিবরণ সম্বলিত কুরআনের আয়াতগুলো একটি নদীর ন্যায় বহমান রয়েছে। যদি আমরা এখানে এ আয়াতগুলো বিস্তারিতভাবে লিখতাম, তাহলে পুস্তকের অনেক অধ্যায় এতেই লেগে যেতো। ইনশাআল্লাহ্ কুরআনের সত্যতার প্রমাণ তুলে ধরতে গিয়ে যেহেতু সেসব আয়াত অচিরেই সবিস্তারে লেখা হবে তাই আমরা এই মুখবন্ধে সূরা ফাতিহা সম্পর্কে (লিখিত) সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ কথাগুলোকেই যথেষ্ট মনে করছি।

এরপর এখন আমরা বর্ণনা করতে চাই যে, এই চারটি সত্য, যা প্রমাণের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিষ্কার এবং সত্যতার দিক থেকে স্পষ্ট। এতটা অনন্য ও উন্নত যে, এটি সুনিশ্চিত ও অকাট্য যুক্তির ভিত্তিতে প্রমাণিত অর্থাৎ, হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর আবির্ভাবের সময় এই চারটি মহান সত্য পৃথিবী থেকে হারিয়ে গিয়েছিল আর ধরাপৃষ্ঠে এমন কোন জাতি ছিল না যারা কোনোরূপ বাড়াবাড়ি বা বিচ্যুতির শিকার না হয়ে এসব সত্যের অনুসরণ করত। এরপর যখন কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হলো তখন এই পবিত্র বাণী নতুনভাবে হারিয়ে যাওয়া এসব সত্যকে নিভৃত কোণ থেকে বের করে এবং ভ্রষ্টদের এসবের স্বর্গীয় অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত করে, অধিকন্তু পৃথিবীতে এসবের বিস্তার ঘটিয়ে এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে এসবের আলোতে আলোকিত করে। সকল জাতি কেন এসকল সত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অনবহিত ও অজ্ঞ ছিল তা স্পষ্ট করার জন্য এই একটি প্রমাণই যথেষ্ট যে, আজও সত্য ধর্ম ইসলাম (বা মুসলমান) ছাড়া পৃথিবীতে সঠিক ও নিখুঁতভাবে আর কেউ এসব সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। যদি কেউ এমন কোন জাতি আছে বলে দাবি করে তাহলে তা প্রমাণ করার দায়িত্ব তার। এছাড়া কুরআনের সাক্ষ্য, যা শত্রু-মিত্র সবার মাঝে প্রকাশিত থাকার কারণে সকল প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য প্রমাণস্বরূপ,

একথার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট, আর সে সকল সাক্ষ্য কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। অধিকন্তু কোন ঐতিহাসিক ও সত্য সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তির অজানা থাকবে না যে, মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত পৃথিবীর সকল জাতির ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তি চরম পর্যায়ে উপনীত ছিল আর তারা কোনো সত্যের ওপর পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। যেমন প্রথমে যদি ইহুদীদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় তাহলে প্রকাশ পাবে যে, খোদা তা'লার পরমোৎকর্ষ প্রতিপালন সম্পর্কে তাদের হৃদয়ে অনেক সন্দেহ-সংশয় দানা বেঁধেছিল। তারা একমাত্র বিশ্বপ্রতিপালকের সত্তায় নির্ভর না করে বিভিন্ন ধরনের শত শত প্রভু নিজেদের জন্য বানিয়ে রেখেছিল অর্থাৎ তাদের মাঝে সৃষ্টিপূজা ও দেবতাপূজার ভয়াবহ প্রচলন ছিল। তাদের এই অবস্থা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে বর্ণনা করে বলেছেন–

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

(সূরা আত তাওবা: ৩১)

অর্থাৎ ইহুদীরা তাদের মৌলভী ও দরবেশদের নিজেদের প্রভু ও অভাব মোচনকারী গণ্য করে রেখেছিল অথচ তারা খোদা নয় বরং সৃষ্ট। আর কিছু নেচারী বা প্রকৃতিবাদীর ন্যায় অধিকাংশ ইহুদীর বিশ্বাস যাতে রূপ নেয় তা হলো, বিশ্ব ব্যবস্থার নিয়মকানুন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সুশৃংখল ও সুনির্দিষ্ট নিয়মে চলছে।

আর এই আইনে নিরঙ্কুশ বা স্বাধীন নিয়ন্তারূপে হস্তক্ষেপে খোদা তা'লা অক্ষম ও ব্যর্থ; যেন তাঁর উভয় হাত বাঁধা রয়েছে। এই নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়ে কিছু আবিষ্কারও করতে পারেন না এবং ধ্বংসও করতে পারেন না। বরং এই বিশ্বজগতে যখন থেকে তিনি এক ধরনের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে এর সৃষ্টিকর্ম থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন, তখন থেকেই এই মেশিন নিজ যন্ত্রাংশের দক্ষতার জোরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে এবং এই মেশিন চলার ক্ষেত্রে বিশ্ব প্রতিপালকের কোন ভূমিকা নেই। নিজের ইচ্ছানুসারে স্বীয় সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির নিরিখে স্বীয় রবুবিয়্যত বা প্রতিপালন বৈশিষ্ট্যকে মর্যাদার নিরিখে প্রকাশ করার বা নিজের বিশেষ ইচ্ছার অধীনে কোন প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধনেরও তাঁর কোন কর্তৃত্ব নেই, বরং ইহুদীরা খোদা তা'লাকে দেহের অধিকারী ও দেহধারী আখ্যা দিয়ে বস্তুজগতের ন্যায়, বরং এর একটি অংশ মনে করে। তাদের দুর্বল

ধ্যানধারণায় একথা বদ্ধমূল যে, অনেক বিষয়, যা সৃষ্টির জন্য বৈধ, তা আল্লাহ্‌র জন্যও বৈধ, আর তাঁকে তারা সকল অর্থে পবিত্র মনে করে না। তাদের পরিবর্তিত পরিবর্ধিত তৌরাতে খোদা তা'লা সম্পর্কে বহু প্রকার অশোভন কথাবার্তা দেখা যায়। যেমন, আদি পুস্তক ৩২ অধ্যায়ে লেখা আছে, খোদা তা'লা ইয়াকুবের সাথে সারারাত, বরং প্রভাত পর্যন্ত মল্লযুদ্ধ করেছেন আর তার বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হতে পারেন নি। অধিকন্তু খোদা তা'লা বিশ্বে যা আছে সবকিছুর প্রভু- এই নীতির বিপরীতে কোন কোন মৃত মানুষকে তারা খোদার পুত্র আখ্যায়িত করে রেখেছে, আর কোন স্থানে মেয়েদেরকে খোদার কন্যা বলে লেখা হয়েছে। কোন কোন জায়গায় বাইবেলে এটিও বলা হয়েছে যে, তোমরা সকলে তো খোদা-ই। আর সত্য কথা হলো খ্রিষ্টানরাও এসব শিক্ষা থেকেই সৃষ্টিপূজার পাঠ নিয়েছে, কেননা যখন খ্রিষ্টানরা উদ্‌ঘাটন করল যে, বাইবেলের শিক্ষা অনেককেই খোদার পুত্র, কন্যা বরং খোদা বানিয়ে থাকে, তখন তারা ভাবল যে, এস আমরাও আমাদের মরিয়ম তনয়কে ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত করি; পাছে তিনি অন্য সন্তানদের চেয়ে পিছিয়ে না থাকেন।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে খোদা তা'লা কুরআন শরীফে বলেছেন যে, খ্রিষ্টানরা মরিয়ম তনয়কে খোদার পুত্র বানিয়ে কোন নুতন কথা আবিষ্কার করেনি বরং পূর্ববর্তী ঈমানহীন ও মুশরেকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে। এককথায় খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর যুগে ইহুদীদের অবস্থা যা ছিল তা হলো, সৃষ্টিপূজা মারাত্মকভাবে তাদের মাঝে বিস্তার লাভ করে আর সত্য বিশ্বাস হতে তারা ছিল যোজন যোজন দূরে। এমনকি তাদের কতক হিন্দুদের মত পুনর্জন্ম ও জন্মান্তরবাদেও বিশ্বাসী ছিল আর অনেকেই শাস্তি-পুরস্কার দিবসে ছিল সম্পূর্ণভাবে অস্বীকারী। কতক শাস্তি-পুরস্কারকে কেবল পৃথিবীতে সীমাবদ্ধ মনে করত আর কিয়ামতে বিশ্বাস করতো না। কতক গ্রীকদের পদাঙ্ক অনুসরণে বস্তু ও আত্মাকে অনাদি-অনন্ত ও সৃষ্টিজগতের ঊর্ধ্বে জ্ঞান করত। অনেকেই নাস্তিকদের ন্যায় আত্মাকে নশ্বর জ্ঞান করত। আর কতকের বিশ্বাস ছিল দার্শনিকদের ন্যায়, অর্থাৎ খোদা বিশ্ব প্রতিপালক নন বরং সচেতন পরিকল্পকও নন। এক কথায় কুষ্ঠীর দেহের ন্যায় তাদের সকল চিন্তাধারা বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে আর খোদার অনন্য গুণাবলী তথা রবুবিয়্যত, রহমানিয়্যত, রহীমিয়্যত এবং শাস্তি পুরস্কার দিবসের মালিক হওয়ায় তারা

বিশ্বাস রাখত না, অধিকন্তু এসকল গুণকে তাঁরই বিশেষত্ব বলে জ্ঞান করত না। এছাড়া এ বিশ্বাসও রাখত না যে, এসকল গুণ পূর্ণমাত্রায় কেবল খোদার মাঝেই বিদ্যমান, বরং অনেক কুধারণা, বিশ্বাসহীনতা এবং নোংরামিতে তাদের বিশ্বাস পরিপূর্ণ ছিল। তৌরাতের শিক্ষাকে অত্যন্ত কুৎসিত (বস্তুর) রূপ দিয়ে তারা শিরক ও পাপের দুর্গন্ধ বিস্তৃত করার কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিল। সুতরাং খোদা তা'লাকে দেহধারী ও জড়দেহের অধিকারী আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে আর তাঁর রবুবিয়্যত, রহমানিয়্যত ও রহীমিয়্যত ইত্যাদি গুণাবলীকে অকেজো জ্ঞান করা এবং এসব গুণে অন্যান্য বস্তুকে শরীক করার ক্ষেত্রে তাদের বেশিরভাগ (মানুষ) মুশরেকদের নেতা, অগ্রজ ও জ্যেষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এ হলো ইহুদীদের অবস্থা। কিন্তু খ্রিষ্টানরা স্বল্প সময়ের মাঝে নিজেদের অবস্থা আরো শোচনীয় করে তোলে এবং উল্লিখিত সত্যগুলোর মাঝে কোন সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে নি, আর খোদার যে অনুপম গুণাবলী ছিল, তার সবকটি মরিয়ম তনয়ে বিদ্যমান ছিল বলে বিশ্বাস করেছে। তাদের ধর্মের সারকথা হলো, খোদা তা'লা বিশ্বে যা আছে সবকিছুর প্রভু নন বরং ঈসা (আ.) তাঁর রবুবিয়্যত বা প্রতিপালনের আওতার বাইরে আর মসীহ্ নিজেই প্রতিপালকারী বা রব। এছাড়া বিশ্বে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তা তাদের ভ্রান্ত দাবি অনুসারে সাধারণ নিয়মের অধীনে সৃষ্টও নয় আর ক্ষণস্থায়ীও নয়, বরং মরিয়ম-তনয় বিশ্বে নতুন ধরনের সৃষ্টি হিসেবে এসেছেন এবং স্পষ্টতই সৃষ্টি হয়েও সৃষ্ট নন। তিনি খোদার সমান, বরং নিজেই খোদা। আর তার অদ্ভুত সত্তায় এমন এক অতিপ্রাকৃত বিষয় রয়েছে যে, নতুন সৃষ্টি হয়েও তিনি আদি। আর যদিও নিজের স্বীকারোক্তি অনুসারে এক আবশ্যকীয় অস্তিত্ব এবং অবশ্য অনুসরণীয় সত্তার অধীন ও শাসিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও অস্তিত্বের ক্ষেত্রে তিনি আবশ্যকীয়-অলঙ্ঘনীয়, সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন এবং কারো-ই অধীন নন। যদিও স্বয়ং তাঁর নিজেরই স্বীকারোক্তি অনুসারে তিনি দুর্বল ও অক্ষম, কিন্তু তা সত্ত্বেও খ্রিষ্টানদের ভিত্তিহীন দাবি অনুসারে তিনি সর্বশক্তিমান, অক্ষম নন। এছাড়া যদিও তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি অনুসারে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে তিনি নিতান্তই অজ্ঞ, এমনকি কিয়ামত কখন হবে তা-ও জানেন না, কিন্তু তা সত্ত্বেও খিষ্টানদের আত্মপ্রতারণামূলক বিশ্বাস অনুসারে তিনি অদৃশ্যে জ্ঞাত। অধিকন্তু যদিও স্বয়ং নিজের স্বীকারোক্তির আয়নায় এবং অতীত নবীদের গ্রন্থের সাক্ষ্য অনুসারে তিনি এক হতদরিদ্র বান্দা, কিন্তু তা সত্ত্বেও খ্রিষ্টান বন্ধুদের দৃষ্টিতে

তিনি খোদা। এছাড়া যদিও (স্বয়ং) নিজের স্বীকারোক্তির আয়নায় তিনি পুণ্যবানও নন আর নিষ্পাপও নন কিন্তু তা সত্ত্বেও খ্রিষ্টানদের দৃষ্টিতে তিনি পুণ্যবান ও নিষ্পাপ। এককথায় খ্রিষ্টান জাতিও একটি অদ্ভুত জাতি যারা দুটি স্ববিরোধী বিষয়কে এক স্থানে একত্রিত করে রেখেছে এবং স্ববিরোধকে বৈধ মনে করেছে। যদি তাদের বিশ্বাস সত্য প্রমাণিত হয় তাহলে হযরত ঈসার মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হওয়া অবধারিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাদের বিশ্বাস পরিত্যাগ করে নি। এক দীনহীন ও দুর্বল এবং অসহায় বান্দাকে বিশ্ব প্রতিপালক আখ্যা দিয়েছে। তারা বিশ্ব প্রতিপালকের জন্য সকল প্রকার লাঞ্ছনা, মৃত্যু, ব্যথা, দুঃখ-বেদনা, দেহধারণ ও কারো দেহে মূর্ত হওয়া, পরিবর্তন-পরিবর্ধনের শিকার হওয়া, নশ্বর হওয়া এবং জন্মগ্রহণ করাকে বৈধ জ্ঞান করে বসে আছে। নির্বোধরা খোদাকেও একপ্রকার তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছে। শুধু খ্রিষ্টানরাই এমন করে নি, বরং এর পূর্বেও খোদার অনেক দুর্বল বান্দাকে খোদা আখ্যা দেয়া হয়েছে। কেউ বলে রামচন্দ্র খোদা, কেউ বলে না, কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব এরচেয়েও অধিক দৃঢ়।

অনুরূপভাবে কেউ বুদ্ধকে, কেউ অন্য কাউকে আর কেউ ভিন্ন কাউকে খোদা আখ্যায়িত করে। অনুরূপভাবে শেষ যুগের এই সকল অতি সরল লোক পূর্ববর্তী মুশরিকদের অনুকরণে মরিয়ম তনয়কে খোদা এবং খোদার সন্তান আখ্যা দিয়েছে। এককথায় খ্রিষ্টানরা প্রকৃত খোদাকে বিশ্ব প্রতিপালকও মনে করে না আর তাঁকে রহমান এবং রহীমও জ্ঞান করে না, এছাড়া এই বিশ্বাসও রাখে না যে, তাঁর হাতে শাস্তি-পুরস্কার রয়েছে। বরং তাদের ধারণা অনুসারে আকাশ ও পৃথিবী সত্যিকার খোদার অস্তিত্ব-শূন্য পড়ে আছে; যা কিছু আছে ইবনে মরিয়মই। যদি কেউ প্রতিপালক থেকে থাকে তবে কেবল তিনিই। যদি কেউ রহমান থেকে থাকে তা তিনিই। যদি কেউ রহীম থেকে থাকে তিনিই রহীম। যদি কেউ মালিক ইয়াউমিদ্দীন থেকে থাকে, তিনিই মালিকি ইয়াউমিদ্দীন (বিচার দিবসের অধিপতি)। অনুরূপভাবে সাধারণ হিন্দু এবং আর্যরাও এসব সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, কেননা তাদের মাঝে যারা আর্য তারা খোদা তা'লাকে স্রষ্টাই মনে করে না, তাঁকে নিজেদের আত্মার প্রতিপালনকারী আখ্যা দেয় না। তাদের মাঝে যারা প্রতিমা পূজারি তারা প্রতিপালন বৈশিষ্ট্যকে একমাত্র সেই বিশ্ব প্রতিপালকের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব মনে করে না আর বিশ্ব-প্রতিপালন ব্যবস্থায় ৩৩ কোটি দেবতাকে

খোদা তা'লার অংশীদার আখ্যা দেয়, অধিকন্তু এসবের কাছে নিজেদের অভীষ্ট যাচনা করে। এই উভয় পক্ষ, খোদা তা'লার রহমানিয়্যতকেও অস্বীকার করে এবং নিজেদের বেদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বাস রাখে যে, খোদা তা'লার সত্তায় আদৌ রহমানিয়্যত বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না। খোদা পৃথিবীর জন্য যা কিছু বানিয়েছেন, স্বয়ং পৃথিবীর নেক কর্মের কারণে তাঁকে তা বানাতে হয়েছে, নতুবা পরমেশ্বর স্বয়ং নিজের ইচ্ছানুসারে কারো কোন উপকার করতে পারেন না এবং কোন সময়ে করেনও নি। একইভাবে তারা খোদা তা'লাকে পূর্ণ রহীমও মনে করে না কেননা তাদের বিশ্বাস হলো– কোন পাপী যতই আন্তরিকভাবে তওবা করুক না কেন, বছরের পর বছর কাকুতিমিনতি, আহাজারি ও সৎকর্মে রত থাকুক না কেন– যতক্ষণ সে বহু লক্ষ জন্ম-চক্রের শাস্তি ভোগ না করবে, খোদা তার পাপ, যা তার হাতে সাধিত হয়, আদৌ ক্ষমা করবেন না। যখনই কেউ একটি পাপ করবে তওবা, ইবাদত-বন্দেগী, খোদা-ভীতি, খোদা-প্রেম বা অন্য কোন নেক কাজ তার কোন কাজে আসবে না- সে যেন জীবন্তই মারা গেল আর খোদার রহীমিয়্যত সম্পর্কেও সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেল!

একইভাবে তারা শাস্তি-পুরস্কার দিবসেও সঠিকভাবে বিশ্বাসী নয় যার নিরিখে খোদা তা'লা মালিকি ইয়াউমিদ্দীন আখ্যায়িত হন। উপরোল্লিখিত যেসব রীতি অনুসারে মানুষ মহা সৌভাগ্যের ভাগী হয় বা ভয়াবহ দুর্ভাগ্যকবলিত হয়, সেই সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের প্রকাশ-বিকাশেও তাদের বিশ্বাস নেই। পারলৌকিক মুক্তিকে সম্পূর্ণভাবে কাল্পনিক ও আনুমানিক বিষয় ধরে বসে আছে, বরং তারা স্থায়ী মুক্তিতে বিশ্বাসই রাখে না এবং তাদের উক্তি হলো মানুষের চিরআরাম এখানেও নেই আর সেখানেও নেই; অধিকন্তু তাদের মিথ্যা ধারণা অনুসারে ইহজগতও পরকালের ন্যায় পূর্ণ শাস্তি ও পুরস্কারস্থল। যাকে পৃথিবীতে প্রভূত ধনসম্পদ দেয়া হয়েছে, তা সেসব নেক কর্মের বিনিময়ে যা সে কোন পূর্বজন্মে করেছে আর সে এই পৃথিবীতেই অবাধ্য প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য এসব সম্পদ খরচ করার পুরো অধিকার রাখে। কিন্তু জানাকথা যে, এ পৃথিবীতে কাউকে খোদা তা'লার এ উদ্দেশ্যে সম্পদ দেয়া, যেন সে সেই সম্পদকে নিজের কর্মের পুরস্কার মনে করে তা পানাহার ও সকল প্রকার বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেয়ার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে পারে– এমন একটি অবৈধ কথা বা ধারণা যা খোদার প্রতি আরোপ করা চরম

শিষ্টাচারবহির্ভূত বিষয়; কেননা এর ফলাফল এটিই দাঁড়ায় যে, যেন হিন্দুদের পরমেশ্বর স্বয়ং মানুষকে অপকর্ম ও নোংরামিতে ঠেলে দিতে চান। তাদের রিপুর পবিত্রতা অর্জনের পূর্বেই প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার প্রশস্ত দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেন আর পূর্বজন্মের পুণ্যকর্মের প্রতিদান তাদের এটি দেন যে, তারা পরবর্তী জন্মে সকল প্রকার বিলাসিতার উপকরণ পেয়ে আর অবাধ্য প্রবৃত্তির পুরো দাসত্ব করে যেন মাটির তলায় তলিয়ে যায়। আর জানা কথা, যার মাথায় এ ধ্যান-ধারণা ছেয়ে থাকে যে, তার হাতে যত ধন-সম্পদ প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা রয়েছে এসব তারই অতীত কর্মের প্রতিদান; সে রিপুর দাসত্বে কোন ত্রুটি করবে কি? কিন্তু যদি সে মনে করত যে, এই পৃথিবী শাস্তি-পুরস্কারের-নিবাস নয় বরং পরীক্ষাগার; যা কিছু আমাকে দেয়া হয়েছে পরীক্ষাস্বরূপ দেয়া হয়েছে, আর উদ্দেশ্য হলো এটি প্রকাশ করে দেয়া যে, আমি কীভাবে তা ব্যবহার করি! এমন কোন জিনিস নেই যা আমার সম্পত্তি বা আমারই প্রাপ্য। এমনটি জ্ঞান করলে সে নিজের সম্পদ পুণ্য কাজে ব্যয় করার মাঝেই নিজের মুক্তি নিহিত বলে বিশ্বাস করবে। একইসাথে সত্যিকার অর্থে কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করবে, কেননা সে ব্যক্তিই আন্তরিক নিষ্ঠা ও ভালোবাসার সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে– যে বিশ্বাস করে যে, আমি কিছু ব্যয় না করেই সবকিছু পেয়েছি আর কোন যোগ্যতা বা অধিকার ছাড়াই আমার লাভ হয়েছে। বস্তুত আর্যদের দৃষ্টিতে খোদা রাব্বুল আলামীন (অর্থাৎ বিশ্ব-প্রতিপালক) নন আর 'রহমান' ও 'রহীম'ও নন, আর স্থায়ী ও পূর্ণ প্রতিদান দেয়ার পূর্ণ ক্ষমতাও তিনি রাখেন না।

এখন আমরা উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে ব্রাহ্ম সমাজীদের জ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশ করছি অর্থাৎ সেই চারটি সত্য যার কথা এখনই উল্লেখ করা হয়েছে, ব্রাহ্ম সমাজীরা এর ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে কিনা, সেকথা এখন আমরা প্রকাশ করছি। সুতরাং স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, ব্রাহ্ম সমাজীরা এই চারটি সত্যের ওপর সেভাবে প্রতিষ্ঠিত নয় যেভাবে হওয়া উচিত, বরং এসকল মহান আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্পর্কে তারা অবহিতই নয়। প্রধানত খোদার বিশ্বপ্রতিপালক হওয়া অর্থাৎ নিখুঁত রবুবিয়্যত বলতে যা বোঝায়, তা আজ পর্যন্ত ব্রাহ্ম সমাজীদের দৃষ্টির অন্তরালে রয়ে গেছে। তারা পৃথিবীতে এর বেশি খোদার রবুবিয়্যতের কার্যকারিতা রয়েছে বলে মনে করে না যে, তিনি কোন সময় হয়ত এই পুরো বিশ্বকে এর সমূহ শক্তি ও সামর্থ্যসহ সৃষ্টি করে থাকবেন; কিন্তু

এখন সেসকল শক্তি ও সামর্থ্য স্থায়ী ও স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কাজ করে চলেছে!

অধিকন্তু খোদা তা'লার এসবে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করার বা পরিবর্তন-পরিবর্ধনের ক্ষমতা নেই। তাদের মিথ্যা দাবি অনুসারে প্রকৃতির সুদৃঢ় ও সুস্থিত ভিত্তি সর্বশক্তিমানকে অকেজো করে তুলেছে। সেগুলোতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করার কোন পথ তাঁর জন্য খোলা নেই। এমন কোন কৌশলও তাঁর জানা নেই– যার মাধ্যমে দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি তপ্ত কোন বস্তুকে এর গরম প্রভাব বিস্তার করা থেকে বিরত রাখতে পারেন বা কোন ঠাণ্ডা পদার্থকে এর শীতল প্রভাব প্রকাশ করা থেকে রুখে দিতে পারেন বা অগ্নিকে দাহ করার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা থেকে বিরত রাখতে পারেন। কোন পরিকল্পনা তাঁর কেবল ততটা জ্ঞাত, যতটা মানুষের জ্ঞানের সীমাপরিসীমার মাঝে রয়েছে, এর বেশি নয়। অর্থাৎ সীমিত ও পরিবেষ্টিত বিশ্বের বৃত্তান্ত ও বিশেষত্ব যা মানুষ আবিষ্কার করেছে, আর এখন পর্যন্ত যা কিছু মানুষের অভিজ্ঞতার আয়ত্তে এসেছে ততটুকুই খোদার শক্তির সীমা-পরিসীমা। তাঁর পূর্ণ শক্তি ও সার্বজনীন প্রতিপালন বা রবুবিয়্যত, এর বেশি কিছুই করতে পারে না! যেন খোদার সাকুল্য শক্তি কেবল ততটুকুই যা মানুষ এখন পর্যন্ত আবিষ্কার করেছে! আর জানাকথা যে, এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ রবুবিয়্যত বা পূর্ণ প্রতিপালন ও পূর্ণ ক্ষমতাবান হওয়া বলতে যা বুঝায় তার সম্পূর্ণ পরিপন্থি, কেননা পূর্ণ রবুবিয়্যত ও পূর্ণ ক্ষমতা, তা এই সীমাহীন সত্তার ন্যায় সীমাহীন হবে। কোন মানবীয় নিয়মনীতি ও আইন তা আয়ত্ত করতে পারে না।

نہیں محصور ہرگز راستہ قدرت نمائی کا　　　خدا کی قدرتوں کا حصر دعویٰ ہے خدائی کا

ক্ষমতা প্রদর্শনের পথ আদৌ রুদ্ধ নয়; খোদার ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করা
খোদার ওপর খোদকারি বইকি।

স্মরণ রাখা উচিত, যে বিষয়টি অকূল ও অসীম, তা কোন আইনের ভেতর পড়তে পারে না, কেননা যে বিষয় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জানা ও সুবিদিত আইনের ধারার অন্তর্ভুক্ত আর কোন অংশ এই ধারার বাইরে না থাকে, আর অজানা ও অবিদিতও না হয়, তাহলে এমন জিনিস সসীম হয়ে থাকে। এখন যদি খোদার সর্বময় ক্ষমতা ও প্রতিপালনকে সীমাবদ্ধ ও সসীম আইনে সীমিত মনে করা হয় তাহলে যে বিষয়কে অসীম স্বীকার করা হলো তা

আবশ্যকীয়ভাবে সীমাবদ্ধ মানতে হবে। সুতরাং ব্রাহ্ম সমাজীদের এটিই বড় ভ্রান্তি। তারা খোদা তা'লার অনন্ত ক্ষমতা ও প্রতিপালনকে নিজেদের সংকীর্ণ ও সীমিত অভিজ্ঞতার গণ্ডিতে টেনে আনতে চায় আর বোঝে না যে, যেসব বিষয় একটি জানা ও নির্ধারিত বিষয়ের অধীনে এসে যায় তা সীমাবদ্ধ হওয়া অবধারিত। অপরদিকে অসীম সত্তার মাঝে যেসকল প্রজ্ঞা ও শক্তি বিদ্যমান, তা সীমাহীন হওয়া অবধারিত। কোন বুদ্ধিমান বলতে পারে কি যে, সেই সর্বশক্তিমান সত্তা অমুক অমুকভাবে সৃষ্টি করতে জানেন, এর বেশি কিছু নয়! প্রশ্ন হলো, তাঁর অনন্ত শক্তি মানবীয় ধারণা ও অনুমানের মাপকাঠিতে যাচাই করা যায় কি? বা তাঁর সর্বশক্তিমানসুলভ ও অনন্ত প্রজ্ঞা কোন সময় বিশ্ব পরিচালনা থেকে ব্যর্থ হতে পারে কি? নিঃসন্দেহে তাঁর শক্তিশালী হাত প্রতিটি অণু-পরমাণুর ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখে। কোন সৃষ্টির স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব এর নিজের দৃঢ় ও নিশ্চিত জন্মের সুবাদে নয় বরং তাঁরই আশ্রয় ও অবলম্বনে টিকে থাকে। তাঁর প্রতিপালনসুলভ শক্তিসমূহের জন্য ক্ষমতা প্রদর্শনের বহু ক্ষেত্র অবারিত রয়েছে। অভ্যন্তরীণভাবেও কোন স্থানে তার শেষ নেই আর বাহ্যিকভাবেও এর কোন প্রান্ত নেই। যেভাবে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির প্রখরতা ও ভয়াবহতা দূরীভূত করার জন্য বাহ্যিকভাবে এমন কোন উপকরণ সৃষ্টি করা খোদা তা'লার জন্য সম্ভব যার মাধ্যমে সেই অগ্নির ভয়াবহতা হ্রাস পেতে পারে, একইভাবে খোদা তা'লা সেই অগ্নির দাহ করার বৈশিষ্ট্য দূর করার জন্য এর অস্তিত্বে এমন কোন উপকরণও সৃষ্টি করতে পারেন যার ফলে দাহ করার বৈশিষ্ট্য লোপ পেতে পারে।

কেননা তাঁর অনন্ত প্রজ্ঞা ও শক্তির কাছে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। আমরা যখন তাঁর প্রজ্ঞা ও ক্ষমতাকে অনন্ত বলে বিশ্বাস স্থাপন করেছি সেখানে আমাদের জন্য একথা মানাও আবশ্যক যে, তাঁর সমূহ প্রজ্ঞা ও ক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন হওয়া আমাদের জন্য অসম্ভব। সুতরাং আমরা তার অনন্ত প্রজ্ঞা ও ক্ষমতার জন্য কোন নীতি নির্ধারণ করতে পারি না। অধিকন্তু যে জিনিসের সীমা-পরিসীমা আমাদের জানা নেই তার পরিমাপ করতে আমরা অক্ষম। আমরা আদম সন্তান হিসেবে আমাদের জগতের গণ্ডি খুবই সংকীর্ণ আর সেই গণ্ডিরও পুরো জ্ঞান আমাদের নেই। সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে আমাদের ক্ষুদ্রতম এই মাপকাঠির মাধ্যমে খোদা তা'লার সীমাহীন প্রজ্ঞা ও শক্তির পরিমাপ আরম্ভ করা হবে চরম ইতরতা ও বোকামি। বস্তুত খোদার অনুপম

প্রতিপালন তাঁর পূর্ণ শক্তি, যা বিন্দু-বিন্দুর অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের জন্য প্রতিটি মুহূর্ত ও ক্ষণ পানি সিঞ্চন করছে, যার সুগভীর কার্যকারণ গণনা ও হিসেবের বাইরে, আর ব্রাহ্মসমাজীরা রবুবিয়্যত বা প্রতিপালনের সেই পরম বিষয়টি অস্বীকার করে থাকে। এছাড়া ব্রাহ্মসমাজীরা খোদার প্রতিপালনকে আধ্যাত্মিকভাবেও নিখুঁত এবং সর্বোৎকৃষ্ট মনে করে না এবং আপন উৎকৃষ্ট প্রতিপালনের দাবি অনুসারে সমুজ্জ্বল ও সন্দেহাতীত বাণী মানুষের হিদায়াতের জন্য অবতীর্ণ করার বিষয়ে খোদাকে তারা অক্ষম ও ব্যর্থ মনে করে। একইভাবে তারা খোদা তা'লার রহমানিয়্যতেও পূর্ণ ঈমান আনে না, কেননা উৎকৃষ্টতম রহমানিয়্যত হলো, খোদা তা'লা দেহের পূর্ণতা ও প্রতিপালনের জন্য স্বীয় বিশেষ শক্তির অধীনে যেভাবে সকল উপকরণ প্রকাশ করেছেন এবং ক্ষণস্থায়ী দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য চন্দ্র-সূর্য, মেঘ-বায়ু ইত্যাদি শত শত বস্তু নিজের হাতে বানিয়েছেন একইভাবে তিনি আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য এবং সে জগতের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য– যার সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য স্থায়ী; আধ্যাত্মিক জ্যোতি অর্থাৎ স্বীয় পবিত্র ও সমুজ্জ্বল গ্রন্থ পৃথিবীর শুভ পরিণামকে সামনে রেখে প্রেরণ করেছেন আর সোচ্চার আত্মার জন্য যেসব জ্ঞানের প্রয়োজন, তার সবকটিই তিনি নিজেই দিয়েছেন। যেসব সন্দেহে তাদের ধ্বংস অবধারিত, সেসব সন্দেহ থেকে তিনি নিজেই তাদের মুক্তি দেন।

কিন্তু এই সর্বোৎকৃষ্ট রহমানিয়্যতকে ব্রাহ্মসমাজীরা স্বীকার করে না। তাদের ধারণা অনুসারে যদিও খোদা মানুষের পেট ভরার জন্য সার্বিকভাবে সাহায্য করেছেন, আর এক্ষেত্রে সাহায্য-সহযোগিতার কোন প্রকার ত্রুটি করেন নি কিন্তু আধ্যাত্মিক তরবিয়ত বা প্রতিপালনের ক্ষেত্রে সেই সাহায্য করতে পারেন নি। বলা যায় আধ্যাত্মিক শিক্ষা যা সত্যিকার ও প্রকৃত প্রতিপালন, সেক্ষেত্রে জেনেশুনে দ্বিধা প্রদর্শন করেছেন আর এর জন্য তেমন কোন দৃঢ়, শক্তিশালী ও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি যেভাবে দৈহিক প্রতিপালনের জন্য করেছেন, বরং মানুষকে কেবল তার দুর্বল-অসম্পূর্ণ বুদ্ধির হাতে ছেড়ে দিয়েছেন আর তার বুদ্ধির সাহায্যের জন্য নিজের পক্ষ থেকে এমন কোন উৎকর্ষ আলো সৃষ্টি করেন নি যার মাধ্যমে বুদ্ধির ঝাপসা চোখ দৃষ্টিশক্তি লাভ করে সোজা পথ অবলম্বন করতে পারত আর ভুলভ্রান্তির ধ্বংসাত্মক আশংকা থেকে রক্ষা পেতো। একইভাবে ব্রাহ্মসমাজীরা খোদা তা'লার রহীমিয়্যতেও

পূর্ণ ঈমান রাখে না, কেননা অনুপম রহীমিয়্যত হলো সোচ্চার সব আত্মাকে খোদা তা'লা তাদের সহজাত আবেগ-উচ্ছ্বাস অনুসারে আর তাদের উচ্ছ্বাস-আপ্লুত নিষ্ঠার মাপকাঠিতে এবং তাদের নিষ্ঠায় সুরভিত চেষ্টার পরিমাণ অনুসারে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ করবেন আর তারা যতটা নিজেদের হৃদয়কে উন্মোচন করে ততটাই তাদের জন্য ঊর্ধ্বলোকের দ্বার খোলা বাঞ্ছনীয়। যতটা তাদের পিপাসা বৃদ্ধি পায় সেই মোতাবেক তাদের পানিও দেয়া উচিত যেন তারা অভিজ্ঞতাভিত্তিক দৃঢ় বিশ্বাসের সুপেয় পানীয় পানে পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে আর সন্দেহের মৃত্যু থেকে পুরোপুরি মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজীরা এই সত্য সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে। তাদের কথা অনুসারে মানুষ এতই দুর্ভাগা যে, সত্যিকার বন্ধুর সাক্ষাতের জন্য যতই ছটফট করুক না কেন আর তার চোখ থেকে অশ্রু-গঙ্গাও যদি বয়ে যায় আর সেই প্রিয় বন্ধুর জন্য ধূলিসাৎও হয়ে যায় তবুও তাঁকে তারা আদৌ পাবে না।

তাদের দৃষ্টিতে তিনি এমন পাষাণ হৃদয় যে, তাঁর সন্ধানীদের জন্য তাঁর কোন দয়া-মায়াই নেই। সন্ধানীদের তিনি আপন বিশেষ নিদর্শনের মাধ্যমে প্রবোধ দেন না আর স্বীয় বন্ধুত্বপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে বেদনা ভারাক্রান্তদের আদৌ চিকিৎসা করেন না, বরং তাদেরকে তাদের ধ্যানধারণার মাঝে দিশেহারা ছেড়ে দেন। তারা কেবল নিজেদের ধারণার মাঝেই হাবুডুবু খাবে আর সেই অনুমানের মাঝেই সারাটি জীবন নষ্ট করে অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থার মাঝে মারা যাবে, এর বেশি কোন তত্ত্বজ্ঞান তাদের দান করেন না! কিন্তু একথা কি সত্য যে, খোদা তা'লা এমনই পাষাণ বা এমনই নির্দয় ও কৃপণ বা এতই দুর্বল ও শক্তিহীন যে, সন্ধানীদের হতভম্ব ও হতবুদ্ধি ছেড়ে দেন আর দরজায় করাঘাতকারীদের জন্য আপন দ্বার বন্ধ রাখেন! যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁর পানে ছুটে আসে, তাদের দুর্বলতায় করুণা প্রদর্শন করেন না, আর তাদের হাত ধরেন না এবং সত্যিকার সন্ধানীদের রসাতলে যেতে দেন, স্বয়ং স্নেহপ্রদর্শন করে কয়েক পা এগিয়ে আসেন না আর স্বীয় বিশেষ বিকাশের মাধ্যমে সমস্যার দীর্ঘ কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত করেন না سُبۡحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰی عَمَّا یَصِفُوۡنَ ! একইভাবে খোদা তা'লা যে 'মালিক ইয়াউমিদ্দিন' ব্রাহ্ম সমাজীরা সে সম্পর্কেও অজ্ঞ। কেননা শাস্তি-পুরস্কার দিবসের মালিক হওয়ার প্রকৃত মর্ম হলো খোদা তা'লার পূর্ণ মালিকিয়্যত প্রকাশ পেয়ে, যা নির্ভর করে মহান বা পূর্ণ বিকাশের ওপর,

পুনরায় সেই পূর্ণ মালিকিয়্যত বা মালিকের মহিমা অনুসারে বান্দাদের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া। অর্থাৎ প্রথমে সেই সত্যিকার মালিকের সর্বোৎকৃষ্ট মালিক হওয়ার প্রমাণ এতটা পূর্ণতার সাথে প্রকাশ পাওয়া বাঞ্ছনীয়, যেন সব সাধারণ বা প্রচলিত উপকরণ মাঝখান থেকে পুরোপুরি উঠে যায় বা লোপ পায়, আর যদু-মধুর কোন হস্তক্ষেপ যেন মাঝে না থাকে, অধিকন্তু এক-অদ্বিতীয় 'কাহ্হার' মালিকের সত্তা যেন পরিষ্কারভাবে পরিদৃষ্ট হয়। এই উৎকৃষ্ট তত্ত্বজ্ঞান যখন স্বীয় পূর্ণ বিকাশ-প্রকাশ সেরে নেয়, তখন প্রতিদানও উৎকৃষ্ট পর্যায়ের প্রকাশ পাওয়া চাই অর্থাৎ তাঁর আসা বা আগমন যেখানে সম্পূর্ণ হবে অস্তিত্বও সেখানে কামেল হওয়া বাঞ্ছনীয়। আগমন বা আসার ক্ষেত্র এভাবে যে, পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির পুরস্কার নাযিল হতেই একথা জানা উচিত ও প্রমাণিত হওয়া দরকার যে, এটি সত্যিকার অর্থে তার কর্মেরই প্রতিদান। এছাড়া একথাও প্রমাণিত হওয়া উচিত যে, এই পুরস্কার অবতারণকারী সত্যিকার অর্থে বদান্যশীল খোদা যিনি বিশ্ব-প্রতিপালক, অন্য কেউ নন।

এই উভয় কথা এমনভাবে প্রমাণিত হওয়া উচিত, যাতে মাঝখানে কোনপ্রকার সন্দেহের অবকাশ না থাকে। অস্তিত্বের ক্ষেত্রে এমনভাবে কামেল হওয়া চাই যে, মানুষের অন্তরাত্মা, ভেতর-বাহির, দেহ-প্রাণ ও সকল আধ্যাত্মিক ও দৈহিক শক্তির ওপর যেন তা এক বৃত্তের ন্যায় ছেয়ে যায়। একইসাথে তা স্থায়ী, অক্ষয় ও নিরবচ্ছিন্ন হওয়া উচিত, যেন পুণ্যে অগ্রগামী ব্যক্তি স্বীয় সেই মহান সৌভাগ্যে, যা সকল সৌভাগ্যের পরম রূপ আর পাপে অধঃপতিত ব্যক্তি স্বীয় সেই চরম দুর্ভাগ্যে, যা সকল দুর্ভাগ্যের চরম মার্গ, তাতে নিপতিত হয়। এছাড়া সকল শ্রেণি যেন সেই মহা শাস্তি-পুরস্কার বা প্রতিদান পেয়ে যায় যা তাদের জন্য লাভ করা সম্ভব অর্থাৎ সেই পূর্ণ ও স্থায়ী প্রতিদান যেন পেয়ে যায় যা এই নশ্বর ও লয়শীল জগতে প্রকাশ পেতে পারে না যার সমস্ত দুঃখ ও আরামের অবসান ঘটে মৃত্যুর মাধ্যমে। বরং তা পূর্ণরূপে প্রকাশের জন্য সত্যিকার মালিক স্বীয় পরম স্নেহ ও কঠোর শাস্তি দেখানোর জন্য অর্থাৎ জামালী ও জালালী বৈশিষ্ট্যাবলীর পূর্ণ বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে একটি ভিন্ন জগৎ নির্ধারণ করে রেখেছেন যা চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর, যেন খোদা তা'লার মাঝে প্রতিদানের যে বৈশিষ্ট্যাবলী রয়েছে তা সেই চিরস্থায়ী ও মহা বিস্তৃত জগতে প্রকাশ পেয়ে যায় যা এই নশ্বর ও সঙ্কীর্ণ জগতে পুরোপুরি প্রকাশ পেতে পারে না আর যাতে করে মানুষ এসব পূর্ণ ও উৎকৃষ্ট বিকাশের মাধ্যমে

সেই মহান ও পরিপূর্ণ দর্শনভিত্তিক অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে যা তার মানবীয় শক্তি-বৃত্তিসমূহের জন্য সম্ভাব্যতার গণ্ডিভুক্ত। বিবেকের নিরিখে সুমহান প্রতিদান যার ওপর নির্ভর করে তা হলো, যে বিষয়টি শাস্তি বা পুরস্কারস্বরূপ হয়ে থাকে তা যেন মানুষের ভেতর-বাহির ও দেহ-প্রাণকে পূর্ণ ও সম্পূর্ণরূপে স্থায়ী ও আবশ্যকীয়ভাবে পরিবেষ্টন করে।

অধিকন্তু সত্যিকার মালিক বা অধিপতির সত্তায় উন্নত বিশ্বাস যে কথার ওপর নির্ভর করে তা হলো, সাধারণ ও প্রচলিত উপকরণ বা নিয়মকে ছিন্ন করে পরিষ্কারভাবে সেই মালিকের সামনে আসা। তাই এই সুদূরপ্রসারী সত্য, যার অর্থ হলো পরম পর্যায়ের তত্ত্বজ্ঞান লাভ ও সর্বোচ্চ প্রতিদান পাওয়া, তা কেবল তবেই বাস্তবায়িত হবে যদি উল্লিখিত সকল কথা হস্তগত বা প্রমাণিত হয় যা বিবেকবানদের দৃষ্টিতে এর সংজ্ঞার অন্তর্গত। কেননা বিবেকের দৃষ্টিতে সত্যিকার মালিকের সৌন্দর্য অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাসের মাধ্যমে দেখা ছাড়া সর্বোচ্চ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হওয়া সম্ভব নয় অর্থাৎ তাঁর প্রকাশ ও বিকাশ এতটা পরিপূর্ণ হওয়া আবশ্যক, যার চেয়ে অধিক ভাবাই যায় না; একই মাপকাঠিতে সর্বোচ্চ প্রতিদানও যুক্তির নিরিখে অসম্ভব অর্থাৎ যেভাবে দেহ-প্রাণ উভয়টি ইহজীবনে যুগপৎ অনুগত বা অবাধ্য ছিল, অনুরূপভাবে প্রতিদান লাভের সময়ও এর উভয়েরই পুরস্কার বা শাস্তি পাওয়া বাঞ্ছনীয়। আর পূর্ণ শাস্তি-পুরস্কারের ফুঁসে ওঠা সমুদ্র ভেতর-বাহিরকে যেন পূর্ণমাত্রায় সমানভাবে পরিবেষ্টন করে এবং এর অংশ হয়ে যায়। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজীরা এই সত্যকেও অস্বীকার করে থাকে, বরং তাদের মতে পরম সত্যের অস্তিত্ব প্রমাণিতই নয়। অধিকন্তু তাদের দাবি অনুসারে মানুষের ভাগ্যে পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করাও সম্ভব নয় এবং সর্বোচ্চ প্রতিদানও নয়, বরং শাস্তি-পুরস্কার বা প্রতিদান তাদের মতে একটি অলীক বিষয়, যা কেবল নিজেরই ভিত্তিহীন ধ্যানধারণার আবিষ্কার, সত্যিকার অর্থে খোদার পক্ষ থেকে বান্দাদের ওপর কোন পুরস্কারও অবতীর্ণ হবে না আর কোন শাস্তিও নয়, বরং নিজেরই বানানো ধারণা সুখ বা দুঃখের কারণ হবে!

আর এমন কোন গুপ্ত ও প্রকাশ্য বিষয় হবে না যা খোদা তা'লার ইচ্ছায় পুণ্যবান বান্দাদের ওপর নিয়ামতের আকারে আর পাপীদের ওপর শাস্তিস্বরূপ অবতীর্ণ হবে। সুতরাং তাদের বিশ্বাস এটি নয় যে, শাস্তি-পুরস্কারের মালিক আল্লাহ্ তা'লা, তিনিই স্বীয় পুণ্যকর্মশীল বান্দাদের ওপর আপন বিশেষ ইচ্ছার

অধীনে স্বাচ্ছন্দ্য ও চিরস্থায়ী আনন্দের কল্যাণরাজি বর্ষণ করবেন। যেই পরম আনন্দকে পুণ্যবান মানুষ কেবল অভ্যন্তরীণভাবে নয় বরং অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমেও প্রত্যক্ষ করবেন; আর মানবীয় শক্তিবৃত্তির কোনটি বাহ্যিক হোক বা আধ্যাত্মিক, তা স্বীয় অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সুখ ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকবে না। অধিকন্তু দেহ ও প্রাণ উভয়টি নিজ নিজ মর্যাদা অনুসারে পারলৌকিক শাস্তি ও পুরস্কারে অংশীদার হবে। এককথায় ব্রাহ্ম সমাজীদের বিশ্বাস সম্পূর্ণভাবে এই সত্যের পরিপন্থি এবং এর সঠিক অর্থের বিরোধী।

এমনকি তারা নিজেদের হৃদয়ের অন্ধত্বের কারণে পারলৌকিক মুক্তির দৈহিক উপকরণকে, যা বাহ্যিক শক্তিবৃত্তির দৃষ্টিকোণ থেকে পরম সৌভাগ্যের পূর্ণতা লাভের জন্য পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে আর একইসাথে পারলৌকিক শাস্তির বাহ্যিক উপকরণকে, যা বাহ্যিক শক্তি-বৃত্তির সামঞ্জস্য অনুসারে চরম দুর্ভাগ্যের পূর্ণমূর্তি ধারণের জন্য পবিত্র কুরআনে রয়েছে, তাকেও আপত্তির কারণ বলে মনে করে। কিন্তু এমন বোধবুদ্ধি কোন্ কাজের যার কারণে একটি অতি স্পষ্ট ও পূর্ণ সত্য বিষয়কে ত্রুটি হিসেবে মনে করা হবে? পরিতাপ এরা কেন বোঝে না যে, চরম দুর্ভাগ্য ও পরম সৌভাগ্য লাভের একমাত্র পথ হলো, খোদা তা'লার বিশেষ স্নেহদৃষ্টির সাথে প্রতিদান বা শাস্তি-পুরস্কারের বিষয়টি পূর্ণমাত্রায় অবতীর্ণ করা। আর পূর্ণমাত্রায় অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ হলো সেই শাস্তি ও পুরস্কার যেন সকল অর্থে ভেতর-বাহির সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আর এমন কোন প্রকাশ্য ও গুপ্ত শক্তি যেন না থাকে যার এই শাস্তি-পুরস্কার থেকে অংশ লাভ হয় নি।

এটি সেই চূড়ান্ত প্রতিদানেরই পরম ও চরম রূপ, যাকে পবিত্র কুরআন অন্য ভাষায় জান্নাত ও জাহান্নাম নামকরণ করেছে আর (তিনি স্বীয়) সমুজ্জ্বল গ্রন্থে বলে দিয়েছেন যে, সেই জান্নাত ও জাহান্নাম পূর্ণমাত্রায় দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার প্রতিদানের সমন্বয়। আর এই প্রশংসিত গ্রন্থে এই দু'শ্রেণির বিশদ বিবরণ দিয়েছেন এবং মহা সৌভাগ্য ও চরম দুর্ভাগ্যের স্বরূপ স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। কিন্তু আমরা যেমনটি এখনই বর্ণনা করেছি, এই গভীর সত্য ও অপরাপর সত্য, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা সম্পর্কে ব্রাহ্মসমাজীরা সম্পূর্ণভাবে অনবহিত।

ষষ্ঠ সত্য যা সূরা ফাতিহায় উল্লিখিত তা হলো–

اِیَّاکَ نَعۡبُدُ وَ اِیَّاکَ نَسۡتَعِیۡنُ

(সূরা আল ফাতিহা: ৫)

অর্থাৎ হে উৎকর্ষ গুণাবলীর অধিকারী সত্তা এবং চারটি কল্যাণের উৎসস্থল! আমরা তোমারই উপাসনা করি আর উপাসনা ইত্যাদির প্রয়োজনে ও দরকারে তোমারই কাছে সাহায্য চাই। অর্থাৎ আমাদের একমাত্র উপাস্য তুমিই আর তোমার কাছে পৌঁছার জন্য আমরা কোন দেবতাকে মাধ্যম বা ওসিলা আখ্যা দেই না, কোন মানুষকেও নয়, আর কোন প্রতিমাকেও নয়। নিজেদের বুদ্ধি ও জ্ঞানকেও গুরুত্ববহ কিছু মনে করি না। সকল বিষয়ে তোমার সর্বশক্তিমান সত্তার কাছেই সাহায্য চাই। এই সত্যও আমাদের বিরোধীদের দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেছে। এ কারণেই প্রতিমা পূজারিরা খোদা তা'লার একক সত্তাকে বাদ দিয়ে অন্যান্য বস্তুর পূজা করে। আর্যরা স্বীয় আধ্যাত্মিক শক্তি-বৃত্তিকে সৃষ্টির গণ্ডি-বহির্ভূত মনে করে সেসবের জোরে মুক্তি পেতে চায়। ব্রাহ্মসমাজীরা এলহামের আলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজেদের বুদ্ধিকে দেবতা আখ্যা দিয়ে বসে আছে, যা তাদের ভ্রান্ত ধারণা অনুসারে খোদা পর্যন্ত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে পূর্ণ কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা রাখে এবং ঐশী রহস্যাবলীর ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখে!

সুতরাং তারা খোদার ইবাদত ও তাঁর কাছে সাহায্য যাচনা করার পরিবর্তে তাঁর কাছেই اِیَّاکَ نَسۡتَعِیۡنُ নিবেদন করছে কিন্তু তা সত্ত্বেও সুপ্ত শির্কে লিপ্ত ও নিপতিত। তাদের নিষেধ করা হলে তারা বলে যে, বুদ্ধি খোদার দানের অন্তর্গত বিষয় আর তা এজন্য দেয়া হয়েছে যেন মানুষ নিজের জীবন-জীবিকার সন্ধানে ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে তা ব্যবহার করে। সুতরাং খোদার দানকে কাজে লাগানো শির্ক হতে পারে না। অতএব ভালোভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, এটি তাদের ভ্রান্তি আর একথা বারবার বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে দৃঢ় বিশ্বাস ও যেসব সত্য তত্ত্বের ওপর আমাদের মুক্তি নিহিত, সেসব মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্য বুদ্ধি মাধ্যম হতে পারে না। অবশ্য এসব তত্ত্ব হস্তগত করার পর এসবের সত্যতা বুঝতে পারে। কিন্তু সেই সঠিক ও শ্রেষ্ঠতম বিকাশ সেই পবিত্র ও স্বচ্ছ জ্যোতির মাধ্যমে হয় যা খোদা তা'লার সত্তায় বিদ্যমান। বুদ্ধির যে অস্বচ্ছ ও দুর্বল আলো মানুষের মাঝে রয়েছে, তা এখানে ব্যর্থ ও

অক্ষম। সুতরাং শির্ক যেভাবে হয় তা হলো, ব্রাহ্ম সমাজীরা সঠিক ও শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কারের কেন্দ্রবিন্দু তথা খোদার সেই জ্যোতির্মণ্ডিত গ্রন্থ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এর প্রতি চরম উদাসীনতা প্রদর্শন করে এবং নিজেদের দুর্বল বুদ্ধিকে নিরঙ্কুশ বা চূড়ান্ত পথপ্রদর্শক আখ্যা দেয়, আর এভাবে কৃত কাজ সাধনে আত্মপ্রসাদ নেয়। সুতরাং তাদের রুগ্ন হৃদয় এই আত্মপ্রতারণায় নিমগ্ন যে, ঐশী শক্তি ও ঐশী বিকাশসমূহ যে মহান পর্যায়ে পৌঁছুতে পারে সে পর্যন্ত তাদের বুদ্ধিই তাদের পৌঁছে দিবে। এখন জানা কথা যে, এর চেয়ে ঘৃণ্য শির্ক আর কী হবে যে, নিজের বুদ্ধিশক্তিকে ঐশী শক্তির সমান বরং তার চেয়েও উত্তম মনে করছে। সুতরাং দেখুন! সেকথা সত্য প্রমাণিত হলো কি-না যে, তারা খোদার পরিবর্তে নিজেদের বুদ্ধির কাছে اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ বলছে। পক্ষান্তরে খ্রিষ্টানদের অবস্থা বর্ণনা করার কোন প্রয়োজনই নেই। সবাই জানে খ্রিষ্টানরা বিশুদ্ধচিত্তে খোদার ইবাদত করার পরিবর্তে ঈসার পূজায় মত্ত। নিজেদের কাজকর্মের জন্য খোদার কাছে সাহায্য চাওয়ার পরিবর্তে মসীহ্‌র কাছে সাহায্য চাইতে থাকে। আর তাদের মুখে সদা রাব্বুনাল মসীহ্, (অর্থাৎ আমাদের প্রভু মসীহ) রাব্বুনাল মসীহ্-ই বিরাজ করে। অতএব তারা–

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

(সূরা আল ফাতিহা: ৫)

এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া থেকে বঞ্চিত আর খোদার দ্বার থেকে বিতাড়িত। সপ্তম সত্য, যা সূরা ফাতিহায় উল্লেখ আছে তা হলো–

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

(সূরা আল ফাতিহা: ৬)

যার অর্থ হলো, আমাদের সেই পথ দেখাও আর আমাদের সে পথে প্রতিষ্ঠিত কর যা সোজা, যাতে কোন প্রকার বক্রতা নেই। এই সত্যের বিস্তারিত বিবরণ হলো, খোদা পর্যন্ত পৌঁছার সোজা পথ সন্ধান করাই হলো মানুষের সত্যিকার দোয়া। কেননা সকল অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রকৃতির নিয়ম হলো, সেসব উপকরণ হস্তগত করা, যার মাধ্যমে সেই লক্ষ্য অর্জিত হয়। খোদা তা'লা সব বিষয় অর্জনের জন্য প্রকৃতির এই নিয়মই নির্ধারণ করেছেন যে, তা অর্জনের জন্য যেসব উপকরণ প্রয়োজন, তা অর্জন করা বাঞ্ছনীয় আর যেসব পথে চললে সেই লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে, সেসব পথ অবলম্বন করা। মানুষ যদি

সোজা পথে সঠিকভাবে পদক্ষেপ নেয় আর লক্ষ্য অর্জনের পথে অগ্রসর হয়, তাহলে অবলীলায় অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন হয়। কিন্তু কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য যা উপকরণস্বরূপ, তা ছেড়ে দিলেও এমনিতেই লক্ষ্য অর্জন হয়ে যাবে– তা আদৌ সম্ভবপর নয়, বরং আদিকাল থেকে প্রকৃতির প্রতিষ্ঠিত নিয়ম এটিই (চলে আসছে) যে, প্রত্যেক লক্ষ্য অর্জনের নির্ধারিত একটি রীতি আছে, মানুষ যতক্ষণ সেই নির্ধারিত পথে পদচারণা না করবে, ততক্ষণ তার সেই বিষয় অর্জিত হবে না।

সুতরাং যে বস্তু পরিশ্রম, চেষ্টা-সাধনা, দোয়া ও আকুতি-মিনতির সাথে অর্জন করতে হয় তা হলো, সিরাতে মুস্তাকীম বা সহজসরল পথ। যে ব্যক্তি সিরাতে মুস্তাকীমের সন্ধানের মানসে চেষ্টা-সাধনা করে না আর এর প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না, সে খোদার দৃষ্টিতে বক্র পথের পথিক। যদি সে খোদার কাছে জান্নাত ও পারলৌকিক জীবনের সুখের দোয়া করে তাহলে ঐশী প্রজ্ঞা তাকে এই উত্তরই প্রদান করে যে, হে অজ্ঞ! প্রথমে সরল পথ বা সিরাতে মুস্তাকীম সন্ধান কর বা যাচনা কর তাহলে এসবকিছু অতি সহজেই তোমার হস্তগত হবে। সুতরাং সব দোয়ার মাঝে সবচেয়ে অগ্রগণ্য দোয়া এবং সত্য সন্ধানীর জন্য যা একান্ত আবশ্যক তা হলো, সিরাতে মুস্তাকীম লাভের জন্য দোয়া করা। এখন জানা কথা যে, আমাদের বিরোধীরা এই সত্যের ওপর পদচারণা করা থেকেও বঞ্চিত। খ্রিষ্টানরা নিজেদের প্রতিটি দোয়ায় রুটির জন্যই হাত পাতে। তারা খেয়ে-দেয়ে এবং পেট পুরেও যদি গির্জায় আসে, তাহলেও মিছেমিছি ক্ষুধার্ত হওয়ার ভান করে রুটি ভিক্ষা চাইতে থাকে; যেন তাদের পরম চাওয়া রুটি ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর্যসমাজীরা এবং তাদের মূর্তি পূজারি ভাইয়েরা নিজেদের দোয়ায়, জীবন-মৃত্যু অর্থাৎ জন্মান্তরবাদ, যা তাদের ভ্রান্ত দাবি অনুসারে সত্য-সঠিক বিষয়, তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন শ্লোক পড়ে থাকে, কিন্তু খোদার কাছে সোজা পথ লাভের জন্য দোয়া করে না। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা এখানে বহুবচনে দোয়া শিখিয়ে এ কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, কোন মানুষের জন্য সঠিক পথ যাচনা করা ও সঠিক পথের দিশা চাওয়া আর ঐশী পুরস্কার লাভ করা বারণ নয়। কিন্তু আর্যসমাজীদের নীতির কারণে পাপীর জন্য হেদায়েত যাচনা করা অবৈধ আর খোদা তাকে অবশ্যই শাস্তি দিবেন। তার জন্য হেদায়েত পাওয়া না পাওয়া সমান কথা। অপরদিকে ব্রাহ্মসমাজীদের দোয়ায় এমন কোন বিশ্বাসই নেই। তারা সদা নিজেদের বুদ্ধির

অহংকারে নিমজ্জিত থাকে। তাদের আরেকটি উক্তি হলো, ইবাদত-বন্দেগীর জন্য কোন বিশেষ দোয়াকে গুরুত্ব দেয়া আবশ্যক নয়। মানুষ নিজের পছন্দমত দোয়া করার বিষয়ে স্বাধীন! এটি তাদের নিছক অজ্ঞতা। জানাকথা যে, যদিও শত শত ছোট ছোট প্রয়োজন মানুষের নিত্যদিনের সাথি কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রয়োজন, যার চিন্তা দিবারাত্রি ও প্রতিটি মুহূর্তে করা উচিত, তা কেবল একটিই আর তা হলো- মানুষ যেন বিভিন্ন প্রকার অন্ধকারের পর্দা থেকে মুক্তি পেয়ে পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। কোন প্রকার অন্ধত্ব, অন্তর্দৃষ্টিহীনতা, লাগামহীনতা ও অবিশ্বস্ততা যেন বাকি না থাকে। বরং খোদাকে ভালোভাবে শনাক্ত করে আর তাঁর খাঁটি ভালোবাসায় সমৃদ্ধ হয়ে খোদার সাথে সাক্ষাতের মর্যাদা লাভ করা, এরই মাঝে তার পূর্ণ সৌভাগ্য নিহিত; এটিই একমাত্র দোয়া যা মানুষের একান্ত প্রয়োজন এবং যাতে তার সকল সৌভাগ্য নিহিত।

সুতরাং তা লাভের সহজ পথ হলো اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ বলা। কেননা মানুষের সকল অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের এটিই একমাত্র পথ যে, যেসব পথে চললে সেই লক্ষ্য অর্জন হয় সেসব পথে দৃঢ়তার সাথে পদচারণা করা আর পথহারাদের পরিত্যাগ করা এবং সেই সকল পথ অবলম্বন করা যা সরাসরি গন্তব্যে পৌঁছে। অধিকন্তু এ কথা অতি স্পষ্ট যে, সবকিছু অর্জনের জন্য খোদা স্বীয় প্রকৃতির নিয়মে কেবল একটিই রাস্তা এমন রেখেছেন যাকে সোজা বলা উচিত। যতক্ষণ সেই সঠিক রাস্তা সত্যিকার অর্থে অনুসরণ বা অবলম্বন করা না হবে, ততক্ষণ তা অর্জিত হওয়া অসম্ভব। যেভাবে খোদার সমস্ত নিয়মকানুন আদিকাল থেকেই সুনির্ধারিত ও সুদৃঢ়রূপে চলে আসছে, অনুরূপভাবে মুক্তি ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্যও একটি রীতি নির্ধারিত আছে, যা-কিনা সোজা ও সরল। সুতরাং দোয়ার সোজা ও সঠিক রীতি হলো খোদার কাছে এই সোজা রাস্তা যাচনা করা। সূরা ফাতিহায় যে, অষ্টম, নবম ও দশম সত্য নিহিত আছে তা হলো,

صِرَاطَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ ۙ غَيۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا الضَّآلِّيۡنَ

(সূরা আল ফাতিহা: ৭)

এর অর্থ হলো আমাদের সেসব পুণ্যের পথযাত্রীদের পথ দেখাও যারা এমন পথ অবলম্বন-অনুসরণ করেছেন যার কল্যাণে তাদের প্রতি তোমার নিয়ামত

বর্ষিত হয়েছে এবং তাদের পথ থেকে দূরে রাখ যারা ঔদাসীন্যবশত সোজা পথে পদচারণার চেষ্টা করে নি আর একারণে তোমার সমর্থন থেকে বঞ্চিত থেকে পথভ্রষ্টই রয়ে গেছে। এই হলো তিনটি সত্য, যার বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ: কিছু মানুষ আন্তরিকভাবে খোদার সন্ধানী হয়ে থাকে আর নিষ্ঠা ও বিনয়ের সাথে খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। অতএব খোদাও তাদের সন্ধানী হয়ে যান আর কৃপা ও পুরস্কার (হাতে) নিয়ে তাদের কাছে ফিরে আসেন। এই অবস্থার নাম ঐশী পুরস্কার। এদিকেই আলোচিত আয়াতে ইঙ্গিত করে বলেন صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ তারা এমন স্বচ্ছ ও সোজা পথ অবলম্বন করেন যার কল্যাণে ঐশী রহমতবারি লাভের যোগ্য বলে গণ্য হন। আর একই কারণে তাদের ও খোদার মাঝে কোন অন্তরায় বাকি থাকে না আর তারা সম্পূর্ণভাবে ঐশী রহমতের সামনে এসে দণ্ডায়মান হন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ঐশী কল্যাণরাজির জ্যোতি তাদের ওপর বর্ষিত হয়। দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ তারা যারা জেনেশুনে বিরোধিতার পথ অবলম্বন করে আর শত্রুর ন্যায় খোদাবিমুখ হয়ে যায়।

সুতরাং খোদা তা'লাও তাদের প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করেন আর করুণার সাথে তাদের প্রতি তাকান না। এর কারণ হলো, খোদা সম্পর্কে তাদের অন্তরে যে শত্রুতা, ঘৃণা, ক্রোধ, রাগ ও অসন্তুষ্টি প্রচ্ছন্ন থাকে, তা তাদের এবং খোদার মাঝে পর্দা হিসেবে বিরাজ করে। এই অবস্থার নাম খোদার ক্রোধ বা গজব। এদিকে ইঙ্গিত করে খোদা তা'লা বলেন غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ তৃতীয় শ্রেণির মানুষ হলো তারা যারা খোদার প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন হয়ে থাকে, পুরো উদ্যম ও প্রচেষ্টার সাথে তাঁকে সন্ধান করে না। খোদাও তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন হয়ে যান এবং তাদেরকে স্বীয় পথ প্রদর্শন করেন না, কেননা তারা পথ সন্ধানে নিজেরা আলস্য দেখায় আর নিজেদেরকে সেই কল্যাণের যোগ্য করে না যা খোদার চিরাচরিত নিয়মে পরিশ্রমী ও চেষ্টা-সাধনাকারীদের জন্য নির্ধারিত। এই অবস্থার নাম হলো **ইযলালে ইলাহী**, অর্থাৎ খোদা তাদের পথভ্রষ্ট করেছেন অর্থাৎ যখন তারা হিদায়াত পাওয়ার পথকে পুরো চেষ্টার সাথে সন্ধান করে নি খোদা স্বীয় আদি নিয়মের অনুবর্তিতায় তাদেরকে হেদায়েতও দেন নি আর স্বীয় সমর্থন থেকেও বঞ্চিত রেখেছেন। এদিকেই তিনি ইঙ্গিত করে বলেছেন وَلَا الضَّآلِّيْنَ বস্তুত এই তিনটি সত্যের সারকথা ও সারাংশ হলো– যেভাবে খোদার সামনে মানুষের তিনটি অবস্থা হয়ে থাকে অনুরূপভাবে খোদাও

প্রত্যেকের অবস্থা অনুসারে তাদের সাথে পৃথক-পৃথক ব্যবহার করে থাকেন। যারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে আর আন্তরিক ভালোবাসা ও নিষ্ঠার সাথে তাঁকে চায়, খোদাও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান আর স্বীয় সন্তুষ্টির জ্যোতি তাদের ওপর অবতীর্ণ করেন। আর যারা তাঁর প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করে এবং জেনেশুনে বিরোধিতা করে, খোদাও তাদের সাথে বিরোধীর মতো ব্যবহার করেন। আর যারা তাঁর সন্ধানে আলস্য ও ভ্রূক্ষেপহীনতা প্রদর্শন করে, খোদাও তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন এবং তিনি তাদেরকে ভ্রষ্টতার মাঝে ছেড়ে দেন। এককথায় আয়নায় যেভাবে মানুষের সেই চেহারা-ই দেখা যায় যা তার সত্যিকার চেহারা, অনুরূপভাবে এক অদ্বিতীয় খোদা, যিনি সকল পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র, তিনি তাদের ভালোবাসেন যারা ভালোবাসা রাখে, রাগীদের সাথে রাগান্বিত হন আর যারা ভ্রূক্ষেপহীন তাদের প্রতি তিনিও ভ্রূক্ষেপহীন। যারা আত্মনিয়ন্ত্রণ করে তাদের শাস্তি দেয়া থেকে বিরত থাকেন আর যারা ঝুঁকে বা বিনত হয় তাদের প্রতি তিনি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। যারা তাঁকে চায় তিনিও তাদের চান। আর যারা ঘৃণা করে তাদের তিনিও ঘৃণা করেন।

আয়নার সামনে তুমি যেমন ভঙ্গিমা প্রদর্শন করবে আয়নায় তা-ই দেখা যাবে, একইভাবে মহা সম্মানিত খোদার সামনে কেউ যেভাবে চলবে তার জন্য খোদার পক্ষ থেকে তা-ই নির্ধারিত রয়েছে। আর যেসব পোশাক বান্দা নিজের জন্য নিজেই বেছে নেয়, তার বপিত সেই বীজই তাকে ফেরত দেয়া হয়। মানুষ যখন সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা, পঙ্কিলতা ও কলুষ থেকে নিজ হৃদয় পবিত্র করে, আর তার হৃদয়ের আঙিনায় কেবল খোদা থেকে যান, অন্য যে কোন নোংরা জিনিস থেকে তা পুরোপুরি মুক্ত হয়ে যায় তখন এর দৃষ্টান্ত এমনই হয়ে থাকে যেমন কেউ নিজ গৃহের সূর্য অভিমুখী দ্বার খুলে দিলে তার ঘরে সূর্যের কিরণ প্রবেশ করে। কিন্তু বান্দা যখন অসৎ পন্থা, মিথ্যাচার ও বিভিন্ন প্রকার নোংরামিতে লিপ্ত হয় আর খোদাকে তুচ্ছ বস্তুতুল্য জ্ঞান করে পরিত্যাগ করে তখন তার দৃষ্টান্ত এমনই হয়ে থাকে যেমনটি কিনা কেউ আলো অপছন্দ করে এবং এর প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করে নিজের ঘরের সব দরজা বন্ধ করে দেয় পাছে কোনদিক থেকে সূর্যের আলো ঘরে ঢুকে পড়ে। মানুষ যখন রিপুর তাড়না বা সম্মান ও খ্যাতি বা জাতির অন্ধ অনুকরণ ইত্যাদির মত হরেক প্রকার ভ্রান্তি ও নোংরামিতে লিপ্ত হয় আর আলস্য ও ঔদাসীন্য এবং ভ্রূক্ষেপহীনতা বশত সেসব কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার আদৌ চেষ্টা করে না তখন তার দৃষ্টান্ত এমনই

যেভাবে কেউ নিজের ঘরের দরজাগুলো বন্ধ পায় আর পুরো ঘরে অন্ধকার ছেয়ে থাকতে দেখে কিন্তু তা সত্ত্বেও উঠে দরজাগুলো খোলে না, হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে আর মনে মনে বলতে থাকে যে, এখন কে উঠবে, কে এত কষ্ট সহ্য করবে। এই তিনটি দৃষ্টান্ত সেই তিন অবস্থার, যা মানুষের নিজের কর্ম ও আলস্যের ফলেই সৃষ্টি হয়, যার প্রথম অবস্থার নাম পূর্বের ব্যাখ্যা অনুসারে ঐশী পুরস্কার, দ্বিতীয় অবস্থার নাম ঐশী ক্রোধ আর তৃতীয় অবস্থার নাম হলো, 'এযলালে এলাহী' বা খোদার নিয়মের দৃষ্টিতে পথভ্রষ্ট। এই তিনিটি সত্য সম্পর্কেও আমাদের বিরোধীরা অবহিত নয় কেননা ব্রাহ্ম সমাজীদের যেহেতু সেই সত্য সম্পর্কে বিন্দুমাত্র কোন জ্ঞান নেই, যেই সত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে খোদা তা'লা বিদ্রোহী ও ক্রুদ্ধ বান্দাদের সাথে ক্রুদ্ধ আচরণ করে থাকেন। যেমন ব্রাহ্মদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি সম্প্রতি এ সম্পর্কে একটি পুস্তিকা লিখেছে, যাতে উল্লিখিত ব্যক্তি ঐশী গ্রন্থাবলীর প্রতি এই আপত্তি করে যে, এসবে কী করে বা কেন খোদার প্রতি ক্রোধের বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হলো? খোদা কী আমাদের দুর্বলতা দেখে ক্ষেপে যান?

এখন জানাকথা যে, এই সত্য সম্পর্কে উল্লিখিত লেখকের যদি আদৌ কোন জ্ঞান থাকত তাহলে কেন সে অনর্থক সময় নষ্ট করে এমন একটি পুস্তিকা প্রকাশ করতো যার মাধ্যমে সবার সামনে তার স্বল্পবুদ্ধিতা প্রকাশ পেয়ে গেছে? আর বুদ্ধির দাবি করা সত্ত্বেও সে একথা বুঝতে পারে নি যে, খোদার ক্রোধ বান্দার নিজ অবস্থারই একটি প্রতিচ্ছবি। যখন (খোদার ইচ্ছা) বিরোধী কোন অপকর্মের ফলে মানুষের বিবেকবুদ্ধি লোপ পায় এবং সে খোদাবিমুখ হয়ে যায়, তখন সত্য প্রেমিক ও সত্যবাদীদের ওপর রহমতের যে কল্যাণরাজি বর্ষিত হয়ে থাকে তার ওপরও সেই একই কল্যাণরাজি বর্ষিত হবে– সে কি সেই যোগ্যতা রাখে? মোটেই না, বরং আদিকাল থেকে খোদার যে নিয়ম চলে আসছে, যা মুত্তাকী ও সত্যবাদী মানুষ সকল যুগে প্রত্যক্ষ করে আসছে আর এখনো সঠিক ও সত্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এর সত্যতা প্রত্যক্ষ করে, সেই নিয়মটি হলো, যে ব্যক্তি (মানবীয়) অন্ধকারের পর্দা ছিন্ন করে নিজের আত্মাকে সরাসরি খোদামুখী করে, তাঁর আস্তানায় সেজদাবনত হয়, তার প্রতিই খোদা তা'লার বিশেষ কল্যাণরাজি বর্ষিত হয়। যে ব্যক্তি এই রীতির পরিপন্থি ভিন্ন কোন রীতি অবলম্বন করে, তার ওপর রহমতের বিপরীত ফল অর্থাৎ খোদার ক্রোধ বর্ষিত হয়। আর গজব বা ক্রোধের আসল মর্ম হলো, যখন কোন ব্যক্তি

সেই সোজা রাস্তা ছেড়ে দেয়, যা ঐশী বিধানে খোদার করুণাসিক্ত হওয়ার রাস্তা, তখন সে ঐশী করুণাবারি থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। বঞ্চনার এই অবস্থার নাম খোদার ক্রোধ বা গজব। যেহেতু মানুষের জীবন ও আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্য খোদার কৃপার কাছে ঋণী এই দৃষ্টিকোণ থেকে যারা রহমতরূপী কল্যাণধারার রীতি পরিত্যাগ করে, তারা খোদার পক্ষ থেকে এ পৃথিবীতে বা পরকালে বিভিন্ন প্রকার শাস্তিতে নিপতিত হয়। কেননা যার সাথে খোদার রহমত নেই, বিভিন্ন প্রকার আধ্যাত্মিক ও দৈহিক শাস্তি তাকে গ্রাস করার জন্য উদ্যত হওয়া অবধারিত। যেহেতু খোদার বিধান হলো, তাদের সাথে বিশেষ রহমত থাকে যারা রহমতের রীতি অর্থাৎ দোয়া ও একমাত্র খোদাকে অবলম্বন করে; সে কারণে যারা এ রীতি পরিত্যাগ করে তারা বিভিন্ন প্রকার বিপদাপদে নিপতিত হয়। এদিকেই আল্লাহ্ তা'লা ইঙ্গিত করেছেন–

قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ○ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

(সূরা আল ফুরকান: ৭৮ ও সূরা আলে ইমরান: ৯৮)

অর্থাৎ তাদের বলে দাও, আমার খোদা তোমাদের প্রতি আদৌ ভ্রুক্ষেপ করেন না যদি তোমরা দোয়া না কর আর তাঁর কল্যাণরাজির প্রত্যাশী না হও। খোদা কারো জীবন বা অস্তিত্বের মুখাপেক্ষী নন। তিনি স্বয়ম্ভু-পরবিমুখ। আর্য ও খ্রিষ্টানরা এই তিনটি সত্যের প্রথম ও তৃতীয় সত্য সম্পর্কে উদাসীন। তাদের কেউ এই আপত্তি করে যে, খোদা তা'লা সবাইকে কেন হেদায়েত দেন না? আবার কেউ এই আপত্তি করছে যে, খোদার মাঝে পথভ্রষ্ট করার বৈশিষ্ট্য কেন থাকবে? যারা খোদার হেদায়েত দেয়া সম্পর্কে আপত্তি করে, তারা একথা চিন্তা করে না যে, খোদার হেদায়েত সেসব মানুষ লাভ করে যারা হেদায়েত লাভের চেষ্টা করে আর সেসব পথে চলে যেসব পথে চলা রহমতের কল্যাণধারায় সিক্ত হওয়ার জন্য আবশ্যক। খোদা পথভ্রষ্ট করেন বলে যারা আপত্তি করে থাকে তাদের মাথায় একথা আসে না যে, খোদা তা'লা স্বীয় নির্ধারিত রীতির অধীনে সকল মানুষের সাথে তার অবস্থানুসারে ব্যবহার করেন। যে ব্যক্তি আলস্য ও ঔদাসীন্য বশত এর জন্য চেষ্টা করে না, এমন লোকদের জন্য আদিকাল থেকে তাঁর নির্ধারিত নিয়ম এটিই যে, তিনি স্বীয় সমর্থন থেকে তাদের বঞ্চিত রাখেন। আর কেবল তাদেরকেই স্বীয় পথ দেখান যারা সেসব পথ পাওয়ার জন্য সর্বান্তঃকরণে চেষ্টা করে। এটি কী করে সম্ভব

হতে পারে যে, যে ব্যক্তি চরম ভ্রুক্ষেপহীনতার সাথে আলস্য প্রদর্শন করে, সে-ও সেভাবেই খোদার কল্যাণরাজি থেকে কল্যাণমণ্ডিত হবে যেভাবে সে ব্যক্তি হয়, যে পুরো বুদ্ধি ও মেধা খাটিয়ে পুরো জোর ও পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে তাঁকে সন্ধান করে! এর প্রতিই আল্লাহ্ তা'লা অন্যত্র ইঙ্গিত করেছেন, আর তা হলো–

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

(সূরা আল আনকাবুত: ৭০)

অর্থাৎ যারা আমাদের পথে চেষ্টাসাধনা অব্যাহত রাখে আমরা অবশ্যই তাদেরকে আমাদের পথ প্রদর্শন করে থাকি। এখন দেখা উচিত যে, সূরা ফাতিহায় উল্লিখিত এই দশটি সত্য কত মহান ও অনন্য সত্য, যা উদ্‌ঘাটনে আমাদের সকল বিরোধী ব্যর্থ হয়েছে। এছাড়া দেখা উচিত যে, কত স্বল্প কথায় ও সূক্ষ্মতার সাথে খুবই ছোট ছোট বাক্যে আল্লাহ্ তা'লা সেগুলোকে সমৃদ্ধ করেছেন। এরপর এদিকে দেখা উচিত যে, এসব সত্য এবং এমন সংক্ষিপ্ত বাক্যের পাশাপাশি আরো কী কী সূক্ষ্ম দিক রয়েছে যা এই আশিসময় সূরায় বিদ্যমান। যদি আমরা এখানে সেই সূক্ষ্ম দিকগুলো বর্ণনা করি তাহলে এই বিষয়টি এক বড় গ্রন্থে রূপ নিবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, কেবল কয়েকটি সূক্ষ্ম কথা এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। প্রথম সূক্ষ্ম কথা হলো, খোদা তা'লা সূরা ফাতিহায় দোয়া করার এমন উন্নত রীতি বর্ণনা করেছেন, যার চেয়ে উত্তম রীতি আর হতে পারে না। আর তাতে সেসব বিষয় একীভূত রয়েছে যা দোয়ার সময় হৃদয়ে আবেগ-উচ্ছ্বাস সৃষ্টির জন্য একান্ত আবশ্যক। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য দোয়ায় একটি উচ্ছ্বাস ও আবেগ থাকা আবশ্যক, কেননা যে দোয়ায় আবেগ নেই তা কেবল মুখের বুলিসর্বস্ব; প্রকৃত দোয়া নয়। কিন্তু এটিও জানাকথা যে, দোয়ায় প্রেরণা সৃষ্টি হওয়া সবসময় মানুষের নিয়ন্ত্রণে নেই; বরং মানুষের জন্য একান্ত আবশ্যক হলো, দোয়া করার সময় যেসব বিষয় আন্তরিক আবেগের কারণ হতে পারে তা তার হৃদয়ে বা মনে উদয় হওয়া। প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তির জন্য এটি স্পষ্ট যে, আন্তরিক উচ্ছ্বাস সৃষ্টিকারী কেবল দুটো জিনিসই রয়েছে। একটি হলো, খোদাকে কামেল ও সর্বশক্তিমান এবং সর্বোৎকৃষ্ট গুণাবলীর সমাহার মনে করে তাঁর করুণা ও বদান্যতাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্বীয়

সত্তা ও অস্তিত্বের জন্য আবশ্যক মনে করা আর তাঁকেই সমস্ত কল্যাণের উৎস জ্ঞান করা। দ্বিতীয়ত, নিজেকে ও নিজের সকল সমশ্রেণিকে অক্ষম ও কপর্দকশূন্য এবং খোদার সাহায্যের মুখাপেক্ষী বিশ্বাস করা। এই দু'টি বিষয় এমন, যার কল্যাণে দোয়ায় আবেগ সঞ্চার হয় এবং তা আবেগ সঞ্চারের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। এর কারণ হলো, মানুষের দোয়ায় আবেগ কেবল তখনই আসে যখন সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দুর্বল ও অক্ষম আর খোদার সাহায্যের মুখাপেক্ষী মনে করে। আর একইসাথে খোদা সম্পর্কে এই দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তিনি পরম ও প্রকৃত অর্থে পূর্ণ শক্তির আধার এবং বিশ্ব প্রতিপালক, রহমান, রহীম আর পারলৌকিক বিষয়ের বা শাস্তি-পুরস্কার সংক্রান্ত বিষয়াদিরও মালিক। আর মানুষের যেসব চাহিদা রয়েছে তার সব পূর্ণ করা তাঁরই হাতে। অতএব সূরা ফাতিহার সূচনায় আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো, তিনিই একমাত্র সত্তা যিনি সকল উৎকৃষ্ট প্রশংসায় প্রশংসিত আর সমস্ত গুণের সমাহার। তিনিই একমাত্র সত্তা যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রভু, সকল করুণা-সিন্ধুর উৎসস্থল এবং সবাইকে তাদের স্ব-স্ব কর্মের প্রতিদান দাতা। সুতরাং এসব গুণ উল্লেখের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, সমস্ত শক্তি তাঁরই হাতে আর যাবতীয় কল্যাণরাজি তাঁরই পক্ষ থেকে। তিনি নিজের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে আপন সত্তাকে ইহলোক ও পারলৌকিক প্রয়োজন পূরণকারী এবং সবকিছুর মূল কারণ ও সকল কল্যাণের উৎসস্থল আখ্যায়িত করেছেন, যাতে এই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তাঁর সত্তা ও তাঁর রহমত ছাড়া কোন জীবের জীবন ও আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হওয়া সম্ভব নয়। এছাড়া বান্দাকে বিনয়ের শিক্ষা দিয়েছেন এবং বলেছেন–

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

(সূরা আল ফাতিহা: ৫)

এর অর্থ হলো, হে যাবতীয় কল্যাণরাজির উৎস! আমরা তোমারই উপাসনা করি আর তোমারই কাছে সাহায্য চাই। অর্থাৎ আমরা অক্ষম, নিজ শক্তিবলে কিছুই করতে সক্ষম নই যতক্ষণ না তোমার প্রদত্ত সামর্থ্য ও শক্তি সাথে থাকবে। সুতরাং খোদা তা'লা দোয়ায় আবেগ ও উচ্ছ্বাস সৃষ্টির জন্য দুটো চালিকাশক্তি বর্ণনা করেছেন। একটি হলো তাঁর মাহাত্ম্য ও প্রকৃতিস্থ রহমত, দ্বিতীয়টি হলো বান্দাদের দুর্বল ও তুচ্ছ হওয়া। স্মরণ রাখা উচিত যে, এই

উভয় চালিকাশক্তিই দোয়ার সময় মন-মস্তিষ্কে উপস্থিত করা প্রার্থনাকারীদের জন্য অত্যাবশ্যক। যারা কিছুটা হলেও দোয়ার বিশেষ স্বাদ পাওয়ার অভিজ্ঞতা রাখে, তাদের ভালোভাবে জানা আছে যে, এই দুটো চালিকাশক্তি ছাড়া দোয়া হতেই পারে না, অধিকন্তু এছাড়া খোদা-প্রেমের অগ্নি দোয়ার সময় নিজ শিখা উচ্চকিত করে না। এটি অতি স্পষ্ট কথা যে, যে ব্যক্তি খোদার মাহাত্ম্য ও রহমত এবং পূর্ণ ক্ষমতাকে স্মরণ রাখে না, সে কোনভাবেই খোদার দিকে ফিরে যেতে পারে না। যে ব্যক্তি নিজের দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা ও দীনতা স্বীকার করে না, তার আত্মা সেই সম্মানিত প্রভুর কাছে আদৌ বিনত হতে পারে না। এককথায় এটি এমন একটি সত্য বিষয়, যা বোঝার জন্য কোন গভীর দর্শনের প্রয়োজন নেই। বরং যখন খোদার মাহাত্ম্য ও স্বীয় হীনতা ও দুর্বলতা সত্যিকার অর্থে হৃদয়ে খচিত হয়, তখন সেই বিশেষ অবস্থা নিজেই মানুষকে বুঝিয়ে দেয় যে, খাঁটি দোয়া করার সেটিই রীতি। সত্যিকার পূজারিরা ভালোভাবে জানে যে, প্রকৃতপক্ষে দোয়ার জন্য এই দুটো জিনিসের জ্ঞান আবশ্যক, অর্থাৎ প্রধানত এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, খোদা তা'লা সকল প্রকার রবুবিয়্যত ও প্রতিপালন এবং রহমত ও প্রতিদান দেয়ার ক্ষমতা রাখেন আর তাঁর এই শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্যাবলী নিরন্তর নিজ কাজে নিয়োজিত।

দ্বিতীয়ত, এই চেতনা বা ধারণা থাকা যে, মানুষ ঐশী সাহায্য ও খোদাপ্রদত্ত সামর্থ্য ছাড়া কোন কিছুই অর্জনে সক্ষম নয়। নিঃসন্দেহে এই বিশ্বাস দুটি এমন যে, দোয়া করার সময় তা যদি হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় তাহলে হঠাৎ মানুষের অবস্থাকে এমনভাবে বদলে দেয় যে, একজন অহংকারী এতে প্রভাবান্বিত হয়ে ক্রন্দনরত অবস্থায় ভূলুণ্ঠিত হয় আর বিদ্রোহী ও পাষাণ-হৃদয় মানুষেরও অশ্রুপাত ঘটে। এই প্রশান্তি লাভের ফলেই আধ্যাত্মিকভাবে এক মৃত ও উদাসীন ব্যক্তির মাঝে প্রাণ সঞ্চার হয়। এই দুটো কথার ধারণা করেই সকল মানুষের হৃদয় দোয়া করার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এককথায়, এই হলো সেই আধ্যাত্মিক মাধ্যম, যার ফলে মানুষের হৃদয় খোদামুখী হয় আর স্বীয় দুর্বলতা ও ঐশী সাহায্যের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। এর মাধ্যমেই মানুষ আত্মবিস্মৃতির এমন এক জগতে গিয়ে উপনীত হয়, যেখানে স্বীয় কলুষিত সত্তার ছাপ আর অবশিষ্ট থাকে না আর শুধু এক মহান সত্তার জাজ্বল্যমান প্রতাপ পরিদৃষ্ট হয়। সেই সত্তাই রহমত সর্বস্ব, সকল অস্তিত্বের অবলম্বন, সকল বেদনার ঔষধ এবং সকল কল্যাণের উৎস হিসেবে পরিদৃষ্ট হয়। অবশেষে এ অবস্থা থেকে

খোদার মাঝে বিলীন হবার একটি চিত্র প্রকাশ পায়, যার কল্যাণ সৃষ্টির প্রতিও মানুষ আকৃষ্ট থাকে না এবং নিজের প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার প্রতিও নয়, বরং সম্পূর্ণভাবে খোদার প্রেমে বিলীন হয়ে যায়। অধিকন্তু সেই প্রকৃত সত্তার অভিজ্ঞতা বা দর্শনলাভের ফলে নিজের এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব বিলুপ্তপ্রায় মনে হয় আর এই অবস্থার নাম খোদা তা'লা সিরাতে মুস্তাকীম রেখেছেন এবং বান্দাকে এর সন্ধান করার শিক্ষা দিয়েছেন আর বলেছেন−

اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ

(সূরা আল ফাতেহা: ৬)

অর্থাৎ উল্লিখিত আয়াত থেকে আত্মবিলুপ্তি, একত্ববাদ এবং খোদাপ্রেমের যে অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে তা আমাদের দান কর আর তুমি ছাড়া অন্য সবার সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করে দাও। সারকথা হলো, খোদা তা'লা দোয়ায় আবেগ সৃষ্টির জন্য মানুষকে সেই প্রকৃত উপকরণ দান করেছেন যা এতটা আন্তরিক আবেগ সৃষ্টি করে যে, দোয়াকারীকে আত্মতোষণ থেকে আত্মপেষণ এবং আত্মবিলুপ্তির জগতে পৌঁছে দেয়। এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, সূরা ফাতেহা দোয়া করার বেশ কয়েকটি পন্থার মাঝে সঠিক পথ যাচনা করার একটি উপায় মাত্র! বিষয় আদৌ কেবল এতটাই নয়! বরং যেভাবে উল্লিখিত যুক্তি থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, সত্যিকার অর্থে এটিই একমাত্র রীতি যার ওপর আন্তরিক আবেগের সাথে দোয়া করা নির্ভর করে এবং মানব প্রকৃতি যার ওপর প্রকৃতিগত দাবি অনুসারে চলতে চায়। সত্য কথা হলো, খোদা যেভাবে অন্যান্য বিষয়ে নির্দিষ্ট নিয়মকানুন নির্ধারণ করে রেখেছেন, অনুরূপভাবে দোয়ার জন্যও একটি বিশেষ নিয়ম বা রীতি রয়েছে, আর সেই রীতি বা নিয়ম হলো সেই উদ্দীপনা বা প্রেরণা যা সূরা ফাতিহায় লেখা হয়েছে। আর সেই উভয় চালিকা শক্তি বা প্রেরণা যতক্ষণ কারো মাথায় না থাকবে ততক্ষণ তার দোয়ায় আবেগ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। দোয়া করার স্বাভাবিক রীতি সেটি, যা সূরা ফাতিহায় উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এই প্রশংসনীয় সূরার সূক্ষ্ম দিকগুলোর একটি হলো, তা দোয়াকে এর চালিকাশক্তিসহ বর্ণনা করেছে; অতএব চিন্তা কর।

এছাড়া এই সূরার আরেকটি সূক্ষ্ম বিষয় হলো, এটি হেদায়েত বা সত্য গ্রহণের জন্য প্রেরণা যোগানোর উপকরণগুলোকে পুরোপুরি বর্ণনা করেছে, কেননা যৌক্তিকভাবে সঞ্চার করা হয় এমন পরিপূর্ণ প্রেরণায় একটি অসাধারণ

আকর্ষণ বিদ্যমান থাকে। যৌক্তিক পর্যালোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বোৎকৃষ্ট প্রেরণা বা উদ্দীপনা সেটিকে বলা হয় যাতে তিনটি অঙ্গ বা অনুষঙ্গ থাকে। একটি হলো, যে বস্তুর প্রতি অনুপ্রাণিত করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে সেটির নিজস্ব সৌন্দর্য বা গুণাবলী বর্ণনা করা আর এই দিকটি এই আয়াতে বর্ণনা করেছেন, اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ অর্থাৎ আমাদেরকে সেই রাস্তার জ্ঞান দাও যাতে দৃঢ়চিত্ততা ও সত্য বা সততার বৈশিষ্ট্য থাকবে আর যাতে বিন্দুমাত্র বক্রতাও থাকবে না। সুতরাং এ আয়াতে এই রাস্তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে তা অর্জনের প্রেরণা সঞ্চার করা হয়েছে। উদ্দীপনা বা প্রেরণার দ্বিতীয় অংশ হলো, যে বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তার উপকারিতা বর্ণনা করা আর এই অংশটি এই আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, صِرَاطَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ অর্থাৎ আমাদের সে পথে পরিচালিত কর যে পথে চলে পূর্ববর্তী পুণ্যের পথযাত্রীদের পুরস্কার ও সম্মান লাভ হয়েছে। সুতরাং এই আয়াতে পুণ্যপথের পথিকদের সফল হওয়ার কথা উল্লেখ করে এ পথের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়েছে। অনুপ্রেরণার তৃতীয় অংশ হলো, যে বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য, তা পরিত্যাগকারীদের ক্ষতি ও শোচনীয় অবস্থা বর্ণনা করা বাঞ্ছনীয়। সুতরাং এ অংশ আয়াত غَيۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا الضَّآلِّيۡنَ এ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সে সমস্ত লোকের পথ থেকে রক্ষা কর যারা সোজা-সরল পথ পরিত্যাগ করে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে আর ঐশী ক্রোধানলে নিপতিত হয়েছে এবং পথ হারিয়ে বসেছে। সুতরাং এই আয়াতে সহজসরল পথ পরিত্যাগের যে ক্ষতিকর দিক সামনে আসে সে সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।

এককথায় সূরা ফাতেহায় উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণার তিনটি অংশকেই সূক্ষ্ম ও সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন আর এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাও তুলে ধরেছেন। এরপর এই পথ পরিত্যাগকারীদের ব্যর্থতা ও শোচনীয় অবস্থার কথাও উল্লেখ করেছেন যেন ব্যক্তিগত সৌন্দর্যের কথা শুনে সুস্থ প্রকৃতির মানুষ সেদিকে আকৃষ্ট হয়। এর উপকারিতা সম্পর্কে অবহিত হয়ে কল্যাণকামীদের মনে এর প্রতি আগ্রহ জাগে এবং এটিকে উপেক্ষা করার ক্ষতিকর দিকগুলো জেনে সেই অশুভ পরিণতিকে ভয় করে যা উপেক্ষার ফলে মানুষের ওপর নিপতিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এটিও একটি সুন্দর দিক যার ব্যবস্থা এই সূরায় রাখা হয়েছে। এছাড়া এ সূরায় তৃতীয় বিস্ময়কর দিক হলো, বাগ্মিতা ও প্রাঞ্জলতার পাশাপাশি এটি এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করেছে যে, খোদার প্রশংসার

গান গাওয়ার পর দোয়া ইত্যাদি সম্পর্কে যে বাক্যাবলী লিপিবদ্ধ করেছে, তা এত সুন্দরভাবে **'লফ ও নশর'** মুরাত্তাব হিসেবে বা অনুবন্ধ হিসেবে বর্ণনা করেছে যা বাগ্মিতা ও আলংকারিকতার সকল দাবি পূরণ করে পরিস্কারভাবে বর্ণনা করা কঠিন কাজ। যারা বক্তৃতা ও রচনার ভালো রুচি রাখে তারা খুব ভালোভাবে বুঝবে যে, এমন অনুবন্ধ কতইনা স্পর্শকাতর ও সূক্ষ্ম একটি কাজ। এর বিশদ বিবরণ হলো, প্রথমে খোদার প্রশংসা-সংক্রান্ত চারটি কল্যাণধারার কথা উল্লেখ করেছেন তা হলো যথাক্রমে রাব্বুল আলামীন, রহমান, রহীম এবং মালিক ইয়ামিদ্দীন। এরপর **তাআব্বুদ** বা দাসত্ব করা, **ইস্তেআনত,** অর্থাৎ সাহায্য যাচনা ও দোয়া আর পুরস্কারের আকুতি সংক্রান্ত বাক্যাবলী এর অধীনে এনেছেন আর এত সূক্ষ্ম ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, যে বাক্যের কোনো প্রকার কল্যাণরাজির সাথে অতি নিবিড় সামঞ্জস্য ছিল তার অধীনেই সেই বাক্য উল্লেখ করেছেন। যেমন রাব্বুল আলামীন এর দৃষ্টিকোণ থেকে 'ইয়্যাকা না'বুদু' লিখেছেন, কেননা প্রতিপালন বা রবুবিয়্যতের কারণে তিনি ইবাদতের অধিকারপ্রাপ্ত হয়েছেন। তাই এর অধীনে আর এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে 'ইয়্যাকা না'বুদু' লেখা খুবই ভারসাম্যপূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত। আর রহমানের নিরিখে 'ইয়্যাকা নাসতাঈন' লিখেছেন। কেননা ইবাদত ও অন্যান্য অভীষ্ট বিষয় লাভের ক্ষেত্রে বান্দার জন্য খোদার যে সাহায্য এসে থাকে এবং যার ওপর তার ইহজগৎ ও পরকালের সফলতা নির্ভর করে তা তার কোনো কর্মের ফলাফল নয়, বরং সম্পূর্ণভাবে রহমানিয়্যত বৈশিষ্ট্যেরই প্রভাব। সুতরাং সাহায্য যাচনার সাথে গুণবাচক নাম 'রহমানিয়্যত'-এর সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে। এর নিরিখে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ লিখেছেন, কেননা দোয়া একটি চেষ্টা ও সংগ্রাম। আর চেষ্টায় যে ফলাফল লাভ হয় তা রহীমিয়্যত গুণবাচক নামেরই ফসল। ملك يوم الدين এর নিরিখে صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ লিখেছেন, কেননা শাস্তি-পুরস্কারের বিষয়টি পরকালের সাথেই সম্পর্ক রাখে। সুতরাং এমন বাক্য যাতে পুরস্কার যাচনা ও শাস্তি থেকে মুক্তির আবেদন নিবেদন থাকে তা এর নীচে রাখাই যুক্তিযুক্ত।

চতুর্থ সূক্ষ্ম সৌন্দর্য হলো, সূরা ফাতিহা সংক্ষিপ্তরূপে সকল কুরআনী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসংবলিত। এক কথায় কুরআন যে সকল উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে এই সূরা কুরআনের সেই উদ্দেশ্যাবলীর একটি সুন্দর সারসংক্ষেপ।

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ

(সূরা আল হিজর, ১৫:৮৮)

আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ হে রসূল! আমরা তোমাকে সূরা ফাতিহার সাতটি আয়াত মহা দানস্বরূপ প্রদান করেছি, যা সংক্ষিপ্তরূপে কুরআনের সমূহ উদ্দেশ্যসংবলিত আর একইসাথে বিশদ কুরআনও দিয়েছি যা ধর্মীয় উদ্দেশ্যাবলীর বিশদ ব্যাখ্যা বা বহিঃপ্রকাশ। আর এ দিক থেকে এই সূরার নাম উম্মুল কিতাব (অর্থাৎ কিতাবের জননী) এবং সূরাতুল জামে। কুরআনের মূল উদ্দেশ্যাবলী এই সূরা থেকে উৎসারিত হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে এটি উম্মুল কিতাব আর কুরআনে বিধৃত সকল প্রকার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সংক্ষিপ্ত রূপ হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে এটি সূরাতুল জামে। এ দিক থেকে মহানবী (সা.)ও বলেছেন যে, সূরা ফাতিহা যে ব্যক্তি পাঠ করেছে সে যেন পুরো কুরআন পাঠ করেছে। অতএব কুরআন শরীফ ও মহানবী (সা.)-এর হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সূরা ফাতিহা হলো কুরআন দর্শনের একটি আয়না। এ কথার ব্যাখ্যা হলো, কুরআনের একটি উদ্দেশ্য হলো, তা খোদা তা'লার সকল সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসা বর্ণনা করে বা স্তুতি গায়। আর তাঁর সত্তার যেসব পরম শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে তা বিশদভাবে তুলে ধরে।

সুতরাং এই উদ্দেশ্য 'আলহামদু লিল্লাহ্'-এর মাঝে সংক্ষিপ্তরূপে বিধৃত হয়েছে, কেননা এর অর্থ হলো, সকল পরম উৎকৃষ্ট প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য প্রমাণিত, যিনি সকল শ্রেষ্ঠত্বের সমাহার ও সমন্বয় এবং সকল ইবাদতের যোগ্য। খোদা তা'লা যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা এবং সমগ্র বিশ্বজগতের স্রষ্টা তা প্রকাশ করা কুরআন শরীফের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। অধিকন্তু তা বিশ্বের সূচনার চিত্রও অঙ্কন করে এবং বিশ্বের পরিধিতে যে প্রবেশ করেছে তাকে সৃষ্টি আখ্যায়িত করে, একইসাথে এসব বিষয়ের যারা বিরোধী তাদের মিথ্যাচার প্রমাণ করে। এই উদ্দেশ্যটি রাব্বুল আলামীন-এ সংক্ষিপ্তরূপে এসে গেছে। ঐশী কল্যাণধারা যে কোনো অধিকার-গুণে লাভ হয় নি তা প্রমাণ করা আর তার সার্বজনীন করুণার বিবরণ দেয়া হলো কুরআন শরীফের তৃতীয় উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যটি 'রহমান' এ সংক্ষিপ্তরূপে এসে গেছে। কুরআন শরীফের চতুর্থ উদ্দেশ্য হলো, খোদার সেই কল্যাণধারার বিষয়টি প্রমাণ করা যা পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে লাভ হয়। সুতরাং এই লক্ষ্য রহীম শব্দে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কুরআন শরীফের পঞ্চম উদ্দেশ্য হলো, পারলৌকিক জগতের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা যা 'মালিক

ইয়াউমিদ্দীন’-এর অধীনে এসে গেছে। কুরআন শরীফের ষষ্ঠ লক্ষ্য হলো নিষ্ঠা, সঠিক ইবাদত বা দাসত্ব এবং আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কলুষ থেকে আত্মশুদ্ধি, আধ্যাত্মিক ব্যাধির চিকিৎসা, পরিত্যাজ্য স্বভাবের চিকিৎসা এবং ইবাদতে শুধু একজনকেই সামনে রাখার বিষয় বর্ণনা করা। এই উদ্দেশ্যও اِيَّاكَ نَعۡبُدُ -এ সংক্ষিপ্তরূপে এসে গেছে। কুরআন শরীফের সপ্তম উদ্দেশ্য হলো, সকল কাজে খোদা তা’লাকে প্রকৃত অধিকর্তা আখ্যায়িত করা আর সকল শক্তিসামর্থ্য, স্নেহ, সাহায্য, আনুগত্যে অবিচলতা, অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকা, সকল কল্যাণের উপকরণ হস্তগত করা, ধর্মীয় ও জাগতিক কল্যাণরাজি-সংক্রান্ত বিষয়াদি তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করা আর এসব বিষয়ে তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়ার ওপর জোর দেয়া। সুতরাং এই লক্ষ্য ইয়্যাকা নাসতাঈন-এ সংক্ষিপ্তরূপে এসে গেছে। কুরআন শরীফের অষ্টম উদ্দেশ্য হলো, সিরাতে মুস্তাকীমের সূক্ষ্ম তত্ত্বের দিকগুলো বর্ণনা করা আর এর সন্ধানের জন্য এই বিষয়ের ওপর জোর দেয়া যে, দোয়া ও আকুতি-মিনতির মাধ্যমে তা সন্ধান কর। কুরআনের নবম উদ্দেশ্য হলো সেসব মানুষের রীতি ও চরিত্র বর্ণনা করা যাদের ওপর খোদার নেয়ামত ও অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছে যেন সত্যান্বেষীদের হৃদয় দৃঢ়তা লাভ করে। সুতরাং এ উদ্দেশ্য **‘সিরাতাল্লাযিনা আনআমতা আলাইহিম’**-এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দশম উদ্দেশ্য হলো, সেসব মানুষের চরিত্র ও রীতি বর্ণনা করা যাদের ওপর খোদার ক্রোধানল বর্ষিত হয়েছে বা যারা পথ ভুলে বিভিন্ন প্রকার কুপ্রথায় নিপতিত হয়েছে যেন সত্যান্বেষীরা তাদের পথ সম্পর্কে সাবধান থাকে। সুতরাং এই উদ্দেশ্য **গাইরিল মাগযুবে আলাইহিম ওয়া লায্যাল্লিন**-এ সংক্ষিপ্তভাবে এসে গেছে। অতএব এই হলো দশটি উদ্দেশ্য যা কুরআন শরীফে উল্লেখ রয়েছে এবং তা সকল সত্য নীতির মূল আর এসব উদ্দেশ্য সূরা ফাতিহায় সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণিত হয়েছে।

সূরা ফাতিহায় পঞ্চম সূক্ষ্ম সৌন্দর্য হলো, তা সবচেয়ে পরিপূর্ণ ও সর্বোৎকৃষ্ট সেই শিক্ষাসংবলিত যা সত্য সন্ধানীদের জন্য আবশ্যক এবং যা (খোদার) নৈকট্য ও তত্ত্বজ্ঞানে উন্নতির জন্য সর্বোৎকৃষ্ট কর্মপন্থা। কেননা (খোদার) নৈকট্যলাভের ক্ষেত্রে উন্নতির যাত্রা আধ্যাত্মিক পথচলার সেই বিন্দু থেকেই আরম্ভ হয় যখন পুণ্যের পথযাত্রী স্বীয় অবাধ্য প্রবৃত্তির ওপর এক মৃত্যু আনয়ন করে আর কঠোরতা ও কষ্ট এবং আত্মপেষণকে শিরোধার্য করে রিপুর সেসব কামনা-বাসনা থেকে সম্পূর্ণভাবে খোদার সন্তুষ্টির জন্য পৃথক হয়ে যায়, অর্থাৎ

তার এবং তার মহাসম্মানিত বন্ধুর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায় আর তাকে খোদাবিমুখ করে রিপুর সুখ, রিপুর আকর্ষণ, অভ্যাস, চিন্তাধারা ও চাওয়া-পাওয়া এবং সৃষ্টি হতে বিমুখ করে, অধিকন্তু সেসবের ভয়ও ফাঁদে ফেলে। প্রাথমিক ধাপে প্রবৃত্তিকে পিষ্ট করার জন্য যে কষ্ট সহ্য করা হয় আর পূর্বের অভ্যাস পরিত্যাগ করে বিভিন্ন প্রকার দুঃখ সহ্য করতে হয়, সেটিই উন্নতির সর্বোত্তম ধাপ যখন সেসব কষ্ট-ক্লেশ পুরস্কার হিসেবে প্রতিভাত হয়, কষ্টের পরিবর্তে আনন্দ আর দুঃখের পরিবর্তে আরাম এবং সংকীর্ণতার পরিবর্তে স্বতঃস্ফূর্ততা ও প্রফুল্লতা প্রকাশ পায়। আর উন্নতির মহান স্তর হলো, সেটি যাতে পুণ্যের পথযাত্রী খোদা ও তাঁর ইচ্ছা এবং পছন্দের সাথে এতটা ঐকতান, ভালোবাসা ও একাগ্রতা সৃষ্টি করে যে, তার নিজের ইচ্ছা ও প্রভাব লোপ পেতে থাকে, খোদার সত্তা ও গুণাবলী সে ব্যক্তির নিজের সত্তারূপী আয়নায় সকল প্রকার অমানিশা হতে পবিত্র থেকে আর অবস্থা-ব্যবস্থার ঊর্ধ্বে থেকে তার মাঝে প্রতিফলিত হতে থাকে আর পূর্ণ বিলীনতার আয়নার মাধ্যমে যা পুণ্যের পথযাত্রী ও তার প্রবৃত্তিগত কামনা-বাসনার মাঝে অপার দূরত্ব সৃষ্টি করেছে, ঐশী সত্তা ও গুণাবলীর পূর্ণ প্রতিফলন অতি স্পষ্ট ভাবে পরিদৃষ্ট।

এই বক্তৃতায় এমন শব্দ নেই যাতে ওজুদীদের বা বেদান্তীয়দের মিথ্যা চিন্তাধারার কোনো সমর্থন হয়, কেননা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে যে চিরস্থায়ী পার্থক্য আছে তা তারা বুঝে নি আর নিজেদের বিভ্রান্তিকর দিব্যদর্শনের প্রতারণায়, মারাত্মক ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছে যা ত্রুটিযুক্ত আধ্যাত্মিক সফরে প্রায়শ ঘটে থাকে বা যা উন্মাদনাপূর্ণ সাধনার ফসল হয়ে থাকে, যে কারণে তারা ভয়াবহ ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছে। অথবা কেউ নেশা ও আত্মবিস্মৃতির ঘোরে যাকিনা এক প্রকার উন্মাদনা, সেই পার্থক্যকে উপেক্ষা করেছে যা শক্তি, সামর্থ্য, শ্রেষ্টত্ব ও পবিত্রতার দৃষ্টিকোণ থেকে খোদা ও মানুষের মাঝে বিদ্যমান। নতুবা এটি জানাকথা যে, নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী সত্তা, একটি বিন্দুও যাঁর চিরন্তন জ্ঞানের গণ্ডির বাইরে নয় আর যার প্রতি কোনো ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা আরোপিত হতে পারে না, যিনি সকল প্রকার অজ্ঞতা, কলুষতা ও দুর্বলতা এবং দুঃখ-বেদনা, কষ্ট পাওয়া ও ধৃত হওয়ার ঊর্ধ্বে, তিনি কীভাবে অবিকল সেই বস্তুর মতো হতে পারেন যা এসব বিপদাপদ ও ত্রুটিবিচ্যুতির মাঝে নিপতিত? প্রশ্ন হলো, যে মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য এখনো অগণিত মাইলফলক অতিক্রম করা বাকি রয়েছে, সে সেই সর্বোৎকৃষ্ট সত্তার

সমকক্ষ বা অবিকল অনুরূপ হতে পারে কি, কোনো কিছুই যার আয়ত্ব করা বাকি নেই? যার সত্তা নশ্বর, যার আত্মায় স্পষ্টভাবে সৃষ্ট জীবের দুর্বলতা বিদ্যমান সে নিজের যাবতীয় কলুষ, দুর্বলতা, অপবিত্রতা, ত্রুটিবিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও সেই সুমহান গুণাবলীর অধিকারী সত্তার সমান হতে পারে কি যিনি স্বীয় গুণাবলী ও পবিত্র বৈশিষ্ট্যে অনাদি, অনন্ত ও অনিবার্যভাবে পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ?

سُبۡحٰنَهٗ وَتَعٰلٰی عَمَّا یَصِفُوۡنَ

(সূরা আল আন'আম: ১০১)

বরং এই তৃতীয় প্রকার উন্নতি বলতে আমরা যা বলতে চাচ্ছি তা হলো, পুণ্য-পথের পথিক খোদার ভালোবাসায় এতটা বিলীন আর এমনভাবে আত্মবিলুপ্ত করে যে, অনন্য ও অতুলনীয় সেই সত্তা নিজের সকল অনুপম গুণের সাথে তার এতটা নিকটে এসে যান, অর্থাৎ ঐশী বিকাশ তার প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার ওপর এমনভাবে আধিপত্য বিস্তার করে আর এমনভাবে তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে নেয় যে, তার স্বীয় প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার সাথে, বরং এমন সকল ব্যক্তির সাথে পুরোপুরি দূরত্ব ও ব্যক্তিগত শত্রুতা জন্মে যারা কামনা-বাসনার বশীভূত। এতে আর দ্বিতীয় প্রকারের উন্নতির মাঝে পার্থক্য হলো, যদিও দ্বিতীয় প্রকারের ক্ষেত্রে স্বীয় প্রভুর ইচ্ছার সাথে পূর্ণ একাত্মতা সৃষ্টি হয় আর তার দুঃখ বরণ পুরস্কার হিসেবে প্রতিভাত হয়, কিন্তু খোদার সাথে তখনও তার এতটা সম্পর্ক থাকে না যা খোদা ছাড়া অন্যদের সাথে ব্যক্তিগত শত্রুতা সৃষ্টির কারণ হবে এবং যার কল্যাণে খোদার ভালোবাসা কেবল হৃদয়ের উদ্দেশ্য না হয়ে বরং হৃদয়ের বৈশিষ্ট্য হয়ে যাবে। এককথায় দ্বিতীয় প্রকার উন্নতির ক্ষেত্রে খোদার সাথে পুরোপুরি একাত্ম হওয়া আর তাঁর বিপরীতে অন্যদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা পুণ্যের পথযাত্রীর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং এ লক্ষ্য অর্জনে সে আনন্দ পায়। কিন্তু তৃতীয় প্রকার উন্নতির ক্ষেত্রে খোদার সাথে পরিপূর্ণ ঐকতান ও তাঁকে ব্যতীত অন্যদের প্রতি শত্রুতা পোষণ পুণ্যের পথযাত্রীর প্রকৃতি বা স্বভাব হয়ে যায় যা সে কোনভাবেই পরিত্যাগ করতে পারে না। কেননা **انفکاک الشی عن نفسہٖ** অসম্ভব [অর্থাৎ একটি বস্তুকে (অর্থাৎ বস্তুর প্রকৃতিকে) বস্তুর অস্তিত্ব থেকে পৃথক করা যায় না]। যা দ্বিতীয় প্রকারের বিপরীত, যাতে পৃথক হয়ে যাওয়া বা বিচ্ছিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। কোনো ওলীর বেলায়েত (খোদার বন্ধু হওয়া) যতক্ষণ তৃতীয়

প্রকার পর্যন্ত না পৌঁছুবে ততক্ষণ তা ক্ষণস্থায়ী হবে আর তা আশঙ্কামুক্তও হবে না। এর কারণ হলো, যতদিন পর্যন্ত মানুষের প্রকৃতিতে খোদার ভালোবাসা ও তাঁর শত্রুদের প্রতি শত্রুতা প্রবেশ না করবে ততদিন পর্যন্ত অন্ধকারের কিছু ধমনী ও স্নায়ু (অর্থাৎ অন্ধকার ধারার প্রবাহমানতা) তার মাঝে বিদ্যমান থাকবে, কেননা সে প্রতিপালকের প্রাপ্য সেভাবে প্রদান করে নি যেভাবে করা উচিত ছিল। এখনো সে (খোদার) পূর্ণ সাক্ষাৎ লাভে অক্ষম। কিন্তু যখন খোদাপ্রেম ও খোদার সাথে পূর্ণ ঐকতান তার প্রকৃতিতে যথাযথভাবে প্রবেশ করবে, এমনকি খোদা তার কান হয়ে যাবেন যার মাধ্যমে সে শোনে আর তার চোখ হয়ে যাবেন যার মাধ্যমে সে দেখে আর তার হাত হয়ে যাবেন যার দ্বারা সে ধরে এবং তার পা হয়ে যাবেন যার দ্বারা সে হাঁটে– এমন পরিস্থিতিতে আর কোনো অন্ধকার অবশিষ্ট থাকে না আর সকল প্রকারের বিপদ ও অনিশ্চয়তা থেকে সে নিরাপদ হয়ে যায়। আল্লাহ্ যে বলেছেন–

اَلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَلَمۡ یَلۡبِسُوۡۤا اِیۡمَانَهُمۡ بِظُلۡمٍ اُولٰٓئِکَ لَهُمُ الۡاَمۡنُ وَهُمۡ مُّهۡتَدُوۡنَ۝

(সূরা আল আন'আম: ৮৩)

তা এদিকেই ইশারা রয়েছে। এখন বুঝতে হবে যে, এই তিনটি উন্নতি যা সকল তত্ত্বজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূল, বরং সকল ধর্মের সারকথা, তা সূরা ফাতিহায় সর্বোত্তমভাবে অথচ অতি সংক্ষেপে ও সুচারুরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং প্রথম উন্নতি যা নৈকট্যের ময়দানে বিচরণের জন্য প্রথম পদক্ষেপ, তার শিক্ষা اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ আয়াতে দেয়া হয়েছে। কেননা সকল প্রকার বক্রতা ও ভ্রষ্টতা থেকে বিরত হয়ে এবং সম্পূর্ণভাবে খোদামুখী হয়ে সঠিক পথ অবলম্বন করা সেই ভয়াবহ উপত্যকা অতিক্রমের নামান্তর যাকে অন্য ভাষায় **ফানা** বা বিলীনতা বলা হয়ে থাকে। কেননা যেসব বিষয়ে মানুষ আসক্ত ও অভ্যস্ত তা হঠাৎ করে ছেড়ে দেয়া আর প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা যা এক দীর্ঘকাল থেকে অভ্যাসে পরিণত হয়েছে তা হঠাৎ করে পরিত্যাগ করা, অধিকন্তু সকল মানসম্মান, আত্মশ্লাঘা ও লোকদেখানোর রীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে এবং খোদা ছাড়া অন্য সবাইকে বিলুপ্তপ্রায় মনে করে পুরোপুরি খোদামুখী হয়ে যাওয়া সত্যিকার অর্থে এমন একটি কাজ যা মৃত্যুর সমান আর এই মৃত্যুই আধ্যাত্মিক জন্মের কেন্দ্রবিন্দু। যেভাবে কোনো বীজ যতক্ষণ মাটিতে না মেশে আর নিজের আকৃতি বিসর্জন না দেয় ততক্ষণ নতুন বীজ জন্ম নেয়া অসম্ভব, একইভাবে

আধ্যাত্মিক জন্মের দেহ এই বিলুপ্তির মধ্য থেকেই জন্ম নেয়। বান্দার অবাধ্য প্রবৃত্তি যতই পরাজিত হতে থাকে এবং তার কর্মে ও ভালোবাসায় সৃষ্টিমুখী হওয়া যতই লোপ পেতে থাকে ততই আধ্যাত্মিক জন্মের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সৃষ্টি হতে থাকে। এক পর্যায়ে যখন পূর্ণ আত্মবিলুপ্তি ঘটে তখন সেই দ্বিতীয় অস্তিত্বের পোশাক পরিধান করানো হয় আর

ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ

(সূরা আল মু'মিনুন: ১৫)

এর সময় এসে যায়। আর এই পূর্ণ বিলীনতা যেহেতু সর্বশক্তিমান প্রদত্ত বিশেষ সাহায্য ও তৌফিক এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতাবানের বিশেষ দৃষ্টি ছাড়া সম্ভব নয়, তাই এই দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন যে, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ যার অর্থ হলো, হে খোদা! তুমি আমাদের সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত কর, সকল প্রকার বক্রতা ও বিপথগামিতা থেকে মুক্তি দাও। এই পরম সঠিক পথে চলা যা যাচনা করার নির্দেশ রয়েছে তা পালন করা সত্যিই একটি কঠিন কাজ। অধিকন্তু পুণ্য পথের পথিকের ওপর প্রথমবার এর আক্রমণ সিংহের আক্রমণতুল্য ভয়াল হয়ে থাকে, যার সামনে কেবল মৃত্যু চোখে পড়ে।

সুতরাং পুণ্যের পথযাত্রী যদি অবিচলতার সাথে সেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে তাহলে এরপর সে আর কোনো কঠিন মৃত্যুর সম্মুখীন হয় না। খোদা তা'লা তাকে পুনরায় প্রজ্বলিত অগ্নি দেখাবেন! (তা অসম্ভব, কেননা) তিনি এর চেয়ে অনেক বেশি দয়ালু। এককথায় এই পূর্ণ এস্তেকামত বা অবিচলতা সেই আত্মবিলুপ্তিরই নাম যার মাধ্যমে বান্দার অস্তিত্বের সূতিকাগার পুরোপুরি পরাস্ত হয় আর কামনা-বাসনা, রিপুর তাড়না, অন্যের প্রতি আকর্ষণ এবং সকল প্রকার আত্মম্ভরিতামূলক কর্মকাণ্ড পুরোপুরি পরিত্যাগ করতে হয়। আধ্যাত্মিকতা ও পুণ্যের পথচারিতার বিভিন্ন মর্যাদার মাঝে এটি এমন এক স্তর যাতে মানবীয় প্রচেষ্টার অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে আর মানবীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলেই এতে উন্নতি হয়। এ পর্যায়ে ওলীউল্লাহ্ ও পুণ্যের পথযাত্রীদের প্রচেষ্টার সমাপ্তি ঘটে আর এরপর রয়ে যায় বিশেষ স্বর্গীয় দান, যাতে মানবীয় প্রচেষ্টার কোন ভূমিকা নেই বরং স্বয়ং খোদা তা'লার পক্ষ থেকে স্বর্গীয় বিস্ময়াদির পরিভ্রমণের জন্য অদৃশ্য বাহন ও স্বর্গীয় **বোরাক** প্রদান করা হয়। আর দ্বিতীয় উন্নতি যা নৈকট্যের ময়দানে বিচরণের জন্য দ্বিতীয় পদক্ষেপ তা

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ আয়াতে শেখানো হয়েছে, অর্থাৎ আমাদেরকে সেসমস্ত মানুষের পথ দেখাও যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ। এখানে স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, যারা পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং খোদার পক্ষ থেকে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক নেয়ামত লাভ করে তারাও পরীক্ষার ঊর্ধ্বে নয়, বরং এই পরীক্ষাগারে তারা এমন সব কঠিন পরিস্থিতি ও সমস্যার মুখোমুখী হয়ে থাকেন যে, অন্য কেউ যদি এর সম্মুখীন হতো তাহলে তার ঈমানের ধারা সেখানেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। কিন্তু এ দিক থেকে তাদের নাম নেয়ামতপ্রাপ্ত রাখা হয়েছে, কেননা তারা ভালোবাসার আতিশহ্যে সেই দুঃখ-বেদনা ও কষ্টকে পুরস্কার হিসেবে দেখে। প্রকৃত বন্ধুর পক্ষ থেকে যতই দুঃখ বা আরাম লাভ করুক ভালোবাসার নেশায় তারা তা উপভোগই করে। সুতরাং নৈকট্যের ক্ষেত্রে এটি উন্নতির দ্বিতীয় স্তর যাতে সে স্বীয় প্রেমাস্পদের সকল কাজ উপভোগ করে আর তাঁর পক্ষ থেকে যা-ই লাভ হয় তার পুরোটাকেই পুরস্কার মনে হয়। এ অবস্থার আসল কারণ হলো প্রেমাস্পদের সাথে এক পরম ভালোবাসা ও উৎকৃষ্ট সম্পর্ক আর একটি বিশেষ দান যাতে দুরভিসন্ধি ও পরিকল্পনার কোন ভূমিকা নেই, বরং তা খোদার পক্ষ থেকে আসে আর যখন আসে তখন পুণ্যের পথের পথিক একটি ভিন্ন রীতি অবলম্বন করে। তখন তার মাথা থেকে সকল বোঝা নামিয়ে দেয়া হয় এবং সকল বেদনা পুরস্কারই মনে হয় আর কোনো অভিযোগ ও আপত্তির চিহ্নই অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং এই অবস্থাটি মানুষকে মৃত্যুর পর জীবিত করার মত একটি বিষয়, কেননা সেসব কাঠিন্য থেকে সে পুরোপুরি বেরিয়ে আসে যা প্রথম স্তরে ছিল এবং যা থেকে সর্বদা মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা চোখে পড়তো।

কিন্তু এ পর্যায়ে চতুর্দিক থেকে পুরস্কারের পর পুরস্কার লাভ হয়। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে তার অবস্থার নিরিখে তার নাম পুরস্কারপ্রাপ্ত রাখা হয় আর অন্যভাবে বলতে গেলে এ অবস্থার নাম **বাকা** (স্থায়িত্ব)। কেননা পুণ্যের পথযাত্রী এমতাবস্থায় নিজেকে এমনভাবে পায় যেন সে মৃত ছিল কিন্তু এখন জীবিত হয়ে উঠেছে এবং নিজের ভেতর সে এক স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রশান্তি খুঁজে পায় আর মানবসুলভ সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর হয়ে যায় এবং ঐশী তত্ত্বাবধানের জ্যোতি নেয়ামতের ন্যায় বর্ষিত হতে দেখা যায়। এ পর্যায়ে পুণ্যের পথযাত্রীদের জন্য সকল নেয়ামতের দ্বার খুলে দেয়া হয় আর ঐশী সাহায্য বা দান পূর্ণমাত্রায় দৃষ্টিগোচর হয় আর এই অবস্থার নাম হলো খোদার সত্তায় পরিভ্রমণ। কেননা এ

পর্যায়ে পুণ্যের পথের পথিকের জন্য রবুবিয়্যত বা প্রতিপালন বৈশিষ্ট্যে বিস্ময়কর দুয়ার খুলে দেয়া হয় আর যেসকল ঐশী নেয়ামত অন্যদের জন্য অপ্রকাশিত থাকে– তাকে তাতে পরিভ্রমণ করানো হয়। সে সত্য দিব্যদর্শন দেখে এবং খোদা তা'লার সাথে বাক্যালাপের সম্মান লাভ করে। দ্বিতীয় জগতের সূক্ষ্ম রহস্যাবলী সম্পর্কে তাকে অবহিত করা হয় আর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রভূত অংশ তাকে দেয়া হয়। এককথায় বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নেয়ামতের অনেক কিছু দানস্বরূপ তাকে প্রদান করা হয়। এমনকি পূর্ণ বিশ্বাসের সেই পর্যায়ে সে পৌঁছে যায় যেখানে সত্যিকার পরিকল্পনাকারী খোদাকে সে যেন নিজ চোখে দেখতে পায়। সুতরাং ঊর্ধ্বলোকের স্বর্গীয় রহস্যাবলী থেকে তাকে যে উৎকৃষ্ট পর্যায়ের সংবাদ দেয়া হয় তার নাম হলো খোদার সত্তায় পরিভ্রমণ। কিন্তু এটি সেই স্তর যাতে মানুষকে খোদাপ্রেম দান করা হয় ঠিকই কিন্তু প্রকৃতিস্বরূপ তার মাঝে তা প্রতিষ্ঠিত করা হয় না, অর্থাৎ সেটি তার প্রকৃতিতে প্রবেশ করে না, বরং তাতে অন্তর্নিহিত (ছাপ) থাকে।

আর তৃতীয় উন্নতি যা (খোদার) নৈকট্যের জগতে বিচরণের জন্য চূড়ান্ত পদক্ষেপ তা غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ আয়াতে শেখানো হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে, এটি সেই মর্যাদা যাতে মানুষের হৃদয়ে খোদার ভালোবাসা ও তাঁর বিপরীতে অন্যের প্রতি শত্রুতা প্রবেশ করে এবং প্রকৃতির অংশ হিসেবে মানুষের মাঝে তা স্থায়ী হয়ে যায়। আর এ পর্যায়ের মানুষ ঐশী গুণাবলীর প্রতি এতটা স্বভাবগত ভালোবাসা রাখে যেভাবে সেই বৈশিষ্ট্যাবলী খোদার দরবারে প্রিয় হয়ে থাকে। এছাড়া খোদার সত্তার জন্য ভালোবাসা তার হৃদয়তন্ত্রিতে এমনভাবে মিশে যায় যে, তার হৃদয় থেকে খোদাপ্রেম হারিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে যায়। তার হৃদয় ও প্রাণকে বড় বড় পরীক্ষা এবং ভয়াবহ দুঃখ-বেদনার যাঁতাকলে পিষে যদি নির্যাস বের করা হয় (তাহলে) খোদার ভালোবাসা ছাড়া তার অন্তরাত্মা থেকে আর কিছুই নির্গত হয় না। তাঁরই প্রেমের বেদনাকে সে উপভোগ করে আর তাঁকেই সত্যিকার অর্থে ও বাস্তবে নিজের একান্ত আন্তরিক বন্ধু মনে করে। এটি সেই মর্যাদা যেখানে (খোদার) নৈকট্য-সংক্রান্ত সকল উন্নতি থেমে যায় এবং মানুষ সেই পরম উন্নতির মার্গে পৌঁছে যায় যা মানব-প্রকৃতির জন্য নির্ধারিত।

এ হলো দৃষ্টিনন্দন পাঁচটি সূক্ষ্ম কথা বা বিষয় যা আমরা অগণিত দৃষ্টান্ত থেকে নমুনাস্বরূপ লিপিবদ্ধ করলাম। কিন্তু অর্থগত বিস্ময়াবলী এবং অন্যান্য সত্য

তথ্য ও তত্ত্ব এতে এত বেশি রয়েছে যে, এর দশভাগের একভাগও যদি লিপিবদ্ধ করা হয় তাহলে এর জন্য অনেক বড় একটি গ্রন্থের প্রয়োজন পড়বে। এই আশিসময় সূরার যে আধ্যাত্মিক বিশেষত্ব রয়েছে তা-ও এত মহান ও আশ্চর্যজনক যা এক সত্যসন্ধানী দেখলে একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, নিঃসন্দেহে তা সর্বশক্তিমান খোদার বাণী। সূরা ফাতিহার সেই মহান বৈশিষ্ট্যাবলীর একটি আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য হলো আন্তরিকভাবে বিগলিতচিত্তে নামাযে এটি পাঠ করা আর এর শিক্ষাকে সত্য মেনে বাস্তবে নিজ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত ও গ্রোথিত করা। হৃদয়কে আলোকিত করার ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ এর মাধ্যমে হৃদয় স্বস্তি পায় এবং মানব প্রকৃতির অমানিশা দূরীভূত হয়, কল্যাণের উৎসের কল্যাণরাজি মানুষের ওপর অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়ে যায় আর গ্রহণযোগ্যতার ঐশী জ্যোতি তাকে পরিবেষ্টন করে। এক পর্যায়ে উন্নতি করতে করতে সে খোদার সাথে বাক্যালাপের সম্মান লাভ করে।

একইসাথে সত্য দিব্যদর্শন ও স্পষ্ট এলহামের মাধ্যমে পুরোপুরি লাভবান হয় এবং খোদা তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়। অদৃশ্য বিষয়ে এলকা লাভ করা, সন্দেহাতীত বাণী প্রাপ্ত হওয়া, দোয়ার গ্রহণীয়তা এবং অদৃশ্য বিষয়াদি প্রকাশ পাওয়া এবং মহাসম্মানিত অভাবমোচনকারীর সাহায্য ও সমর্থনের সেসব বিস্ময়কর বিষয় তার হাতে প্রকাশ পায় যার দৃষ্টান্ত অন্যদের মাঝে দেখা যায় না। বিরোধীরা যদি একথা অস্বীকার করে যার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। আশঙ্কায় এর প্রমাণ এ গ্রন্থে দেয়া হয়েছে। এই অধম সকল সত্যসন্ধানীকে আশ্বস্ত করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে; কেবল বিরোধীদেরই নয় বরং নামেমাত্র ও প্রথাগতভাবে যারা একমত, বাহ্যত যারা মুসলমান, কিন্তু কার্যত উদাসীন ও প্রাণহীন। এই তমসাচ্ছন্ন যুগে ঐশী নিদর্শনাবলীতে তাদের বিশ্বাস হারিয়ে গেছে এবং মহাসম্মানিত খোদার এলহাম করাকে তারা অসম্ভব বিষয় মনে করে এবং সন্দেহ ও কুসংস্কারের ফসল আখ্যা দেয় তারা মানুষের উন্নতির পরিধিকে অতি সংকীর্ণ ও অপ্রশস্ত বানিয়ে রেখেছে যা কেবল যুক্তি ও বুদ্ধিগত ধারণা এবং আনুমানিক ও অসার কথাবার্তার গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ আর অপরদিকে খোদা তা'লাকে নিতান্ত দুর্বল ও অক্ষম জ্ঞান করছে। সুতরাং এই অধম এমন সব লোকের কাছে পুরো সৌজন্য বজায় রেখে নিবেদন করছে যে, এখনো যদি তারা কুরআনের প্রভাব বা কার্যকারিতা অস্বীকার করে আর নিজেদের পুরোনো

অজ্ঞতায় অনড় থাকে তাহলে এখনই সুবর্ণ সুযোগ। এই অধম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সকলকে পুরোপুরি আশ্বস্ত করতে পারে। তাই আবশ্যক হবে সত্যান্বেষী হিসেবে এ অধমের কাছে আসা আর ঐশী বাণীর যেসব বৈশিষ্ট্যের কথা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে তা স্বচক্ষে দেখে নেয়া এবং অমানিশার ঘোর থেকে বেরিয়ে সত্যিকার আলোতে প্রবেশ করা। এখনো এই অধম জীবিত আছে, কিন্তু মাটির মানুষের কিবা ভরসা আর নশ্বর জীবনের বিশ্বাসই বা কী? সুতরাং এই সাধারণ বা গণ-ঘোষণা শুনতেই সত্যের সত্যতা ও মিথ্যার মিথ্যা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার দিকে মনোযোগ দেয়া সমীচীন যেন এই অধমের দাবি যদি প্রমাণিত না হয় তাহলে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানের জন্য একটি দৃঢ় যুক্তি হস্তগত হয়। কিন্তু এই অধমের কথার সত্যতা যদি যথাযথভাবে প্রমাণ হয়ে যায় তাহলে খোদাকে ভয় করে তাদের নিজেদের মিথ্যা ধ্যানধারণা থেকে বিরত হওয়া উচিত এবং ইসলামের সত্য রীতির ওপর পদচারণা করা উচিত যেন এই পৃথিবীতে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং পরকালে শাস্তি ও অশুভ পরিণতি থেকে নিস্তার পায়।

সুতরাং হে ভাইয়েরা, হে প্রিয়গণ, হে দার্শনিক, পণ্ডিত, পাদরি, আর্য ও ব্রাহ্মধর্মের অনুসারীগণ; দেখ! আমি এখন পরিষ্কার করে ও প্রকাশ্যে বলছি যে, যদি কারো সন্দেহ থাকে এবং উল্লিখিত বিশেষত্ব গ্রহণে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকে তাহলে সে যেন অনতিবিলম্বে এ অধমের সাথে যোগাযোগ করে আর ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে কিছুকাল সাহচর্যে থেকে উল্লিখিত বিবৃতির যথার্থতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে। পাছে এই অধমের তিরোধানের পর কোনো ন্যায়নীতি-বিবর্জিত ব্যক্তি বলবে যে, এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য আমাকে আবার কখন পরিষ্কার করে বলা হলো? আমি যে দাবির প্রমাণ চাইব, তার জন্য নিজের দায়িত্ববোধের সাথে কে কোন্ সময় দাবি করেছে? সুতরাং হে ভাইয়েরা! হে সত্যসন্ধানীগণ! এদিকে তাকাও, এই অধম পরিষ্কার করে বলছে আর নিজ খোদার ওপর ভরসা করে বলছে যার জ্যোতি দিবারাত্র প্রত্যক্ষ করে চলেছে আর একথার দায়িত্ব নিচ্ছে যে, যদি তোমরা নিষ্ঠা ও স্বচ্ছতার সাথে সত্যসন্ধানী ও সত্যের অভিলাষী হও তাহলে ধৈর্য ও আন্তরিকতার সাথে কিছুকাল এই অধমের সাহচর্যে জীবনযাপন কর তাহলে এই কথা তোমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, সত্যিকার অর্থে এখানে যে আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে তা সূরা ফাতিহা ও কুরআন শরীফে বিদ্যমান। সুতরাং

কতইনা আশিসমণ্ডিত সেই ব্যক্তি যে নিজের হৃদয়কে বিদ্বেষ ও শত্রুতামুক্ত করে এবং ইসলাম গ্রহণে প্রস্তুত হয়ে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিষ্ঠা ও ভালোবাসার সাথে মনোযোগ দেয়। পক্ষান্তরে কতইনা দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি যে এত স্পষ্ট কথা শোনার পরও চোখ তুলে তাকায় না আর এভাবে সে জেনেশুনে খোদার অভিশাপের শিকার হয়। মৃত্যু সন্নিকট আর **বাযিয়ে আজল বা আযরাঈল** মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। যদি অচিরেই খোদাকে ভয় করে এই অধমের কথার প্রতি কর্ণপাত না কর আর স্বীয় প্রবোধ ও প্রশান্তির জন্য নিষ্ঠা ও ভালোবাসার সাথে পদক্ষেপ না নাও তাহলে আমার আশঙ্কা হয় যে, কোথাও তোমাদের পরিণামও আর্যদের নেতা পণ্ডিত দিয়ানন্দের মতো না হয়ে যায়। কেননা এই অধম তাকে তার মৃত্যুর দীর্ঘকাল পূর্বে সঠিক পথের দিকে আহ্বান করে আর পরকালের লাঞ্ছনার কথা স্মরণ করিয়ে এবং দ্ব্যর্থহীন প্রমাণাদির মাধ্যমে তার ধর্ম ও বিশ্বাস সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত হওয়া তার সামনে প্রকাশ করেছে।

অধিকন্তু অতি উন্নত ও উৎকৃষ্ট এবং সন্দেহাতীত প্রমাণাদির মাধ্যমে সম্পূর্ণ শালীনতা বজায় রেখে তার সামনে স্পষ্ট করেছে যে, নাস্তিকদের পর সারা বিশ্বে আর্য ধর্মমতের চেয়ে ঘৃণ্য আর কোনো ধর্ম নেই। কেননা এরা খোদা তা'লার চরম অবমাননা করে এবং তাঁকে স্রষ্টা ও বিশ্ব-প্রতিপালক মনে করে না বরং সারা বিশ্বকে, এমনকি পৃথিবীর প্রতিটি অণু-পরমাণুকে তাঁর সমান বা অংশীদার মনে করে। যদি তাদের বল যে, তোমাদের পরমেশ্বর কোনো আত্মা সৃষ্টি করতে পারেন কি? বা দেহের কোনো অণু সৃষ্টি করতে পারেন কি? অথবা অনুরূপ কোনো আকাশ ও জমিন সৃষ্টি করতে পারেন কি? বা নিজের কোনো প্রকৃত প্রেমিককে স্থায়ী মুক্তি দিতে পারেন কি এবং বার বার কুকুর বিড়ালে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারেন কি? বা নিজের কোন আন্তরিক প্রেমিকের তওবা গ্রহণ করতে পারেন কি? এসব প্রশ্নের উত্তর হলো, 'মোটেই নয়'। তার এই শক্তিই নেই যে, নিজের পক্ষ থেকে কিছু সৃষ্টি করবেন। অধিকন্তু তার ভিতর এই রহীমিয়্যতও নেই যে, কোনো অবতার, মুনি-ঋষি বা এমন কোনো ব্যক্তি যার প্রতি বেদ অবতীর্ণ হয়েছে তাকে স্থায়ীভাবে মুক্তি দিতে পারে আর এর মর্যাদা সামনে রেখে মুক্তির নিবাস থেকে তাকে বাইরে বের করবেন না এবং স্বীয় সেই প্রেমিককে যার হৃদয়ে পরমেশ্বরের প্রেম ও ভালোবাসা ঘর বেঁধেছে, বার বার কুকুর বিড়ালে রূপান্তরিত হওয়া থেকে রক্ষা করবেন!

পরিতাপ! পণ্ডিত সাহেব এই চরম ঘৃণ্য বিশ্বাস পরিত্যাগ করে নি আর স্বীয় সকল পুণ্যাত্মা ও অবতার প্রমুখদের অসম্মান করা বৈধ জ্ঞান করছেন কিন্তু এই নোংরা বিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নি আর আমৃত্যু তার এই বিশ্বাসই ছিল যে, অবতার যে পর্যায়েরই হোন না কেন, রামচন্দ্র হোন বা কৃষ্ণ বা স্বয়ং তিনি হোন, যার প্রতি বেদ অবতীর্ণ হয়েছে; পরমেশ্বর তার প্রতি স্থায়ী কৃপা বর্ষণ করা পছন্দই করেন না, বরং অবতার বানিয়েও তাদের কীটপতঙ্গ বানাতে থাকবেন। তিনি এমন পাষাণহৃদয় যে, প্রেম ও ভালোবাসার প্রতি আদৌ ভ্রুক্ষেপ করেন না আর এমন দুর্বল যে, তার মাঝে নিজ ক্ষমতাবলে কিছু বানানোর কোন শক্তিই নেই। এটি কেবল পণ্ডিত সাহেবের আত্মপ্রসাদ বৈ কিছু নয়, যাকে জোরালো প্রমাণাদির মাধ্যমে খণ্ডন করে পণ্ডিত সাহেবের সামনে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, খোদা তা'লা আদৌ অসম্পূর্ণ ও দুর্বল নন, বরং সকল কল্যাণরাজির উৎস, সকল সৌন্দর্যের আধার এবং সকল অনুপম গুণের সমাহার আর আপন সত্তা, গুণাবলী ও উপাস্য হওয়ার বৈশিষ্ট্যে এক-অদ্বিতীয়। এরপর তাঁকে দুবার রেজিস্ট্রি পত্রযোগে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে স্পষ্ট যুক্তিপ্রমাণের মাধ্যমে অবহিত করা হয়।

দ্বিতীয় পত্রে এটিও লেখা হয়েছে যে, ইসলাম সেই ধর্ম যা সব সময় স্বীয় সত্যতার দুধরণের প্রমাণ নিজের মাঝে ধারণ করে। এর প্রথমটি হলো যৌক্তিক প্রমাণ, যার মাধ্যমে ইসলামের সত্য নীতি সীসাগলিত প্রাচীরের মতো মজবুত ও দৃঢ় প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয়টি স্বর্গীয় নিদর্শন ও ঐশী সমর্থন এবং অদৃশ্য থেকে লব্ধ দিব্যদর্শন, রহমান খোদার পক্ষ থেকে এলহামপ্রাপ্তি ও কথোপকথন এবং অন্যান্য অলৌকিক বিষয়াদি যা ইসলামের কামেল অনুসারীদের পক্ষ থেকে প্রকাশ পায় আর যার কল্যাণে এই পৃথিবীতেই সত্যিকার বিশ্বাসীর মুক্তি লাভ হয়। এই উভয় প্রকার প্রমাণ ইসলাম বিরোধীদের মাঝে দেখা যায় না আর এর সামনে কথা বলার সামর্থ্যও তাদের নেই, কিন্তু ইসলামে এর অস্তিত্ব স্বীকৃত। সুতরাং এই উভয় প্রকার প্রমাণের মধ্য থেকে কোনো একটিতে যদি সন্দেহ থাকে তাহলে এখানে কাদিয়ানে এসে তাদের নিশ্চিত হওয়া উচিত। পণ্ডিত সাহেবকে একথাও লেখা হয়েছে যে, আপনার আসা-যাওয়ার যৎসামান্য ব্যয়ভার ও পানাহারের আবশ্যকীয় ব্যয়ভারের দায়িত্ব আমাদের ওপর থাকবে। উক্ত পত্রটি কয়েকজন আর্যকেও দেখানো হয়েছে। এই উভয় রেজিস্ট্রিপত্র তিনি যে বুঝে পেয়েছেন সেই দস্তখতও এসে গেছে, কিন্তু জগৎপ্রেম ও জাগতিক

নাম-সম্মানের লোভে তিনি এদিকে আদৌ মনোযোগ দেন নি। পরিতাপ! যে বস্তুজগতকে তিনি ভালোবেসেছেন এবং যার সাথে যোগাযোগ দৃঢ় করেছেন অবশেষে শত আক্ষেপের সাথে একে ছেড়ে এবং সকল সহায় সম্পত্তি পরিত্যাগে বাধ্য হয়ে ক্ষণস্থায়ী এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন আর বহু ঔদাসীন্য, অন্ধকার, ভ্রষ্টতা ও কুফরের পাহাড় নিজের মাথায় বয়ে নিয়ে গেছেন। তার পরকালের যাত্রার সংবাদও খোদা তা'লা এই অধমকে প্রায় তিন মাস পূর্বেই প্রদান করেছেন যা ১৮৮৩ সনের ৩০ অক্টোবর এসেছিল। অবশ্য এই সফর সবারই করতে হবে, কেউ আগে যাবে আর কেউ পরে, এই মুসাফিরখানা অবশ্যই ছেড়ে যেতে হবে। কিন্তু এই আক্ষেপ অনেক বড় যে, এই অধমকে তার যুগে সৃষ্টি করে পণ্ডিত সাহেবকে খোদা তা'লা হেদায়েতের সুযোগ প্রদান করেছিলেন। কিন্তু সকল লক্ষণ (স্পষ্ট হওয়া) সত্ত্বেও তিনি হেদায়েত-বঞ্চিত অবস্থায় চলে গেলেন। তাকে আলোর দিকে ডাকা হয়েছে কিন্তু তিনি হতভাগা পৃথিবীর মোহে সেই আলো গ্রহণ করেন নি, আপাদমস্তক অন্ধকারেই নিমজ্জিত থেকে গেলেন। খোদার এক বান্দা কল্যাণের জন্য তাকে বারংবার নিজের দিকে আহ্বান করলেন, কিন্তু তিনি সেদিকে আসার জন্য একটি পদক্ষেপও নেন নি আর এভাবে অনর্থক বিদ্বেষ ও অহংকারে নিজের জীবন নষ্ট করে বুদবুদের ন্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন, অথচ এই অধমের ১০,০০০ রুপি পুরস্কার ঘোষণার প্রথম লক্ষ্যস্থল ছিলেন তিনিই। এ কারণে একবার 'ব্রাদারে হিন্দ' পত্রিকায়ও তার জন্য ঘোষণা প্রকাশ করা হয়েছিল, কিন্তু তার পক্ষ থেকে কখনো কোনো কথা শোনা যায় নি, এমনকি অবশেষে মাটি বা ছাইয়ের সাথে একাকার হয়ে গেলেন!

সুতরাং হে ভাইয়েরা! এই পণ্ডিত সাহেবের অবস্থা দেখে শিক্ষা গ্রহণ কর আর নিজ প্রাণের প্রতি অবিচার করো না। মুক্তির সন্ধানে থাক, যেন এ পৃথিবীতেই এর কল্যাণরাজি লাভ করতে পার। সত্যিকার ও প্রকৃত মুক্তি তা-ই যার কল্যাণরাজি এ পৃথিবীতে প্রকাশ পায় আর সর্বশক্তিমানের পবিত্র বাণী তা-ই যা এখানেই সত্যসন্ধানীদের জন্য স্বর্গের পথ উন্মোচন করে। সুতরাং নিজেকে প্রতারিত করো না আর যে ধর্মের সত্যতা এ পৃথিবীতেই প্রতীয়মান হচ্ছে সেই পবিত্র ধর্মকে অবজ্ঞা করে নিজ হৃদয়ে অমানিশার কালিমা লেপন করো না। অবশ্য যদি মোকাবিলার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্যতা থাকে তাহলে এই সূরা ফাতিহায় অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠত্বের সমতুল্য অন্য কোনো ধর্মীয় শিক্ষা বা বাণী

উপস্থাপন কর। এই অধম সূরা ফাতিহার আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা কিছু লিখেছে তা কোন শোনা কথা নয় বরং এই অধম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছে যে, সত্যিকার অর্থে সূরা ফাতিহা ঐশী জ্যোতির বিকাশস্থল। এ সূরা পাঠের সময় এত ব্যাপক সংখ্যক বিস্ময়কর বিষয় সামনে এসেছে যার কল্যাণে খোদার পবিত্র বাণীর গুরুত্ব ও মর্যাদা বুঝা যায়। এই কল্যাণময় সূরার কল্যাণে আর এর যথাযথ তিলাওয়াতের ফলে এত বেশি অদৃশ্য বিষয়াদি প্রকাশ পেয়েছে যে, শত শত অদৃশ্য ঘটনা ঘটবার পূর্বেই পরিষ্কার হয়ে সামনে ধরা দেয়। অধিকন্তু সকল সমস্যায় এটি পাঠে বিস্ময়করভাবে পর্দা উন্মোচন করা হয়। প্রায় তিন হাজারের মতো সত্য দিব্যদর্শন ও সত্য স্বপ্নের কথা মনে আছে যা অদ্যাবধি এ অধমের পক্ষ থেকে প্রকাশ পেয়েছে আর প্রভাতের প্রথম আলো প্রকাশ পাওয়ার মতো পরিষ্কারভাবে পূর্ণতাও লাভ করেছে। আর দুশরও অধিক স্থানে দোয়া গৃহীত হওয়ার স্পষ্ট লক্ষণাবলী এমন স্পর্শকাতর মুহূর্তে দেখা গেছে যাতে বাহ্যত সমস্যা থেকে মুক্তি লাভের অন্য কোন উপায় দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না।

অনুরূপভাবে এই সূরা নিয়মিত পাঠের ফলে কবরসংক্রান্ত বিষয়াদি এবং অন্যান্য বহু বিস্ময়কর বিষয়াদি এমনভাবে প্রকাশিত হয় যে, কোন পাদরি বা পণ্ডিতের হৃদয়ে যদি এর সামান্যতম প্রতিফলন ঘটতো তাহলে সে তখনই জগতের মোহ ছিন্ন করে ইসলাম গ্রহণের জন্য মৃত্যুবরণে প্রস্তুত হয়ে যেত। অনুরূপভাবে সত্য এলহামের মাধ্যমে এই অধমের ওপর ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত যেসব বিষয় প্রকাশিত হয়ে আসছে, তার মধ্যে কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণী বিরোধীদের সামনে পূর্ণ হয়েছে আর পূর্ণ হওয়া অব্যাহত রয়েছে, সংখ্যায় তা এত বেশি যে, এ অধমের মতে দুটো ইঞ্জিলের কলেবর থেকে তা কম হবে না। আর এই অধম হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর অনুসরণের মাধ্যমে খোদার সাথে বাক্যালাপের এত পুরস্কার লাভ করে– যার কিছু নমুনা টীকা পাদটীকা ৩-এ আরবী এলহাম ইত্যাদিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। খোদা তা'লা মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যের কল্যাণে আর স্বীয় পবিত্র বাণীর অনুসরণের ফলাফলস্বরূপ এই অধমকে তাঁর সাথে কথোপকথনের ক্ষেত্রে বিশেষত্ব দান করেছেন আর আধ্যাত্মিক বা স্বর্গীয় জ্ঞানে ভূষিত করেছেন এবং অনেক গুপ্ত বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তিনি এই অধমের হৃদয়কে বহু সত্য ও তত্ত্বজ্ঞানে ভরে দিয়েছেন আর বারংবার বলেছেন যে, এসব দান ও পুরস্কার

এবং এসব কৃপা, অনুগ্রহ, স্নেহ ও ভালোবাসাপূর্ণ দৃষ্টি এবং সকল পুরস্কার ও সমর্থন আর এসব কথোপকথন ও বাক্যালাপ- সবই হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর অনুসরণ ও তাঁর প্রতি ভালোবাসার কারণেই লাভ হয়েছে।

جمالِ ہم نشیں در من اثر کرد　وگرنہ من ہماں خاکم کہ ہستم

আমার সাথির সৌন্দর্য আমার মাঝে প্রভাব ফেলেছে,
নতুবা আমি সেই মাটিই, যা আমি সবসময় ছিলাম।

এখন ইঞ্জিলের সেসব বক্তা ও পথহারা পাদরিরা কোথায় যারা চরম পর্যায়ের হঠকারিতা দেখিয়ে নিছক হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা ও শয়তানী পন্থা অনুসরণ করে পশুতুল্য সাধারণ মানুষকে এ কথা বলে বিভ্রান্ত করতো যে, মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে কোন ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ পায় নি। সুতরাং সত্যনিষ্ঠ ন্যায়-পরায়ণ মানুষ নিজেরাই এখন বিচার করতে পারেন যে, হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর তুচ্ছ সেবক ও সামান্য চাকরদের পক্ষ থেকে যেখানে সহস্র সহস্র ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ পায় এবং বিস্ময়কর ও অলৌকিক ঘটনাবলী সামনে আসে, সেখানে কোন অন্ধ ব্যক্তি যদি মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অস্বীকার করে তবে তা হবে বড় নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার শামিল। মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে পাদরিদের দুশ্চিন্তার কারণ হলো, তওরাতের দ্বিতীয় বিবরণের ১৮ অধ্যায়ের ২১-২২ পদে সত্য নবীর এই নিদর্শন লেখা রয়েছে যে, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবে। পাদরিরা যখন দেখল যে, মহানবী (সা.) যেখানে ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই সহস্র সহস্র বিষয়ের সংবাদ আগাম প্রদান করলেন আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কুরআন শরীফও ভবিষ্যদ্বাণীতে পরিপূর্ণ অধিকন্তু সকল ভবিষ্যদ্বাণী যথাসময়ে পূর্ণতাও লাভ করেছে, তখন তাদের অন্তরে এই উদ্বেগ ঘনীভূত হয় যে, এসব ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি দৃষ্টিপাতে মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যত স্পষ্টভাবে সত্য প্রমাণিত হয়, অন্যথায় এটি বলতে হয় যে, তওরাতের দ্বিতীয় বিবরণের ১৮ অধ্যায়ের ২১-২২ পদে সত্য নবীর যেসমস্ত লক্ষণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, সেগুলো সঠিক নয়। সুতরাং এই সমস্যায় পড়ার কারণে চরম হঠকারিতার আশ্রয় নিয়ে তাদের এটি বলতে হয়েছে যে, সেসব ভবিষ্যদ্বাণী সত্যিকার অর্থে দূরদৃষ্টি বইকি, যা দৈবক্রমে পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু যে বৃক্ষের শিকড় মজবুত আর শক্তি অটুট, তা সকল যুগে ফল বহন করে। অতএব সেই দৃষ্টিকোণ থেকে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ও অন্যান্য

অলৌকিক বিষয়াদি কেবল সেই যুগ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং এখনো এর চলমান ধারা অব্যাহত রয়েছে। যদি পাদরিদের সন্দেহ থাকে তাহলে তাদের জন্য আবশ্যক হবে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা, এরপর দেখুক যে, এখন পর্যন্ত কী মহিমায় মহানবী (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হচ্ছে। অতএব এ যুগের বিদ্বেষী পাদ্রিরা আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিতে চাইলে নিতে পারে, কিন্তু সত্যসন্ধানী হয়ে পরম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে তারা এই নিদর্শনের সন্ধানী হবে– তাদের কাছে এমন আশা করা দূরাশা মাত্র। যাহোক, মানুষের সামনে একথা স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক যে, মহানবী (সা.)-এর কল্যাণরাজি যেখানে এখনো সূর্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল, অপরদিকে অন্য কোন নবীর কল্যাণরাজির চিহ্নমাত্র দেখা যায় না- এমন পরিস্থিতিতে শহর, গ্রাম বা বাজারে এমন কোন বিদ্বেষী ও জগৎপূজারি পাদরিকতৃক এই সত্য বিষয় সম্পর্কে যদি কাউকে বিভ্রান্ত করতে দেখা যায়, তাহলে তার সামনে এই কিতাব খুলে দেখানোর এটিই উপযুক্ত সময়। কেননা এই গ্রন্থে ১০ হাজার রুপি বিজ্ঞাপন দিয়ে লেখা হয়েছে যে, এর প্রতিদ্বন্দ্বী ১০ হাজার রুপি পুরষ্কার পেতে পারে। সুতরাং পণ্ডিত হোক বা পাদ্রি, আর্য হোক বা ব্রাহ্ম, যারাই মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যতকে অস্বীকার করে, তারা কেবল সত্যের অপলাপ ও বৃথা চেষ্টাই করে চলেছে। অপরদিকে যেসব কথা মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যত ও রিসালতের পক্ষে সরব সাক্ষী, সেগুলোর উত্তর প্রদানের কথা বিন্দুমাত্র বিবেচনা না করা সম্পূর্ণ লজ্জাবোধ বিবর্জিত একটি কাজ। এই অধম অযথা তাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করে না। কিন্তু প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যদি তারা ব্যর্থ হয়, আর সেসব স্বর্গীয় নিদর্শন ও যৌক্তিক প্রমাণ যা ইসলামের সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে, তার দৃষ্টান্ত নিজেদের ধর্ম থেকে উপস্থাপন করতে না পারে তাহলে আবশ্যক হবে মিথ্যা পরিহার করে সত্য ধর্ম গ্রহণ করা।

এখন আমরা পুনরায় আমাদের মূল কথায় ফিরে এসে লিপিবদ্ধ করছি যে, এখন পর্যন্ত আমি সূরা ফাতিহার যত সূক্ষ্ম সৌন্দর্য আর তত্ত্ব ও বিশেষত্ব উল্লেখ করেছি তা স্পষ্টতই অনন্য ও অতুলনীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে ব্যক্তি কিছুটা ন্যায়পরায়ণতার সাথে প্রধানত সূরা ফাতেহায় সমবেত সত্যের সেসব মহান মান সম্পর্কে প্রণিধান করবে আর সেসব সূক্ষ্ম সৌন্দর্য ও নিগূঢ় তত্ত্বে দৃষ্টিপাত করবে যার সমন্বয় ও সমাহার হলো উল্লিখিত সূরা, এছাড়া আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গী ও ভাষার সংক্ষিপ্ততা লক্ষ্য করবে যে, কত ব্যাপক বিষয়াদি সংক্ষিপ্ত

কিছু শব্দ সমষ্টির মাঝে আবদ্ধ করা হয়েছে; এরপর বাক্যগুলোকে দেখবে যে, কত মহান ঔজ্জ্বল্য নিজ সত্তায় ধারণ করে রেখেছে আর কতটা সাবলীলতা, স্বচ্ছতা ও মসৃণতা এতে বিরাজমান– যেন অতি পরিষ্কার ও স্বচ্ছ পানির একটি ধারা ক্রমাগতভাবে বয়ে চলেছে। একইভাবে এর আধ্যাত্মিক প্রভাবের কথা যদি চিন্তা করে যে, তা মানব প্রকৃতির অমানিশা থেকে অলৌকিকভাবে হৃদয়কে মুক্ত করে মহাসম্মানিত খোদার জ্যোতির অবতরণস্থলে পরিণত করে, যা আমরা এ গ্রন্থের* সর্বত্র প্রমাণ করা অব্যাহত রেখেছি, তাহলে তার সামনে কুরআন শরীফের মহান মর্যাদা এত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেতে পারে যার অধিক চিন্তাই করা যায় না এবং মানবীয় শক্তি কোনভাবেই এর সামনে দাঁড়াতে পারে না। এসব শ্রেষ্ঠত্ব প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও যদি কোন অন্তর্দৃষ্টিহীন মানুষের সামনে এই পবিত্র ধর্মীয় বাণীর অনন্যতা সন্দেহের আবরণে আচ্ছন্ন থেকে যায়, তবে তার চিকিৎসা কুরআন নিজেই যেভাবে করেছে এবং যে উৎকর্ষতার সাথে অস্বীকারকারীদের সামনে স্বীয় সত্যতার পূর্ণ প্রমাণ তুলে ধরেছে তা হলো–

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۪ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚۖ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ○

(সূরা আল বাকারা: ২৪-২৫)

অর্থাৎ যদি এই বাণী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে তোমার সন্দেহ থাকে, তাহলে এর কোন সূরার ন্যায় কোন বাণী বা সূরা বানিয়ে দেখাও; যদি তোমরা বানাতে না পার, আর স্মরণ রেখো তোমরা কখনো পারবে না, তাই সেই অগ্নিকে ভয় কর যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, যার ইন্ধন হবে কাফের মানুষ ও তাদের প্রতিমা, যারা স্বীয় পাপ ও দুষ্কৃতির মাধ্যমে জাহান্নামের অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করছে। এটি চূড়ান্ত কথা, যা খোদা তা'লা কুরআনের নিদর্শনের অস্বীকারকারীকে অভিযুক্ত করার জন্য নিজেই বলেছেন। এখন যদি কেউ দোষী ও নির্বাক হয়েও কুরআন শরীফের অনন্য বাগ্মিতাকে অস্বীকার করে আর অপলাপ ও অর্থহীন কথা বলা থেকে বিরত না

*** টীকা:** পাদটীকা নম্বর চার (৪) এই পুস্তকের ৪০৪ পৃষ্ঠায় দেয়া আছে। অনুগ্রহপূর্বক সেখান থেকে পড়ে নিন। –অনুবাদক

হয় তাহলে এমন নির্লজ্জ ও বিকৃত প্রকৃতির মানুষের চিকিৎসা এ পৃথিবীতে হতে পারে না, তার চিকিৎসা তা-ই যা প্রদানে খোদা তা'লা স্বীয় চূড়ান্ত বাণীতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন। কিছুসংখ্যক দুষ্কৃতকারী ও বিদ্বেষপরায়ণ মানুষ, যারা হঠকারিতা ও অবাধ্য প্রবৃত্তির দাসত্বে অনড় এবং বিদ্বেষের প্রবল ধূলিঝড় যাদেরকে পুরোপুরি অন্ধ করে রেখেছে, তারা একথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে যে, কুরআনের যত সূক্ষ্ম সৌন্দর্য ও নিগুঢ় তত্ত্বের কথা মুসলমানরা বলে থাকে এবং যত বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যের কথা তাদের গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ পেয়েছি তার সব তাদের নিজেদেরই চিন্তাভাবনার ফসল এবং তাদের মস্তিষ্কের আবিষ্কার; বাস্তবে কুরআন সূক্ষ্ম সৌন্দর্য, রহস্য ও গূঢ়তত্ত্ব এবং বিস্ময়কর বিশেষত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে রিক্তহস্ত। কিন্তু এরূপ মানুষ কেবল স্বভাবগত নোংরামি ও দুর্ভাগা হওয়ার স্বাক্ষর রাখা ছাড়া কুরআনের জ্যোতির ওপর কখনো পর্দা লেপন করতে পারবে না। এদের উত্তরে একথা বলাই যথেষ্ট হবে যে, আসলেই যদি কুরআনে কিছু না থাকে আর মুসলমানরা স্বয়ং নিজেদের বিচক্ষণতার বলেই যদি কুরআনে বিভিন্ন প্রকার সূক্ষ্ম-সুন্দর ও গূঢ় কথা এবং বিশেষত্ব আবিষ্কার করে থাকে, তাহলে তোমরাও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তোমাদের নিজেদের কোন এলহামী গ্রন্থ বা অন্য কোনো গ্রন্থ থেকে সেই পরিমাণ সূক্ষ্ম-সুন্দর বিষয় ও নিগুঢ় তত্ত্ব এবং বিশেষত্ব বের করে দেখাও। পুরো কুরআনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় না হলেও নমুনাস্বরূপ কেবল সূরা ফাতিহার বিপরীতে অন্য কোন গ্রন্থ থেকে এর মত কিছু বের করে দেখাও, যার শ্রেষ্ঠত্ব এই টীকায় বর্ণনা করা হয়েছে।

পরিতাপ! এমনসব জন্মান্ধ কোথা থেকে এলো, এত আলো দেখেও যাদের অন্ধকার দূরীভূত হয় নি? এদের অভ্যন্তরীণ ব্যাধির পুঁজ, ... ইত্যাদি এত বেশি ঘৃণ্য ও দুর্গন্ধযুক্ত যে, তা তাদের সকল বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়কে অকেজো করে রেখেছে। এরা আদৌ চিন্তা করে না যে, কুরআন শরীফ সেই গ্রন্থ যা স্বীয় মাহাত্ম্য, প্রজ্ঞা, সত্যতা, বাগ্মিতা, স্বীয় সুন্দর-সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় তত্ত্ব এবং স্বীয় আধ্যাত্মিক জ্যোতির দাবি নিজেই করেছে এবং অনন্য ও অতুলনীয় হওয়ার কথা নিজেই প্রকাশ করেছে। মুসলমানরা নিছক ধারণার বশবর্তী হয়ে এর সৌন্দর্যের গান গায়– এ কথা মোটেই সঠিক নয় বরং তা নিজেই স্বীয় সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণনা করে সকল সৃষ্টির মাঝে নিজের অনন্য ও অতুলনীয় হওয়ার কথা উপস্থাপন করছে এবং ডঙ্কা বাজিয়ে ঘোষণা করছে,

‘কোনো প্রতিদ্বন্দ্বি আছে কি?’ এর সূক্ষ্মতা ও সত্য তত্ত্ব কেবলমাত্র দু’তিনটি নয় যাতে কোন নির্বোধ সন্দেহ করতে পারে, বরং এর নিগূঢ়তা তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় ফুঁসে উঠছে এবং আকাশের নক্ষত্ররাজির ন্যায় যেখানেই দৃষ্টিপাত করবে তা ঝলমল করতে দেখবে। কোন মহান সত্য নেই যা বাদ পড়েছে, কোন প্রজ্ঞা নেই যা এর আদিগন্তব্যাপী বর্ণনার আওতার বাইরে রয়ে গেছে, কোন জ্যোতি নেই যা এর আনুগত্যে লাভ হয় না। এ কথাগুলো প্রমাণবিহীন নয়। এমন কোন বিষয় নেই যা কেবল বুলিসর্বস্ব বরং এটি এমন সত্য যা প্রমাণিত আর যার প্রমাণ অতি স্পষ্ট এবং ১৩শ বছর ধরে যা অবিরাম স্বীয় জ্যোতি প্রকাশ করে চলেছে। আমরাও এই সত্যকে আমাদের এ গ্রন্থে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করেছি। কুরআনের নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্যকে এতটা বর্ণনা করেছি, যা এক সত্যসন্ধানীর সান্ত্বনা, সন্তুষ্টি, স্বস্তি ও প্রবোধলাভের জন্য এক মহাসমুদ্রের মতো ফুঁসে উঠছে।

এটি কীভাবে হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি নিছক হীন বুলি আওড়িয়ে এই মহান আলোর সম্মানহানি করবে? অবশ্য যদি কারো হৃদয়ে এই সন্দেহ জাগে যে, এসকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব, সুন্দর বিষয়াদি ও বিশেষত্ব, যা কুরআন শরীফে প্রমাণ করে দেখানো হয়েছে, তা অন্য কোন গ্রন্থ থেকেও দেখানো সম্ভব, সেক্ষেত্রে তার উচিত হবে উপরোল্লিখিত শর্তাবলীর নিরিখে সেই গ্রন্থের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যাবলী, তত্ত্ব ও বিশেষত্ব উপস্থাপন করা– এটিই মুনাযেরার সঠিক পদ্ধতি। কুরআন যেভাবে সকল মিথ্যা বিশ্বাসের খণ্ডনসংবলিত আর যেভাবে সেই পবিত্র বাণী সকল সঠিক বিশ্বাসকে যৌক্তিক প্রমাণাদিতে সজ্জিত করে বা প্রমাণ করে আর যেভাবে সেসকল পবিত্র গ্রন্থে ঐশীতত্ত্ব ও তথ্যের উল্লেখ রয়েছে আর যেভাবে সেসবে হৃদয় আলোকিত করা সম্পর্কে বিস্ময়কর বিশেষত্ব ও অভাবনীয় কার্যকারিতা পাওয়া যায়, যা আমরা এ গ্রন্থে প্রমাণ করেছি, সেসব নিজের গ্রন্থে প্রমাণ করে দেখাক। যতক্ষণ এমনটি না করবে, কারো ঘেউ ঘেউ করাতে চাঁদের আলোর কোন ক্ষতি নেই। সত্যিকার অর্থে এমন ব্যক্তির অবস্থা সত্যিই শোচনীয়, যে এখনো স্পষ্ট সত্য থেকে রিক্ত ও বঞ্চিত জেনেশুনে ভ্রষ্টতার পথে পদচারণা করে। আমাদের বিরোধীদের অনেকেই খ্যাতিমান ও সুপরিচিত আর তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস এটিই যে, ন্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখা হয় তাহলে এসব সত্য তারা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবে। আমাদের হৃদয়ে আত্মম্ভরিতার কোন স্থান নেই। পৃথিবীতে

সত্য ও পুণ্যের প্রসার ছাড়া আমাদের আর কোন লক্ষ্য নেই। তাই ন্যায়পরায়ণ জ্ঞানী লোকদের কাছে এটিই আবেদন যে, এক মুহূর্তের জন্য হলেও আন্তরিক সদিচ্ছা নিয়ে তাদের কাজ করা উচিত। তাদের বড়মনা হওয়া ও নেক প্রকৃতি স্বজাতির মাঝে যেখানে প্রমাণিত বিষয়, সেখানে আমরা কী করে নিরাশ হতে পারি বা কীভাবে ধারণা করতে পারি যে, এই নেক মনমানসিকতা এর চেয়ে মহানতর হওয়া সম্ভব নয়? তাই যদিও আমি এখন পর্যন্ত কোন বিরোধীকে ন্যায়নিষ্ঠাপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে দেখি নি, তা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত আমি দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত আর দৃঢ় আশা রেখে বলতে পারি যে, আমাদের ন্যায়পরায়ণ বিরোধীরা যদি অতি মনোযোগ সহকারে এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন তাহলে (স্বয়ং) তাদের মনোসংযোগই তাদের সন্দেহ দূর করার জন্য যথেষ্ট হবে। আমার আশা ছিল, এ গ্রন্থের তৃতীয় অংশ ছাপা হলে ব্রাহ্ম ও আর্য সমাজীদের বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা নিজেদের ভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত হয়ে প্রকৃত সত্যের পানে পিপাসার্ত ব্যক্তির ন্যায় ছুটে আসবে। কিন্তু এখন আমি দেখছি, আমার দূরদৃষ্টি ভ্রান্তির শিকার হয়েছে আর একথা শুনে আমি গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছি যে, ব্রাহ্ম ও আর্যরা আমার এ পুস্তকটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করে নি। বিশেষত পণ্ডিত শিব নারায়ণ সাহেবের রিভিউ দেখার মাধ্যমে ব্রাহ্ম সাহেবদের প্রকৃতিতে বিদ্বেষের এক দিগন্ত আমার চোখে পড়েছে (খোদা করুণা করুন)।

পরিতাপ! পণ্ডিত সাহেব এসব ঐশী সত্য থেকে আদৌ লাভবান হন নি যা সূর্যের মতো দেদীপ্যমান। আর এত দৃঢ় ও শক্তিশালী প্রমাণাদির জ্যোতি সত্ত্বেও পণ্ডিত সাহেবের বিদ্বেষের অন্ধকার হ্রাস পায় নি। এ বিষয়টি নিশ্চয় অতি আশ্চর্যের বিষয় যে, এমন বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী মানুষ এমন নিখুঁত প্রমাণ দেখেও তা গ্রহণে বিলম্ব করবে! পণ্ডিত সাহেব এই অস্বীকারের মাধ্যমে শুধু ন্যায়ের সীমাই লঙ্ঘন করেন নি বরং সত্য গোপন করে নিজ জাতির সহানুভূতি থেকে, উপরন্তু খোদা তা'লা থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন। আমার একথা প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই যে, পণ্ডিত সাহেবের অস্বীকার কতটা ন্যায়নীতি বিবর্জিত। একথা স্বয়ং সে ব্যক্তির ওপর স্পষ্ট হতে পারে, যে প্রথমে আমার পুস্তকটি দেখবে যে, আমি কীভাবে খোদার ওহীর প্রয়োজন এবং এর অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়েছি আর এরপর পণ্ডিত সাহেবের রচনার ওপর দৃষ্টি দিবে যে, তিনি আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কী লিখেছেন এবং আমার প্রমাণাদির কী খণ্ডন তিনি

উপস্থাপন করেছেন। পণ্ডিত সাহেবের স্বজাতির মধ্যে যারা এ গ্রন্থ মনোযোগ সহকারে পাঠ করবে তাদের হৃদয়ে পণ্ডিত সাহেব আদৌ অন্তরায়ের পর্দা লেপন করতে পারবেন না, অবশ্য প্রকৃতিগত কোন পর্দা যদি না থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

পাদটীকা নম্বর দুই (২)

[তৃতীয় খণ্ডের ধারাবাহিকতায়]

আপনার এই উক্তিটি তেমনই, যেমনটি কিনা আজ পর্যন্ত সব ইহুদি জোর দিয়ে বলে থাকে যে, মসীহ্ আমাদের নবীদের গ্রন্থাবলী হতে চুরি করে ইঞ্জিল বানিয়েছে; বরং তাদের আলেম ও জ্ঞানীরা বই খুলে খুলে দেখিয়ে থাকে যে, এখান থেকে বিভিন্ন বাক্য চুরি করা হয়েছে।*

অনুরূপভাবে পণ্ডিত দিয়ানন্দও স্বীয় রচনাবলীতে আপত্তি উত্থাপন করেছেন যে, আমাদের বিভিন্ন গ্রন্থ হতে কেটে-ছেঁটে 'তৌরাত' বানানো হয়েছে আর আজ পর্যন্ত বেদের ন্যায় হবন (যজ্ঞ) ইত্যাদি আচার অনুষ্ঠান তাতেও বিদ্যমান; যেমনটি কিনা আপনিও স্বীকার করেন যে, হিন্দুদের নীতিমালার সাথে ইঞ্জিলের শিক্ষার অনেক ক্ষেত্রে মিল রয়েছে। সুতরাং এই স্বীকারোক্তির মাধ্যমেই মূলত আপনি নিজের মুখে হিন্দুদের দাবির সত্যায়ন করছেন। কিন্তু পবিত্র কুরআন এমন নয় যা সম্পর্কে এসব আপত্তির অবকাশ থাকতে পারে বা কোন দুরভিসন্ধিবাজের ষড়যন্ত্র এক্ষেত্রে কোন কাজে আসতে পারে। আপনি সূর্যে থু থু ফেলার অভিসন্ধি এঁটে অনেক মন্দ কাজ করেছেন। জনাব! এটি উল্টো আপনারই মুখে পড়বে। বক্তা সাহেব! আপনার অনর্থক বুলি আওড়ানোর পেছনে হয়তো উদ্দেশ্য হলো, কতক অতি সরল খ্রিষ্টানকে প্রীত করা কিন্তু সত্য কথা হলো, বুদ্ধিমান খ্রিষ্টানরা আপনার কাণ্ডজ্ঞানহীন একথা শুনে হাসবে। যেখানে কুরআন কোত্থেকে একত্র করা হয়েছে আর এর সকল গূঢ় সত্য-তথ্য-উপাত্ত ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব ইহুদী খ্রিষ্টান বা তারকা পূজারিদের কোন কোন গ্রন্থ থেকে চুরি করা হয়েছে তা আপনি খুব ভালোভাবে জানেন সেখানে এমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করা হতে কেন বিরত থাকলেন, যার ফলে সকল খ্রিষ্টানের সম্মান অক্ষুন্ন থাকতে পারে, তাদের অক্ষমতা ও নির্বাক থাকার ঐতিহাসিক কলঙ্ক আপনার এই সুদৃঢ় মনোবলের কারণে মুছে যেতে পারে, অধিকন্তু ১০,০০০ রুপিও হস্তগত হতে পারে? আপনার সুশীল-সত্তা এতটা

নোট: এই পাদটীকার প্রথম অংশ পড়তে হলে বারাহীনে আহমদীয়ার ৩য় খণ্ড দেখুন।

কুশলী যদি হয়ে থাকে, যা হযরত ঈসারও লব্ধ ছিল না তাহলে প্রশ্ন হলো, এই মহামূল্যবান রত্ন কোন্ দিনের জন্য লুকিয়ে রেখেছেন? যেখানে আপনি এতটাই যোগ্য-সিদ্ধহস্ত যে, পবিত্র কুরআনেরও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন বরং এর উৎস কি তাও বাতলে দিতে পারেন! সেক্ষেত্রে বিষয়টি আপনার জন্য অত্যন্ত সহজ হয়ে গেল, আপনি অতি সহজেই এসব সত্য-তত্ত্ব, যুক্তিপ্রমাণের সূক্ষ্মতা ও কুরআনে বিধৃত কল্যাণরাজির মোকাবিলা করে বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত পুরো অংক হস্তগত করতে পারেন যা প্রসঙ্গত বারাহীনে আহমদীয়ায় উল্লেখ আছে! বিশেষ করে, আপনার কথাবার্তা হতে যখন এটিও বুঝা যায় যে, আপনি চরম জাগতিক কষ্টে নিপতিত আর টাকা-পয়সার আপনার একান্ত প্রয়োজনও রয়েছে! এমন পরিস্থিতিতে জাগতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার এর চেয়ে উত্তম কৌশল আর কী হতে পারে?

অর্থাৎ আপনি সব কাজ পরিত্যাগ করে এই কাজই করুন আর পবিত্র কুরআনের ঐশী জ্ঞান, সূক্ষ্ম-নিগূঢ় যৌক্তিক প্রমাণাদি ও আধ্যাত্মিক প্রভাবাদির সাথে আপন গ্রন্থের তুলনা করে পুরস্কারের অর্থ হস্তগত করুন। এর ফলে আপনার পরম খ্যাতি অর্জন হবে আর যে ক্ষেত্র জয় করতে মসীহ্ ব্যর্থ হয়েছেন আর স্বীয় দুর্বল শিক্ষার ত্রুটির কথা স্বীকার করে যিনি এ জগৎ থেকে স্বয়ং প্রস্থান করেছেন, হয়ত সেই ময়দান এবারে আপনার হাতে বিজিত হবে। বলা যায়, এক দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি খ্রিষ্টানদের কাছে ঈসা থেকেও উত্তম গণ্য হবেন অর্থাৎ যেই গ্রন্থকে তিনি সারাজীবন অসম্পূর্ণ জ্ঞান করতেন আপনি এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে দেখালেন! চরমভাবে দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হয়েও এত টাকা হেলায় কেন হারাচ্ছেন? এ কাজ একা সমাধা করা যদি সম্ভব না হয় তাহলে আরো দু'চার-দশ বা বিশজন পাদ্রিকে দলে ভেড়াতে পারেন যারা হাট-বাজার ও গ্রামগঞ্জে বৃথা ঘুরে বেড়ায় আর খোদার সাথে এবারে একটু যুদ্ধ করে দেখান; নতুবা যারা আমাদের পুরুষোচিত বিজ্ঞাপন পড়ে আর আপনাদের এই মেয়েলী কথাবার্তা শুনে তাদের সামনে এখন খ্রিষ্টান সাহেবদের সততা ও খোদাভীতির বাস্তব চিত্র অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়ে যাবে। আরেকজন খ্রিষ্টান সাহেব ১৮৮২ সনের ২৫ মে তারিখের নূর আফশাঁ পত্রিকায় এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, এমন কোন্ কোন্ লক্ষণাবলী বা শর্তাবলী রয়েছে, যার সাহায্যে সত্যপরিত্রাতা আর মিথ্যাপরিত্রাতার মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করা যায়? এর উত্তর হলো, খোদার পক্ষ থেকে প্রকৃত

মুক্তিদাতা তিনিই হয়ে থাকেন যার অনুসরণের কল্যাণে প্রকৃত মুক্তি লাভ হয় অর্থাৎ তার উপস্থাপিত বক্তব্যে খোদা এ কল্যাণ অন্তর্নিহিত রাখেন যে, এর পূর্ণ অনুসারী প্রবৃত্তির অমানিশা ও মানবীয় ত্রুটিবিচ্যুতি হতে মুক্ত হয়ে যায় আর তার মাঝে সেসব জ্যোতি সৃষ্টি হয় যা পবিত্র হৃদয়ে সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। অবশ্য অনুসরণকারীর অনুসরণে যতক্ষণ ত্রুটি থাকবে ততক্ষণ প্রবৃত্তিগত অন্ধকার দূরীভূত হবে না আর অভ্যন্তরীণ জ্যোতিও প্রকাশ পাবে না। কিন্তু এটি সেই অনুসরণীয় নবীর দোষ নয় বরং অনুসরণের দাবিদার স্বয়ং বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক অবজ্ঞা ও ভ্রুক্ষেপহীনতায় নিপতিত। এই অবজ্ঞা-অনিহা বা ব্যাধির কারণেই সে বঞ্চিত ও পর্দাবৃত রয়েছে। এটিই প্রকৃত লক্ষণ যার কল্যাণে মানুষ অতীত কল্পকাহিনীর আর মুখাপেক্ষী থাকে না বরং, স্বয়ং সত্যসন্ধানী হিসেবে সত্যিকার পথপ্রদর্শক ও প্রকৃত হিতসাধনকারীকে শনাক্ত করে নেয়।

অধিকন্তু উৎকৃষ্ট মানব ও হিতসাধনকারীর মাঝে যে পবিত্রতা ও জ্যোতি রয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়েছে সেই পবিত্রতা ও জ্যোতিকে স্বচক্ষে শুধু অবলোকনই করে না বরং স্বীয় যোগ্যতা অনুসারে এর স্বাদও পায়। এছাড়া মুক্তি বা পরিত্রাণের বিষয়টিকে কেবল কাল্পনিকভাবে এমন এক বিষয় আখ্যা দেয় না, যা কিয়ামত দিবসে প্রকাশ পাবে বরং অজ্ঞতা, সন্দেহ ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনারূপী বিপর্যয় হতে মুক্তি লাভ করে এবং স্বর্গীয় জ্যোতিতে জ্যোতির্মণ্ডিত হয়ে এ পৃথিবীতেই সত্যিকার মুক্তি লাভ করে। যেহেতু সত্যিকার পরিত্রাতার এটিই পরিচয় আর সত্যান্বেষীর এটিই সবচেয়ে মহান উদ্দেশ্য যা তার জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য এবং তার ধর্ম অবলম্বনের মূল কারণ; তাই মানতে হবে যে, এই লক্ষণ কেবল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাঝেই বিদ্যমান। একমাত্র তাঁর অনুসরণেই অভ্যন্তরীণ জ্যোতি ও খোদার ভালোবাসা অর্জন হয় যা পবিত্র কুরআন অনুসরণের ওপর নির্ভরশীল। পবিত্র কুরআন, যার ওপর নির্ভর করে মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ, তা এমন এক গ্রন্থ যার অনুসরণে এ পৃথিবীতেই মুক্তির লক্ষণাবলী প্রকাশ পায় কেননা এটিই সেই গ্রন্থ যা যুগপৎ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে অসম্পূর্ণদের পূর্ণতা দান করে আর সন্দেহ ও সংশয় থেকে মুক্তি দিয়ে থাকে। বাহ্যিকভাবে এই অর্থে এর বিবৃতি সূক্ষ্ম-সত্য ও সত্য তত্ত্বের এমন এক সমাহার যে, পৃথিবীর এমন সব সন্দেহ যা খোদা পর্যন্ত পৌঁছার পথে বাদ সাধে, যাতে আক্রান্ত হয়ে শত শত মিথ্যা

ফেরকার বিস্তার ঘটছে আর শত প্রকার ভ্রান্ত চিন্তাধারা পথভ্রষ্টদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হচ্ছে– মোটের ওপর যৌক্তিকভাবে এর সবক'টির খণ্ডন এতে বিদ্যমান। এছাড়া বর্তমান যুগের অন্ধকার-অমানিশা দূর করার জন্য সত্য ও উৎকৃষ্ট শিক্ষার যেসব জ্যোতির প্রয়োজন, এর প্রত্যেকটি সূর্যের ন্যায় এতে ঝলমল করছে আর প্রবৃত্তিগত সকল ব্যাধির চিকিৎসা এতে বিধৃত রয়েছে। এছাড়া সকল প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের বিবরণে এটি সমৃদ্ধ আর ঐশী জ্ঞানের এমন কোন সূক্ষ্ম দিক নেই যা ভবিষ্যতে কোন সময় প্রকাশ পাবে আর তা এর বাইরে থেকে যাবে। আধ্যাত্মিকভাবে এই অর্থে যে, এর পূর্ণ অনুসরণ হৃদয়কে এমনভাবে পরিচ্ছন্ন করে যে, মানুষ অভ্যন্তরীণ সব কলুষ হতে পুরোপুরি মুক্ত হয়ে মহান খোদার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে, আর গ্রহণীয়তার জ্যোতি তার ওপর বর্ষিত হতে আরম্ভ করে। অধিকন্তু ঐশী দান তাকে এভাবে পরিবেষ্টন করে রাখে যে, সমস্যার সময় সে দোয়া করলে পরম কৃপা ও স্নেহের সাথে খোদা তা'লা তার উত্তর দেন।

কখনো কখনো এমনও হয় যে, স্বীয় সমস্যা ও কষ্টকর পরিস্থিতিতে সহস্রবারও যদি সে হাত পাতে তো সহস্রবার-ই স্বীয় বদান্যশীল প্রভুর পক্ষ থেকে অত্যন্ত বাগ্মিতাপূর্ণ, সুমধুর এবং কল্যাণময় ভাষায় মমতামাখা উত্তর সে পায়। খোদার এলহাম বৃষ্টির ন্যায় তার প্রতি অবতীর্ণ হয়। নিজের হৃদয়কে সে এমনভাবে খোদার ভালোবাসায় পরিপূর্ণ দেখতে পায় যেভাবে এক স্বচ্ছ বোতল উন্নতমানের সুগন্ধিতে পরিপূর্ণ থাকে। ভালোবাসা ও উদ্দীপনার এমন এক পবিত্র স্বাদ তাকে প্রদান করা হয়, যা অবাধ্য প্রবৃত্তির কঠিনতম শিকলগুলো ছিন্ন করে প্রবৃত্তির সৃষ্ট ধূম্রজাল হতে নিষ্কৃতি দিয়ে তাকে প্রকৃত প্রেমাষ্পদের সুশীতল ও স্বস্তিদায়ক সমীরণ প্রবাহে প্রতিটি মুহূর্ত ও প্রতিক্ষণে নিত্যনতুন সজীবতা দান করে থাকে। সুতরাং সে নিজের মৃত্যুর পূর্বেই সেসব ঐশী দান স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে, যা অন্যরা মৃত্যুর পর দেখার জন্য আশায় বুক বাঁধে। এসব নিয়ামত কোন সন্ন্যাসসুলভ পরিশ্রম ও সাধনার ওপর নির্ভরশীল নয় বরং কেবল পবিত্র কুরআনের পূর্ণ অনুসরণের কল্যাণে তা প্রদান করা হয়। সকল সত্যান্বেষীই তা পেতে পারে। অবশ্য তা অর্জনের জন্য শর্ত হলো, খাতামুর রসূল ও রসূলকুল-গর্ব (সা.)-এর পূর্ণ ভালোবাসা। আল্লাহ্‌র নবী (সা.)-কে ভালোবাসার শর্ত পূরণের পর মানুষ নিজের সামর্থ্য অনুসারে সেসব জ্যোতি হতে অংশ পায়, যা পূর্ণমাত্রায় আল্লাহ্‌র নবী (সা.)-কে দেয়া হয়েছে। সুতরাং

সত্যান্বেষীর জন্য এর চেয়ে উত্তম আর কোন পন্থা নেই যে, সে কোন দৃষ্টিবান ও তত্ত্বজ্ঞানীর মাধ্যমে স্বয়ং এ ধর্মে প্রবেশ করবে ও খোদার বাণীর অনুসরণ এবং রসূলে মকবুলকে পুরোপুরি ভালোবেসে আমাদের এসব বিবৃতির যথার্থতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আন্তরিকতা নিয়ে যদি সে আমাদের কাছে আসে তাহলে আমরা খোদার কৃপা ও বদান্যতার ওপর আস্থা রেখে তাকে অনুসরণের পথ দেখাতে প্রস্তুত রয়েছি, কিন্তু খোদার অনুগ্রহের সাথে ব্যক্তিগত যোগ্যতারও প্রয়োজন রয়েছে। স্মরণ রাখা উচিত, সত্যিকার পরিত্রাণ সত্যিকার সুস্থতার ন্যায়। যেমনটি কিনা সেটিই সত্যিকার সুস্থতা গণ্য হয়, যাতে সুস্থতার সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় আর সুস্থতার পরিপন্থি ও বিরোধী কোন রোগ যাতে বিদ্যমান না থাকে। অনুরূপভাবে সত্যিকার মুক্তি সেটি, যাতে মুক্তির লক্ষণাবলী বিদ্যমান; কেননা যে বস্তুর অস্তিত্ব সত্যিকার অর্থেই প্রমাণিত, সেই প্রমাণিত সত্তার জন্য কিছু চিহ্ন ও লক্ষণ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। সেসব চিহ্ন ও লক্ষণ প্রমাণিত হওয়া ছাড়া সে বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হতে পারে না। আমরা যেভাবে বারংবার লিখে এসেছি যে, নাজাত বা মুক্তির সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার বিশেষ লক্ষণাবলী হলো সবার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া আর খোদা-প্রেম এমন মহান মার্গে উপনীত হওয়া, যেন সে ব্যক্তির সাহচর্য, দৃষ্টি ও দোয়ার কল্যাণে এ বিষয়গুলো অন্যান্য যোগ্য লোকদের মাঝেও সৃষ্টি হতে পারে। আর ব্যক্তিগত পর্যায়ে অভ্যন্তরীণভাবে তার এতটা আলোকিত হওয়া উচিত যে, তার কল্যাণরাজি যেন সত্যান্বেষীদের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট হয় আর তার মাঝে সেসব বৈশিষ্ট্য এবং খোদার সাথে বাক্যালাপের বিশেষত্ব থাকা চাই যা নৈকট্যপ্রাপ্তদের মাঝে থেকে থাকে। এখানে কেউ জ্যোতির্বিদ ও গণক প্রমুখ অদৃশ্য সংবাদদাতাদের ভবিষ্যদ্বাণী বা পূর্বাভাসে যেন প্রতারিত না হয় আর ভালোভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, খোদা- প্রেমিকদের জ্যোতি ও কল্যাণের সাথে এদের কোনই সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য নেই। আমরা পূর্বেও লিখে এসেছি যে, ঐশী ক্ষমতাব্যঞ্জক ভবিষ্যদ্বাণী ও সম্মানজনক প্রতিশ্রুতি যা ষোলআনা সত্য আর যা আগাগোড়াই সমৃদ্ধ থাকে বিজয় ও সাহায্যের আর সম্মান ও উন্নতির শুভ সংবাদে; মানবীয় মাধ্যমের সাথে এর কোন সামঞ্জস্য ও সাজুয্য নেই। ঐশীপ্রেমে বিভোরদের খোদা তা'লা এমন এক প্রকৃতি দান করেছেন যে, তাদের দৃষ্টি, সাহচর্য, মনোযোগ এবং দোয়া, মহৌষধের মর্যাদা রাখে।

অবশ্য শর্ত হলো, কল্যাণপ্রত্যাশী ব্যক্তির মাঝে সেই যোগ্যতা থাকা। এমন মানুষকে কেবল ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে নয় বরং তাদের তত্ত্ব-ভাণ্ডার, অলৌকিক খোদানির্ভরতা, পরম ভালোবাসা, খোদা ছাড়া অন্য সবার সাথে পুরোপুরি বিচ্ছেদ, তাদের নিষ্ঠা ও অবিচলতা, খোদানুরাগ, আগ্রহ ও একাগ্রতা, পরম অনুনয়-বিনয়, আত্মশুদ্ধি, জগৎ-বিমুখতা, বারিধারার ন্যায় বর্ষণশীল স্বীয় অজস্র কল্যাণরাজির মাধ্যমে ঐশী সাহায্যপুষ্ট, অনন্য অবিচলতা ও সুমহান বিশ্বস্ততা, অদ্বিতীয়-অনন্য তাকওয়া ও পবিত্রতা এবং মহান দৃঢ়তা ও হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ততার মাধ্যমেও তাদের চেনা যায়। ভবিষ্যদ্বাণী করা তাদের মূল লক্ষ্য নয় বরং এর উদ্দেশ্য হলো, তাদের ওপর ও তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদের ওপর যেসব কল্যাণরাজি বর্ষিত হতে যাচ্ছে, তা বর্ষিত হওয়ার পূর্বেই উল্লেখ করে আল্লাহ্‌র বিশেষ কৃপা বা স্নেহদৃষ্টি সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদান করা। এছাড়া মহা সম্মানিত খোদার পক্ষ থেকে তাদেরকে বাক্যালাপ ও কথোপকথনের যে সম্মান প্রদান করা হয় সেগুলো সঠিক হওয়া ও খোদার পক্ষ থেকে মনোনীত হওয়ার এক নিশ্চিত প্রমাণ উপস্থাপন করা। এমন মানুষ যাদের এসব পবিত্র কল্যাণরাজি অজস্র ধারায় দেয়া হয় তাদের ক্ষেত্রে খোদার শক্তি ও আদি প্রজ্ঞার বিধানে এই সিদ্ধান্তই হয়েছে যে, তারা এমন শ্রেণির মানুষ যাদের বিশ্বাস হবে সত্য ও পবিত্র আর যারা থাকবে সত্য বিশ্বাসের ওপর অনড় ও অটল, আর এক অদ্বিতীয় খোদার সাথে থাকবে তাদের নিবিড় সম্পৃক্ততা, অধিকন্তু এ পার্থিব জগৎ ও পার্থিব বিষয়াদি হতে তারা থাকবে যোজন যোজন দূরে। এমন মানুষ পরশপাথরের বৈশিষ্ট্য রাখে। ঐশী জ্যোতি ও ঐশী সত্যধর্ম তাদের প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

তাদের প্রশংসনীয় গুণরাজির আধার সত্তাকে যা বহু কল্যাণের সমাহার, হতভাগা জ্যোতিষী ও গণকদের সাথে তুলনা করা চরম বক্র চিন্তাধারার পরিচায়ক আর একান্ত দুর্ভাগ্যজনক বিষয়, কেননা তারা শব-ভক্ষণকারী দুনিয়ার হীন লোকদের সাথে কোন সামঞ্জস্য রাখেন না বরং, তারা চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় স্বর্গীয় জ্যোতি। ঐশী প্রজ্ঞার আদি বিধান তাদের সৃষ্টি করেছে এ উদ্দেশ্যেই যে, তারা যেন পৃথিবীতে এসে পৃথিবীকে জ্যোতির্ময় করতে পারেন। এ কথা পূর্ণ সচেতনতার সাথে স্মরণ রাখা উচিত যে, খোদা দৈহিক রোগব্যাধির জন্য যেভাবে কিছু ঔষধ সৃষ্টি করেছেন আর হরেক প্রকার ব্যথা-বেদনা নিরাময়ের জন্য বিভিন্ন উপকারী বস্তু যেমন, প্রতিষেধক ইত্যাদি

পৃথিবীতে বিদ্যমান রেখেছেন আর সেসব ঔষধে আদি থেকেই এই বৈশিষ্ট্য অন্তর্নিহিত রেখেছেন যে, যখন কোন রুগ্ন ব্যক্তি সেসব ঔষধ যথোচিত বাছবিচারের দাবি অনুসারে ব্যবহার করে আর তার রোগ যদি আরোগ্য লাভের সীমা ছাড়িয়ে না যায় সেক্ষেত্রে প্রজ্ঞার মূর্ত প্রতীক, খোদার রীতি হলো, সেই রোগীকে তার (দেহের) সামর্থ্য ও যোগ্যতার নিরিখে কিছুটা নিরাময় বা পূর্ণ আরোগ্য দান করেন; অনুরূপভাবে মহা সম্মানিত খোদা সেই নৈকট্যপ্রাপ্তদের পবিত্র প্রকৃতিতে বা আত্মায় আদিকাল থেকেই এই বিশেষত্ব অন্তর্নিহিত রেখেছেন যে, তাদের দৃষ্টি ও দোয়া, সাহচর্য ও দৃঢ়তা, যোগ্যতার শর্ত সাপেক্ষে আধ্যাত্মিক ব্যাধি নিরাময়ে দোয়াস্বরূপ হয়ে থাকে। তাদের প্রাণ মহা সম্মানিত, এক-অদ্বিতীয় খোদার সাথে বাক্যালাপ ও কথোপকথনের এবং দিব্যদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার কল্যাণরাজি লাভ করে থাকে। তখন সেই কল্যাণরাজি সৃষ্টিকে সঠিক পথের দিশা দেয়ার ক্ষেত্রে এক অসাধারণ প্রভাব প্রকাশ করে। বস্তুত খোদাপ্রেমিকদের অস্তিত্ব সৃষ্টির জন্য একটি আশীর্বাদ হয়ে থাকে। যেখানে এই উপকরণালয়ে (পৃথিবীতে) খোদা তা'লার প্রকৃতির নিয়ম হলো, যে পানি পান করে কেবল সে-ই পিপাসার কাতরতা হতে নিস্তার লাভ করে। যে রুটি খায়, ক্ষুধার জ্বালা থেকে সে-ই নিষ্কৃতি পায়; অনুরূপভাবে খোদার চলমান রীতি হলো, আধ্যাত্মিক ব্যাধি দূর করার জন্য তিনি নবী ও তাদের কামেল অনুসারীদেরকে মাধ্যম বা ওসীলা নির্ধারণ করে রেখেছেন। তাদেরই সাহচর্যে হৃদয় প্রবোধ ও প্রশান্তি লাভ করে আর মানবিক দুর্বলতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। প্রবৃত্তির অমানিশা দূরীভূত হতে থাকে, খোদাপ্রেমের গভীর উচ্ছ্বাস ও সাধ জাগে আর স্বর্গীয় কল্যাণরাজি স্বীয় বিকাশ ঘটিয়ে থাকে। তাদের বাদ দিয়ে এসব বিষয় আদৌ (কারো) অর্জন হয় না। অতএব এসব বৈশিষ্ট্যই তাদেরকে শনাক্ত করার বিশেষ লক্ষণ হয়ে থাকে। **সুতরাং চিন্তা করো, উদাসীন হয়ো না।**

পাদটীকা নম্বর তিন (৩)

এ সম্পর্কে খ্রিষ্টানদেরও সবিশেষ মনোযোগ সহকারে ভাবা উচিত, যে খোদা সকল অর্থে সম্পূর্ণ, অনন্য ও অতুলনীয় তাঁর খোদার বাণী বা গ্রন্থে কী কী নিদর্শন বা চিহ্ন থাকা আবশ্যক? কেননা তাদের ইঞ্জিল পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কারণে সে সকল লক্ষণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে রিক্ত ও বঞ্চিত বরং ঐশী নিদর্শন তো দূরের কথা সামান্য সত্য ও সঠিক কথাও ইঞ্জিলের ভাগ্যে জোটেনি যা একজন ন্যায়পরায়ণ ও বুদ্ধিমান বক্তার কথা বা বাণীতে থাকা বাঞ্ছনীয়। হতভাগা সৃষ্টির পূজারিরা খোদার বাণী এবং পথনির্দেশনা ও খোদার জ্যোতিকে স্বীয় তমসাচ্ছন্ন চিন্তাধারার সাথে এমনভাবে গুলিয়ে ফেলেছে যে, সে গ্রন্থ পথ প্রদর্শনের পরিবর্তে এখন লুটতরাজের বা পথচ্যুত করার একটি নিশ্চিৎ মাধ্যম। এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে কে একত্ববাদ বিমুখ করেছে? এই কৃত্রিম ইঞ্জিল। এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে কে ধ্বংস করেছে? সেই চারটি সংকলন (অর্থাৎ মার্ক, মথি, লুক, যোহন)। যেসব বিশ্বাসের দিকে সৃষ্টির পূজারিদের অবাধ্য আত্মা আকৃষ্ট হয়, অনুবাদের সময় তাদের শব্দ চয়নও সেদিকে আকৃষ্ট হতে থাকে। কেননা মানুষের শব্দগুচ্ছ সদা তার ধ্যানধারণার অধীনস্থই হয়ে থাকে। এককথায়, ইঞ্জিলে অব্যাহত পরিবর্তন পরিবর্ধনের ফলে আজকে তা ভিন্ন কোন বস্তু। এর বর্তমান শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে খোদা এখন সেই প্রকৃত খোদা নন, যিনি চিরকাল নতুনত্ব অর্থাৎ পরিবর্তনের শিকার হওয়া, জন্মগ্রহণ করা, দৈহিক রূপধারণ ও মৃত্যু হতে পবিত্র।

বরং ইঞ্জিলের শিক্ষা অনুসারে খ্রিষ্টানদের খোদা একজন নতুন খোদা অথবা সেই খোদা, দুর্ভাগ্যবশত যার ওপর অনেক বিপদাপদ আপতিত হয়েছিল। তার প্রথম অবস্থা অর্থাৎ অনাদি-অনন্ত হওয়া থেকে তাঁর শেষ অবস্থা পুরোপুরি বদলে গেছে। চিরস্থায়ী স্থিতিদাতা ও অপরিবর্তনশীল হয়েও অবশেষে তার সকল স্থায়িত্ব ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। এছাড়া খ্রিষ্টান গবেষকরা স্বয়ং স্বীকার করে যে, সকল ইঞ্জিল এলহামের ভিত্তিতে লেখা হয় নি বরং মথি প্রমুখ এর অনেক

নোটঃ পাদটীকা নম্বর তিন (৩) এই পুস্তকের ১৬০ পৃষ্ঠার সাথে সম্পর্ক রাখে। –অনুবাদক

কথা মানুষের কাছে শুনে লিখেছে। ‘লুক’ সংকলিত ইঞ্জিলে, স্বয়ং লুক স্বীকার করেন, ঈসাকে যারা দেখেছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে আমি লিখেছি। সুতরাং এই বিবৃতিতে স্বয়ং লুক স্বীকার করছেন যে ইঞ্জিল এলহামী নয় কেননা এলহামের পর মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করার কী প্রয়োজন? অনুরূপভাবে মার্ক, যে ঈসার শিষ্য ছিলেন, তারও কোন প্রমাণ নেই। তাহলে প্রশ্ন হলো, তবে তিনি কীভাবে নবী হতে পারেন? যাহোক চারটি ইঞ্জিলের কোনটিই সঠিক নয় আর স্বীয় সকল বিধৃত কথার বা বিবরণের দৃষ্টিকোণ হতে এলহামীও নয়, একারণেই বিভিন্ন ইঞ্জিলের ঘটনাবলীতে বিভিন্ন প্রকার ভ্রান্তি অনুপ্রবেশ করেছে আর কিছু লিখতে গিয়ে লেখা হয়েছে ভিন্ন কিছু। এককথায় এ বিষয়ে খ্রিষ্টানদের বিজ্ঞ গবেষকরা একমত যে, ইঞ্জিল শতভাগ খোদার বাণী নয় বরং তা বিভক্ত মালিকানা স্বত্ববিশিষ্ট গ্রামের ন্যায়, কিছু খোদার আর কিছু মানুষের। অবশ্য কতক অজ্ঞ খ্রিষ্টান নিজেদের অতি সরলতার কারণে কখনো কখনো এই দাবি করে বসে, স্বীয় শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে ইঞ্জিল অদ্বিতীয় ও অনন্য; অর্থাৎ মানুষ এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে অক্ষম, তাই প্রমাণ হলো, এর শিক্ষা খোদার বাণী।

অধিকন্তু ইঞ্জিলের শিক্ষার অনন্যতার প্রমাণ এভাবে তুলে ধরে, এতে মার্জনা, ক্ষমা, পুণ্য ও অনুগ্রহের ওপর প্রভূত তাগিদ রয়েছে আর সর্বত্র (নির্বিচারে) দুষ্কৃতির মোকাবিলা করতে বারণ করা হয়েছে, বরং দুর্ব্যবহারের প্রত্যুত্তরে পুণ্য করার বা সদ্ব্যবহারের কথা লেখা আছে। একগালে চপেটাঘাত খেয়ে অপর গালও পেতে দেয়ার নির্দেশ রয়েছে। সুতরাং এই যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ হয়ে গেল, তা অনন্য ও অতুলনীয় এবং মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে! لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ ভদ্র মহোদয়গণ! এই অভিনব যুক্তি আপনারা কোত্থেকে আনলেন যার ভিত্তিতে আপনারা ধরে নিয়েছেন, যেসকল শিক্ষায় সহনশীলতা ও ক্ষমার ওপর অধিক জোর দেয়া হয় তা অনন্য হয়ে থাকে আর মানবীয় শক্তি-বৃত্তি এমন উপদেশাবলী প্রদানে অক্ষম! এটিইতো বোঝার ভুল যে, এখন পর্যন্ত আপনাদের জানাই নেই, কোন বস্তু সম্পর্কে অনন্য ও অতুলনীয় বিশেষণ কেবল তখনই বলা হয় যখন সেই বস্তু নিজ সত্তায় এমন মানে অধিষ্ঠিত থাকে, যার দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে মানবীয় শক্তি-বৃত্তি অক্ষম। আপনারা গলা ফাটিয়ে বারবার এই দাবিই করে থাকেন যে, ইঞ্জিলে সর্বত্র ও সকল স্থানে ক্ষমা ও মার্জনা করার তাগাদা দেয়া হয়েছে আর এমন তাগিদ অন্য কোন গ্রন্থে নেই!

ভালোকথা, তাই হোক! কিন্তু প্রশ্ন হলো, এর মাধ্যমে কি এটি প্রমাণিত হলো, মানুষ এতটা জোর বা তাগাদা দিতে পারে না? আর মানবীয় শক্তিবৃত্তি এই সকল তাগাদা প্রদানে অক্ষম? প্রশ্ন হলো, দয়া ও মার্জনার ওপর জোর দেয়ার ক্ষেত্রে মূর্তিপূজারিদের পুস্তকে কি কোন ঘাটতি আছে? সত্য কথা হলো, আর্যজাতিভুক্ত প্রতিমাপূজারিরা দয়ামায়ার ওপর জোর দেয়াকে সেই পরাকাষ্ঠায় পৌঁছিয়েছে যে, সীমাই ছাড়িয়ে গেছে। তাদের শাস্ত্রের একটি শ্লোক এখন আমার মনে পড়লো, যার ওপর প্রায় সব হিন্দু প্রতিষ্ঠিত আর তাহলো, অহিংসা পরম ধর্ম। অর্থাৎ কোন জীবকে কষ্ট না দেয়ার চেয়ে বড় ধর্ম আর নেই। এই শ্লোকের দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দুরা কোন প্রাণীকে কষ্ট দেয়া পছন্দ করে না এমনকি সাপের অনিষ্টকেও প্রতিহত করে না বরং অনিষ্টের মোকাবিলার পরিবর্তে এদের দুধ পান করায় এবং তাদের পূজা করে। তাদের ধর্মে এই পূজার নাম হলো ‘নাগ পূজা’। কোন কোন হিন্দু এত দয়ালু যে মাথার উকুনও চুল থেকে বের করে আনে না বরং কোথাও উকুনের আরামে ব্যাঘাত না ঘটে, এই আশংকায়, নিজেদের শরীরের কোন চুলও ছাঁটে না; বরং নিজেরা কষ্ট সহ্য করে, পাছে উকুনের বসবাসস্থলে শৃংখলা ভঙ্গ হয়! কিছু হিন্দু মুখে থলি লাগিয়ে রাখে আর পানি ছেকে নেবার পর পান করে যেন কোন প্রাণী বিশেষ তাদের মুখে ঢুকে না যায় আর কোথাও না আবার তা জীব হত্যার কারণ হয়ে যায়। এখন দেখুন! এই চরম দয়া ও মার্জনার প্রমাণ ইঞ্জিলে কোথায়? কিন্তু তা সত্তেও কোন খ্রিষ্টান এ ব্যক্তমত করবে না যে, হিন্দু শাস্ত্রের এই শিক্ষা অনন্য ও মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে। তাই ধৈর্য, মার্জনা ও দয়ার প্রতি জোর দেয়ার ক্ষেত্রে ইঞ্জিলের যে শিক্ষা, এর চেয়ে (অর্থাৎ হিন্দুশাস্ত্রের শিক্ষার চেয়ে) মহান কিছু নয়, তাই এটি কীভাবে অনন্য হতে পারে? পরিতাপ! খ্রিষ্টান বন্ধুরা একটুও ভাবে না যে নৈতিক বিষয়াদি কিছুটা জোর দিয়ে বর্ণনা করা একথার প্রমাণ বহন করে না যে, কোনো মানুষ এমন জোর দিয়ে বিষয় বর্ণনা করতে পারে না।

আর যদি করতে পারে তাহলে এর কোন যৌক্তিক প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই যেন সেই প্রমাণের মাধ্যমে ইঞ্জিলের শিক্ষা ও হিন্দুদের পুস্তক অনন্য প্রমাণিত হয়। কিন্তু যতক্ষণ কোন প্রমাণ উপস্থাপন না করা হবে ততক্ষণ আমরা কীভাবে এমন শিক্ষার অনন্য হওয়া স্বীকার করতে পারি, যা সামনে আনা বা রচনার জন্য মানুষের মাঝে অন্তর্নিহিত সক্ষমতা দেখতে পাই? আমরা কী

করবো, প্রমাণ ছাড়া কোন দাবি মেনে নিব, নাকি যে বিষয় স্পষ্টতই মিথ্যা তাকে খাঁটি সত্য হিসেবে গ্রহণ করে নেবো? সুতরাং জানাকথা যে, এটি কত অর্থহীন বিতর্ক আর কত ঘৃণ্য নির্বুদ্ধিতা যে, একটি অমূলক ও প্রমাণবিহীন বিষয় নিয়ে হঠকারিতা প্রদর্শন করছে আর স্বচ্ছ ও সোজা যে পথ চোখে পড়ে সে পথে পদচারণা করতে চায় না। আরো মজার বিষয় হলো, ইঞ্জিলের শিক্ষা অনন্য হওয়া তো দূরের কথা এটি সম্পূর্ণও নয়। সকল গবেষক এবিষয়ে মতৈক্য রাখেন যে, নির্বিচারে সকল স্থানে ও সকল পর্যায়ে ক্ষমা ও মার্জনার ওপর জোর দেয়ার ওপরই নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে না। মানুষকে কেবল ক্ষমা ও মার্জনার নির্দেশই যদি দেয়া হতো তবে শতশত কাজ যা রাগ ও প্রতিশোধের ওপর নির্ভরশীল তা ভেস্তে যেতো। মানুষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, যার ওপর প্রতিষ্ঠিত হলে সে মানুষ আখ্যায়িত হয় তা হলো, খোদা তা'লা তার ফিতরতে যেমন মার্জনা ও ক্ষমার বৈশিষ্ট্য রেখেছেন একইভাবে ক্রোধ ও প্রতিশোধের প্রবণতাও রেখেছেন আর এ সকল শক্তিবৃত্তির ওপর বিবেককে কর্মকর্তা বা নিয়ন্তা নিযুক্ত করেছেন। সুতরাং মানুষ প্রকৃত মনুষত্বের স্তরে তখন পৌঁছতে পারে যখন প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট অনুসারে এই উভয় প্রকার শক্তি-বৃত্তি বিবেকবুদ্ধির অধিনস্থ হয়ে কাজ করে। অর্থাৎ এসকল শক্তি প্রজাসদৃশ হবে আর বুদ্ধি ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ হিসেবে তাদের লালনপালন, কল্যাণ সাধন, বিতণ্ডার অবসান এবং সমস্যা সমাধানে তৎপর থাকবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন কোন ক্ষেত্রে রাগ প্রকাশ পায় অথচ তখন বাস্তবে নমনীয়তা-সহনশীলতা প্রদর্শনের সময় হয়ে থাকে। সুতরাং এমন সময় বিবেক নিজ গুণে ক্রোধকে কমিয়ে সহনশীলতাকে সক্রিয় করে। অনেক সময় রাগ প্রকাশের সময় হয়ে থাকে কিন্তু কোমলতা প্রকাশ পেয়ে যায় আর এমন ক্ষেত্রে বিবেকবুদ্ধি রাগকে জাগ্রত করে নমনীয়তাকে মাঝ থেকে প্রত্যাহার করে নেয়। সারকথা হলো, সুগভীর গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত যে, মানুষকে এই পৃথিবীতে বিভিন্ন শক্তি-বৃত্তি সহকারে প্রেরণ করা হয়েছে আর এর প্রকৃতিগত শ্রেষ্ঠত্ব হলো, এ সকল শক্তিবৃত্তিকে যথাস্থানে কাজে লাগানো। রাগের স্থানে রাগ আর দয়ার স্থানে দয়া (প্রদর্শন করা উচিত)। এমন নয় যে, কেবল সহনশীলতা প্রদর্শিত হবে আর অন্য সকল শক্তি-বৃত্তিকে অকেজো ও পরিত্যক্ত ছেড়ে দিবে। অবশ্য সকল অভ্যন্তরীণ শক্তি-বৃত্তির মাঝে সহনশীলতা ও নমনীয়তার বৈশিষ্ট্য যথাস্থানে প্রকাশ করা মানুষের উত্তম গুণের পরিচায়ক,

কিন্তু মানবপ্রকৃতিরূপী বৃক্ষকে খোদা তা'লা বেশ কয়েক শাখায় বিভক্ত করেছেন, যেমন এর বিভিন্ন প্রকার শক্তিসামর্থ্য রয়েছে। শুধু একটি শাখা সবুজশ্যামল হলে পূর্ণাঙ্গীন আখ্যা পেতে পারে না বরং এর সবকটি শাখা যদি সবুজ-সতেজ হয় আর কোন শাখা ভারসাম্যের নিরিখে বাড়তি-ঘাটতির শিকার না হয় কেবল তবেই তা পূর্ণাঙ্গীন আখ্যা পাবে। বিবেকের নিরিখে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত, দুষ্কৃতকারীর দুষ্কর্ম নির্বিচারে মার্জনা করা মানুষের এহেন বৈশিষ্ট্য সর্বক্ষেত্রে ভাল বিবেচিত হতে পারে না বরং এই ধারণা যে ত্রুটিপূর্ণ, স্বয়ং প্রকৃতির নিয়মই তা প্রকাশ করে। কেননা আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, সত্যিকার পরিকল্পক খোদা, বিশ্ব ব্যবস্থার নিখুঁত পরিচালনা এর মাঝে অন্তর্নিহিত রেখেছেন যে, কখনও কোমলতা আর কখনও কঠোরতা প্রদর্শন করা উচিত আর কখনও মার্জনা এবং কখনও শাস্তি দেয়া উচিত। যদি কেবল কোমলতাই প্রদর্শিত বা নিছক কঠোরতাই প্রদর্শন করা হয়, তাহলে 'বিশ্ব ব্যবস্থা'ই ভেঙে পড়তো।

সুতরাং এর মাধ্যমে প্রমাণিত যে, সর্বদা-সর্বত্র মার্জনা করা সত্যিকার অর্থে পুণ্য নয় বরং এমন শিক্ষাকে সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা মনে করাই একটি ভ্রান্তি যাতে তারা নিপতিত, যাদের দৃষ্টি মানবপ্রকৃতির গভীরে পৌঁছে নি আর যাদের দৃষ্টি সেসকল শক্তি-বৃত্তি অবলোকন করা হতে বঞ্চিত থাকে, যা মানুষকে যথাস্থানে ব্যবহারের জন্য দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি সবসময়, স্থানে-অস্থানে একই শক্তিকে ব্যবহার করে আর অন্য সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে অকেজো অবস্থায় ছেড়ে দেয়, সে যেন খোদা-প্রদত্ত প্রকৃতিকে পরিবর্তন করতে চায়! আর সর্বময় প্রজ্ঞার অধিকারী খোদা তা'লার কর্মকে স্বীয় নির্বুদ্ধিতার কারণে আপত্তিকর আখ্যা দেয়। এটি কী কোন কাজের কথা হলো যে, আমরা সর্বদা স্থানকালপাত্রের দাবি উপেক্ষা করে আমাদের বিরুদ্ধে অন্যায়কারীদের অন্যায় নির্বিচারে উপেক্ষা করবো আবার কখনও এমন কোন সহানুভূতি প্রদর্শন করবো না যার কল্যাণে দুস্কৃতকারীর দুস্কৃতির চিকিৎসা হয়ে ভবিষ্যতে তার সংশোধন হয়ে যাবে? এটি জানাকথা, যেভাবে সকল ক্ষেত্রে শাস্তি দেয়া ও প্রতিশোধ নেয়া অপছন্দনীয় ও নৈতিক চরিত্রের পরিপন্থি কাজ, অনুরূপভাবে সবসময় এই নীতিই নির্ধারণ করা যে, কারো হাতে কোন অপরাধ সংঘটিত হলে নির্বিচারে তার অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হবে– এটিও সত্যিকার হিতাকাঙ্খার পরিপন্থি বিষয়। যে ব্যক্তি অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে সবসময়

ক্ষমা করে দেয় সে বিশ্ব ব্যবস্থার সেভাবেই শত্রু যেভাবে কোন ব্যক্তি সকল পরিস্থিতিতে প্রতিশোধপ্রবণ আর প্রতিহিংসাপরায়ণ। নির্বোধ যত্রতত্র মার্জনা ও ক্ষমা করা পছন্দ করে। একথা চিন্তা করে না যে, সবসময় ক্ষমা করলে বিশ্ব ব্যবস্থায় বিপত্তি দেখা দেয় আর এ কাজ স্বয়ং অপরাধীর জন্যও ক্ষতিকর কেননা এর মাধ্যমে তার অন্যায় অভ্যাস ক্রমশ পোক্ত হয়ে ওঠে আর দুষ্কৃতির অভ্যাস ধীরে ধীরে মজ্জাগত হয়ে যায়। কোন চোরকে শাস্তি না দিয়ে এমনিতেই ছেড়ে দিয়ে দেখ দ্বিতীয়বার কেমন রূপ প্রকাশ করে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে খোদা তা'লা স্বীয় এই প্রজ্ঞাপূর্ণ গ্রন্থে বলেন–

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِي الْاَلْبَابِ ○ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۚ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا

(সূরা আল বাকারা: ১৮০ ও সূরা আল মায়েদা: ৩৩)

অর্থাৎ হে বুদ্ধিমানগণ! হত্যাকারীকে হত্যা করা আর অপরাধীর অপরাধ অনুসারে শাস্তি দেয়ার মাঝেই তোমাদের জীবন নিহিত। যে একজন মানুষকে বিনা কারণে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে সে যেন পুরো মানবতাকে হত্যা করল। অনুরূপভাবে বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى

(সূরা আন নাহ্ল: ৯১)

অর্থাৎ খোদা নির্দেশ দিচ্ছেন, 'তোমরা যথাস্থানে ন্যায়বিচার, অনুগ্রহ ও আত্মীয়সুলভ মমতা প্রদর্শন করো।' সুতরাং স্মরণ রাখা উচিত যে, ইঞ্জিলের শিক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের সেই মান হতে নিতান্তই অধঃপতিত এবং নিম্নমানের যার কল্যাণে বিশ্বব্যবস্থা এক সূত্রে গাঁথা ও সুদৃঢ়। সেই শিক্ষাকে সম্পূর্ণ মনে করাও চরম ভুল। এমন শিক্ষা আদৌ সম্পূর্ণ হতে পারে না; বরং এটি সে যুগের অপকর্ম বা অপচেষ্টা যখন বনী ইসরাঈলী জাতির পারস্পরিক দয়া-মায়া মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছিল আর নির্দয়তা, নিষ্ঠুরতা, পাষণ্ডতা, হৃদয়ের কঠোরতা ও প্রতিহিংসা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। যেমনটি তারা চরম বিদ্বেষের প্রতি আকৃষ্ট ছিল, অনুরূপভাবে তাদেরকে পরম দয়ামায়া ও মার্জনার প্রতি আকৃষ্ট করাই ছিল খোদার অভিপ্রায়। কিন্তু করুণা ও মার্জনার এই শিক্ষা এমন শিক্ষা ছিল না, যা চিরস্থায়ী হতে পারত। কেননা এর ভিত্তি প্রকৃত (শিক্ষার) প্রাণকেন্দ্রের ওপর ছিল না বরং (এটি) বিশেষ স্থানের জন্য জারি বিধানতুল্য যা

বিদ্রোহী ইহুদিদের সংশোধনের জন্য সময়ের একটি বিশেষ দাবি ছিল মাত্র; আর এ ব্যবস্থা ছিল সাময়িক। ঈসা (আ.) ভালভাবেই জানতেন যে, খোদা অচিরেই এই সাময়িক শিক্ষাকে নিশ্চিহ্ন করে সেই পূর্ণ শিক্ষা এই পৃথিবীতে পাঠাবেন যা সারা পৃথিবীকে সত্যিকার পুণ্যের প্রতি আহ্বান করবে আর খোদার বান্দাদের জন্য সত্য ও প্রজ্ঞার দরজা খুলে দেবে। সে কারণেই তাকে বলতে হয়েছে যে, এখনো অনেক কথা শেখার বাকী আছে যা তোমরা আপাতত সহ্য করতে পারবে না; কিন্তু আমার পর এক দ্বিতীয় ব্যক্তি আসবেন। তিনি সবকিছু স্পষ্ট করে বলবেন আর ধর্মকে পরম মার্গে পৌঁছাবেন। সুতরাং ইঞ্জিল যেমন অসম্পূর্ণ ছিল হযরত মসীহ্ তা ঠিক তেমনই রেখে আকাশে গিয়ে আসন গেড়েছেন আর দীর্ঘকাল পর্যন্ত সেই অসম্পূর্ণ গ্রন্থই তাদের হাতে রয়ে গেলো। এরপর সেই নিষ্পাপ নবীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে খোদা কুরআন শরীফ অবতীর্ণ করেছেন আর এমন পূর্ণাঙ্গীন শরীয়ত দান করেছেন, যাতে তৌরাতের মত অযৌক্তিকভাবে স্থানে-অস্থানে লেখা নেই, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত ফেলে দেয়া আবশ্যক। অধিকন্তু ইঞ্জিলের ন্যায় এই নির্দেশও প্রদান করে না, ক্ষমতাশালী লোকদের চড় খাওয়া উচিত! বরং উৎকৃষ্ট সেই বাণী সাময়িক সব চিন্তাধারা হতে সরে এসে সত্যিকার ও স্থায়ী পুণ্যের প্রতি অনুপ্রাণিত করে আর সত্যিকার অর্থে যাতে কোন কল্যাণ নিহিত থাকে তা করার তাগাদা প্রদান করে; হোক না তা কঠোর কিংবা কোমল। যেমন তিনি বলেন–

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ

(সূরা আশ্ শূরা: ৪১)

অর্থাৎ পাপের শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের দাবি হলো, পাপীকে পাপের শাস্তি ততটা দেয়া উচিত যতটা সে অন্যায় করেছে কিন্তু যে ব্যক্তি মার্জনা করে কোন সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার প্রতিদান খোদার হাতে। তবে, এমন মার্জনা হওয়া উচিত নয় যার ফলাফল হবে নেতিবাচক; অনুরূপভাবে শরীয়তের সম্পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি এই আয়াতেও ইঙ্গিত করেছেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ

(সূরা আল মায়েদা: ৪)

অর্থাৎ আজ আমি ধর্মের জ্ঞানকে পরম মার্গে পৌঁছিয়েছি এবং স্বীয় নিয়ামতকে উম্মতে মুহাম্মদিয়্যার জন্য পূর্ণ করেছি। এখন এই পুরো গবেষণা হতে

প্রমাণিত যে, ইঞ্জিলের শিক্ষা অনন্য ও অদ্বিতীয় হওয়া তো দূরের কথা এটি সম্পূর্ণও নয়। অবশ্য ইঞ্জিল যদি শব্দ ও অর্থের নিরিখে খোদার বাণী হতো আর তাতে এমন বৈশিষ্ট্য পাওয়া যেতো যা মানুষের বাণী বা কথায় থাকা অসম্ভব, তাহলে তা নিঃসন্দেহে অতুলনীয় আখ্যায়িত হতো; কিন্তু সেই সকল গুণাবলী ইঞ্জিল হতে সেযুগেই বিদায় নিয়েছে যখন খ্রিষ্টান বন্ধুরা অবাধ্য প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে এতে হস্তক্ষেপ করা আরম্ভ করেছে। সেই শব্দও রইল না, সেই অর্থও থাকল না, সেই প্রজ্ঞাও না এবং সেই তত্ত্বজ্ঞানও না। সুতরাং হে বন্ধুগণ! কিছুটা বিবেক খাটিয়ে উত্তর দিন! যেখানে একদিকে ঈমানের সম্পূর্ণতা অনন্য গ্রন্থের ওপর নির্ভরশীল সেখানে আপনাদের অবস্থা হলো, আপনারা কুরআন শরীফকেও মানলেন না আর এমন কোন গ্রন্থও বের করে দেখালেন না– যা হবে অনন্য! তাহলে প্রশ্ন হলো, আপনারা বিশ্বাস ও ঈমানের পরম মার্গে কীভাবে পৌঁছতে পারেন আর কেনইবা নিশ্চিন্তে বসে আছেন? অন্য কোন গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়ার অপেক্ষা আছে কি? নাকি ব্রাহ্মণজী সাজার ইচ্ছা আছে? (সত্য কথা হলো) ঈমান ও খোদা নিয়ে আপনাদের কোন মাথা ব্যথাই নেই। এখন দেখুন! কুরআন শরীফের অনন্য শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করা আপনাদেরকে কোথা হতে কোথায় পৌঁছিয়েছে। একটু অপেক্ষা করুন, এখানেই কথার শেষ নয়! আপনাদের এই বিশ্বাসের কারণে খোদার অস্তিত্বও নিরাপদ থাকে না, কেননা আমরা পূর্বেই লিপিবদ্ধ করেছি, খোদার অস্তিত্বের বড় প্রমাণ হলো, যা কিছু তাঁর পক্ষ থেকে উৎসারিত হয়েছে তা এতটা অনন্য যে তা সেই অনন্য স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করছে।

সুতরাং যেহেতু সেই অনন্যতা ইঞ্জিলে প্রমাণিত হয় নি, অপরদিকে কুরআন শরীফকেও আপনারা গ্রহণ করেন নি! এমতাবস্থায় আপনারা এটি মানতে বাধ্য হয়েছেন, যা কিছু খোদার পক্ষ থেকে উৎসারিত তার অনন্য হওয়া আবশ্যক নয়; আর একই বিশ্বাসের কারণে আপনাদের জন্য এ কথা স্বীকার করা আবশ্যক হয়ে পড়ল যে, যে সকল বিষয় খোদার পক্ষ থেকে সূচিত ও উৎসারিত, অন্যরাও সেসব বানাতে সক্ষম। সুতরাং এ কথা বলার ফলে বিশ্বস্রষ্টাকে সনাক্ত করার মত কোন নিদর্শন বা প্রমাণ আর বাকী থাকল না। এককথায় আপনাদের ধর্মের সারকথা হলো, খোদার অস্তিত্বের কোন যৌক্তিক প্রমাণ নেই। সুতরাং এখন আপনারাই সুবিচার করুন যে, আপনাদের নাস্তিকতায় কোন ঘাটতি আছে কি? আপনাদের মাঝে কি এমন কোন ব্যক্তি নেই যে এই সূক্ষ্ম বিষয়কে বুঝবে, অর্থাৎ কুরআনকে অস্বীকার করা সত্যিকার

অর্থে রহমান আল্লাহ্‌র ওপরই আক্রমণ করার নামান্তর? যে গ্রন্থের আলোকে তাঁর গুণাবলীর অনন্যতা প্রমাণিত হয়, তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়, তাঁর ক্রটিমুক্ত ও পবিত্র হওয়ার বিষয়টি স্বীকৃত, তাঁর একত্ববাদের বিস্তার ঘটে, তাঁর হারিয়ে যাওয়া তৌহীদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়; সেই গ্রন্থের প্রতিই আপনারা বিমুখতা প্রদর্শন করেন– এটি কি দুর্ভাগ্য নয়?

হে সাথিরা! কুরআন শরীফের অনন্যতা ও সত্যতা এখন সম্পূর্ণভাবে স্পষ্ট হয়ে গেছে, তোমরা গোপন করলেও তা গোপন থাকতে পারে না। যেমনটি তোমরা প্রত্যক্ষ করে থাক যে, মৌসুমী ফলের ফলন ও এর পাকাকে কেউই বাধাগ্রস্ত করতে পারে না, অনুরূপভাবে এখন কুরআনের সত্যতা প্রকাশ হওয়ার সময় এসে গেছে; কেউ এটিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা এখন চাঁদে থুতু ফেলোনা, পাছে তা তোমাদেরই চোখে এসে পড়ে। কোন কোন খ্রিষ্টান ইঞ্জিলকে দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে নিরাশ হয়ে ফয়েযীর মওয়ারেদুল কলম উপস্থাপন করে আর বলে যে, ফয়েযীর এই পুরো গ্রন্থ নোক্তাবিহীন, তাই স্বীয় বাগ্মিতা ও প্রাঞ্জলতায় তাও কুরআনের সমতুল্য বরং এর চেয়ে উৎকৃষ্ট পরিতাপের বিষয় হলো, নির্বোধদের এতটা বোধবুদ্ধিও নেই যে, এই বৃথা কাজ প্রকৃত বাগ্মিতা ও (ভাষার) আলংকারিকতার গণ্ডি বহির্ভূত আর তা এমন কোন রচনা নয় যার কল্যাণে কোন গ্রন্থ অতুলনীয় ও অনন্য হতে পারে। সত্যকথা হলো নোক্তাবিহীন বাক্যাবলী লিপিবদ্ধ করা অত্যন্ত সহজ কাজ। তা এমন কোন কাজ বা সৃষ্টি নয় যা সাধন করা মানুষের জন্য দুষ্কর।

এ কারণে অনেক লেখক নিজেদের আরবী ও ফারসী লেখায় এমন নোক্তাশূন্য বাক্যাবলী লিখেছে আর এখনও লিখে থাকে বরং কোন কোন লেখকের এমন বাক্যাবলীও রয়েছে যার সকল অক্ষরই নোক্তাযুক্ত; নোক্তাবিহিন কোন অক্ষর এতে নেই। কিন্তু কুরআন শরীফের বাগ্মিতা ও ভাষার আলংকারিকতা যেসকল আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ ও বিশেষত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেসব এমন বিষয়, বুদ্ধিমান-বিচক্ষণ মানুষ ভাবলেই নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারে যে, পবিত্র সেই বাণী বা গ্রন্থ মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে। কেননা যেভাবে আমরা লিখে এসেছি, কুরআন শরীফ স্বীয় ভাষাশৈলী ও আলংকারিকতাকে হারীরি ও ফায়েযীর ন্যায় লেখকদের রচনার মত বৃথাচারের আদলে বর্ণনা করে নি। আর এই পবিত্র বাণীতে কোন প্রকার বৃথা ও বাজে কথা এবং মিথ্যাচারের কোন প্রকার সংশ্রবও নেই বরং কুরআন পবিত্র স্বীয় বাগ্মিতা ও আলঙ্কারিকতাকে সত্য ও

প্রজ্ঞা এবং প্রকৃত প্রয়োজনের নিরিখে ব্যক্ত করেছে এবং অতি সংক্ষিপ্তভাবে সাথে ধর্মীয় সকল সত্যকে পরিবেষ্টন করে দেখিয়েছে। যেমন এতে সকল বিরোধী ও অস্বীকারকারীর মুখ বন্ধ করার জন্য অগণিত সুমহান ও সমুজ্জ্বল প্রমাণাদি রয়েছে আর মু'মিনদের বিশ্বাসের পূর্ণতার জন্য সহস্র সহস্র সূক্ষ্ম সত্য-তত্ত্বের একটি গভীর ও স্বচ্ছ সমুদ্র প্রবহমান দেখা যাচ্ছে। যে সকল বিষয়ে ত্রুটি দেখেছে, সেসবের সংশোধনের প্রতি জোর দিয়েছে। কোন বাড়াবাড়ি বা শৈথিল্য যত প্রবল দেখেছে একই প্রাবল্যের সাথে তা প্রতিহতও করেছে। যেসব প্রকার ও যত ধরনের রোগব্যাধি বিস্তৃত দেখেছে সেসবের ব্যবস্থাপত্র বা চিকিৎসাও প্রস্তাব করেছে। বিকৃত ধর্মাবলীর সকল সন্দেহের নিরসন করেছে। সকল আপত্তির উত্তর দিয়েছে। এমন কোন সত্য নেই যা বর্ণনা করে নি। কোন ভ্রষ্ট দল নেই যার (দৃষ্টিভঙ্গির) খণ্ডন করে নি। আর পরাকাষ্ঠা দেখুন, এমন কোন শব্দ নেই যা বিনা প্রয়োজনে লিখেছে এবং এমন কোন কথা নেই যা অযথা-অস্থানে বর্ণনা করে থাকবে। আর বৃথা লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে এমন কোন শব্দ এতে নেই।

এসব বিষয়ের নিখুঁত ব্যবস্থা নেয়া সত্ত্বেও বাগ্মিতার সুমহান সেই মান উপহার দিয়েছে যার চেয়ে বেশি ভাবাই যায় না। বাক্যালঙ্কারকে এমন উৎকর্ষ পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে, পরম সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করে, সংক্ষিপ্ত কিন্তু যুক্তিসমৃদ্ধ বর্ণনার মাধ্যমে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সকল জ্ঞানভাণ্ডার একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে পুরে দিয়েছে। যেন সে মানুষ অগণিত-অসহনীয় মাথাব্যথা হতে মুক্তি লাভ করে যার আয়ুষ্কাল সংক্ষিপ্ত অথচ কাজ অনেক। এই প্রাঞ্জলতার কল্যাণে ইসলামী শিক্ষামালা প্রচারে যেন সাহায্য লাভ হয় আর যেন মুখস্থ করা ও স্মরণ রাখা সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। এখন এই উন্নত সাহিত্যমান ও আলংকারিকতার বিপরীতে মানবীয় গ্রন্থাবলী কত (ঘৃণ্যভাবে) মিথ্যা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ এবং আজেবাজে কথাবার্তায় পরিপূর্ণ আর এসব গ্রন্থের বাক্যাবলী কত অপ্রয়োজনীয়ভাবে ও অযথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা দেখা উচিত। শব্দাবলীকে উদ্দিষ্ট-অভীষ্ট অর্থের অধীনস্থ করার সুযোগ তাদের আদৌ হয় নি বরং এসবের অর্থ শব্দের পেছনে ছুটে বা শব্দাবলীরই অন্ধ অনুকরণ করে সত্য, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, প্রয়োজন এবং উপযোগিতা ও উপযুক্ততা হতে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত ও রিক্তহস্ত। যেহেতু তারা সত্য ও প্রকৃত প্রয়োজনের দাবিকে বিসর্জন দিয়েছে আর প্রতিটি শব্দের ক্ষেত্রে মিথ্যাচার বা অপলাপ অথবা বৃথাচার ও অপ্রয়োজনীয় বাক্য ব্যয়ের পন্থা অবলম্বন করলো, সেখানে কুরআন শরীফের

বাগ্মিতার সাথে তাদের কীইবা সম্পর্ক? এখানে একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, যেহেতু কুরআনের প্রাঞ্জলতা ও বাগ্মিতা বৃথা ও বাজে রীতিনীতি হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ও পবিত্র, তাই এমন পরিস্থিতিতে এটি সর্বময় প্রজ্ঞা, আল্লাহ্‌র পবিত্র মহিমা-পরিপন্থী বিষয় হতো যদি তিনি বাচাল কবিদের ন্যায় নোকতাশূন্য বা নোকতাযুক্ত বাক্যমালায় স্বীয় বাণী অবতীর্ণ করতেন। কেননা এসব হলো নিরর্থক কার্যকলাপ যাতে লাভের লেশমাত্র নেই। আর নিরঙ্কুশ প্রজ্ঞা খোদার মহিমা এর ঊর্ধ্বে যে তিনি কোন বাজে পন্থা অবলম্বন করবেন। যেখানে তিনি নিজেই বলেছেন,

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ

(সূরা আল মু'মিনুন: ৪)

অর্থাৎ যারা বিশ্বাসী তারা বৃথা কার্যকলাপ এড়িয়ে চলে আর বৃথা কার্যকলাপে নিজেদের সময় নষ্ট করে না সেখানে তিনি নিজেই কীভাবে বৃথা কর্যকলাপে লিপ্ত হতে পারেন? যেখানে তিনি স্বীয় গ্রন্থের প্রশংসায় নিজেই বলেছেন,

وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ○ لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ

(সূরা ইয়াসিন: ৩ ও সূরা হা মীম আস্ সাজদা: ৪৩)

অর্থাৎ কুরআন প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ, মিথ্যা এর ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারে না– এই সত্যের বিদ্যমানতায় তিনি নিজেই কীভাবে একে মিথ্যায় ভরে দিতে পারেন? এ কাজের জন্য ফয়েযীর ন্যায় কোন নির্বোধ ও অপলাপকারীরই প্রয়োজন–

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ ... وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ

(সূরা আন নূর: ২৭)

খোদার বাণীকে এ অর্থে নোকতাশূন্য জ্ঞান করা উচিত যে, তা বৃথাচার, মিথ্যা ও অপলাপের কলুষ থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। অধিকন্তু এর বাগ্মিতা ও আলংকারিকতা হলো সেই অনন্ত মণিমুক্তা যার মাধ্যমে পৃথিবীর কল্যাণ সাধন হয়। আধ্যাত্মিক ব্যাধি হতে আরোগ্য লাভ হয়। সত্য ও সূক্ষ্ম বিষয়াদি অবগত হওয়া সন্ধানীদের জন্য সহজ হয়। কেননা খোদার বাগ্মিতাপূর্ণ বাণী প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানকে অতি সংক্ষেপে নিপুণ ধারাবাহিতকা ও গাঁথুনিতে, অতি স্বচ্ছভাবে ও মাধুর্যের সাথে লিপিবদ্ধ করে এবং সেই রীতি অবলম্বন করে যার কল্যাণে হৃদয়ে সুগভীর প্রভাব পড়ে আর গুটিকয়েক বাক্যে সেই ঐশী জ্ঞান পরিবেষ্টিত

বা অন্তর্নিবিষ্ট হয় যা পৃথিবীর আদি হতে কোন গ্রন্থ বা রেজিস্ট্রার-টেক্সট আয়ত্ব করতে পারে নি। এটিই সত্যিকার বাগ্মিতা ও আলংকারিকতা যা মানবাত্মার উৎকর্ষ সাধনে সাহায্যকারী ও সহযোগী, যার মাধ্যমে সত্যান্বেষী পরম অভীষ্ট লক্ষ্যে পোঁছে যায়। এটিই সেই ঐশী সৃষ্টি বা ঐশী শিল্প যার সম্পূর্ণতা ঐশী শক্তি ছাড়া এবং তাঁর ব্যাপক জ্ঞান ছাড়া সম্ভব নয়। স্বীয় বাণীর প্রতিটি বাক্যের সত্যতা প্রমাণের দায়িত্ব খোদা তা'লার আর তাঁর উক্তিতে যা কিছু রয়েছে তা অতীতের সংবাদ হোক এবং বা অতীতের স্মৃতিচিন্নই হোক অথবা ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন সংবাদ বা ভবিষ্যদ্বাণীই হোক কিংবা ধর্মীয় ও জ্ঞানগত সত্যই হোক না কেন, এর পুরোটাই কোনরূপ মিথ্যা, কোন প্রকার দুর্বলতা ও অপলাপের কলুষ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। এতে বিন্দুমাত্রও যদি স্ববিরোধ বা বৃথাচার বা অহংকারমূলক উক্তি বিদ্যমান থাকে তাহলে তা আর খোদার বাণী থাকে না। তাই তিনি স্বয়ং স্বীয় সকল বিবৃতির সত্যতার প্রমাণ দিয়ে থাকেন।

কিন্তু কোন কবি এ কথার দায়িত্ব নিতে পারে না আর কখনো পারেও নি যে, তার উক্তি সকল প্রকার মিথ্যা, ক্রীড়াকৌতুক ও অপ্রয়োজনীয় কথা হতে মুক্ত এবং প্রয়োজনীয় ও আবশ্যকীয় কথায় সমৃদ্ধ থাকবে। সুতরাং কবিদের বৃথা কথাবার্তা যেখানে সে মর্যাদা রাখে না যা খোদার পবিত্র বাণীর রয়েছে আর এবিষয়ে কবিরা দাবিও করে না আর দায়িত্বও নেয় না বরং নিজেরাই নিজেদের দুর্বলতা স্বীকার করে, সেখানে খোদার বাণীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাদের তুচ্ছ রচনা উপস্থাপন করা কত বড় বোকামী ও নির্বুদ্ধিতা! কবি মরে গেলেও স্বীয় রচনায় সত্যতা, সততা ও সত্যিকার প্রয়োজনের দাবি পূরণের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিতে পারে না। বৃথাচার করা বই তারা কথাই বলতে পারে না। তাদের সকল কাজ অত্যুক্তি ও মিথ্যার ওপরই নির্ভরশীল। মিথ্যা না থাকলে বা বৃথা কথা না থাকলে কবিতাও থাকবে না। তুমি তাদের এক একটি বাক্য খতিয়ে দেখ, তাতে সত্য ও সূক্ষ্মতা কতটা রয়েছে, সততা ও সত্যের প্রতি কতটা দৃষ্টি রাখা হয়েছে, সত্য আর প্রজ্ঞার ওপর কতটা প্রতিষ্ঠিত, আর ন্যায়সঙ্গত এমন কোন্ প্রয়োজনের নিরিখে সেসকল কথা তাদের মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে আর কোন্ কোন্ অনন্য ও অতুলনীয় রহস্য তাতে প্রচ্ছন্ন আছে? –তাহলে জানতে পারবে যে, তাদের নিষ্প্রাণ বাক্যাবলীতে এসকল বৈশিষ্ট্যের কোনটিই পরিলক্ষিত হয় না। এদের বাস্তব অবস্থা যা হয়ে থাকে তা

হলো, কবিতার ছন্দ ও শব্দের মিল যেদিকে আছে বলে মনে হবে সেদিকেই তারা ছুটবে। আর যে বিষয় তাদের হৃদয়ে মোহনীয় বলে মনে হয় তার পেছনেই ছুটে চলে। সত্য ও প্রজ্ঞার অনুসরণও নেই আর বৃথাচার এড়ানোর দিকেও কোন দৃষ্টি নেই। কোন্ কথা বলার আবশ্যকতা কি আর একে পরিত্যাগ করলে কি ভয়াবহ ক্ষতির মধ্যে নিপতিত হতে পারে– এই ধারণাও তাদের নেই? অনর্থক বাক্যের সাথে বাক্য যোগ করতে থাকে। মাথার স্থানে পা আর পায়ের স্থানে মাথা জুড়ে দেয়। মরীচিকার মত ঔজ্জ্বল্য অনেক, কিন্তু সন্ধান করলে দেখা যাবে, বাস্তবে কিছুই নেই। ভেল্কিবাজের মত নিছক খেল-তামাশাই সার, বস্তুনিষ্ঠ কিছু নেই। এরা হলো অনাথ, হতদরিদ্র, শক্তিহীন, অক্ষম ও অযোগ্য; চোখ অন্ধ, আর তাতে রয়েছে পর্দা। তাদের সম্পর্কে একান্ত ছাড় দিয়ে যদি বলতে হয় তাহলে একথা বলতে পারেন যে, তারা সবাই দুর্বল ও গুরুত্বহীন হওয়ার ক্ষেত্রে মাকড়সার ন্যায়। খোদা তা'লা তাদের সম্পর্কে কতইনা সুন্দর কথা বলেছেন,

وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ○ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِىْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ○ وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ○ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ انْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ؕ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ○

(সূরা আশ শো'য়ারা, ২২৫-২২৮)

অর্থাৎ কবিদের পিছনে সেসকল লোকই চলে যারা সত্য ও প্রজ্ঞার রাস্তা ছেড়ে দিয়েছে। তুমি কি দেখো না, কবি তারা যারা ছন্দ ও শব্দের সন্ধানে সকল জঙ্গলে হাবুডুবু খায়। সত্য উৎসের সাথে সম্পর্কযুক্ত কথাবার্তার ওপর তারা থিতু নয় আর তারা যা বলে তা করেও না। সুতরাং সীমালজ্ঘনকারী, যারা খোদার সত্য কথাবার্তাকে কবিদের কথার সাথে তুলনা করে, তারা কোন্ দিকে যাচ্ছে তা অচিরেই জানতে পারবে। এখন বুদ্ধিমানের ভেবে দেখা উচিত, নিরঙ্কুশ সত্যকে সম্পূর্ণ বৃথা বিষয়ের সাথে বা অন্ধকারকে আলোর সাথে তুলনা করার চেয়ে বড় অন্যায় আর হতে পারে কি? প্রশ্ন হলো, এমনসব গ্রন্থের এই পবিত্র গ্রন্থের সাথে কোন তুলনা হয় কি, যার চেহারায় অপলাপের কালিমা, মিথ্যা এবং অযৌক্তিক কথাবার্তার কলঙ্ক এতটা ছড়িয়ে গেছে, যা দেখে সকল পবিত্র হৃদয়ের মানুষের ঘৃণা হয়? প্রশ্ন হলো, এমনসব গ্রন্থ সেসব পবিত্র গ্রন্থের সদৃশ আখ্যা পেতে পারে কি যেসব গ্রন্থের বিষয়বস্তু কুষ্ঠ রোগীর

রক্তের ন্যায় দূষিত? না, মোটেই নয়। যদিও বিদ্বেষ সেই ভয়াবহ আপদ যা বোধবুদ্ধি কোনটিকে সুস্থ ও সঠিক থাকতে দেয় না। শ্রবণশক্তি আর দৃষ্টিশক্তি, কোনটিই এর ফলে নিরাপদ থাকে না। কিন্তু মানুষের এটিও ভেবে দেখা উচিত, যেই দুটি জিনিসের মাঝে আদৌ কোন সাদৃশ্য নেই সেগুলোকে অনর্থক পরস্পরের সৃদশ আখ্যা দেয়ার ফলাফল সদা এটিই দাঁড়ায় যে, এমন লোকদেরকে বুদ্ধিমান মানুষেরা 'উন্মাদ' বলতে আরম্ভ করে।

হে খ্রিষ্টান ভাইয়েরা! আপনারা হিন্দুদের রীতি অনুসরণ করবেন না। কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হওয়ার যুগে আপনাদের মাঝে সৎ প্রকৃতির এমন মানুষ অনেক ছিলেন, কুরআন শুনে যাদের অশ্রুধারা আর বাঁধ মানতো না। সেসকল পুণ্যবান পাদরিদের স্মরণ কর যাদের সাক্ষ্য কুরআন শরীফে উল্লেখ রয়েছে আর যারা কুরআন শুনে সেজদায় অশ্রু বিসর্জন দিতেন। কুরআনের মাহাত্ম্যই তাদেরকে কলেমা পাঠে বাধ্য করেছে এবং সকল ঐশী গ্রন্থের ওপর স্বীয় শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্বীকার করিয়েছে। এখন আপনাদের দৃষ্টিতে সেই কুরআন হারীরি এবং ফয়েযীর বৃথাচারের সমান নয়। এই ঘৃণ্য কুফর খোদার পছন্দ নয়। যদি আপনারা কুরআনের মত বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের কোন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে দেখাতেন তাহলে কোন বিবাদই ছিল না। কিন্তু আপনারা এমন কোন্ দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে পুরোপুরি ব্যর্থ ও নির্বাক। তাই প্রশ্ন হলো, চোখ থাকা সত্ত্বেও আপনারা দেখেন না কেন? কান থাকা সত্ত্বেও শুনেন না কেন? হৃদয় থাকা সত্ত্বেও বুঝেন না কেন? যদি ফয়েযী ও হারীরি আপনাদের মতো বুদ্ধিমান হতো তা হলে তারা নিজেরাই দাবি করত যে, আমরা কুরআনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছি। কিন্তু আমি দোয়া করব, কোন লেখাপড়া জানা মানুষের বিবেকবুদ্ধি যেন এত নিম্নমানের না হয়। আপনারা নিজেরাই বলুন, আপনাদের কাছে এমন কোন্ গ্রন্থ আছে যাতে কুরআনের মতো এই দাবি বিদ্যমান?

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا○ وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ○ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ○

(সূরা বনী ইসরাঈল: ৮৯ ও সূরা আল বাকারা: ২৪-২৫)

অর্থাৎ তাদের বলে দাও, সকল জ্বিন ও মানব কুরআনের মত কোন বাণী রচনা করতে যদি ঐকমত্যে পৌঁছে আর পরস্পরকে সাহায্য করও তা করা তাদের জন্য সম্ভব হবে না। আর যদি কুরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে অবতীর্ণ হবার বিষয়ে তোমাদের সন্দেহ থাকে তাহলে তোমরা এর সূরাগুলোর মতো কোন একটি সূরা রচনা করে দেখাও, যদি তা করতে পার। স্মরণ রেখো! আদৌ বানাতে সক্ষম হবে না; তাহলে সেই অগ্নিকে ভয় কর যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। আমি পুনরায় বলছি, কুরআনের মতো কোন বাণী সন্ধানের চিন্তা করার পূর্বে তোমাদের প্রথমে এটি দেখে নেয়া একান্ত আবশ্যক যে, সেই দ্বিতীয় গ্রন্থ বা বাণী এই দাবি করেছে কিনা, যে দাবি উল্লিখিত আয়াতে এখনই শুনেছ? কেননা যদি কোন বক্তা এই দাবি না করে যে, আমার উক্তি বা বাণী অনন্য ও অতুলনীয় যার মোকাবিলা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সত্যিকার অর্থে সকল জিন ও মানব ব্যর্থ ও নির্বাক, তাহলে এমন বক্তার কথাকে অনর্থক অনন্য ও অতুলনীয় মনে করা সত্যিকার অর্থে সেই প্রসিদ্ধ প্রবাদ 'বাদী নীরব সাক্ষী সরব' এরই সত্যায়ন। এছাড়া কোন বাণী বা রচনাকে কুরআনের শিক্ষার অনুরূপ ও সদৃশ আখ্যা দিলে কুরআনে যেসকল বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ শ্রেষ্ঠত্বের সমন্বয় সাধিত রয়েছে তাতেও তা থাকার প্রমাণ দেয়া উচিত, যাকে দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। কেননা উপস্থাপিত দৃষ্টান্তে যদি কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের কিছুই না থাকে তাহলে এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের পেছনে নিজের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করা ছাড়া আর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে? ভালোভাবে স্মরণ রেখো, যেভাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উৎসারিত সকল বস্তুর দৃষ্টান্ত ও সাদৃশ্য উপস্থাপন করা অসম্ভব, অনুরূপভাবে কুরআন শরীফের সমকক্ষ কোন দৃষ্টান্ত উপস্থাপনও অসম্ভব।

একারণেই আরবের সনামধন্য কবিদের আরবী যাদের মাতৃভাষা ছিল, আর যারা প্রকৃতিগতভাবে ও ভাষা সম্পর্কে গবেষণার নিরিখে ভাষাগত রুচিবোধ সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত ছিল; তাদের মানতে হয়েছে যে, কুরআন শরীফ রচনা করা মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে। আর একথাটি কেবল আরবদের জন্য নয়, বরং তোমাদের অনেকেই অন্ধ ছিল, এই পূর্ণ জ্যোতির কারণে তারা দৃষ্টিবান হয়ে উঠেছে আর অনেকেই বধির ছিল কিন্তু এর মাধ্যমে শোনা আরম্ভ করেছে, এখনও সেই জ্যোতি চতুর্দিক থেকে অন্ধকারকে দূরীভূত করে চলেছে। কুরআনের প্রকৃত জ্যোতি হৃদয়গুলোকে আলোকিত করে চলেছে। বাস্তবে যা

ঘটছে, তা হলো মানুষের চোখ যতই খুলছে ততটাই তারা কুরআনের মাহাত্ম্য স্বীকার করছে। যেমন, বড় বড় বিদ্বেষী ইংরেজদের মধ্য হতেও যারা জ্ঞানী ও দার্শনিক আখ্যায়িত হতো তারা স্বয়ং বলে উঠেছে যে, কুরআন শরীফ স্বীয় বাগ্মিতায় ও আলঙ্কারিকতায় অনন্য। এমনকি গডফ্রি হিগিনস সাহেবের মতো একান্ত উদ্যোগী খ্রিষ্টান স্বীয় গ্রন্থের ২২১তম দফায় লিখতে বাধ্য হয়েছেন যে, সত্যিকার অর্থে যেমন মহান আয়াত বা বাক্যাবলী কুরআনে বিদ্যমান এর চেয়ে মহান কিছু খুব সম্ভব সারা বিশ্বেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। অনুরূপভাবে ইয়ুট সাহেবকে বাধ্য হয়ে নিজ গ্রন্থে একই সাক্ষ্য দিতে হয়েছে। আর্যসমাজীরা, এলহাম ও ঐশীবাণীকে যারা বেদ-এ শেষ করে বসে আছে, তারাও খ্রিষ্টানদের ন্যায় পবিত্র কুরআনের অনন্যতা অস্বীকার করে স্বীয় বেদের বাগ্মিতা ও আলংকারিকতার দাবি করে। কিন্তু আমরা বারংবার উদাসীনদের সামনে এ বিষয় প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করি যে, পবিত্র কুরআনের অনন্যতাকে অস্বীকার করা কেবল তার জন্য যুক্তিযুক্ত হতে পারে, যে এ গ্রন্থে বা কুরআনে উল্লিখিত অনন্যতার যুক্তিগুলি অন্য কোন গ্রন্থেও বের করে দেখাতে পারবে। সুতরাং আর্যসমাজীদের যদি নিজেদের বেদ সম্পর্কে এই আশা থাকে যে, তা কুরআন শরীফের মোকাবিলা করতে পারবে তাহলে তাদেরও বেদের শক্তি প্রদর্শনের স্বাধীনতা রয়েছে।

কিন্তু কেবল দাবিসর্বস্ব হওয়া এবং বখাটে কথাবার্তা মুখে আনা ভাল লোকদের কাজ নয়। যদি নিজের দাবির স্বপক্ষে কোন প্রমাণ থাকে মানুষের ভদ্রতা ও বিবেকের দাবি হলো তা উপস্থাপন করা, নতুবা এমন দাবি করা হতে মুখ বন্ধ রাখাই ভালো যার সারকথা অপলাপ ও বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই নয়। বুঝতে হবে, কুরআন শরীফের বাগ্মিতা একটি পূতপবিত্র বাগ্মিতা যার মহান উদ্দেশ্য হলো প্রজ্ঞা ও তাকওয়ার জ্যোতিকে বাগ্মিতাপূর্ণভাবে বর্ণনা করে সকল ধর্মীয় জ্ঞানের সত্য তথ্য ও সূক্ষতত্ত্ব একটি সংক্ষিপ্ত অথচ যুক্তিপ্রমাণে সমৃদ্ধ বাক্যে সন্নিবেশিত করা। যেখানে বিশদ বিবরণ দেয়া একান্ত আবশ্যক সেখানে তার বিস্তারিত আলোচনা হওয়া আর যেখানে সংক্ষেপে উপস্থাপন যথেষ্ট সেখানে সংক্ষেপ করা। কোন ধর্মীয় সত্য যেন এমন না থাকে যার সংক্ষিপ্ত বা বিশদ উল্লেখ থাকবে না। এর পাশাপাশি সত্যিকার প্রয়োজনের নিরিখে তা উল্লেখ থাকা আবশ্যক, অপ্রয়োজনীয়ভাবে নয়। অধিকন্তু বাণীও এমন উন্নত সাহিত্যমানের, সহজবোধ্য ও সুসংহত হওয়া বাঞ্ছনীয় যার চেয়ে উত্তম কালাম

বা বাণী গঠন বা গ্রন্থ প্রণয়ন আদৌ যেন কারো পক্ষে সম্ভব না হয়। একইসাথে সেই বাণী আধ্যাত্মিক কল্যাণেও সমৃদ্ধ হওয়া উচিত। এটিই কুরআনের দাবি, যা তা (তথা কুরআন) নিজেই প্রমাণ করেছে আর বিভিন্ন স্থানে বলেছেও যে, এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা কোন সৃষ্টির পক্ষে সম্ভব নয়। এখন যে ব্যক্তি ন্যায়সঙ্গতভাবে বিতর্ক করতে চায় তার জন্য একথা অজানা নয় যে, কুরআন শরীফের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য এমন গ্রন্থ উপস্থাপন করা আবশ্যক যাতে সেসকল গুণাবলী বিদ্যমান থাকবে, যা পবিত্র কুরআনে রয়েছে। একথা সত্য যে, 'বেদ'-এ কবিসুলভ আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ দেখা যায় আর কবিদের মত বিভিন্ন প্রকার রূপকের ব্যবহারও দেখা যায় যেমন, ঋগ্বেদে অগ্নিকে এক সম্পদশালী ব্যক্তি ধরে নেয়া হয়েছে, যার কাছে রয়েছে প্রভূত মণিমুক্তা আর যার জ্যোতিকে উজ্জ্বল রত্নের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কোন কোন স্থানে একে এক সেনাপতিরূপে নিযুক্ত করা হয়েছে যার কাছে রয়েছে কালো পতাকা। আগুনের সাথে যে ধূম্র দেখা যায় তাকে 'কালো জ্ঞান' আখ্যা দেয়া হয়েছে। এক স্থানে সেই তাপকে চোর আখ্যায়িত করা হয়ছে যা জলীয় বাষ্প সৃষ্টির কারণ। নিয়ন্ত্রণ শক্তির নিরিখে এর নাম রাখা হয়েছে ওরতরা বা অসুর। বাষ্পকে গাভী আখ্যায়িত করেছে। বেদে ইন্দ্র বলতে বায়ুমণ্ডল, বিশেষকরে শীতলমণ্ডল বোঝায়, একে এ উপমায় কসাইয়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে আর লেখা রয়েছে যে কসাই গাভীর মাংস টুকরো টুকরো করে থাকে।

অনুরূপভাবে ইন্দ্র বত্রা অসুরের মাথায় এমনভাবে স্বীয় বজ্রাঘাত হানে যে তাকে টুকরো টুকরো করে দেয় আর তা ফোঁটা ফোঁটা পানি হয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। কিন্তু এটি স্পষ্ট যে, এমন কাল্পনিক কথাবার্তার সাথে কুরআনের কোন তুলনা হয় না। এসব কেবল কবিসুলভ ধারণামাত্র, কিন্তু তা অত প্রশংসনীয়ও নয় আর কোন গুরুত্বেরও দাবি রাখে না বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কঠিন সমালোচনার যোগ্য। যেমন, উল্লিখিত রূপক ঘটনা যাতে ইন্দ্রকে একটি কসাইয়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যার কাজ হলো গোমাংস বিক্রি করা; এটি এমন একটি বিষয় যা সূক্ষ্ম রুচিবোধ সম্পন্ন কবিদের কবিতায় আদৌ স্থান পেতে পারে না। কেননা কবির জন্য এটিও ভাবা আবশ্যক যে, আমার এ বিষয়টি মানুষ ঘৃণা করবে না তো? কিন্তু এই শ্লোকে এই দিকটি উপেক্ষিত হয়েছে, কেননা হিন্দু যারা বেদের সম্বোধিতজন, তারা গোমাংসের কথা শুনতেই ঘৃণা প্রকাশ করে আর এমন কথা তাদের জন্য দুঃসহ। আর ইন্দ্র, যে

বেদে এক বুযূর্গ দেবতা হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে তাকে কসাইয়ের সাথে তুলনা করা আর বুযূর্গ আখ্যা দেয়ার পর তার চরম সমালোচনা বাক-সৌকর্য বিবর্জিত এবং এক প্রকার অশিষ্টাচার। এছাড়া এই তুলনাতে আরো একটি ত্রুটি আছে, তা হলো, তুলনা সেই বিষয়ে করা উচিত যা সুপরিচিত ও সুবিদিত। তাই একথা বলা যে, ইন্দ্র ওরতরাকে বা অসুরকে এমনভাবে টুকরো টুকরো করেছে যেভাবে কসাই গোমাংস টুকরো টুকরো করে থাকে– এই তুলনা বাগ্মিতার দৃষ্টিকোণ থেকে তখন সঠিক গণ্য হতো, যদি বেদের যুগে সর্বত্র গোমাংস বাজারে বিক্রি হতো বা কসাই তা টুকরো টুকরো করে সেই মাংস আর্যদের দিত কিন্তু অধুনা আর্যরা আদৌ এমন কথায় বিশ্বাসী নয়। এখন জানাকথা, ভাষায় এমন তাশবীহ বা উপমা দেয়া, বাস্তব জীবনে যার কোন অস্তিত্বই নেই বরং বাস্তবে যার প্রতি মানুষ ঘৃণা পোষণ করে ভাষার বাগ্মিতা ও আলংকারিকতা বহির্ভূত কাজ। কোন বালক নিজের উক্তিতে যদি এমন তুলনা উপস্থাপন করে তাহলে সে বুদ্ধিমানদের মতে সমালোচনার যোগ্য এবং অতি সরল গণ্য হয়। কেননা তুলনার সৌন্দর্য তখন প্রকাশ পায় যখন, যে বিষয়ের সাথে তুলনা করা হচ্ছে শ্রোতারা তা সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত থাকে আর তাদের দৃষ্টিতে সে বস্তু সুপ্রকাশিত-সুবিদিত ও এর অস্তিত্ব সর্বজন স্বীকৃত।

অধিকন্তু তা উল্লেখ করতে যেন তাদের ঘৃণা বোধ না হয়। কিন্তু কে প্রমাণ করতে পারবে যে, বেদের যুগে হিন্দুদের মাঝে গাভীর মাংস কেনাবেচা ও ভক্ষণ সর্বত্র প্রচলিত ছিল যার প্রতি আর্যদের হৃদয়ে কোন ঘৃণা ছিল না? আর যদি এটি ধরে নেয়া হয় যে, স্বয়ং বেদের উল্লেখই এই প্রচলনের প্রমাণ হিসাবে গণ্য হবে– কিন্তু কথা হলো এমনটি মনে করলেও আপত্তির পুরোপুরি নিরসন হতে পারে না কেননা গাভীর রক্ত ও মাংসের সাথে পানির ভাল সামঞ্জস্য নেই। অবশ্য গাভীর দুধের সাথে স্বচ্ছ পানির উত্তম সামঞ্জস্য বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, যদি ঋগ্বেদ সংহিতা, প্রথম অষ্টক, ৬১নং সুক্ত'র এই মন্ত্র যাতে লেখা আছে যে, হে ইন্দ্র বত্রা অসুরের ওপর তোমার বজ্রাঘাত কর আর তাকে সেভাবে টুকরো টুকরো করে দাও যেভাবে কসাই গাভীকে কেটে টুকরো টুকরো করে থাকে; যদি এমন হতো অর্থাৎ ইন্দ্র যখন স্বীয় বজ্র দ্বারা বত্রাকে চাপ দিয়েছে তখন তা হতে সেভাবে পানি প্রবাহিত হওয়া আরম্ভ হয়ে যায় যেভাবে দুধেল গাভীর স্তনে চাপ দিলে দুধ বইতে থাকে! তাহলে সেই আবশ্যকীয় কথা যা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল তাও প্রতিষ্ঠিত থাকতো আর

তুলনাও হতো যথাযথ, এছাড়া কারো প্রকৃতিতে এই তুলনার প্রতি ঘৃণাও নেই কেননা হিন্দুরাও নির্দ্বিধায় গাভীর দুধ পান করে থাকে।

এসব কথা বাদ দিলেও এমন কবিসুলভ অনুষঙ্গ নিয়ে আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয় আর কুরআন শরীফের সামনে এসব বৃথা বিষয়াদির উল্লেখ এক অনর্থক কাজ ও অহেতুক মাথাব্যথা। কুরআন শরীফ যেই সত্যিকার বাগ্মিতাকে উপস্থাপন করে তা এক ভিন্ন জগত; যার সাথে বৃথা, মিথ্যা ও বাজে কথাবার্তার কোন সাযুজ্য নেই বরং প্রজ্ঞা ও তত্ত্বের অনন্ত সমুদ্রকে তা অতি সংক্ষিপ্ত ও প্রমাণসমৃদ্ধ বাক্যে আলংকারিকতা ও বাগ্মিতার দাবির নিরিখে বর্ণনা করেছে আর সকল ঐশী সূক্ষ্ম বিষয়াদি পরিবেষ্টন করে এমন শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করেছে যা প্রদর্শনে মানবীয় শক্তি অপারগ। কিন্তু বেদ সম্পর্কে কী বলব, কী লিখব আর কীইবা রচনা করবো যাতে সত্য ও তত্ত্বের পরিবর্তে বিভিন্ন প্রকার বিভ্রান্তিকর বিষয়াদি রয়েছে! খোদার কোটি কোটি বান্দাকে সৃষ্টিপূজার কোলে কে ঠেলে দিয়েছে? -বেদ। আর্যদেরকে শতশত দেবতার পূজারি কে বানিয়েছে? -বেদই। এতে এমন কোন শ্লোক বা শুরতী আছে কি, যা স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে সৃষ্টিপূজারি হতে বারণ করে এবং সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদির পূজা হতে বিরত রাখে আর সেসকল শ্লোককে আপত্তিকর আখ্যা দিবে যা সৃষ্টিপূজার শিক্ষাসংবলিত? একটিও নেই।

সুতরাং সেই বাগ্মিতা যা সত্য ও প্রজ্ঞার জ্যোতি প্রদর্শনের ওপর নির্ভরশীল তা কীভাবে এর ভাগ্যে জুটতে পারে? আমরা এমন বাণীকে বাগ্মিতাপূর্ণ বলতে পারি কি, যা সম্পর্কে দাবি এটি করা হয় যে, তার মূল উদ্দেশ্য হলো শিরক নির্মূল করা ও একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা, কিন্তু সে বোবাদের ন্যায় এই দাবিকে সত্য প্রমাণে ব্যর্থ থাকে? সকল বুদ্ধিমান জানে যে, বাগ্মিতার দিকগুলোর একটি হলো যেকথা প্রকাশ করা ও স্পষ্ট করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তা সেভাবে স্পষ্ট করে বর্ণনা করা যা সত্য সন্ধানীদের জন্য যথেষ্ট হবে। সবাই জানে, কেবল সে ব্যক্তিই বাগ্মী আখ্যায়িত হয়, যে হৃদয়ের চিত্র অঙ্কন করে দেখানোর মত করে নিজের মনের কথা উত্তমভাবে তুলে ধরার দক্ষতা রাখে। এখন আর্যদের দাবি যদি এটি হতো যে, বেদের আসল উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টি পূজার শিক্ষা দেয়া, তাহলে হয়ত এ সম্পর্কে ধারণা করা যেতো যে তা সম্পূর্ণভাবে বাগ্মিতা-বিবর্জিত নয়, কেননা বাগ্মিতার প্রকৃত অর্থের নিরিখে সৃষ্টি পূজার কোন যুক্তি যদিও বেদ উপস্থাপন করে নি এবং তা প্রমাণ করে দেখায় নি তা

সত্ত্বেও স্পষ্ট উক্তির মাধ্যমে যা বাগ্মিতার একটি অংশ, দেবতাদের পূজা সম্পর্কে নিজের মনের কথা খোলাসা করে বর্ণনা করেছে এবং অগ্নি ও বায়ু এবং ইন্দ্র প্রমুখের প্রশংসায় শতশত যন্ত্র-মন্ত্র বানিয়ে ফেলেছে আর এসকল জিনিসের কাছে গাভী, ঘোড়া এবং বহু ধনসম্পদ যাচনা করেছে। কিন্তু যদি এ মর্মে দাবি করা হয়, বেদ স্বীয় বর্ণনাশৈলী ও পরম বাগ্মিতার বলে একত্ববাদের ওপর জোর দিয়েছে এবং মুশরিকদের সন্দেহ ও কুমন্ত্রণাকে স্পষ্ট প্রমাণাদির মাধ্যমে খণ্ডন করেছে এবং একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা ও পৌত্তলিকতা নিরসনে যেসকল প্রমাণাদি আবশ্যক, তার সবকটি বর্ণনা করেছে আর খোদার একত্ববাদ প্রমাণ করে দেখিয়েছে এবং অগ্নি ইত্যাদির পূজা করতে বারণ করেছে; তাহলে এই দাবি কোনভাবে সঠিক ও সফল প্রমাণিত হতে পারে না। একথা কে না জানে যে, বেদের শিক্ষায় একথাই প্রাধান্য পেয়েছে যে, তোমরা অগ্নিপূজা কর, ইন্দ্রের ভজন গাও এবং সূর্যের সামনে করজোরে প্রার্থনা কর। এখন জানা কথা যে, তোমাদের কথা অনুসারে যেখানে বেদের উদ্দেশ্য ছিল একত্ববাদ বর্ণনা করা, সূর্য-চন্দ্র ইত্যাদির পূজা হতে বিরত রাখা, মুশরিকদেরকে একত্ববাদী করে তোলা, বিকৃতদের সংশোধনের পথে ফিরিয়ে আনা, সৃষ্টিপূজারিদের খোদাপূজারি বানানো এবং বহু-ইশ্বরবাদীদের সকল কুমন্ত্রনা দূরীভূত করা; পরিতাপ! এই অভীষ্ট অর্জনের পরিবর্তে বিভিন্ন স্থানে এর মন্ত্র পড়ে সৃষ্টিপূজার শিক্ষা বদ্ধমূল হতে থাকে। সে শিক্ষা কোটি কোটি মানুষের ভরাডুবির কারণ হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে পৌত্তলিকতা ও কুফরীর আবর্তে নিমজ্জিত করেছে। বেদ এক স্থানেও বলে নি যে সৃষ্টি– পূজা হতে বিরত হও। অগ্নি ইত্যাদির পূজা করো না।

খোদা ছাড়া অন্য কারো কাছে অভীষ্ট যাচনা করো না। খোদাকে অনন্য ও অতুলনীয় বিশ্বাস করো। এমন পরিস্থিতিতে সকল বিবেকবানের নিজেরই সুবিচার করা উচিত যে, বাগ্মিতাপূর্ণ বাণীর প্রমাণ কি এটিই হয়ে থাকে যে, হৃদয়ে ভিন্ন কিছু আর মুখ থেকে নির্গত হবে অন্য কিছু? এমন আজেবাজে কথা যে উন্মাদ এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকদের কথায়ও থাকে না। নিজেদের হৃদয়ের কথা প্রকাশ করার মত বাকশক্তি তারাও রাখে; পানি পান করার ইচ্ছা হলে আগুন চায় না, রুটির চাহিদা হলে আগুন যাচনা করে না। কিন্তু আমি আশ্চর্য যে, বেদের বাগ্মিতা কোনো ধরনের বাগ্মিতা, যার উদ্দেশ্য ছিল একত্ববাদ, কিন্তু তা না করে শতশত দেবতার (পক্ষে) সাফাই গাওয়া আরম্ভ করেছে। যে

বাণী স্বীয় উদ্দেশ্য প্রকাশে অপারগ তা আলংকারিক ও বাগ্মিতাপূর্ণ হবে– খোদা করুন এমনটি যেন না হয়। কোন আলংকারিকতাপূর্ণ বাণীতে এমন ত্রুটি দেখা দেয়া কী করে সম্ভব হতে পারে যে, যে বিষয়টি কার্যকর করা উদ্দেশ্য, পরিস্কার ও সুন্দরভাবে তা-ই বর্ণনা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না? আলংকারিকতার প্রথম শর্তই হলো, বক্তা যা বলতে চায় তা সুন্দরভাবে প্রকাশে সক্ষম হওয়া, অধিকন্তু যা প্রকাশ করতে চায় তা এত নিখুঁত ভাবে প্রকাশ করা যে, তাতে যেন কোন অস্পষ্টতা অবশিষ্ট না থাকে। বোবাদের মত অস্পষ্ট ও হাত-পা বিহীন কথা যেন না বলে। অবশ্য যে কথা গোপন রাখা ও রহস্য হিসেবে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তা রহস্যের আবরণে বর্ণনা করাই বাগ্মিতা। কিন্তু একত্ববাদ, যার সাথে পুরো মুক্তির বিষয়টি সম্পর্কযুক্ত; তা এমন নয়, যা গোপন রাখা বৈধ হতে পারে। তাই একথা বলা সঠিক নয় যে, বেদ একত্ববাদের বিষয়কে জেনেশুনে ধাঁধা ও প্রহেলিকার আকারে বর্ণনা করেছে আর জেনেশুনে প্রতারণামূলক বাক্যাবলী লিপিবদ্ধ করেছে।

কেননা, এর ফলে এটি মানতে হবে যে, বেদ জেনেশুনে কয়েক কোটি মানুষকে ধ্বংসের ঘূর্ণাবর্তে ঠেলে দিতে চেয়েছে আর জেনেশুনে এমন সব বাক্য লিখেছে যা পাঠ করলে সৃষ্টিপূজার শিক্ষা বিস্তার লাভ করে। বরং এমন পরিস্থিতিতে সাধারণ হিন্দুদের একথা সঠিক হবে যে, বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল আর্যদেরকে দেবতা-পূজারি বানানো। বেদের আসল উদ্দেশ্য যদি সৃষ্টিপূজা-পরিপন্থী মনে করেন তাহলে এটি বলতে হবে যে, বাকশৈলী এর আদৌ জানা নেই আর স্বীয় কথা সম্বোধিত লোকদের সামনে ভালোভাবে প্রকাশ করার যোগ্যতাই এর মাঝে নেই। সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে বাগ্মিতার মানদণ্ডে বেদের অধঃপতিত হওয়া এতটা স্পষ্ট যে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এমন বাণী কোন বুদ্ধিমানের দৃষ্টিতে বাগ্মিতাপূর্ণ ও প্রাঞ্জল আখ্যায়িত হতে পারে না, যার শব্দ (কাঙ্খিত) কোন অর্থ প্রকাশ করে না বরং প্রকৃত লক্ষ্যের পরিপন্থী বিভিন্ন নৈরাজ্যের দিকে নিয়ে যায়। যে মন্ত্রের প্রতিই তাকানো হোক না কেন, পথ প্রদর্শনের পরিবর্তে দস্যুবৃত্তি করে অর্থাৎ যা আছে তাও ছিনিয়ে নেয়। মনের ভাব বোঝানোর ক্ষেত্রে এই অদ্ভুত বাগ্মিতা ও অভিনব আলংকারিকতা বেদেরই বৈশিষ্ট্য। একথা হয়ত এমনিতে কোন সাহেব বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমরা সব বেদের মাঝে যা সর্বশ্রেষ্ঠ গণ্য করা হয় অর্থাৎ ঋগ্বেদ, তা হতে এমন কতক শ্লোক লিপিবদ্ধ করবো যা সম্পর্কে

আর্যদের ধারণা হলো, এতে একত্ববাদের শিক্ষা রয়েছে। এরপর দৃষ্টান্তস্বরূপ, এমন শ্রেণির কতক মন্ত্র লিপিবদ্ধ করবো, যা কুরআন শরীফ একত্ববাদ সম্পর্কে লিখেছে যেন সবাই অবগত হতে পারে যে, বেদ ও কুরআনের মধ্য হতে কোনটি একত্ববাদের বিষয়টি স্পষ্টভাবে ও শালীনতার সাথে, জোরালো ও বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষ্যে বর্ণনা করেছে এবং কার বর্ণনা অর্থহীন ও হাত-পা বিহীন এবং বিভিন্ন প্রকার সন্দেহের মুখে ঠেলে দেয়। কেননা আমরা যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছি যে, বাগ্মিতা যাচাইয়ের জন্য সহজ উপায় হলো, যে দু'টো গ্রন্থের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা উদ্দেশ্য, সে দুটোর উপস্থাপনার জোর যাচাই করা যে, তা কোনো পর্যায়ে আছে আর স্বীয় দায়িত্ব পালনের নিরিখে কতটা গভীর চুলচেরা বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্ম গবেষণা করেছে আর নিজের যুক্তিপ্রমাণসমৃদ্ধ অথচ সংক্ষিপ্ত বিবৃতির মাধ্যমে অজ্ঞতার অন্ধকারকে তিরোহিত করার জন্য কতটা জ্ঞানের আলো প্রকাশ করেছে এবং খোদার একত্ববাদের সৌন্দর্য ও শিরকের ক্ষতিকর দিকগুলো কতটা প্রকাশ করেছে? কিন্তু কারো যদি সন্দেহ থাকে যে, ঋগ্বেদে হয়ত এমন শ্লোকও থাকবে যা একত্ববাদের বিবরণে কুরআন শরীফের মোকাবিলা করতে পারে তাহলে সে উল্লিখিত বেদ হতে সেই সকল শ্লোক তুলে ধরার বিষয়ে স্বাধীন, যেন আর্যরা, যারা ঋগ্বেদ! ঋগ্বেদ! যপ করছে তাদের জন্য সব বেদের পূর্বে এরই সিদ্ধান্ত হয়ে যায়।

এখানে একথাও স্মরণ থাকা চাই, কুরআন শরীফের অনন্য বাগ্মিতা এবং এর সহস্র সহস্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় ও তত্ত্ব নিজ স্থানে উল্লেখ করা হবে যার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মানবীয় শক্তিনিচয় অর্থহীন ও ব্যর্থ। এখানে কেবল কতক আর্যের নাছোড় মনোবৃত্তির কারণে কুরআনের কিছু আয়াত লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে যার উদ্দেশ্য হলো, কুরআনের মোকাবিলায় যারা বেদের বাগ্মিতার দাবি করে তাদের বড় বড় বুলি আওড়ানো অনায়াসে বন্ধ করা এবং ন্যায়পরায়ণদের সামনে বেদের তুচ্ছ ও অর্থহীন হওয়া পুরোপুরি স্পষ্ট করা। অধিকন্তু একথা প্রকাশ করা যে, কুরআন শরীফের বাগ্মিতার সাথে প্রতিযোগিতা করা তো দূরের কথা, বেদে নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্পষ্ট করারও শক্তি নেই, কেননা এর মাধ্যমে সকল ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এটি বুঝতে সক্ষম হবে যে, যে গ্রন্থ স্বীয় অভীষ্ট পরিস্কারভাবে বর্ণনা করতে পারে না তার কাছে বাগ্মিতা ও প্রাঞ্জলতার বিভিন্ন পর্যায় আশা করা চরম নির্বুদ্ধিতার শামিল। বেদ যদি এই সহজ

পদ্ধতিতে কুরআনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াতে পারে তাহলে তা হয়তো কুরআনের এ সকল সূক্ষ্ম শিক্ষামালারও মোকাবিলা করতে পারবে, তবে কুরআন শরীফের দাবি হলো অন্য সকল গ্রন্থ এর মোকাবিলা করতে অক্ষম। কিন্তু যদি এখানেই আর্য সাহেবদের বেদ লাশের ন্যায় চেতনাহীন এবং নীরব নিথর ও স্থির স্থবির পড়ে থাকে, সামান্য কোন বিষয়েও কুরআন শরীফের সামনে দাঁড়াতে না পারে তাহলে এমন বেদ সম্পর্কে গর্ব করে একথা বলা যে, তা কুরআন শরীফের মহান তত্ত্ব ও সূক্ষ্মতার মোকাবিলা করবে– চরম পর্যায়ের অজ্ঞতা। এখানে দৃষ্টিবানদের সামনে এটিও প্রকাশ করা হচ্ছে যে, যেহেতু হিন্দু গবেষকরা উপনিষদকে বেদের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন নি আর একে নিজেদের পরমেশ্বরের উক্তিও আখ্যা দেন নি বরং পরিস্কারভাবে বলেছেন, তা গুটিকতক মানুষের নিজস্ব মতামত, যেমন পণ্ডিত দিয়ানন্দেরও একই মত আর খ্যাতনামা ও যোগ্য সকল পণ্ডিতও এ বিষয়ে একমত; তাই উপনিষদের বিষয় নিয়ে গবেষণা করা অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। যেহেতু সেসকল বাক্য বেদে অন্তর্ভুক্ত নয় বরং পণ্ডিত দিয়ানন্দ ও বেদের অন্যান্য গবেষকদের উক্তি অনুসারেও নয়, বরং একটি বৃথা ও সম্পর্কহীন সংযোজন যা কতক নিবোর্ধ ব্রাহ্মণ পরবর্তীকালে যোগ করেছে; এমন পরিস্থিতিতে উপনিষদে যতই ভ্রান্তি থাকুক না কেন এখানে তা বর্ণনা করা আলোচনাকে অনর্থক দীর্ঘ করার নামান্তর। অবশ্য খাঁটি বেদ হতে যাকে আর্যরা পরমেশ্বরের বাণী এবং সৎ বিদ্বানদের গ্রন্থ বলে মনে করছে কিছু মন্ত্র তুলে ধরা সমীচীন হবে। সুতরাং আমরা ঋগ্বেদ হতে কিছু মন্ত্র নিম্নে লিপিবদ্ধ করছি যে ঋগ্বেদ সম্পর্কে আর্যদের ধারণা হলো তা একত্ববাদের শিক্ষা দেয় আর তা হলো:

আমি **অগ্নি দেবতার** স্তুতি করি যে যজ্ঞের বড় পুরোহিত, দেবতাদেরকে আমাদের নৈবেদ্য পরিবেশনকারী ঋত্বিক এবং প্রভূত রত্নধারী। অগ্নি, যার মহিমা প্রাচীন ও বর্তমান যুগের ঋষিরা করে আসছে, তিনি **দেবদেরকে** এ যজ্ঞে আনুন। **হে অগ্নি!** যা কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে উৎপন্ন হও, এই কর্তিত পবিত্র কুশ ঘাষে **দেবতাদের** আন। তুমি আমাদের পক্ষ থেকে দেবদের আহ্বানকারী আর তুমি স্তুতিভাজন।

হে অগ্নি! আজ আমাদের সুস্বাদু কুরবানী **দেবতাদেরকে** খাওয়ার জন্য পরিবেশন কর। হে অগ্নি, বায়ু, সূর্য! প্রমুখ দেবতাদেরকে আমাদের নৈবেদ্য পরিবেশন কর। হে ক্রুটিমুক্ত অগ্নি! তুমি দেবতার মাঝে এক চৌকস দেবতা। তুমি তোমার

পিতামাতার কাছে থাক আর আমাদের সন্তান দান করে থাক। সকল ধনসম্পদের দাতা তুমিই। অগ্নির আশিসময় নাম নিয়ে ডাক যে সর্বপ্রথম দেবতা। হে অগ্নি! লাল অশ্বের স্বামী, আমাদের প্রশংসায় আনন্দিত হও। তেত্রিশ জন দেবতাকে এখানে আনো। হে অগ্নি! যেমনটি কিনা তুমি, ঠিক সেভাবে মানুষ তোমাকে নিজেদের গৃহের নিরাপদ স্থানে সদা প্রজ্জ্বলিত রাখে। তুমি, যে সবার জীবনের উৎস, আমাদের কল্যাণার্থে সম্পদশালী হয়ে যাও। হে মেধাবী অগ্নি তুমি তনূনপাৎ অর্থাৎ নিজের দেহের নিজেই দাহকারী! আজ আমাদের সুস্বাদু বা রসবৎ কুরবানী দেবগণের ভক্ষণার্থে উপস্থাপন কর। অগ্নি দেবতা বড়ই বুদ্ধিমান, যে চিরযুবক। কুরবানীকারীর ঘরের রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং নৈবেদ্য বহনকারী। যার মুখ দেবতাদের কাছে আমাদের অর্ঘ পৌঁছানোর মাধ্যম আর গৃহাগ্নির মাধ্যমে তা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। চির অম্লান অগ্নি স্বীয় খোরাককে নিজের লাট বা স্ফুলিঙ্গে যুক্ত করে এবং তা তাড়াতাড়ি ভক্ষণ করে শুষ্ক কাঠে আরোহণ করেছে। দাহকারী সত্তার স্ফুলিঙ্গ ধূর্ত ঘোড়ার মত ছুটে আর গগনচুম্বী মেঘের ন্যায় গর্জন করে। হে অগ্নি, নৈবেদ্য! যাকে কেউ বাধা দিতে পারে না আর যাকে তুমি সকল দিক থেকে রক্ষাকারী তা অবশ্যই যেন দেবতাদের কাছে পৌঁছে। হে অগ্নি! তুমি তোমাকে অর্ঘ যথাসম্ভব পরিবেশনকারীর উপকার কর। হে অঙ্গিরা! সে নিশ্চয় তোমার কাছে ফেরত আসবে। অগ্নির ওসিলায় পূজারীর এমন স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হয় যা প্রতিদিন প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পায় আর যা খ্যাতির উৎস আর মানুষের বংশ বিস্তারের কারণ হয়।

হে ইন্দ্র! হে বায়ু! এই অর্ঘ তোমাদের জন্য ছিটানো হয়েছে। আমাদের জন্য খাবার নিয়ে এখানে আস। হে ইন্দ্র! যার সবাই স্তুতি করে, প্রসারমান সোমরস তোমার মাঝে শোষিত হোক আর তোমার উন্নত বুদ্ধি অর্জনে সহায়ক হোক। অন্যান্য দেবতার যেসকল মহান প্রশংসা করা যেতে পারে ইন্দ্রও সেসবের যোগ্য। যুদ্ধের ময়দানে কিংবা সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে যারা ইন্দ্রের ধ্যান করে হোক আর সেসব বুদ্ধিমান যারা বোধবুদ্ধির সন্ধানী– তাদের সবার বাসনা পূর্ণ হয়। ইন্দ্রের পেট অপরিমিত মাত্রায় সোমরস পান করার কারণে সমুদ্রের ন্যায় ফুলে যায় আর তালুর আদ্রতার মত সদা আদ্র থাকে। ইন্দ্র সকল দেবতার চেয়ে বেশি শক্তিশালী আর সকল দেবতার ওপর তার শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। বড় দেবতাদের সালাম, ছোট দেবতাদের অভিবাদন, যুবক দেবতাদের নমস্কার আর বৃদ্ধ দেবতাদেরও নমস্কার। আমরা সকল দেবতার যথাসাধ্য পূজা করি।

হে কুশিকা ঋষির পুত্র ইন্দ্র, ছুটে আস আর আমি ঋষিকে সম্পদশালী করে দাও (সকল পুরাণের বংশ পরিক্রমায় লেখা আছে বসুমিত্র Vishwamtar কুশিকার ছেলে ছিল। বেদের ভাষ্যকার সিয়ানা, ইন্দ্র কীভাবে কুশিকার পুত্র হয়ে গেল তা বর্ণনা করার জন্য একটি কাহিনী বর্ণনা করেন যা বেদের পরিশিষ্ট-অনুক্রমণিকাতে উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ আশরাথার পুত্র কুশিকার বাসনা হলো যে, ইন্দ্রের দৃষ্টির কল্যাণে আমার পুত্র সন্তানের জন্ম হোক, এই বাসনায় যপতপ আরম্ভ করে। যে তপস্যা ও ইবাদতের কারণে স্বয়ং ইন্দ্রই তার ঘরে জন্মগ্রহণ করে আর নিজেই তার পুত্র সাজে।

ইন্দ্র, যার অনেক মানুষ প্রশংসা করে, প্রবাহমান বাতাসে ভর করে পাষাণদের ও নোংরাদের [দসিওঁ ও সামীদের Dasyus (cruel men) and the Samyus] অর্থাৎ রাক্ষসদের ওপর হামলা করে নিজের বজ্র দ্বারা তাদের হত্যা (arabic) করে এরপর তার শুভ্র সহযাত্রী-সহচারীদের মাঝে ভূমি বিতরণ করে এবং সূর্য ও পানিকে মুক্ত করে। (বেদ অনুসারে এখানে শুভ্র সাথী বলতে পানির ফোঁটা বোঝায়। এই মন্ত্রের অর্থ হলো, বায়ুমণ্ডলের শীতল স্তরের প্রভাবে পানি মেঘ থেকে ভূমিতে বর্ষিত হয় যা আকৃতিতে গোল ও শুভ্র বর্ণের মনে হয়। কতক ফোঁটা কোন ক্ষেতের ওপর কতক ফোঁটা ভিন্ন কোন ভূমিতে আর এভাবে পুরো পানি বয়ে যায় এবং সূর্য উদিত হয়।

ইউরোপীয় ভাষ্যকাররা এর এই অর্থ করেছেন যে, ইন্দ্র আর্যদের দাবি অনুসারে আর্যদের মাঝে ভূমি বণ্টন করে দিয়েছে যারা আদিবাসীদের চেয়ে ফর্সা বর্ণের ছিল। কিন্তু এ অর্থ সঠিক নয়, কেননা বেদের শ্লোকের প্রসঙ্গ এমন ধারণার প্রকাশ্য পরিপন্থি।

সুতরাং হে ইন্দ্র! তোমার কারণেই সর্বত্র খোরাকের প্রাচুর্য আর তা সহজলভ্য। হে দক্ষতার সাথে বজ্র পরিচালনাকারী! চারণক্ষেত্রগুলোকে সবুজের মেলায় ভরে দাও এবং প্রভূত সম্পদ দান কর। আমরা ইন্দ্রের কাছে আসি তার স্নেহ, সম্পদ ও পূর্ণশক্তি লাভের জন্য, কেননা সেই শক্তিশালী ইন্দ্র সম্পদ দানের মাধ্যমে আমাদের রক্ষা করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখে। হে সূর্য ও চন্দ্র! আমাদের কুরবানী সফল কর, আমাদের শক্তি বৃদ্ধি কর, কেননা তুমি বহু মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি হয়েছ। অনেক মানুষ তোমার ওপরই নির্ভর করে। সূর্য উদিত হলে নক্ষত্র রাতসহ চোরের ন্যায় পলায়ন করে। আমরা সূর্য দেবতার কাছে যাই, যে দেবতাদের মাঝে সবচেয়ে মহান দেবতা। হে চন্দ্র!

আমাদেরকে অপবাদ হতে রক্ষা কর আর পাপ থেকে মুক্ত রাখ। তোমার ওপর আমাদের নির্ভরতায় প্রীত হয়ে আমাদের বন্ধু হয়ে যাও। তোমার শক্তি বৃদ্ধি পাক। হে চন্দ্র! তুমি সম্পদদাতা এবং সমস্যা হতে পরিত্রাতা, আমাদের ঘরে সাহসী বীরদের সাথে আস। হে চন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা মর্যাদায় সমান, আমাদের প্রশংসা তোমরা নিজেদের মাঝে বণ্টন করে নাও, কেননা তোমরা সদা দেবতাদের সর্দার চলে আসছ। আমি জল দেবতাকে ডাকছি যাতে আমাদের গবাদি পশু পানি পান করতে পারে। সুতরাং আমাদের প্রবহমান নদীতেই নৈবেদ্য উৎসর্গ করা উচিত। সে জল যা সূর্যের সন্নিকটবর্তী আর যা সূর্যের শরীক, তা যেন আমাদের এই আচার-অনুষ্ঠানে সদয় হয়। হে পৃথিবী দেবতা! তুমি অনেক বেশি বিস্তৃত হয়ো না আর তোমার বুকে যেন কাঁটা না থাকে। তুমি আমাদের আবাসস্থল হয়ে যাও, আমাদের প্রভূত আনন্দ দাও। বরুন দেবতা! আমাদের প্রতি বিশেষভাবে সদয় হোক। মিত্র দেবতা আমাদের তত্ত্বাবধান করুন। তাদের উভয়েই সম্মিলিত হয়ে আমাদের সম্পদশালী করে তুলুক। হে নশত্রী (Neshtri) দেবতা! তুমি ও তোমার স্ত্রী কুরবানীর দেবতার কাছে আমাদের পক্ষে সুপারিশ কর।

হে অগ্নি! দেবতাদের এখানে আন, তাদের তিন স্থানে বসাও এবং তাদের সজ্জিত কর। তুমি ঋতু দেবতার সাথে একসাথে পান কর। হে অগ্নি! লাল ঘোড়ার মালিক, লাল শিখাধারী, আমাদের প্রশংসায় সন্তুষ্ট হয়ে ৩৩ জন দেবতাকে এখানে আন। আমরা অগ্নির ইবাদত করি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে যা প্রজ্জ্বলিত করা হয়। হে অগ্নি! দেবতাদের আহ্বানকারী কর্মী, পুরোহিত, সম্পদদাতা স্বল্পতম সময়ে কাকুতি গ্রহণকারী ও অতি খ্যাতিসম্পন্ন পেয়ে বুদ্ধিমানরা তোমাকে যজ্ঞে রেখেছে। অগ্নি বাতাসে ধপ করে জ্বলে ওঠে, প্রজ্জ্বলিত শিখা ধারণ করে, অতি সহজে বড় বড় কাঠে ঢুকে যায়। হে অগ্নি! যখন তুমি ষাঁড়ের মত জঙ্গলে ঢুকে যাও তখন তুমি যে দিকে যাও তোমার পথ কালো হয়ে যায় অর্থাৎ কাঠ-খড়ি জ্বালিয়ে ছাই করে ফেল আর প্রত্যেক বস্তুকে জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দাও, তা গতিবিশিষ্ট বা স্থিরই হোক না কেন। আমি অগ্নির পূজা করি যা সকল প্রকার সম্পদদাতা। অগ্নিতে এমন আলো রয়েছে যা অন্য কারো মাঝে থাকতে পারে না। যজ্ঞস্থলে তা সেভাবেই সবার ভূষণ যেভাবে ঘরের ভূষণ হলো নারী। অগ্নি যে জঙ্গলে জন্ম নিয়েছে আর যে মানুষের বন্ধু, সে স্বীয় পূজারির সেভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে যেভাবে রাজা

যোগ্য লোকের নিরাপত্তা করে থাকে। আমাদের প্রত্যাশা, সে আমাদের প্রতি সদয় হবে। হে অগ্নি! তুমি যখন শুষ্ক কাঠের ঘর্ষণে সৃষ্টি হও তখন তোমার সকল ইবাদতকারী পবিত্র আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। আমাদের প্রত্যাশা, সেই বিভিন্ন প্রকার আলোর মালিক অগ্নি, স্বীয় পূজারিদের আকুতি-মিনতি মনোযোগ সহকারে শুনবে। প্রিয় অগ্নিকে আঙ্গুল সদা সেভাবে ভালোবাসে যেভাবে মহিলারা স্বামীকে ভালোবাসে। হে অগ্নি! যখন পূজারি তোমাকে নিজের ঘরে প্রজ্জ্বলিত করে আর তোমার ক্ষুধা জাগায় যার সে প্রতিদিন বাসনা পোষণ করে, তুমি দুভাবে বৃদ্ধি পেয়ে তার জীবনোপকরণ সৃষ্টি করে থাক। পরিপাকশক্তির অগ্নি যা খোরাকের সাথে সম্পর্ক রাখে, ভক্ত ও প্রসিদ্ধ পুরোহিতদের সেবাকারীদেরকে পুরুষত্বের প্রস্রবণস্বরূপ দেয়া হোক আর অগ্নির সাহায্যে তার দৃঢ় ও নিখুঁত এবং যুবক ও বুদ্ধিমান সন্তান জন্ম নিক।

হে অগ্নি! তোমার সম্পদশালী পূজারিরা যেন প্রভূত খোরাক লাভ করতে পারে। অনুরূপভাবে সেসকল বিদ্বান যারা তোমার প্রশংসা করে আর তোমাকে প্রজ্জ্বলিত করে তারা দীর্ঘজীবি হোক। আমরা যেন যুদ্ধে আমাদের শত্রুদের হাত থেকে মালে গনিমত পেতে পারি। জলে যেহেতু অনেক উদ্ভিদ রয়েছে তাই হে সংযমী! পানির প্রশংসা করার জন্য সোচ্চার হও। হে জল! সকল ব্যাধি-নিরাময়ক উদ্ভিদ আমার দেহের কল্যাণের জন্য পাকাও। ইন্দ্রের অস্ত্র তার বিরোধীদের ওপর পড়েছে। স্বীয় প্রখর ও উন্নত তিরের মাধ্যমে সে তাদের শহর ধ্বংস করেছে তখন ইন্দ্র স্বীয় অস্ত্র, অর্থাৎ বজ্রসহ বৃত্র- এর দিকে অগ্রসর হয় আর তাকে বধ করে নিজের মনকে প্রীত করেছে। হে জঙ্গলের উভয় মালিকগণ, পছন্দনীয় চেহারার অধিকারীগণ! তোমরা উভয়েই আমাদের সুমিষ্ট সোমরস, পছন্দনীয় নৈবেদ্যসহ, ইন্দ্রের জন্য প্রস্তুত কর আর সোমের অবশিষ্টাংশ পেয়ালায় আন আর সেটিকে কুশা ঘাসের পাতায় ছিটিয়ে দাও এরপর যা অবশিষ্ট থাকে তা গাভীর চামড়ার ওপর অর্থাৎ গাভীর চামড়া দিয়ে বানানো ব্যাগে রাখ। হে সোমরস পানকারী ইন্দ্র! আমাদেরকে হাজার হাজার গাভী ও উত্তম ঘোড়া দিয়ে সম্পদশালী করে দাও, যদিও আমরা তার যোগ্য নই। হে সুদর্শন ও শক্তিশালী ইন্দ্র, অন্নের মালিক! তোমার স্নেহ যেন সদা বিরাজমান থাকে। আমাদেরকে হাজার হাজার উন্নত গাভী ও উত্তম ঘোড়া দাও। প্রত্যেক সে ব্যক্তিকে ধ্বংস কর যে আমাদের গালি দেয় আর প্রত্যেক

সে ব্যক্তিকে হত্যা কর যে আমাদের ক্ষতি করে; আমাদের হাজার হাজার গাভী ও উত্তম ঘোড়া দাও। হে ইন্দ্র! যে আমাদের মঙ্গল হলে প্রীত হয়, তুমি এমন বিধান কর যেন আমাদের প্রচুর খোরাকের ব্যবস্থা হয় আর বহু শক্তিশালী ও দুধেল গাভী আমাদের হস্তগত হয়, যেন আমরা স্বাচ্ছন্দ ও বিলাসিতার মাঝে জীবন কাটাতে পারি। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আমি, যে সম্পদের অভিলাষী, তোমাদের উভয়কে নিজ হৃদয়ে আত্মীয় ও কাছেরজন মনে করি। তোমরা উভয়েই আমাকে যে উপলব্ধি ও ব্যুৎপত্তি দান করেছ তোমরা ছাড়া অন্য কেউ আমাকে তা আদৌ দান করে নি। এটিকে কাজে লাগিয়ে আমি তোমাদের প্রশংসায় এই মন্ত্রগুলো লিখেছি যাতে আমি আমার খাদ্যের বাসনা ব্যক্ত করেছি।

হে নেয়ামতদাতা ইন্দ্র ও অগ্নি! আকাশ পাতাল ও স্বর্গ, যেখানেই তোমরা থাক না কেন সেখান থেকে এখানে আস আর এই অর্ঘ্য পান কর। হে নেয়ামতদাতা ইন্দ্র ও অগ্নি! স্বর্গ মর্ত্য বা পাতাল যেখানেই তোমরা থাক না কেন সেখান থেকে এখানে আস এবং উপস্থিত অর্ঘ্য পান কর। হে নেয়ামতদাতা ইন্দ্র ও অগ্নি, বজ্রাঘাতকারী আর শহর ও জনপদকে ধ্বংসকারী! আমাদের সম্পদ দাও আর যুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর। মিত্র, বরুন, আদিতী, সমুদ্র, পৃথিবী ও আকাশ দেবতাসহ সকলেই সম্মিলিতভাবে আমাদের এই দোয়ার প্রতি মনোযোগী হবে; এটিই কাম্য। হে মানুষের প্রতি দয়ালু ইন্দ্র, তুমিও তো সৃষ্টি, কিন্তু জন্ম থেকে অদ্যবধি তোমার কোন জুড়ি নেই। তুমি ত্রিভুবন এবং তিন জ্যেতিষ্কমণ্ডলী ও সৃষ্টিতে পরিপূর্ণ পুরো জগতের আশ্রয়দাতা। হে ইন্দ্র! যে সকল দেবতার মাঝে প্রথম পর্যায়ের দেবতা, আমরা তোমাকে ডাকছি। তুমি যুদ্ধে বিজয় লাভ করেছ। ইন্দ্র, যে প্রবল কার্যবিধায়ক আর সকল নিষিদ্ধ বস্তুকে মূল হতে উৎপাটনকারী, এমন যেন হয় যে যুদ্ধে আমাদের মর্যাদা সবচেয়ে উঁচু রাখবে। হে ইন্দ্র! তুমি জয় কর কিন্তু আমাদেরকে লুটপাট করতে নিষেধ করো না। ছোট-ছোট ও বড়-বড় ভয়াবহ যুদ্ধে হে রক্তপিপাসু মিঘাওয়ান! আমরা আমাদের নিরাপত্তার জন্য তোমাকে ধার দেই। ইন্দ্র আমাদের সাথী হবে এমন যেন হয়। আমরা সঠিক পথে প্রভূত খোরাক অর্জন করতে সক্ষম হব, এমনটি যেন হয়। মিত্র, বরুন আদিতী দেবী, সমুদ্র দেবতা, পৃথিবী ও আকাশ দেবতা আমাদের জন্য যেন খোরাকের সুরক্ষা করে। আমরা সোমের নৈবেদ্য তার উপর ছিটিয়ে থাকি যে বহু

বীরত্বপূর্ণ অভিযানের সফল অংশগ্রহণকারী, সকল দেবতা হতে উত্তম দেবতা, নিয়ামতদাতা, সত্যিকার ক্ষমতাশালী বাহাদুর ইন্দ্র, যে সম্পদের দেখাশোনা করে এবং যে ইবাদত বা হোমাচার করে না তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় আর তাকে দেয় যে ইবাদত করে; সেভাবে যেভাবে ডাকাত মুসাফিরের নিকট হতে ছিনিয়ে নেয়। সুতরাং হে ইন্দ্র, সকলেই তোমার স্তুতি গায় তাই আমাদের প্রতি করুণা কর যেন অন্যদের হাতে আমদের কোন ক্ষতি না হয়। তুমি শক্তিশালী, সুতরাং তুমি জুলুম ও অত্যাচার হতে আমাদের রক্ষা কর। হে মানবসকল! তোমাদের নিত্যদিনের জীবনের উৎস হলো সেই ইন্দ্র যে সূর্যের কিরণের মাধ্যমে নির্বোধদের বোধবুদ্ধি দিয়ে থাকে আর কুৎসিতদের চেহারা দান করেন। তুমি হে ইন্দ্র মরুৎ অর্থাৎ হাওয়া দেবতার সাথে মিলে যে দুর্গম স্থানে পৌঁছতে পারে, সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে যাও, তুমি গাভী খুঁজে বের করেছ যা চোরেরা গুহায় লুকিয়ে রেখেছিল। হে মরুৎ দেবতা, তুমি ও সাহসী ইন্দ্র উভয়ই আনন্দ উল্লাসের সাথে আর একই প্রকার মহিমা ও প্রতাপের সাথে প্রকাশিত হবে; এমনটিই যেন হয়। হে অজেয় ইন্দ্র! এমনসব যুদ্ধে আমাদের নিরাপত্তা বিধান কর যেখান থেকে অনেক গণিমত আমাদের হস্তগত হবে। আমরা ইন্দ্রকে দায়িত্ব হতে অব্যহতি লাভ করা ও অঢেল ধনসম্পদের জন্য ডাকি যে আমাদের শত্রুর মোকাবিলায় বজর (বজ্র) পরিচালনা করে আর যে আমাদের সাহায্যকারী।

হে বৃষ্টি বর্ষণকারী, সকল বাসনা পূর্ণকারী, এই মেঘমালা খুলে দাও। তুমি সদা আমাদের আবেদন গ্রহণ করে আসছ। বৃষ্টি বর্ষণকারী শক্তিশালী বাদশাহ ইন্দ্র, সদা আবেদন গ্রহণকারী, মানুষকে সেভাবে স্বীয় শক্তি দিয়ে থাকে যেভাবে ষাঁড় গাভীপালের নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। হে ইন্দ্র! যে মানুষের মাঝে সর্ববিরাজমান, আমরা তোমাকে ডাকি। তুমি সম্পূর্ণভাবে আমাদের হয়ে যাও। হে ইন্দ্র! আমাদের কাছে তোমার সাহায্যের একটি ব্যক্তিগত অস্ত্র রয়েছে যার সাহায্যে আমরা আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হতে পারি। ইন্দ্র দেবতা খুবই শক্তিশালী ও মহান মর্যাদার অধিকারী। সম্মান ও মর্যাদা সদা বিদ্যুৎবাহী নিয়ন্ত্রণে থাকবে এমনটি যেন হয়। তার সাহসী বাহিনী আকাশের ন্যায় যেন সদা মহান থাকে। সত্যিকার অর্থে ইন্দ্রের গাওয়ার যোগ্য বা পড়ার যোগ্য স্তুতি বারবার গাওয়া উচিত যেন তিনি সোমরস পান করতে পারেন। হে ইন্দ্র দেবতা! এখানে আস বিভিন্ন প্রকার নৈবেদ্য ও খাবারে পরিতৃপ্ত হয়ে শক্তি

অর্জন কর এবং নিজের শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হও। হে নিয়ামতদাতা ও স্বীয় পূজারিদের রক্ষাকর্তা ইন্দ্র! আমি তোমার প্রশংসা করেছি যা তোমার কাছে পৌঁছে গেছে আর যা তুমি মঞ্জুর করেছ। হে সম্পদশালী ইন্দ্র! এই পূজায় আমাদেরকে সম্পদ অর্জনের জন্য সাহসী করে তুল কেননা আমরা পরিশ্রমী ও প্রসিদ্ধ। হে ইন্দ্র! আমাদের অপরিসীম অগণিত ও অক্ষয় সম্পদ দান কর যা গবাদি পশু খোরাক ও জীবনের প্রস্রবণ। হে ইন্দ্র! আমাদের খ্যাতিমান কর আর এমন সম্পদ দাও যা সহস্র-সহস্রভাবে অর্জন হতে পারে। খাবারের সে সকল পণ্য দাও যা ক্ষেত হতে গরুর গাড়িতে আসে। আমরা ইন্দ্রকে আমাদের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রশংসার সাথে ডাকি। এমন ইন্দ্র যে সম্পদের মালিক, যার মানুষ প্রশংসা করে আর যে ইবাদতের স্থানে বা যজ্ঞে যাওয়া-আসা করে।

হে সতাক্রুত ইন্দ্র! বা হে প্রশংসার যোগ্য ইন্দ্র সাম বেদের পাঠকরা তোমার প্রশংসা করে আর ঋগ্বেদের পাঠকরা তোমার প্রশংসা করে। ব্রাহ্মণরা তোমাকে বাঁশের মত উঁচিয়ে রাখে। নেয়ামতদাতা ইন্দ্র, স্বীয় পূজারির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত, যে পাহাড়ের ছড়ায় সোম গাছ এনে অনেক পূজা করেছে। তাই ইন্দ্র মরুতের সৈন্যরাজির সাথে আসে। হে সোমরস পানকারী ইন্দ্র, তোমার সুঠাম-সুন্দর ও দীর্ঘকেশী ঘোড়া জোতে আমাদের প্রশংসা শোনার জন্য এখানে আস। হে বসুদেব! আমাদের এই পূজায় এসে যোগ দাও। আমাদের মন্ত্র, প্রশংসা ও দোয়াগুলো গ্রহণ কর। আমাদের কুরবানীতে তুমি সদয় হও আর আমাদের প্রচুর জীবিকা দাও। ইন্দ্রের প্রশংসায় বারবার মন্ত্র পড়া উচিত যে অগণিত শত্রুকে ছত্রভঙ্গকারী, কেননা এটি উন্নতির কারণ; যেন এই শক্তিশালী দেবতা আমাদের সাথে আমাদের সন্তানসন্ততির সাথে এবং আমাদের বন্ধুদের সাথে স্নেহভরে কথা বলে। আমরা ইন্দ্রের কাছে তার স্নেহ, সম্পদ ও কামেল শক্তি লাভের জন্য আসি, কেননা সেই শক্তিশালী ইন্দ্র সম্পদ দিয়ে আমাদের রক্ষা করার যোগ্যতা রাখে। হে ইন্দ্র! যখন তুমি তোমার শত্রুদের ধ্বংস কর তখন আকাশ ও পৃথিবী তোমার সামনে নিরুপায়। বৃষ্টি বর্ষণ করার ক্ষমতা তোমারই নিয়ন্ত্রণে। আমাদের মহাবদান্যতার স্বাক্ষর রেখে গাভী দান কর। হে প্রশংসনীয় ইন্দ্র! আমরা যেন সদা তোমার প্রশংসায় নিমগ্ন থাকি। হে দীর্ঘজীবী! এই প্রশংসায় তোমার শক্তি বৃদ্ধি পাক। আমাদের এই প্রশংসা যেন তোমার পছন্দ হয় আর আমরা যেন আনন্দ লাভ করতে পারি।

আমরা দেবতাদের বার্তাবাহক ও তাদের আহ্বানকারী অগ্নিকে বেছে নিচ্ছি, ব্যাপক সম্পদশালী আর এই ইবাদতের পূর্ণতাদাতা। হে উজ্জ্বল অগ্নি! আমরা তোমাকে অনেক আগে হোম হিসেবে সম্বোধন করেছি, আমাদের শত্রুদের জ্বালিয়ে দাও যাদের নিরাপত্তাদাতা হলো, নোংরা রূহ। কুরবানী বা যজ্ঞে সেই অগ্নির প্রশংসা কর যে অনেক বুদ্ধিমান, সত্যবাদী ও উজ্জ্বল এবং রোগ-নিরাময়কারী। হে আলোকিত অগ্নি! দেবতাদের বার্তাবাহক, এই নৈবেদ্য উপস্থাপনকারীর নিরাপত্তা বিধান কর যে তোমার পূজা করে। হে পরিচ্ছন্নকারী, সেই ব্যক্তির প্রতি সদয় হও যে দেবতাদের মনোঃতুষ্টির জন্য আগুনের কাছে এসে উপস্থিত হয়।

হে সমুজ্জ্বল ও পরিষ্কারক অগ্নি! আমাদের কুরবানী ও আমাদের নৈবেদ্যে দেবতাদের আন। আমরা সেই মন্ত্র পড়ে তোমার প্রশংসা করেছি যা সবার শেষে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আমাদের খোরাক ও সম্পদ দাও যা সন্তানসন্ততির উৎস। হে অগ্নি দেবতা! আমাদের নৈবেদ্য দেবতাদের দাও আর নৈবেদ্যদাতা অর্থাৎ এর বিনিময়ে যেন অগ্নির জ্ঞান অর্জন হয়। হে অগ্নি! সকল দেবতাসহ সোমরস পান করার জন্য আমাদের পূজায় আস আর কুরবানী উপস্থাপন কর। হে বুদ্ধিমান অগ্নি কানোয়া অর্থাৎ ঋষিরা তোমাকে ডাকে আর তোমার গুণগান গায়। হে অগ্নি! দেবতাদের সাথে আস। হে অগ্নি! নেককর্মের প্রচার-প্রসারকারীদেরকে তাদের স্ত্রীদেরসহ এই কুরবানীর অংশীদার কর, যাদের আমরা পূজা করি। হে উজ্জ্বল জিহ্বার অধিকারী! তাদের সোমরস পান করতে দাও। সেসব দেবতাকে যাদের আমরা পূজা ও প্রশংসা করি ইবাদতের সময় সোমরস পান করাও। হে অগ্নি দেবতা! তোমার ধূর্ত ও শক্তিশালী অশ্বীদের নিজের রথে যোগ কর যাদের আমরা রোহিত নাম দিয়ে থাকি আর তাদের ওসীলায় এখানে দেবতাদের আন। হে পুরস্কারদাতা ও ঋতু দেবতার সাথে কুরবানী বা যজ্ঞে অংশগ্রহণকারী অগ্নি, ঘরের অগ্নি হয়ে যাও আর ইবাদতকারীদের সাথে দেবতাদের উপাসনা কর। হে অগ্নি! সোম পানার্থে তোমাকে আগ্রহের সাথে ডেকেছি। মরুৎকে সাথে নিয়ে আস। হে শক্তিশালী! এই যজ্ঞে কোন মানুষ বা কোন দেবতার কোন কর্তৃত্ব নেই; কেবল তোমারই তা লব্ধ। হে অগ্নি! মরুৎসহ আস। হে অগ্নি! দেবতাদের সুন্দরী রাণীদের ও নোয়াশত্রীদের (বা নববধুদের) সোমরস পান করার জন্য এখানে নিয়ে আস। হে অগ্নি! আমাদের এই নৈবেদ্য ও নতুন মন্ত্র সম্পর্কে দেবতাদের সংবাদ

দাও। হে অগ্নি! তুমি সর্বপ্রথম এবং সকল অগ্নির ঋষি ছিলে। দেবতাদের পূজা তোমার কারণে কল্যাণমণ্ডিত হয়। তুমি বুদ্ধিমান, বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সারা বিশ্বের কল্যাণের জন্য তুমি বুদ্ধিমান, তুমি জ্ঞানী লোকদের সন্তান, মানুষের কল্যাণের জন্য নেক রূপ ধারণ করে রেখেছ। হে বাতাসের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী অগ্নি! স্বীয় পূজারিদের দেখা দাও যেন সে জানতে পারে, আমার পূজা গৃহীত হয়েছে। তোমার শক্তিমত্তার ভয়ে আকাশ ও পৃথিবী কম্পমান। তুমি সেই বোঝা বহন করেছ যার জন্য পুরোহিত নিযুক্ত করা হয়েছিল। তুমি সম্মানিত দেবতাদের পূজা করেছ। হে অগ্নি! তুমি বাসনা পূর্ণকারী। তুমি তোমারই পূজারিদের সম্পদ বৃদ্ধিকারী। হে অগ্নি! আমরা সম্পদের জন্য তোমার পূজা করি। এই হোমাচারী বা ইবাদতকারীদের খ্যাতি দান কর। তোমার কৃপায় আমাদের যখন সন্তান হয় আমরা যেন এই আচার অনুষ্ঠান পালন করতে পারি। ধরণী, আকাশ ও সকল দেবতাসহ আমাদের রক্ষা কর।

হে অগ্নি! আমাদের এই ভ্রান্তি এবং সেই রীতিনীতিকে মার্জনা কর যার কারণে আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছি। তোমার প্রশংসা করা উচিত কেননা তুমি তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী যারা তোমাকে তোমার যোগ্য নৈবেদ্য দিয়ে থাকে। হে পবিত্র অগ্নি! যে নৈবেদ্য নেয়ার জন্য সর্বত্র যায়, যেভাবে প্রথম যুগের মনু, তয়াতী ও অঙ্গিরা (Manus , Angrius , Angiras and Yayati) অর্থাৎ অতীতের রাজারা যেতো সেভাবে তুমি ইবাদতের বা যজ্ঞকক্ষে যাও যা তোমার সামনে আর দেবতাদের এখানে আন, তাদের পবিত্র কুশা ঘাসে বসাও এবং তাদের সামনে এমন মহান কুরবানী পেশ কর যার কারণে তারা ধন্য হতে পারে। হে অগ্নি! তুমি আমাদের এই মন্ত্রের মাধ্যমে উন্নতি দান কর যা আমরা আমাদের যোগ্যতা ও আমাদের জ্ঞান অনুসারে পড়ি। আমাদের সম্পদশালী কর, আমাদেরকে পবিত্র বুদ্ধি ও প্রভূত খোরাক দাও। আমরা মন্ত্র পড়ে অনেক মানুষের কল্যাণার্থে, যারা দেবতাদের পূজা করে থাকে, শক্তিশালী অগ্নিকে মানিয়ে থাকি; অন্য ঋষিরাও এর প্রশংসা করে থাকে। মানুষ সেই অগ্নির দিকে প্রত্যাবর্তন করে যে শক্তি বৃদ্ধিকারী। হে অগ্নি! আমরা নৈবেদ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে তোমার পূজা করি। হে প্রভূত খোরাকদাতা! আজ আমাদের প্রতি সদয় হও। হে অগ্নি! তুমি আনন্দদাতা, দেবতাদের আহ্বানকারী আর তাদের বার্তাবাহক ও মানুষের তত্ত্বাবধায়ক। যেসকল নেক

ও দীর্ঘস্থায়ী কাজ দেবতারা করে, সেসব তোমার মাঝে সমবেত রয়েছে। হে যুবক ও প্রসন্ন-শুভলক্ষণপূর্ণ অগ্নি! যা কিছু আমরা তোমার কাছে উপস্থাপন করি তুমি আমাদের প্রতি সদয় হয়ে অনুগ্রহপূর্বক এখন বা অন্য কোন সময় তা দেবতাদের কাছে নিয়ে যাও। হে অগ্নি! এভাবে তোমার পূজারি তোমার পূজা করে আর তুমি নিজের আলোতে নিজেই আলোকিত। সাত জন পুরোহিতের সাহায্য নিয়ে মানুষ নৈবেদ্য পেশ করে অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করে, যে নিজের শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত। হে অগ্নি! যে বিলুপ্তকারী, তুমি ও অন্যান্য দেবতারা সম্মিলিতভাবে অত্রিকে হত্যা করেছ। দেবতারা ধরণী, স্বর্গ ও আকাশকে সৃষ্টির বসবাসের জন্য প্রশস্ত জায়গা বানিয়েছে। সম্পদশালী অগ্নি প্রয়োজনের সময় কানোয়ার ওপর যেন এমন সদয় হয় যেভাবে যুদ্ধে গবাদিপশুর জন্য ঘোড়া হ্রেষাধ্বনি করে। সেই অগ্নির কিরণ সফলভাবে ঝলমল করে যাকে কানোয়া সূর্য হতে বেশি উজ্জ্বল করেছে; আমরা তার প্রশংসা করি। আমরা একে সুউচ্চ-সমুন্নত করি। হে খোরাকদাতা অগ্নি! আমাদের ভাণ্ডার ভরে দাও কেননা দেবতাদের বন্ধুত্ব তোমার মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। তুমি বিভিন্ন প্রকার খোরাকের মালিক। আমাদের সুখী কর কেননা তুমি পুণ্যবান। হে অগ্নি! আমাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সূর্য দেবতার মত হয়ে যাও। সোজা দণ্ডায়মান হও। তুমি খোরাকদাতা, যে কারণে আমরা মলমের অর্ঘ উপস্থাপন করে তোমাকে ডাকি আর পুরোহিতরা তোমাকে নৈবেদ্য পেশ করে।

হে যুবক ও উজ্জ্বল অগ্নি! আমাদেরকে অসূচী আত্মা এবং ক্ষমা করে না এমন প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষ হতে আর বিষাক্ত প্রাণী এবং সেসকল লোকদের হাত হতে রক্ষা কর যারা আমাদের হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। হে অগ্নি! তোমাকে মনু বহু মানব প্রজন্মের ওপর আলো বিচ্ছুরণের জন্য নিযুক্ত করেছেন। তুমি নৈবেদ্য পাওয়ার জন্য সৃষ্টি হয়েছ আর নৈবেদ্য পেয়ে তৃপ্ত হও, তুমি অলোকিত, যাকে সবাই নমস্কার করে। অগ্নির শিখা উজ্জ্বল, শক্তিশালী ও ভয়ানক, এসবকে বিশ্বাস করা উচিত নয়, তা শক্তিশালী অপবিত্র আত্মা ও আমাদের অন্যান্য বিরোধীদের সবসময় পুরোপুরি দগ্ধীভূত করে থাকে। হে অগ্নি! যে সম্পদশালী আর যে পুরো সৃষ্টির ফরিয়াদ গ্রহণকারী, প্রভাতে নৈবেদ্য উপস্থাপনকারীর কাছে উন্নত বাসস্থানসহ অনেক প্রকার সম্পদ নিয়ে আস। আজ উঠতেই এখানে দেবতাদের নিয়ে আস। আজকে আমরা বার্তাবাহক

অগ্নিকে বেছে নিচ্ছি, যে গৃহদাতা, সর্বজনপ্রিয়, ধূম্রের পতাকাধারী, আলোকদাতা আর প্রত্যুষে যে পূজারি পূজা করে তার নিরাপত্তা বিধানকারী। অগ্নি, যে সব দেবতার মাঝে উত্তম ও স্বল্পবয়সী, মানুষের অতিথি, যাকে সবাই ডাকে আর যে কুরবানী উপস্থাপনকারীদের বন্ধু, সকল সৃষ্টিকে জানে; আমি প্রভাতে তার মহিমাকীর্তন করি যেন সে অন্যান্য দেবতাদের আনতে যায়। হে কুরবানীকারী ও সর্বজ্ঞানী অগ্নি! সবাই তোমাকে আলোকিত করে, অনেকেই তোমাকে ডাকে। বুদ্ধিমান দেবতাদের দ্রুত এখানে নিয়ে আস। হে অগ্নি! তুমি মানুষের নৈবেদ্যের রক্ষণাবেক্ষণকারী আর দেবতাদের বার্তাবাহক। যেসকল দেবতা সকালে ওঠে আর সূর্যের পূজা করে আজকে তাদের এখানে আন। হে আশ্বিন দেবতাগণ! তোমরা সকালের ইবাদতের জন্য জাগ্রত হও। সেই উভয় দেবতা সোমরস পান করার জন্য এখানে আসবে এমনটি যেন হয়। আমরা উভয় আশ্বিনকে আহ্বান করি যাদের উভয়েই দেবতা আর তারা রথ চালনায় খুবই দক্ষ। তারা একটি অতি উন্নত রথে সওয়ার হয় আর স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছে।

হে আশ্বিন দেবতাগণ! নিজেদের চাবুক দ্বারা সোম নৈবেদ্য নেড়ে দাও যা তোমাদের ঘোড়ার মুখের ফেনায় সিক্ত আর যখন চাবুক মারা হয় তখন তা হতে সুউচ্চ ধ্বনি নির্গত হয়। হে আশ্বিন! সোম প্রথা আদায়ের দায়িত্বে ন্যস্ত অর্থাৎ পুরোহিতদের থাকার জায়গা তোমাদের থেকে দূরে নয় যেখানে তোমরা তোমাদের রথে বসে যাও। আমি আমার নিরাপত্তার জন্য স্বর্ণহাতি সূর্যকে ডাকছি, সে পূজ্যারদের ধাপ বা মর্যাদা নির্ধারণ করে। সূর্য যে পানির সাহায্যকারী নয়, আমাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তার প্রশংসা কর। আমরা তার পূজার বাসনা রাখি। বন্ধুগণ বস। আমরা সূর্যের প্রশংসা করব কেননা তা সত্যিকার অর্থে সম্পদদাতা। বুদ্ধিমান সদা সূর্যের মহান মর্যাদার যথাযথ সম্মান দিয়ে থাকে আর তাদের চোখ আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। বুদ্ধিমান মানুষ সর্বদা অতি সচেতন থাকে আর প্রশংসা করার ক্ষেত্রে বড় সক্রিয় বা কর্মঠ। আমরা সূর্যের সুমহান মর্যাদার প্রশংসা করি। সর্বজ্ঞানী সূর্য দেবতাকে, এর ঘোড়া উচ্চতায় নিয়ে যায় যেন সারা পৃথিবী তাকে দেখতে পায়। হে সূর্য! তুমি সবচেয়ে বেশি চল আর সবাই তোমাকে দেখে। তুমি আলোর উৎস, যে সারা আকাশে ঝলমল করে। হে সূর্য! তুমি মর্ত (Marit) দেবতার সামনে উদিত হও। তুমি মানুষের মুখোমুখি বের হও আর এমনভাবে বের হও যেন সব স্বর্গীয় অস্তিত্ব তোমাকে দেখতে পায়। তুমি সেই আলোসহ

আবির্ভূত হও যার মাধ্যমে তুমি পরিচ্ছন্নকারী ও পাপ হতে রক্ষাকারী। দিন ও রাতের ধারণা করে এবং পুরো সৃষ্টিকে দৃষ্টিতে রেখে তুমি বিস্তৃর্ণ আকাশ অতিক্রম করো।

হে সূর্য! তুমি আরামদায়ক আলোর মাধ্যমে জ্বলে উঠে দৃশ্যমান হও আর সবচেয়ে উঁচু আকাশে চড়ে আমার হৃদয়ের ব্যাধি ও আমার দেহের রুগ্নভাব দূর করে দাও। আলোকে অন্ধকারের অন্তরালে দেখে আমরা সূর্য দেবতার কাছে যাই যে দেবতাদের মাঝে এক বিশিষ্টস্থানীয় দেবতা। হে চন্দ্র দেবতা! তুমি সদা কর্মে রত থেকে পুণ্য করছ। তুমি স্বীয় শক্তির কারণে শক্তিমান ও সর্বব্যাপী। তুমি স্বীয় দানের কল্যাণে নেয়ামতদাতা আর স্বীয় মাহাত্ম্যের গুণে মহান। তুমি, হে মানুষের পথপ্রদর্শক! নৈবেদ্য বা ধর্মীয় কৃত্যের কল্যাণে অসাধারণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছ। তোমার কাজ বরুন রাজার কাজের ন্যায়। হে চন্দ্র! তোমার কথা মহান। তুমি প্রিয় মিত্র দেবতার ন্যায় সবাইকে পরিচ্ছন্নকারী। তুমি আরিয়ামান (Aryaman) দেবতার ন্যায় সবার প্রবৃদ্ধিদাতা। যেহেতু তোমাতে সেসকল যশ বিদ্যমান যা তোমার কল্যাণে আকাশ, জমিন, পাহাড় ও পানিতে বিকশিত, তাই হে চন্দ্ররাজা! আমাদের সাথে সদাচরণ করো আর রাগান্বিত না হয়ে আমাদের নৈবেদ্য গ্রহণ কর। হে চন্দ্র! যে প্রশংসাপ্রিয় আর গাছপালার গুরু, তুমি আমাদের প্রাণ, তুমি চাইলে আমরা মরব না। হে চন্দ্র! যে তোমার পূজা করে তার উপভোগের জন্য ও জীবিত থাকার জন্য তুমি তাকে সম্পদ দিয়ে থাক, সে যুবা হোক বা বৃদ্ধই হোক না কেন। হে চন্দ্র রাজা! যে ক্ষতি করার ফন্দি আঁটে তার হাত থেকে আমাদের নিরাপদ রাখ। তোমার ন্যায় দেবতার বন্ধু কখনো মরতে পারে না। হে চন্দ্র দেবতা! এমন সাহায্য করে আমাদের রক্ষা কর যার ফলে নৈবেদ্য পেশকারীরা আনন্দিত হয়। আমাদের এই প্রশংসা ও নৈবেদ্যকে গ্রহণ করে আমাদের কাছে আস আর আমাদের ধর্মীয় কৃত্যের উন্নতিদাতা হয়ে যাও। আমরা যেহেতু মন্ত্র সম্পর্কে অবহিত, একারণে আমরা তোমার প্রশংসা করে তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করি। হে কৃপাশীল চন্দ্র! এদিকে আস। হে সম্পদদাতা! আমাদের হারিয়ে যাওয়া সম্পদ সম্পর্কে অবহিত, খোরাক বৃদ্ধিকারী চন্দ্র দেবতা! আমাদের একজন যোগ্য সাহায্যকারী হয়ে যাও। হে চন্দ্র দেবতা! আমাদের হৃদয়ে সেভাবে আনন্দের সাথে বিরাজ কর যেভাবে গবাদিপশু চারণভূমিতে বা মানুষ নিজেদের ঘরে আনন্দিত থাকে। হে চন্দ্র দেবতা! তোমাতে সকল দিক থেকে শক্তি আসুক, আমাদের জন্য খোরাক

সরবরাহের ক্ষেত্রে সক্রিয় হও। হে আনন্দিত চন্দ্র দেবতা! লতানো উদ্ভিদের সাথে বৃদ্ধি পাও, আমাদের বন্ধু হয়ে যাও। খাবারের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি দাও যাতে আমরা উন্নতি করতে পারি। চন্দ্র দেবতা, যে নৈবেদ্য পেশ করে, তাকে দুধের গাভী, দক্ষ ঘোড়া অধিকন্তু এক পুত্রসন্তান দান করেন যে ব্যবসাবাণিজ্যে দক্ষ, পারিবারিক সম্পর্কে কুশলী আর পূজায় সক্রিয় বৈঠকে যোগ্য আর যে স্বীয় পিতার সম্মানের কারণ। হে চন্দ্র দেবতা! আমরা তোমাকে প্রসিদ্ধ ও বীর জেনে আনন্দিত হই, যে রণক্ষেত্রে অটল, সহস্র সহস্র মানুষের মাঝে যুদ্ধ করে বিজয়ী, শক্তি নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষাকারী, নৈবেদ্যের মাঝে জন্মগ্রহণকারী ও প্রদীপ্ত গৃহে বসবাসকারী। হে চন্দ্র দেবতা! তুমি এসব জলজ উদ্ভিদ এবং গাভী সৃষ্টি করেছ। তুমি বিস্তীর্ণ আকাশকে বিস্তৃত করেছ তুমি অন্ধকারকে আলোর মাধ্যমে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছ।

হে শক্তিশালী চন্দ্র দেবতা! তোমার আলোকিত মনমানসিকতার মাধ্যমে স্বীয় সম্পদের একাংশ দাও, কোন বিরোধী যেন তোমাকে বিরক্ত করতে না পারে। তুমি সমপর্যায়ের যেকোন দুজন সাহসী প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখ, যুদ্ধে শত্রুদের হাত হতে আমাদের রক্ষা কর। সূর্য সমুজ্জ্বল প্রভাতের সাথে সেভাবে আসে যেভাবে যুবক পুরুষ সুন্দরী নারীর পেছনে ছুটে। তখন ধর্মপ্রাণ মানুষ নির্ধারিত সময়ের প্রথাগুলো পালন করে আর আশিসমণ্ডিত সূর্যকে উত্তম পুরস্কারের জন্য পূজা করে, অর্থাৎ তার উপাসনা করে। নিশ্চয় সূর্যের সুপ্রসন্ন দ্রুতগতিসম্পন্ন, শক্তিশালী ও সুদূর পথ পাড়িদাতা ঘোড়া, যাদের আমরা ইবাদত করেছি আর যারা প্রশংসার যোগ্য তারা আকাশের চূড়ায় পৌঁছে গেছে আর দ্রুত আকাশ ও পৃথিবীর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে এসেছে। দেবতা হিসেবে সূর্যের মাহাত্ম্য ও প্রতাপ এমন যে, সে যখন অস্ত যায় তখন সে নিরর্থক কাজে নিয়োজিত বিস্তৃত কিরণরাজিকে নিজের মাঝে গোপন করে নেয়। সে যখন নিজের ঘোড়া ছেড়ে দেয় তখন রাতের অমানিশা সবার ওপর ছেয়ে যায়। সূর্য নিজের উজ্জ্বল চেহারা মিত্র ও বরুণ দেবতার সামনে আকাশে বিস্তৃত করে। তার কিরণ একদিকে তার অনন্ত ও অতি উজ্জ্বল শক্তিকে বিস্তৃত করে আর দ্বিতীয়ত সে যখন চলে যায় তখন অন্ধকার নিয়ে আসে। হে দেবতা! আজকে সূর্য উদিত হতেই আমাদেরকে নিম্নমানের কাজকর্ম হতে রক্ষা কর। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সমুদ্র, ধরণী ও আকাশ দেবতা আমাদের দোয়া যেন মনোযোগ সহকারে শুনে।

এখন এ গ্রন্থের পাঠকরা নিজেরাই চিন্তা করুন! এতগুলো শ্লোকে খোদার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় কি যার স্তুপ লিখে আমরা বেশ কয়েক পৃষ্ঠা কালো করেছি? আর্য সাহেবরা ন্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের বলুন! ঋগ্বেদের এসব শ্লোকে স্বীয় উদ্দেশ্য-অভিপ্রায় প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন্ বাগ্মিতা প্রদর্শন করা হয়েছে? আপনি নিজেই বলুন, এসব বক্তব্য কি বাগ্মিতাপূর্ণ প্রাঞ্জল বক্তৃতাবলীর ন্যায় শক্তিশালী ও প্রমাণসমৃদ্ধ– নাকি অকার্যকর ও নিম্নমানের? ন্যায়পরায়ণ লোকদের একথা অজানা নয়, এই সকল শ্লোকে সত্য বিষয়কে প্রাঞ্জল বর্ণনার মাধ্যমে প্রকাশ করা এবং সত্য প্রসারের চেষ্টা করা তো দূরের কথা স্বয়ং শ্লোকগুলোর বিষয়বস্তু এতটা অকেজো ও অর্থহীন যে, এর মাধ্যমে শ্রোতা এক প্রকার অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে যায়। কখনো কোন কিছুকে স্রষ্টা আখ্যা দেয় আর তার কাছে অভীষ্ট যাচনা করে আবার কখনো তাকেই সৃষ্টির আসনে বসায় এবং অন্যের মুখাপেক্ষী আখ্যায়িত করে। খোদার বৈশিষ্ট্যাবলী কখনো কাউকে প্রদান করে এরপর আবার তাঁরই প্রতি নশ্বর বস্তুনিচয়ের গুণাবলী আরোপ করে।

এখন এটি জানাকথা, বক্তব্যকে যে এতটা দীর্ঘসূত্রিতার মাঝে ঠেলে দিয়েছে অথচ অর্জন কিছুই হয় নি, সে তৌহীদের দাবিদার হয়ে তৌহীদ বা একত্ববাদও বর্ণনা করে নি আর সৃষ্টিপূজার দাবিদার হয়ে সৃষ্টিপূজার যৌক্তিকতার পক্ষে কোন প্রমাণও উপস্থাপন করে নি। বরং দিশেহারা ও বিবেকবুদ্ধিহীন মানুষের মত এমন ভিত্তিহীন ও স্ববিরোধী কথা বলেছে যার ফলে হিন্দু ধর্মে অদ্ভুত সব বিপত্তি দেখা দিয়েছে। কেউ এক দেবতার পূজারি আবার কেউ অন্য দেবতার ভজন গাইছে। তাই প্রশ্ন দাঁড়ায়, আপাদমস্তক এমন বৃথা ও অর্থহীন বাজে বক্তৃতা এ যোগ্যতা রাখে কি, যাকে কোনো বিবেকবান বাগ্মিতাপূর্ণ ও অলঙ্কারময় বলবে? হয়ত কিছু হিন্দু ব্যক্তিবর্গ, যারা কেবল বেদের নাম শুনে রেখেছে আর কখনো এই পবিত্র গ্রন্থের দর্শন লাভ করে নি তারা হৃদয়ে এই সন্দেহ পোষণ করতে পারে যে, ঋগ্বেদের যেসব শ্লোক লেখা হয়েছে তা সঠিকভাবে লেখা হয় নি বা হয়ত এর চেয়ে উত্তম শ্লোকও উল্লিখিত বেদে থাকবে যাতে বেদ খোদার একত্ববাদ বর্ণনা করতে গিয়ে বাগ্মিতার পরিচয় দিয়ে থাকবে বা সৃষ্টিপূজাকে বাগ্মিতাপূর্ণ ও যুক্তিসমৃদ্ধ বক্তৃতার মাধ্যমে তুলে ধরে থাকবে যা কিনা বাগ্মিতা ও আলংকারিকতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এমন সন্দেহপ্রবণ লোকদের কথার উত্তর

হলো, আমরা এসব শ্লোক ঋগ্বেদ সংহিতা প্রথম অষ্টক, শ্লোক ১-১১৫ পর্যন্ত নমুনাস্বরূপ বেছে নিয়ে লিপিবদ্ধ করেছি। যদি কারো এই দাবি থেকে থাকে, এসকল শ্লোক সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয় নি তাহলে তার দৃষ্টিতে যা সঠিক অনুবাদ তা উপস্থাপন করা উচিত যেন ন্যায়পরায়ণ মানুষ নিজেই বিবেচনা করতে পারে, এসকল শ্লোক সঠিক, নাকি তার উপস্থাপিত শ্লোক সঠিক। যদি কারো এই দাবি থেকে থাকে যে, যদিও শ্লোকগুলো অর্থহীন ও হাত-পা বিহীন কিন্তু একই ঋগ্বেদে এমন শ্লোকও রয়েছে যাতে খোদার একত্ববাদের বিবরণ অতি স্পষ্ট ও শালীনতার সাথে বিদ্যমান! তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হবে, উপস্থাপিত এসকল শ্লোকের সাথে সে শ্লোকগুলোও তুলে ধরা যেন কোনভাবে বেদের বাগ্মিতা ও বর্ণনার সৌন্দর্য প্রমাণ হয়ে যায়। অন্যায়ভাবে কোন ব্যক্তির প্রতি হঠকারিতামূলক ব্যবহারের মানুষ আমরা নই।

আমরা সত্য অন্তঃকরণে বলছি, আমরা বেদে গভীর প্রণিধান ও চিন্তাভাবনার পর এতে শালীন বর্ণনার নামগন্ধও খুঁজে পাই নি। আমরা গভীর আক্ষেপের সাথে লিখছি, বিচ্ছিন্ন অগোছালো এমন কথাগুলো আর্যসমাজীদের হৃদয়ের ওপর কতবড় একটি বোঝা! তারা কেন এমন অপরিপক্ক ও সেকেলে চিন্তাধারার মোহে আচ্ছন্ন হচ্ছে? বেদের ধর্মীয় সাহিত্য যদি এত বাজে দীর্ঘসূত্রিতা, অর্থহীন বক্তৃতা আর কাণ্ডজ্ঞানহীন বিষয়বস্তু সম্বলিত হওয়া সত্ত্বেও বাগ্মিতাপূর্ণ ও প্রাঞ্জল হয়ে থাকে তাহলে পৃথিবীতে কোন্ রচনাকে প্রাঞ্জলতাহীন এবং বাগ্মিতাশূন্য বলা উচিত হবে? আর বাগ্মিতাপূর্ণ রচনা কাকে বলা হয় আর্যসমাজীরা যদি তা না জানে তবে তাদের জন্য আবশ্যক হবে চোখ খুলে উল্লিখিত বেদের দীর্ঘ বক্তৃতার বিপরীতে কুরআনের কিছু আয়াতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেখা যে, কত সূক্ষ্মভাবে সংক্ষিপ্ততার সাথে একত্ববাদ-সংক্রান্ত অগণিত বিষয় অতি ছোট ও যুক্তিপূর্ণ বাক্যাবলীতে বর্ণনা করে আর কত চেষ্টাসাধনা করে একত্ববাদের বিষয়টি হৃদয়ে গ্রথিত করে আর কত প্রাঞ্জল ও প্রমাণসমৃদ্ধ নিখুঁত শব্দবিন্যাসে খোদার একত্ববাদকে স্বচ্ছ হৃদয়ে গেঁথে দেয়! উল্লিখিত বেদে এর মত শ্লোক যদি থেকে থাকে তাহলে উপস্থাপন করা উচিত, নতুবা অনর্থক বকবক করা আর নির্বাক হয়েও নোংরামি ও দুষ্কৃতি হতে বিরত না হওয়া তাদের কাজ যাদের কোন সম্পর্ক খোদা ও বিশ্বস্ততার সাথে নেই আর লজ্জাবোধ ও লজ্জাশীলতার সাথেও

যাদের সংশ্রব নেই। তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে বেদের বিভিন্ন শ্লোকের মোকাবিলায় এখানে আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ কুরআন শরীফের কিছু আয়াত লিপিবদ্ধ করছি যা খোদা তা'লার একত্ববাদ বা তৌহীদকে উপস্থাপন করে যেন সবাই বুঝতে পারে যে, বেদ ও কুরআন শরীফের বাক্যাবলীর মাঝে কোনটির বাক্যগুচ্ছ বা শ্লোকে সূক্ষ্মতা-সৌন্দর্য, সংক্ষিপ্ততা এবং বর্ণনার দৃঢ়তা পাওয়া যায় আর কোনটির বাক্যগুচ্ছ বা কথা বিভিন্ন প্রকার সন্দেহের মুখে ঠেলে দেয় আবার যা বৃথা ও অপ্রয়োজনীয়ভাবে দীর্ঘ। সেই আয়াতগুলো নিম্নরূপ:

اَللّٰہُ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۬ۚ لَا تَاۡخُذُہٗ سِنَۃٌ وَّلَا نَوۡمٌ ؕ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الۡاَرۡضِ

(সূরা আল বাকারা: ২৫৬)

قُلۡ ہُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ ○ اَللّٰہُ الصَّمَدُ ○ لَمۡ یَلِدۡ ۬ۙ وَلَمۡ یُوۡلَدۡ ○ وَلَمۡ یَکُنۡ لَّہٗ کُفُوًا اَحَدٌ ○

(সূরা ইখলাস: ২-৫)

لَوۡ کَانَ فِیۡہِمَاۤ اٰلِہَۃٌ اِلَّا اللّٰہُ لَفَسَدَتَا

(সূরা আল আম্বিয়া: ২৩)

مَا کَانَ مَعَہٗ مِنۡ اِلٰہٍ اِذًا لَّذَہَبَ کُلُّ اِلٰہٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعۡضُہُمۡ عَلٰی بَعۡضٍ

(সূরা আল মু'মিনুন: ৯২)

قُلِ ادۡعُوا الَّذِیۡنَ زَعَمۡتُمۡ مِّنۡ دُوۡنِہٖ فَلَا یَمۡلِکُوۡنَ کَشۡفَ الضُّرِّ عَنۡکُمۡ وَلَا تَحۡوِیۡلًا ○

(সূরা বনী ইসরাঈল: ৫৭)

قُلِ ادۡعُوۡا شُرَکَآءَکُمۡ ثُمَّ کِیۡدُوۡنِ فَلَا تُنۡظِرُوۡنِ ○ اِنَّ وَلِیِّۦَ اللّٰہُ الَّذِیۡ نَزَّلَ الۡکِتٰبَ ۫ۖ وَہُوَ یَتَوَلَّی الصّٰلِحِیۡنَ ○ وَالَّذِیۡنَ تَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِہٖ لَا یَسۡتَطِیۡعُوۡنَ نَصۡرَکُمۡ وَلَاۤ اَنۡفُسَہُمۡ یَنۡصُرُوۡنَ ○

(সূরা আল আ'রাফ: ১৯৬-১৯৮)

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبۡعُ وَالۡاَرۡضُ وَمَنۡ فِیۡهِنَّ ؕ وَاِنۡ مِّنۡ شَیۡءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمۡدِهٖ وَلٰکِنۡ لَّا تَفۡقَهُوۡنَ تَسۡبِیۡحَهُمۡ ؕ

(সূরা বনী ইসরাঈল: ৪৫)

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبۡحٰنَهٗ ؕ هُوَ الۡغَنِیُّ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ اِنۡ عِنۡدَکُمۡ مِّنۡ سُلۡطٰنٍۭ بِهٰذَا ؕ اَتَقُوۡلُوۡنَ عَلَی اللّٰهِ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ ○

(সূরা ইউনুস: ৬৯)

اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبۡحٰنَهٗۤ اَنۡ یَّکُوۡنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ وَکَفٰی بِاللّٰهِ وَکِیۡلًا

(সূরা আন নিসা: ১৭২)

وَیَجۡعَلُوۡنَ لِلّٰهِ الۡبَنٰتِ سُبۡحٰنَهٗ ۙ وَلَهُمۡ مَّا یَشۡتَهُوۡنَ ○

(সূরা আন নাহ্‌ল: ৫৮)

اَلَکُمُ الذَّکَرُ وَلَهُ الۡاُنۡثٰی ○ تِلۡکَ اِذًا قِسۡمَةٌ ضِیۡزٰی ○

(সূরা আন নাজ্‌ম: ২২-২৩)

یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اعۡبُدُوۡا رَبَّکُمُ الَّذِیۡ خَلَقَکُمۡ وَالَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِکُمۡ لَعَلَّکُمۡ تَتَّقُوۡنَ ○ الَّذِیۡ جَعَلَ لَکُمُ الۡاَرۡضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۪ وَّاَنۡزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخۡرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزۡقًا لَّکُمۡ ۚ فَلَا تَجۡعَلُوۡا لِلّٰهِ اَنۡدَادًا وَّاَنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ○

(সূরা আল বাকারা: ২২-২৩)

وَهُوَ الَّذِیۡ فِی السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّفِی الۡاَرۡضِ اِلٰهٌ

(সূরা আয্ যুখ্‌রুফ: ৮৫)

هُوَ الۡاَوَّلُ وَالۡاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالۡبَاطِنُ

(সূরা আল হাদীদ: ৪)

لَا تُدۡرِکُهُ الۡاَبۡصَارُ ۫ وَهُوَ یُدۡرِکُ الۡاَبۡصَارَ

(সূরা আল আন'আম: ১০৪)

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

(সূরা আশ শূরা: ১২)

خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا

(সূরা আল ফুরকান: ৩)

لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ۫ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

(সূরা আল কাসাস: ৭১)

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ

(সূরা আন নিসা: ৪৯)

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا

(সূরা আল কাহ্‌ফ: ১১১)

لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

(সূরা লুকমান: ১৪)

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۘ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۟ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ؕ
لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

(সূরা আল কাসাস: ৮৯)

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

(সূরা বনী ইসরাঈল: ২৪)

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۙ فَلَا تُطِعْهُمَا

(সূরা লুকমান: ১৬)

اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ؕ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

(সূরা আল আন'আম: ১৮-১৯)

لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ○

(সূরা আর রা'দ: ১৫)

مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ

(সূরা আল বাকারা: ২৫৬)

وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ

(সূরা আল আম্বিয়া: ২৯)

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۪ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

(সূরা আল আ'রাফ: ১৮১)

اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا

(সূরা আল আনকাবুত: ১৮)

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ

(সূরা আল হাজ্জ: ৩১)

اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَآ ۫ اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَآ ۫ اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَآ ۫ اَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا

(সূরা আল আ'রাফ: ১৯৬)

لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

(সূরা হা মীম আস্ সাজদা: ৩৮)

لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَاۤ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ○

(সূরা ইয়াসিন: ৪১)

اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّاۤ اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ○

(সূরা মারইয়াম: ৯৪)

وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْۤ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ○

(সূরা আল আম্বিয়া: ৩০)

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ؕ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

(সূরা আন নিসা: ১৭২)

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ؕ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ؕ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ○ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ○

(সূরা আল হাজ্জ: ৭৪-৭৫)

اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا

(সূরা আল বাকারা: ১৬৬)

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۭ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ○

(সূরা আল আন'আম: ১০১)

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ۨابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○ اِتَّخَذُوْۤا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَاۤ اُمِرُوْۤا اِلَّا لِيَعْبُدُوْۤا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

(সূরা আত্ তাওবা: ৩০-৩১)

مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

(সূরা মারইয়াম, ১৯:৩৬)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـِٕيْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْۤا ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ○ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ؕ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ

(সূরা আল হাজ্জ, ২২:১৮-১৯)

আল্লাহ্‌, যিনি সকল উৎকর্ষ গুণাবলীর সমাহার এবং ইবাদতের যোগ্য, তাঁর সত্তা প্রমাণের মাপকাঠিতে সুপ্রকাশিত, কেননা তিনি নিজ সত্তায় চিরঞ্জীব ও স্থায়ী। তিনি ব্যতীত কোন কিছু নিজ সত্তায় চিরঞ্জীব ও স্থায়ী নয়। অর্থাৎ তিনি ছাড়া কোনো বস্তুতে এই বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না যে, অস্তিত্বের আবশ্যকতা ছাড়া নিজেই বর্তমান ও প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে বা এই বিশ্বের অস্তিত্বের কারণ হতে পারে যা পরম প্রজ্ঞা এবং দৃঢ় বিন্যাস ও ভারসাম্য বজায় রেখে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এ বিষয়টি সেই বিশ্বস্রষ্টার সত্তাকে প্রমাণ করে যিনি সকল উৎকর্ষ গুণাবলীর সমাহার। এই সূক্ষ্ম-সুন্দর যুক্তি প্রদানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা হলো, একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, বিশ্বের বস্তুনিচয়ের মাঝে প্রত্যেক বস্তু যা চোখে পড়ে সেসবের অস্তিত্ব সম্পর্কে ভাবলে বোঝা যাবে, সেসবের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব আবশ্যক নয়। যেমন, পৃথিবী গোলাকার। এর আয়তন বা ব্যাস কারো কারো মতে প্রায় ৪ হাজার ক্রোশ*। কিন্তু একথার কোন প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যে, এই আকৃতি ও ভর কেন আবশ্যক আর কেন এর চেয়ে বেশি বা কম হওয়া বা যে আকৃতি বর্তমানে রয়েছে এর চেয়ে ভিন্ন কোনো আকৃতির হওয়া বৈধ নয়?

যেহেতু একথার পক্ষে কোন প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় নি তাই এই আকৃতি ও এই ভর যার সম্মিলিত রূপের নামই হলো অস্তিত্ব, তা যদি পৃথিবীর জন্য আবশ্যক

* টীকা: ক্রোশ অর্থাৎ প্রায় দুই মাইল। –অনুবাদক

না হয় তাহলে একই মাপকাঠিতে পৃথিবীর সকল বস্তুর অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব অপ্রয়োজনীয় সাব্যস্ত হলো। কেবল এটিই নয় যে, প্রত্যেক সৃষ্টির অস্তিত্বের প্রতি তাকালে বস্তুর অস্তিত্ব অপ্রয়োজনীয় মনে হয় বরং কোন কোন দিক এমন সামনে আসে যার মাধ্যমে অধিকাংশ বস্তুর নিশ্চিহ্ন হওয়ার কারণগুলো সামনে চলে আসে কিন্তু সেসকল বস্তু নিশ্চিহ্ন হয় না। যেমন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়া সত্ত্বেও সূচনা হতে সব কিছুর বীজ সুরক্ষিত-সংরক্ষিত থাকে। অথচ যুক্তির নিরিখে সহস্র সহস্র কঠিন পরিস্থিতি ও দুর্যোগের সময় যা যুগের সূচনা হতে পৃথিবীতে চলে আসছে, ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্যশস্য বা মানুষের খোরাক সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যাওয়ার কথা বা কোন প্রকার শষ্যদানা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কথা বা কখনো ভয়াবহ মহামারীর সময় মানবজাতির নামচিহ্ন মুছে যাওয়ার কথা অথবা বিভিন্ন প্রকার পশুর মধ্য হতে কোন কোন প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারত বা কখনো দৈবক্রমে সূর্য ও চন্দ্রের কার্যবিধান বিকল হয়ে যেতে পারত বা অন্যান্য অগণিত জিনিষের মধ্য হতে যা বিশ্ব-ব্যবস্থা নিখুঁতভাবে চলার জন্য আবশ্যক, কোনো বস্তুর অস্তিত্বে ক্রুটি দেখা দিতে পারত। কেননা কোটি কোটি বস্তুর একটির অন্যটির পথে বাদ সাধা ও বিশৃংখলামুক্ত থাকা এবং কখনো এতে কোনো প্রকার বিপত্তি নেমে না আসা অকল্পনীয়। সুতরাং যেসব বস্তুর অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব আবশ্যক নয় বরং সেসবের কোনো না কোনো সময় হারিয়ে যাওয়ার আশংকা টিকে থাকার সম্ভাবনার চেয়ে অধিক, কিন্তু এতদসত্ত্বেও সেসবের হারিয়ে না যাওয়া আর সুচারুরূপে ও সুবিন্যস্তভাবে, নিখুঁত গঠন নিয়ে এসবের অস্তিত্ব ও স্থিতি বিদ্যমান থাকা আর পৃথিবীর কোটি কোটি প্রয়োজনীয় বস্তুনিচয়ের মাঝে কখনো কোন বস্তুর নিশ্চিহ্ন না হওয়া এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, এসবের এক জীবনদাতা ও নিরাপত্তাবিধায়ক এবং স্থায়িত্বদাতা রয়েছেন, যিনি সকল উৎকর্ষ গুণাবলীর সমাহার, অর্থাৎ সুপরিকল্পনাকারী, প্রজ্ঞাবান, রহমান, রহীম আর স্বীয় সত্তায় অনাদি, অনন্ত ও চিরস্থায়ী এবং সকল প্রকার ক্রটিবিচ্যুতি থেকে মুক্ত, যাকে মৃত্যু ও বিলুপ্তি কখনো স্পর্শ করে না বরং তন্দ্রা ও ঘুম থেকেও তিনি পবিত্র যা মোটের ওপর মৃত্যুর সাথে সাদৃশ্য রাখে। সুতরাং সেই সত্তাই সকল পরমোৎকর্ষ গুণাবলীর সমাহার যিনি এই অনিশ্চিৎ জগৎকে পরম প্রজ্ঞা ও ভারসাম্যের নিরিখে অস্তিত্ব দান করেছেন আর অস্তিত্বকে অনস্তিত্বের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। এছাড়া তিনিই স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব, সৃজনী বৈশিষ্ট্য, প্রতিপালন এবং স্থায়ীত্বদাতা ও স্থায়ী হওয়ার কারণে ইবাদতের যোগ্য। এতটুকু হলো আয়াত–

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ

(সূরা আল বাকারা, ২:২৫৬)

-এর অনুবাদ। এখন ন্যায়ের দৃষ্টিতে দেখা উচিত, কত বাগ্মিতা, আলংকারিকতা, সূক্ষ্মতা, দৃঢ়তা ও প্রজ্ঞার সাথে এই আয়াতে বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণাদি তুলে ধরা হয়েছে। কীভাবে গুটিকতক শব্দকে এক ব্যাপক ও বিস্তৃত অর্থভাণ্ডারে এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ সূক্ষ্ম বিষয়ে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। আর এটি আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সেসবের জন্য এমন দৃঢ় প্রমাণের মাধ্যমে এক সর্বসম্পূর্ণ গুণাবলীর আধার সত্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করে দেখিয়েছে যাঁর সর্বোৎকৃষ্ট ও নিখুঁত কথার ন্যায় কোনো জ্ঞানী আজ পর্যন্ত কোনো বক্তৃতা করে নি বা কথা বলে নি বরং দুর্বল বুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানীরা আত্মা ও বস্তুকে নতুন বা সাম্প্রতিক সৃষ্টি (হাদেস) জ্ঞান করে নি আর এই সূক্ষ্ম রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞই থেকে যায় যে, সত্যিকার জীবন ও সত্যিকার অস্তিত্ব এবং প্রকৃত স্থায়িত্ব কেবল খোদার জন্যই স্বীকৃত ও গৃহীত। এই সুগভীর তত্ত্বজ্ঞান কেবল সেই আয়াত থেকেই মানুষের অর্জন হয় যাতে খোদা তা'লা বলেছেন, সত্যিকার অর্থে জীবন ও জীবনের স্থায়িত্ব বলতে যা বুঝায় তা কেবল আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যিনি সকল উৎকর্ষ গুণাবলীর সমাহার। তিনি ব্যতীত অন্য কোন বস্তু সত্যিকার অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব উপভোগ করে না আর এই বিষয়কেই তিনি বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ ও যুক্তি আখ্যা দিয়েছেন এবং বলেছেন– لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ অর্থাৎ যেহেতু সত্যিকার স্থায়িত্ব বলতে যা বোঝায় তা বিশ্বের নেই, তাই আবশ্যকীয়ভাবে এর অস্তিত্বের একটি কারণ বা উৎস থাকা আবশ্যক যার মাধ্যমে এর জীবন ও স্থায়িত্ব লাভ হয়েছে। আর এমন উৎস ও কারণকে (অর্থাৎ ইল্লতে মুজেবাকে) সকল উৎকর্ষ গুণাবলীর সমাহার, সচেতন পরিকল্পক, প্রজ্ঞাবান ও অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া চাই। অতএব তিনিই হলেন আল্লাহ্।

কুরআন শরীফের পরিভাষা অনুসারে আল্লাহ্ সেই সত্তার নাম যিনি সকল শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর সমাহার। সে কারণেই কুরআন শরীফে আল্লাহ্ নামটিকে সকল উৎকর্ষ গুণাবলীতে গুণান্বিত আখ্যা দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ্ তিনি যিনি বিশ্ব প্রতিপালক, রহমান, রহীম, সচেতন পরিকল্পনাকারী, প্রজ্ঞাবান, অদৃশ্যে জ্ঞাত, সর্বশক্তিমান, অনাদি, অনন্ত ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং এটি কুরআন

শরীফের একটি পরিভাষা স্বীকৃত হলো যে, আল্লাহ্ সেই সত্তার নাম যিনি সকল উৎকৃষ্ট গুণাবলীর সমাহার। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ আয়াতের সূচনাতেও আল্লাহ্ নাম এনেছেন এবং বলেন– اَللّٰہُ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ অর্থাৎ এই ক্ষণভঙ্গুর বিশ্বের স্থায়িত্বদাতা হলেন সকল শ্রেষ্ঠত্বের সমাহার এক সত্তা। এর মাধ্যমে একথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, এই বিশ্বজগৎ সুদৃঢ় যে বিন্যাস ও পরম নিখুঁত গঠনসহ বিদ্যমান ও বিন্যস্ত এর জন্য এই ধারণা করা ভ্রান্ত যে, এসকল বস্তুনিচয়ের কতক কতকের অস্তিত্বের (ইল্লতে মুজেবা বা) কারণ বা উৎস হতে পারে। বরং এই প্রজ্ঞাপূর্ণ কাজ যা সম্পূর্ণভাবে প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ এর জন্য এমন একজন স্রষ্টার প্রয়োজন যিনি হবেন সচেতন পরিকল্পনাকারী, প্রজ্ঞাবান, সর্বজ্ঞানী, বারংবার কৃপাকারী, অবিনশ্বর এবং সকল উৎকর্ষ গুণাবলীর আধার। সুতরাং তিনিই আল্লাহ্ যিনি স্বীয় সত্তায় পরম শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। বিশ্ব স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়ার পর সত্যান্বেষীর একথা বোঝা আবশ্যক ছিল যে, সেই স্রষ্টা সকল প্রকার অংশীবাদিতা থেকে পবিত্র; তাই এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন– قُلۡ ہُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ ۔ اَللّٰہُ الصَّمَدُ ۔ الخ এই অতি সংক্ষিপ্ত বাক্যটি দেখা উচিত যা একটি লাইনের সমানও নয়, অথচ কত সূক্ষ্ম সৌন্দর্যে শোভামণ্ডিত করে ও কত উন্নতভাবে মহাসম্মানিত স্রষ্টার সত্তার সকল প্রকার অংশীবাদিতা থেকে পবিত্র হওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। এর বিশদ ব্যাখ্যা হল, হাস্‌রে আকলীর বা যৌক্তিক সীমাপরিসীমার মাপকাঠিতে অংশীদারিত্ব মোট চারভাবে হতে পারে। কখনো সংখ্যায় হয়ে থাকে, কখনো মর্যাদায়, কখনো বংশের ক্ষেত্রে আর কখনো বা কর্ম ও প্রভাবে। সুতরাং এই সূরায় এই চার প্রকার অংশীদারিত্ব থেকে খোদার পবিত্র হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে আর পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি সংখ্যায় এক, দুই বা তিন জন নন। আর তিনি 'সামাদ', অর্থাৎ স্বীয় অলঙ্ঘনীয় পদমর্যাদা (বা মরতবায়ে ওজুব) তথা সত্তার ক্ষেত্রে আবশ্যকতা আর তাঁর প্রতি সবার মুখাপেক্ষী হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি অনন্য ও অদ্বিতীয়। তিনি ব্যতীত বাকি সবকিছুর অস্তিত্ব সম্ভাব্য বা আপেক্ষিক (বা মুমকীনুল ওজুদ) (অর্থাৎ থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে) এবং মরণশীল; প্রতিটি মুহূর্ত সবকিছু তাঁর মুখাপেক্ষী। আর তিনি لَمۡ یَلِدۡ অর্থাৎ তাঁর কোন পুত্র নেই, যে পুত্র হওয়ার কারণে তাঁর অংশীদার গণ্য হতে পারে। এছাড়া তিনি لَمۡ یُوۡلَدۡ অর্থাৎ তাঁর কোন পিতা নেই, যে পিতা হওয়ার কারণে তাঁর অংশীদার গণ্য হতে পারে। আর তিনি

لَمۡ یَکُنۡ لَّہٗ کُفُوًا অর্থাৎ তাঁর কাজে, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, যে কাজের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর অংশীদার হতে পারে।

সুতরাং এভাবে তিনি প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, খোদা তা'লা চার প্রকারের শির্‌ক বা অংশীদারিত্বের ঊর্ধ্বে এবং তিনি এক ও অদ্বিতীয়। এরপর তাঁর এক ও অদ্বিতীয় হওয়ার একটি যৌক্তিক প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন এবং বলেছেন,

لَوۡ کَانَ فِیۡہِمَاۤ اٰلِہَۃٌ اِلَّا اللّٰہُ لَفَسَدَتَا ۚ - وَّ مَا کَانَ مَعَہٗ مِنۡ اِلٰہٍ - الخ

(সূরা আল আম্বিয়াঃ ২৩ ও সূরা আল মু'মিনুনঃ ৯২)

অর্থাৎ যদি পৃথিবী ও আকাশে পরম উৎকর্ষ গুণাবলীর সমাহার সত্তা ছাড়া অন্য কোন খোদাও থাকত তাহলে উভয়টি অশান্তিতে ভরে যেত কেননা সেসকল খোদার জামা'তগুলোর কোন সময় একে অন্যের বিরুদ্ধে কোন কাজ করা অবধারিত একটি ব্যাপার ছিল। সুতরাং এই বিরোধ ও বিভেদের কারণে বিশ্বে নৈরাজ্য দেখা দিত। এছাড়া যদি পৃথক পৃথক স্রষ্টা থাকত তাহলে তাদের সবাই স্বীয় সৃষ্টিরই কল্যাণ চাইত আর তাদের আরামের জন্য অন্যদের ধ্বংস করা বৈধ জ্ঞান করত। সুতরাং এটিও বিশ্বে নৈরাজ্যের কারণ সাব্যস্ত হতো। এ পর্যন্ত 'লিম্মি' বা আরোহ যুক্তির মানদণ্ডে খোদার এক ও অদ্বিতীয় হওয়া প্রমাণ করা হয়েছে। এরপর খোদার এক অদ্বিতীয় হওয়া সম্পর্কে 'ইন্নী' বা অবরোহ যুক্তি উপস্থাপন করেছেন এবং বলেন–

قُلِ ادۡعُوا الَّذِیۡنَ زَعَمۡتُمۡ مِّنۡ دُوۡنِہٖ فَلَا یَمۡلِکُوۡنَ کَشۡفَ الضُّرِّ عَنۡکُمۡ وَلَا تَحۡوِیۡلًا ○

(সূরা বনী ইসরাঈলঃ ৫৭)

অর্থাৎ বহু-ঈশ্বরবাদী ও মহাসম্মানিত খোদার অস্তিত্বে অস্বীকারকারীদের বল, খোদার বিশ্বব্যবস্থায় যদি অন্য কেউ অংশীদার থেকে থাকে বা যদি বর্তমান উপকরণই যথেষ্ট হয় তাহলে এখন যে তোমরা ইসলামের সত্যতার প্রমাণ এবং এর মাহাত্ম্য ও শক্তির সামনে পরাস্ত হচ্ছ, তোমাদের সেসমস্ত শরীকদের সাহায্যের জন্য ডাক। স্মরণ রেখো! তারা আদৌ তোমাদের সমস্যা দূর করবে না আর তোমাদের মাথার ওপর থেকে বিপদাপদও দূরীভূত করতে পারবে না। হে রসূল! তুমি এসব মুশরিককে বলে দাও যে, তোমরা যাদের ইবাদত কর এমন শরীকদের আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ডাক আর আমাকে পরাজিত করার জন্য

তোমরা সম্ভাব্য সকল পরিকল্পনা করো। আমাকে বিন্দুমাত্র অবকাশ দিবে না। একথা ভালোভাবে হৃদয়ে গেঁথে রাখ যে, আমার তত্ত্বাবধায়ক, সাহায্যকারী ও কার্যনির্বাহক হলেন খোদা তা'লা যিনি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। স্বীয় সত্য ও পুণ্যবান প্রেরিতদের তত্ত্বাবধান তিনি নিজেই করে থাকেন, কিন্তু নিজেদের সাহায্যের জন্য তোমরা যাদেরকে ডেকে থাক তারা তোমাদের সাহায্য করবে তা সম্ভব নয়, অধিকন্তু তারা নিজেদেরকে সাহায্য করার শক্তিও রাখে না। এরপর খোদা তা'লা যিনি সকল দুর্বলতা ও ত্রুটি থেকে মুক্ত, প্রকৃতির নিয়মের দৃষ্টিকোণ থেকে তা প্রমাণ করেছেন আর বলেছেন–

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبۡعُ وَالۡاَرۡضُ وَمَنۡ فِيۡهِنَّ ؕ۔الخ

(সূরা বনী ইসরাঈল: ৪৫)

অর্থাৎ সাত আকাশ ও জমিন এবং যা কিছু এতে আছে তা খোদা তা'লার পবিত্রতা ঘোষণা করে। এমন কিছু নেই যা তাঁর পবিত্রতার মহিমাগীতি গায় না, কিন্তু তোমরা এদের পবিত্রতা ঘোষণা করা বুঝতে সক্ষম নও। অর্থাৎ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সম্পর্কে সুগভীর প্রণিধানে খোদার পবিত্র হওয়া এবং পুত্র ও শরীক থেকে মুক্ত হওয়া প্রমাণিত, কিন্তু কেবল তাদের জন্য যারা বোধবুদ্ধি রাখে। এরপর আংশিকভাবে সৃষ্টিপূজারিদের অভিযুক্ত করেছেন এবং তাদের ভ্রান্তিতে নিপতিত থাকা সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন–

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبۡحٰنَهٗ ؕ هُوَ الۡغَنِیُّ ؕ۔الخ

(সূরা ইউনুস: ৬৯)

অর্থাৎ কিছু মানুষ বলে, খোদার পুত্র আছে অথচ পুত্রের মুখাপেক্ষিতা একটি দুর্বলতা আর খোদা সকল দুর্বলতার ঊর্ধ্বে। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরবিমুখ, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। তোমরা কি খোদার ওপর এমন অপবাদ আরোপ করছ যার স্বপক্ষে তোমাদের কাছে কোন প্রকার জ্ঞান নেই। খোদা কেন পুত্রের মুখাপেক্ষী হবেন? তিনি এক সর্বসম্পূর্ণ সত্তা আর খোদার দায়িত্বাবলী পালনের জন্য তিনি একাই যথেষ্ট, অন্য কোন পরিকল্পনার প্রয়োজন নেই। কিছু মানুষ বলে, খোদার কন্যা সন্তানাদি রয়েছে অথচ তিনি এসব দুর্বলতা থেকে মুক্ত। তোমাদের জন্য পুত্র আর তাঁর জন্য কন্যা! এতো ন্যায্য বণ্টন হল না। হে মানবমণ্ডলী! তোমরা সেই এক-অদ্বিতীয় খোদার উপাসনা করো, যিনি

তোমাদেরকে এবং তোমাদের পিতা-পিতামহদের সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের সেই সর্বশক্তিমানকে ভয় করা উচিত যিনি ভূমিকে তোমাদের জন্য বিছানা আর আকাশকে ছাদস্বরূপ বানিয়েছেন আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে বিভিন্ন প্রকার ফলফলাদির মধ্য থেকে তোমাদের জন্য বিবিধ প্রকার জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন।

সুতরাং তোমরা জেনেশুনে এসব বস্তুনিচয়কে খোদার শরীক সাব্যস্ত করবে না যা তোমাদের কল্যাণের জন্য বানানো হয়েছে। খোদা এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আকাশেও তিনিই খোদা আর পৃথিবীতেও তিনিই খোদা। তিনিই প্রথম আর তিনিই শেষ, তিনিই প্রকাশ্য আর তিনিই গুপ্ত। দৃষ্টি তাঁর গভীরতা উদ্‌ঘাটন করতে অক্ষম, কিন্তু দৃষ্টির গভীরতা সম্পর্কে তিনি অবহিত। তিনি সবার স্রষ্টা আর কোন কিছুই তার মত নয়। তাঁর স্রষ্টা হওয়ার এটি অতি স্পষ্ট প্রমাণ যে, সকল বস্তুকে তিনি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের মাঝে সীমিত ও সীমাবদ্ধ রেখেছেন যার মাধ্যমে এক পরিবেষ্টনকারী ও সীমাবদ্ধকারীর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এটিই প্রমাণিত যে, সকল প্রশংসা তাঁর। ইহকালে ও পরজগতে তিনিই সত্যিকার পুরস্কারদাতা। সকল শাসনব্যবস্থা তাঁরই হাতে। সকল বস্তুর প্রত্যাবর্তনস্থল ও আশ্রয়স্থল তিনিই। খোদা যার জন্য চাইবেন সকল পাপ ক্ষমা করে দিবেন, কিন্তু তিনি শির্‌ক আদৌ ক্ষমা করবেন না। খোদার সাক্ষাৎপ্রত্যাশী ব্যক্তির এমন কার্যাবলী অবলম্বন করা উচিত যাতে কোন প্রকার ত্রুটি থাকবে না। আর কোন বস্তুকে যেন সে খোদার উপাসনায় অংশীদার না করে। তুমি খোদার সাথে অন্য কোন বস্তুকে আদৌ অংশীদার করো না, খোদার অংশীদার দাঁড় করানো অনেক বড় অন্যায়। খোদাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে তুমি অভীষ্ট যাচনা করতে যেও না। তাঁর সত্তাই কেবল অবশিষ্ট থাকবে, বাকি সবই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। শাসন ক্ষমতা তাঁরই হাতে আর তিনিই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল। তোমার খোদা এটিই চেয়েছেন যে, তুমি কেবল তাঁরই দাসত্ব কর আর তোমার পিতামাতার প্রতি সদয় আচরণ অব্যাহত রাখ। আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করার জন্য যদি তারা তোমাকে বিভ্রান্ত করে তাহলে তুমি তাদের কথা অনুসরণ করবে না। যদি তোমার কোন কষ্ট হয় তাহলে খোদা ছাড়া তোমার আর কোন বন্ধু নেই যে সেই কষ্ট দূরীভূত করতে পারে। যদি তোমার কোন কল্যাণ লাভ হয় তাহলে সকল কল্যাণ সাধনের বিষয়ে খোদাই সর্বশক্তিমান, অন্য কেউ

নয়। সকল বান্দার ওপর তাঁরই আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ আর তিনিই পূর্ণ প্রজ্ঞাবান এবং সবকিছুর প্রকৃত রূপ সম্পর্কে অবহিত। সকল অভাব মোচনের আবেদন তাঁর কাছেই করা উচিত। যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যান্য বস্তুনিচয়ের কাছে স্বীয় অভীষ্ট যাচনা করে সেসকল জিনিস তাদের দোয়ার কোন উত্তর দেয় না। এমন লোকদের দৃষ্টান্ত এমনই যেভাবে কেউ পানির দিকে হাত প্রসারিত করে বলে, 'হে পানি আমার মুখে এসে যাও'।

জানাকথা যে, নিজে থেকে মুখে এসে যাওয়ার কোন শক্তিই পানিতে নেই। একইভাবে মুশরিকরা স্বীয় উপাস্যদের কাছে বৃথা সাহায্য কামনা করে যার লাভজনক কোন দিকই সামনে আসে না। কেউ খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত হলেও অনধিকার চর্চার মাধ্যমে সুপারিশ করে কোন অপরাধীকে মুক্ত করার কারো সাধ্য নেই। খোদার জ্ঞান তাদের পূর্বাপরের সবকিছুকে পরিবেষ্টন করছে। যে বিষয়ে তিনি স্বয়ং তাদেরকে অবহিত করেন, খোদার জ্ঞানের কেবল ততটাই তারা অবগত হয়, এর বেশি নয়। আর তারা সবসময় খোদার ভয়ে ভীত থাকে। আর যত উৎকৃষ্ট ও সর্বসুন্দর নাম আছে তা কেবল খোদারই অনন্য বৈশিষ্ট্য, এতে অন্যদের কোন অংশীদারিত্ব অবৈধ। সুতরাং খোদাকে সেসমস্ত নামে ডাক যাতে অন্য কারো অংশীদারিত্ব নেই, অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিনিচয়ের নাম খোদার জন্য নির্ধারণ করো না আর খোদার নাম সৃষ্ট বস্তুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করো না। সেসব লোকের কাছ থেকে পৃথক থাক যারা খোদার বিভিন্ন নামে অন্যের অংশীদারিত্ব বৈধ জ্ঞান করে। অচিরেই তারা আপন কর্মের প্রতিদান পাবে। হে মুশরিকরা! তোমরা খোদার পরিবর্তে কেবল প্রাণহীন সব প্রতিমার পূজা করো আর নিছক মিথ্যার ওপর অনড় ও অটল রয়েছ। সুতরাং নোংরামি অর্থাৎ প্রতিমা পূজা এড়িয়ে চল আর মিথ্যা বলা থেকে বিরত হও। তাদের কি পা আছে যদ্বারা তারা হাঁটে? তাদের কি হাত আছে যদ্বারা তারা ধরে? তাদের কি কান আছে যার দ্বারা তারা শুনে? আর তোমরা সূর্য এবং চন্দ্রকেও সেজদা করো না, বরং সেই খোদাকে সেজদা করো যিনি এ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তোমরা যদি সত্যিকার অর্থে খোদার উপাসনাকারী হয়ে থাক তাহলে সেই স্রষ্টারই ইবাদত করো। চাঁদের জায়গায় পৌঁছে যাওয়ার শক্তি সূর্যের নেই আর রাতও দিনকে অতিক্রম করার শক্তি রাখে না। কোন নক্ষত্র স্বীয় নির্ধারিত আকাশ বা কক্ষপথ (ফালাক) থেকে অগ্রে বা পশ্চাতে থাকতে পারে না। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রতিটি বস্তুই

খোদার সৃষ্টি ও তাঁর দাসত্বের অধীন। কেউ যদি বলে, আমিও খোদার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একজন খোদা তাহলে এমন ব্যক্তিকে আমরা জাহান্নামে প্রবিষ্ট করব আর অন্যায়কারীদের আমরা এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি।

সুতরাং তোমরা খোদা ও তাঁর পয়গম্বরদের ওপর ঈমান আন আর একথা বলবে না যে, খোদা তিনজন। এ থেকে বিরত হও, এটিই তোমাদের জন্য উত্তম। হে মানবমণ্ডলী! এটি একটি উপমা, তোমরা গভীর মনোযোগ সহকারে শুন। যেসব বস্তুনিচয়ের কাছে তোমরা অভীষ্ট যাচনা কর সেসব বস্তু তো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না। আর যদি মাছি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাহলে তারা তাও পুনরুদ্ধারের শক্তি রাখে না। যাচনাকারীও দুর্বল আর যার কাছে যাচনা করা হচ্ছে সেও দুর্বল, অর্থাৎ সৃষ্ট জিনিসের কাছে অভীষ্টের জন্য যারা হাত পাতে তারা বড়ই দুর্বল বুদ্ধির অধিকারী আর যে সমস্ত সৃষ্ট জিনিসকে উপাস্য স্থির করা হয়েছে তারাও শক্তিতে দুর্বল। মুশরিকরা খোদাকে যথাযথভাবে শনাক্ত করতে পারে নি, তারা মনে করে অন্য শরীকদের বাদ দিয়ে খোদার বিশ্বব্যবস্থা চলতেই পারে না অথচ খোদা স্বীয় সত্তায় পূর্ণ শক্তির আধার ও পূর্ণ বিজয়ী, সর্বশক্তির অধিকারী হওয়া তাঁরই বিশেষত্ব। মুশরিকরা এতই নির্বোধ যে, জিনদেরকে খোদার অংশীদার স্থির করে রেখেছে আর কোন জ্ঞান ছাড়াই ও প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত না হয়েই তাঁর জন্য পুত্র ও কন্যা বানিয়ে রেখেছে। ইহুদিরা বলে, 'উযাইর' খোদার পুত্র এবং খ্রিষ্টানরা বলে, 'মসীহ্' খোদার পুত্র! এসব তাদের বুলি বৈ কিছু নয়, যার সত্যতার কোন প্রমাণ তারা দিতে পারবে না বরং তারা পূর্ববর্তী যুগের মুশরিকদের অনুকরণ করছে মাত্র। অভিশপ্তরা কত ঘৃণ্যভাবে সত্যের পথ পরিত্যাগ করেছে আর স্বীয় আলেম, দরবেশ ও মরিয়মের পুত্রকে খোদা স্থির করেছে। অথচ নির্দেশ ছিল, শুধুমাত্র এক খোদার ইবাদত কর, খোদা স্বীয় সত্তায় সম্পূর্ণ। তাঁর পুত্র অবলম্বনের কোন প্রয়োজন নেই। তাঁর সত্তায় কী ঘাটতি আছে যা পুত্রের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে? যদি কোন ত্রুটি বা ঘাটতি না থাকে তাহলে প্রশ্ন হল, পুত্র গ্রহণের মত বৃথা কাজ খোদা করতে পারেন কি, যার কোন প্রয়োজনই তাঁর ছিল না? তিনি সকল বৃথা কাজ ও সকল অসম্পূর্ণ অবস্থা থেকে পবিত্র।

তিনি যখন কোন বিষয় সম্পর্কে বলেন, 'হও' তখন তা হয়ে যায়। খাঁটি একত্ববাদে ঈমান স্থাপনকারী মুসলমান, যারা ঈমান এনেছে, ইহুদি, যারা

নিজেদের নবী ও ওলীদেরকে অভাব মোচনকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছে এবং সৃষ্টিকে খোদার কার্যক্রমে শরীক আখ্যা দিয়েছে আর সাবী যারা নক্ষত্রের পূজা করে, অধিকন্তু খ্রিষ্টান যারা হযরত ঈসাকে খোদার পুত্র আখ্যায়িত করেছে, এছাড়া মজুসী যারা অগ্নি ও সূর্যের পূজারি এবং বাকি সকল মুশরিক যারা বিভিন্ন প্রকার শিরকে লিপ্ত খোদা তা'লা কিয়ামত দিবসে তাদের সবার মাঝে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। খোদা সকল বিষয়ে সাক্ষী আর সৃষ্টি পূজারিদের মিথ্যায় নিপতিত থাকা কোন গোপন বিষয় নয়। এটি অতি স্পষ্ট কথা, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই মনোনিবেশ করে দেখতে পারে যে, স্বর্গে-মর্ত্যে স্বর্গীয় বস্তুনিচয় ও পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তু তথা উদ্ভিদ, জড় জগৎ, প্রাণী জগৎ, বিভিন্ন মৌল, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহনক্ষত্র, পাহাড়, বৃক্ষরাজি এবং বিভিন্ন প্রকার প্রাণী ও মানুষ রয়েছে যাদের মুশরিকরা পূজা করে অথচ এ সবকিছুই খোদাকে সেজদা করে। অর্থাৎ স্বীয় সত্তা এবং স্থায়িত্ব ও অস্তিত্বের জন্য এরা তাঁরই মুখাপেক্ষী। পূর্ণ বিনয়ের সাথে তাঁর সামনেই ঝুঁকে রয়েছে। এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন হতে পারে না। সুতরাং যেসমস্ত বস্তু নিজেরাই মুখাপেক্ষী তাদের কাছে অভাব মোচনের আকুতি স্পষ্টতই ভ্রষ্টতা। যারা বিদ্রোহী হয়ে যায় এমন মানুষও বিনয়ের সেজদা করতে বাধ্য, কেননা এই পৃথিবীতেই বিভিন্ন প্রকার দুঃখকষ্ট, রোগব্যাধি এবং দুশ্চিন্তারূপী শাস্তি অবতীর্ণ হতে থাকে আর পারলৌকিক শাস্তিও তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। সুতরাং খোদা ছাড়া আর কোন্ সত্তা আছে যার সম্পর্কে চিন্তা করলে তার মাঝে পরবিমুখতা ও ভ্রুক্ষেপহীনতার বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, যে কারণে কেউ তাকে স্বীয় উপাস্য স্থির করতে পারে? যেহেতু খোদা ছাড়া কোন বস্তু পরবিমুখ ও ভ্রুক্ষেপহীন হতে পারে না, তাই সকল সৃষ্টিপূজারির মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রমাণ হয়ে গেল। এই হলো কুরআন শরীফের কয়েকটি আয়াত যা ঋগ্বেদের অতিদীর্ঘ শ্লোক (শুরতী)-এর বিপরীতে আমরা এখানে বর্ণনা করলাম।

এখন বেদের শ্লোকে যত অর্থহীন, দীর্ঘ এবং বৃথা বক্তৃতা আর অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও প্রতারণামূলক বিষয় এবং অযৌক্তিক কথাবার্তা রয়েছে এর মোকাবিলায় দেখা উচিত যে, কুরআন শরীফের আয়াতে কীভাবে অতি সংক্ষেপে ও সূক্ষ্মতার সাথে একত্ববাদের এক সুমহান নদীকে প্রজ্ঞাপূর্ণ প্রমাণ ও দর্শনভিত্তিক যুক্তির সাথে স্বল্পতম শব্দে প্রবাহমান করা হয়েছে এবং কত যুক্তিপূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত বাক্যে একত্ববাদের প্রমাণ দিয়ে সত্যান্বেষীদের ওপর

তত্ত্বজ্ঞানের দরজা খুলে দেয়া হয়েছে আর কত সুন্দরভাবে সকল আয়াত স্বীয় শক্তিশালী বাকশৈলীর মাধ্যমে সোচ্চার হৃদয়ে পূর্ণ প্রভাব ফেলছে এবং অভ্যন্তরীণ অমানিশা দূরীভূত করার জন্য উন্নত মানের আলো প্রদর্শন করছে। এস্থান থেকেই বুদ্ধিমান মানুষ বুঝতে পারে যে, কোন্ গ্রন্থে ভাষার আলংকারিকতা, সুন্দর উপস্থাপন ও বাগ্মিতা বিদ্যমান আর কোন্ গ্রন্থ আলংকারিকতা ও বাগ্মিতাবিবর্জিত। সৎ-হৃদয় ও ন্যায়পরায়ণ মানুষ যদি তুলনার মানসে বেদ ও কুরআনের বাক্যাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে তার চোখে পড়বে যে, বেদ বাক্য গঠনে এত অপরিপক্ক ও অসম্পূর্ণ যে, তা পাঠকের হৃদয়ে বিভিন্ন প্রকার সন্দেহ সৃষ্টি করে আর খোদা তা'লা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার সন্দেহে নিপতিত করে। কোন একটি স্থানেও শক্তিশালী বর্ণনার মাধ্যমে স্বীয় দাবি স্পষ্ট করে দেখায় না আর (দাবিকে) প্রমাণের পর্যায়েও পৌঁছায় না বরং বুঝাই যায় না যে, এর দাবি কী! কিছু জানা গেলেও কেবল এতটুকু যে, তা অগ্নি, সূর্য ও ইন্দ্র ইত্যাদির উপাসনা করাতে চায় আর এর পক্ষেও কোনো প্রমাণ বা যুক্তি উপস্থাপন করে না যে, কখন থেকে আর কীভাবে এসব জিনিস খোদার মর্যাদা লাভ করল। অথচ এমন অস্পষ্ট বর্ণনা সত্ত্বেও এর চারটি বেদই এত দীর্ঘ ও লম্বা লম্বা বাক্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যার অধ্যয়ন কেবল কোনো পরিশ্রমী ব্যক্তিই করতে পারে; অবশ্য সে যদি দীর্ঘ জীবন লাভ করে। পক্ষান্তরে কোন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি যদি কুরআন শরীফ দেখে তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে সে বুঝতে পারবে, কথা বা বাণীর সংক্ষিপ্ততা ও যুক্তিপ্রমাণে সমৃদ্ধ হওয়া যা বাক্যালংকারের আবশ্যকীয় দিক– এসবের প্রতি দৃষ্টি রাখার ক্ষেত্রে কুরআন শরীফ এমন শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছে যে, তা সকল ধর্মীয় প্রয়োজনকে পরিবেষ্টন করে এবং সকল যুক্তিপ্রমাণ পুরোপুরি প্রদান করে। অথচ তা সত্ত্বেও পুরুত্ব ও কলেবরে এত ছোট যে, মানুষ কেবল তিন চার প্রহরে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তা অনায়াসে পাঠ করা শেষ করতে পারে। এখন দেখা উচিত যে, কুরআনের এই বাগ্মিতা কত বড় একটি নিদর্শন যেখানে জ্ঞানের ফুঁসে ওঠা একটি সমুদ্রকে তিন চারটি জুয বা অংশে আয়ত্ব করে দেখানো হয়েছে এবং প্রজ্ঞার এক বিশাল জগতকে কেবল কয়েকটি পৃষ্ঠা আয়ত্ব করেছে। কেউ কখনো দেখেছে বা শুনেছে কি যে, এত ছোট আকৃতির একটি কিতাব সকল যুগের সত্যের সমাহার হবে?

প্রশ্ন হলো কোন বুদ্ধিমানের বোধবুদ্ধি, মানুষের এমন মর্যাদার কথা ভাবতে বা প্রস্তাব করতে পারে কি যে, সে স্বল্প কিছু শব্দ দিয়ে প্রজ্ঞার এক সমুদ্রকে

এমনভাবে ভরে দিবে যে, ধর্মীয় জ্ঞানের কোনো সত্য এর বাইরে থাকবে না? এগুলো একেবারে বাস্তব ও সত্য কথা যা আমরা লিখছি। যে ব্যক্তি তা স্বীকার করে না সে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলকভাবে আমাদের পরীক্ষা করতে পারে। এখানে একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, ঐশী বাণীর জন্য আবশ্যকীয় ও অনিবার্য একটি চিহ্ন হতে বেদের বাণী বিচ্যুত ও বঞ্চিত আর তা হলো বেদে ভবিষ্যদ্বাণীর নামগন্ধও নেই এবং বেদ আদৌ অদৃশ্যের সংবাদমূলে গঠিত নয়। অথচ যে গ্রন্থ খোদার বাণী আখ্যায়িত হয় তাতে খোদার জ্যোতি প্রকাশ পাওয়া আবশ্যকীয়। অর্থাৎ খোদা তা'লা যেভাবে আলেমুল গায়েব, সর্বশক্তিমান, অনন্য ও অতুলনীয়, একইভাবে তাঁর বাণীর, যা তাঁর উৎকর্ষ গুণাবলীর প্রতিচ্ছবি; উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলীকে স্বীয় অবস্থার মাঝে ধারণ করা আবশ্যক। এটি জানাকথা যে, খোদার বাণীর পরম উদ্দেশ্য হলো এর মাধ্যমে খোদার সত্তা ও গুণাবলীর পূর্ণ জ্ঞান অর্জন হওয়া যেন মানুষ আনুমানিক কারণ থেকে উন্নতি করে দর্শনভিত্তিক বরং অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞানের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। জানাকথা যে, জ্ঞানগত এই মর্যাদা কেবল তখনই অর্জন হতে পারে যদি খোদার বাণী সত্য সন্ধানীকে কেবল বুদ্ধির হাতে ছেড়ে দেয় না বরং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞানী বিকাশের (তাজাল্লীর) মাধ্যমে সকল বিশ্বাসকে স্পষ্ট করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভবিষ্যদ্বাণী ও অদৃশ্যের বহু সংবাদ প্রদানের মাধ্যমে এবং এর পূর্ণ হওয়া দেখিয়ে সত্যসন্ধানীর নিকট 'আলেমুল গায়েব' (অর্থাৎ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখার) প্রমাণ দেয়া উচিত যা কেবল খোদা তা'লার সত্তায় বিদ্যমান। এ দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীয় অনুসারীদের পুরোপুরি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং সেসকল ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করে নিজের সর্বশক্তিমান, সত্যবাদী ও সাহায্যকারী হওয়া প্রমাণ করা বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু বেদে এসকল বৈশিষ্ট্যের একটিও নেই। কেউ যদি ন্যায়বিচার ও মনোযোগের সাথে দেখে তাহলে তার সামনে প্রকাশ পেয়ে যাবে যে, বেদে এসকল লক্ষণাবলীর একটিও দেখা যায় না। যে জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের জন্য ঐশীবাণী অবতীর্ণ হয়ে থাকে সেই পূর্ণতা প্রদানের উপকরণ বেদের কাছে নেই। বরং সত্য কথা হলো, যৌক্তিকভাবে এক বিবেকবান মানুষ ঐশী তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য যতটা ব্যবস্থা গ্রহণ করে আর যথাসম্ভব ও যথাসাধ্য নিজেকে ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্ত রাখে সেই মর্যাদাও বেদের অর্জন হয় নি। বেদের নীতি এত ত্রুটিপূর্ণ ও এত স্পষ্ট মিথ্যা যে, দশ বছরের কোনো

বালকও যদি বিদ্বেষপরায়ণ ও হঠধর্মী না হয় তাহলে এগুলোর অন্তর্নিহিত ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারে। এছাড়া এটিও জেনে রাখা উচিত যে, কুরআন যেসকল আধ্যাত্মিক কার্যকারিতার সমাহার (অর্থাৎ নিজের মাঝে ধারণ করে রেখেছে) তা থেকেও বেদ সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত ও রিক্তহস্ত। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, পবিত্র কুরআন সেই সকল পরম শ্রেষ্ঠত্ব, বাগ্মিতা, প্রাঞ্জলতা এবং প্রজ্ঞা ও তত্ত্বজ্ঞানকে পরিবেষ্টন করে রাখার পাশাপাশি নিজ কল্যাণময় সত্তায় এমন এক আধ্যাত্মিক প্রভাবও রাখে যে, এর সত্যিকার অনুসরণ মানুষকে অবিচল, অভ্যন্তরীণভাবে আলোকিত, স্বতঃস্ফূর্ত চিত্ত, খোদার গ্রহণীয় জন ও মহা-সম্মানিত খোদার সাথে বাক্যালাপের যোগ্য করে তোলে। তার ভেতর সেসব জ্যোতি সৃষ্টি করে এবং সেই অদৃশ্য কল্যাণরাজি ও সন্দেহাতীত ঐশী সমর্থনরাজি তার অদৃষ্টে রেখে দেয় যে, অন্যদের মাঝে আদৌ তা পাওয়া যায় না। এক-অদ্বিতীয় খোদার পক্ষ থেকে সেই সুস্বাদু ও প্রাণসঞ্জীবনী বাণী তার প্রতি অবতীর্ণ হয় যার ফলে প্রতিনিয়ত তার সামনে এটি স্পষ্ট হতে থাকে যে, কুরআন শরীফের সত্যিকার অনুবর্তিতার মাধ্যমে এবং হযরত নবী করীম (সা.)-এর সত্যিকার অনুসরণের কল্যাণে সেই সকল মর্যাদায় তাকে পৌঁছানো হয়েছে যা খোদার প্রিয়দেরই বিশেষত্ব। সেসকল ঐশী সন্তুষ্টি ও কৃপারাজিতে সে কল্যাণমণ্ডিত হয়েছে যার মাধ্যমে অতীতের পূর্ণ ঈমানদারগণ কল্যাণমণ্ডিত হয়েছেন। আর কেবল কথার কথা নয় বরং কার্যত সেসব ভালোবাসার একটি স্বচ্ছ প্রস্রবণ নিজের নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে প্রবহমান দেখতে পায় আর খোদার সাথে সম্পর্কের এমন এক অবস্থা নিজের অবারিত ও সংকীর্ণতামুক্ত বক্ষে প্রত্যক্ষ করে যা সে কোন শব্দের আকারে বা কোন উদাহরণস্বরূপ বর্ণনা করতে পারে না। সে ঐশী জ্যোতিকে বৃষ্টির মত নিজের ওপর বর্ষিত হতে দেখে। সেসকল জ্যোতি কখনো অদৃশ্যের সংবাদরূপে আবার কখনো জ্ঞান ও নিগূঢ় তত্ত্বরূপে আর কোন সময় সুমহান চারিত্রিক গুণাবলীর আদলে তার ওপর স্বীয় প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনের এসমস্ত প্রভাব ক্রমাগতভাবে চলে আসছে। যখন থেকে সত্যের সূর্য তথা মহানবী (সা.)-এর কল্যাণময় সত্তা পৃথিবীতে এসেছে তখন থেকে আজ পর্যন্ত সহস্র সহস্র মানুষ, যারা যোগ্যতা ও সামর্থ্য রাখত তারা খোদার বাণীর অনুসরণ ও মহানবী (সা.)-এর অনুগমনের ফলে সেই মহান মর্যাদায় পৌঁছে গেছে আর এই ধারা অব্যাহত আছে।

খোদা তা'লা এমনভাবে তাদের প্রতি ক্রমাগত ধারায় ও নিরবচ্ছিন্নভাবে স্বীয়

স্নেহ ও অনুগ্রহরাজি বর্ষণ করেন এবং স্বীয় নিরাপত্তা ও দানদক্ষিণা প্রদান করেন যার ফলে স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের কাছে প্রমাণ হয়ে যায় যে, তারা এক-অদ্বিতীয় খোদার দৃষ্টিতে গৃহীত লোকদের অন্তর্গত, যাদের প্রতি খোদার এক অসাধারণ স্নেহের ছায়া ও ঐশী কৃপার এক সুমহান রূপ বিরাজমান। দর্শকরা স্পষ্ট দেখতে পায় যে, তারা অলৌকিক নেয়ামতে ভূষিত আর বিস্ময়কর ও অভাবনীয় নিদর্শন প্রদর্শনে স্বাতন্ত্র্য রাখে। তারা প্রেমাস্পদের সৌরভে সুরভিত আর গৃহীত হওয়ার গৌরবে গৌরবান্বিত। নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী খোদার জ্যোতি তাদের সাহচর্য, মনোযোগ, ইচ্ছা, দোয়া ও দৃষ্টিতে, তাদের চরিত্রে, তাদের সামাজিক জীবনাচারে, তাদের সন্তুষ্টি ও ক্রোধে, তাদের অনুরাগ ও ঘৃণায়, তাদের ওঠাবসায়, তাদের সরবতা ও নীরবতায় এবং তাদের ভেতর-বাইরে এমনভাবে পরিপূর্ণ থাকে যেমনটি কিনা দৃষ্টিনন্দন ও স্বচ্ছ কোন বোতল অতি উন্নত মানের আতরে পরিপূর্ণ থাকে। তাদের সাহচর্যের কল্যাণে এবং তাদের সাথে সম্পর্কবন্ধনের সুবাদে আর তাদেরকে ভালোবাসার ফলে সেই সকল বিষয়াদি হস্তগত হয় যা কঠোর সাধনার মাধ্যমেও লাভ হওয়া সম্ভব নয়। তাদের জন্য ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ সঞ্চারণের ফলে ঈমানী অবস্থা ভিন্ন এক রূপ ধারণ করে আর উন্নত চরিত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে এক প্রকার শক্তি সৃষ্টি হয়। অবাধ্য প্রবৃত্তির উম্মাদনা ও অবাধ্যতা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। ক্রমাগতভাবে প্রশান্তি ও স্বাদ লাভ হতে থাকে এবং যোগ্যতা ও সামঞ্জস্য অনুসারে ঈমানী উদ্দীপনা উথলে ওঠে, ভালোবাসা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রকাশ পায়। খোদার স্মরণ অধিক উপভোগ্য হয়ে উঠে। তাদের দীর্ঘ সাহচর্যের ফলে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, নিজেদের ঈমানী শক্তি, নৈতিক অবস্থা, জগৎ বিমুখতা, খোদামুখিতা, খোদাপ্রেম, মানবজাতির জন্য স্নেহ ও ভালোবাসা, বিশ্বস্ততা, খোদার ইচ্ছায় সন্তুষ্ট থাকা ও অবিচলতায় তারা এমন মহান পর্যায়ে রয়েছেন যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে দেখা যায় নি। (মানুষের) সুস্থ বিবেক তাৎক্ষণিকভাবে উদ্‌ঘাটন করে নেয় যে, সেই শৃঙ্খল ও বেড়ি তাদের পা থেকে খুলে ফেলা হয়েছে যাতে অন্যরা বন্দি। সেই সংকীর্ণতা ও সংকোচ তাদের হৃদয় থেকে বের করে দেয়া হয়েছে যার কারণে অন্যদের বক্ষ সংকুচিত আর অন্তরে থাকে এক প্রকার অগ্নি।

অনুরূপভাবে তারা এক-অদ্বিতীয় খোদার সাথে বাক্যালাপ ও কথোপকথনের সম্মানে অনেক বেশি সম্মানিত হয়ে থাকেন আর অবিরত ও স্থায়ী বাক্যালাপের

যোগ্য বলে গণ্য হন। মহা সম্মানিত ও মহিমান্বিত খোদা এবং তাঁর সচেতন বান্দাদের মাঝে তাকওয়া ও হেদায়েতের জন্য মাধ্যম বিবেচিত হন। তাদের জ্যোতি অন্যদের হৃদয়কে আলোকিত করে। যেভাবে বসন্ত এলে উদ্ভিদের শক্তি উজ্জীবিত হতে দেখা যায়, অনুরূপভাবে তাদের আবির্ভাবের ফলে প্রকৃতিগত জ্যোতি সুস্থ প্রকৃতিতে জোরালোভাবে প্রতিভাত হয়। স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেক নেক ব্যক্তির হৃদয় স্বীয় পুণ্যের যোগ্যতা ও সামর্থ্যকে পূর্ণ চেষ্টার মাধ্যমে দৃশ্যপটে আনতে ও ঔদাসীন্যের নিদ্রার পর্দা থেকে মুক্তি পেতে আর পাপ, অনাচার ও কদাচারের কলুষ ও অজ্ঞতা এবং জ্ঞানহীনতার অন্ধকার থেকে মুক্তি পেতে চায়। সুতরাং তাদের কল্যাণময় যুগের এমন কিছু বিশেষত্ব থেকে থাকে আর এমন এক প্রকার আলোর বিস্তার ঘটে যে, সকল মু'মিন ও সত্যান্বেষী নিজ ঈমানী শক্তি অনুসারে বাহ্যিক কোন কারণ ছাড়াই নিজের হৃদয়ে এক স্বতঃস্ফূর্ততা ও ধর্মের প্রতি উদ্দীপনা খুঁজে পায় আর মনোবলে দৃঢ়তা ও মজবুতি প্রত্যক্ষ করে। এক কথায় পূর্ণ আনুগত্যের কল্যাণে তারা যে সূক্ষ্ম ও মনমাতানো সৌরভ প্রাপ্ত হয়েছে তা থেকে সকল নিষ্ঠাবান মানুষ নিজেদের আন্তরিকতা অনুপাতে স্বাদ লাভ করে। অবশ্য চির দুর্ভাগারা এটি থেকে কোন অংশ পায় না বরং শত্রুতা, হিংসা ও নিষ্ঠুরতায় আরো অধঃপতিত হয়ে হাবিয়া দোযখে নিক্ষিপ্ত হয়। আল্লাহ্ তা'লা যে বলেছেন–

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ

(সূরা আল বাকারা: ৮)

তাতে এ দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। এ বক্তৃতা বা কথাকে হৃদয়ঙ্গম করানোর উদ্দেশ্যে আমরা অন্যভাবে এরই পুনরাবৃত্তি করে বিস্তারিত এই বিবরণ তুলে ধরছি যে, কুরআনের অনুসারীরা যে পুরস্কার পায় আর যে বিশেষ দানে ভূষিত হয়, যদিও তা বর্ণনা ও বক্তৃতার ঊর্ধ্বে, তবুও সেসবের মাঝে এমন কিছু মহান পুরস্কারও আছে যা এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ সন্ধানীদের হেদায়েতের জন্য বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়। নিম্নে তা লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে: সেসকল জ্ঞান ও ঐশী অন্তর্দৃষ্টি যা কুরআনের পূর্ণ অনুসারীদের কুরআনের নিয়ামতরূপী তশতরী থেকে লাভ হয়, মানুষ যদি সত্যিকার অর্থে কুরআন শরীফের অনুসরণ করে আর নিজেকে সম্পূর্ণভাবে এর আদেশ-নিষেধ মোতাবেক পরিচালিত করে আর পূর্ণ ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সাথে তাঁর নির্দেশাবলী সম্পর্কে প্রণিধান করে এবং বাহ্যিক বা রূপক তথা অভ্যন্তরীণ কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে,

তখন তার দৃষ্টি ও অন্তরাত্মাকে বদান্যতার মূর্ত প্রতীক খোদার পক্ষ থেকে একটি বিশেষ আলো দান করা হয় এবং এক সূক্ষ্ম বিবেকবুদ্ধি তাকে প্রদান করা হয়, যার ফলে ঐশী জ্ঞানের বিস্ময়কর ও দুষ্প্রাপ্য সূক্ষ্ম দিক ও নিগূঢ় তত্ত্ব তার সামনে উন্মোচিত হয় যা খোদার বাণীতে সুপ্ত ছিল। প্রবল বর্ষণশীল বারিধারার ন্যায় সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী তার হৃদয়ে বর্ষিত হয়। সেই সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানকেই পবিত্র কুরআনে প্রজ্ঞা নাম দেয়া হয়েছে, যেমন তিনি বলেন–

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ؕ

(সূরা আল বাকারা, ২:২৭০)

অর্থাৎ খোদা যাকে চান প্রজ্ঞা দান করেন আর যাকে প্রজ্ঞা দেয়া হয় তাকে প্রভূত কল্যাণরাজি দেয়া হয়। অর্থাৎ প্রজ্ঞা হলো, প্রভূত কল্যাণের সমন্বয় ও সমাহার। যে প্রজ্ঞা লাভ করেছে সে প্রভূত কল্যাণ লাভ করেছে। সুতরাং এই জ্ঞান ও তত্ত্ব যা অন্য ভাষায় প্রজ্ঞা নামে অভিহিত তা প্রভূত কল্যাণের ধারকবাহক হওয়ার কারণে সর্বপরিবেষ্টনকারী সমুদ্রের মর্যাদা রাখে যা ঐশী বাণীর অনুসারীদের দেয়া হয়ে থাকে। তাদের চিন্তাচেতনা ও দৃষ্টিতে এমন একটি আশিষ রেখে দেয়া হয়ে থাকে যার সুমহান সত্য তত্ত্ব তাদের কাঁচের মত স্বচ্ছ ব্যক্তিত্বের ওপর প্রতিফলিত হয়ে থাকে আর উৎকর্ষপ্রাপ্ত সত্য তাদের সামনে প্রকাশ পেতে থাকে এবং ঐশী সাহায্য ও সমর্থন সকল গবেষণা ও সূক্ষ্ম বিচারবিশ্লেষণের সময় তাদের জন্য এমন কিছু উপকরণ তাদের নাগালের ভিতর এনে দেয় যার কল্যাণে তাদের বক্তৃতা অসম্পূর্ণ ও দুর্বল থাকতে পারে না আর কোনো ভুলও হয় না। সুতরাং যে সকল জ্ঞান ও ঐশী তত্ত্ব এবং সত্যের সূক্ষ্ম দিক ও সৌন্দর্য আর নিগূঢ় রহস্য ও দলিলপ্রমাণ তাদের মনে জাগ্রত হয় তা স্বীয় প্রকৃতি ও পরিমাণের দিক থেকে এমন উৎকৃষ্ট পর্যায়ের হয়ে থাকে যা হলো, অলৌকিক; যার সাথে কোনভাবেই অন্যদের তুলনা হয় না। কেননা তারা কেবল নিজেদের ওপরই নির্ভর করেন না বরং অদৃশ্য হতে প্রাপ্ত জ্ঞান, মেধা ও স্বয়ংসম্পূর্ণ খোদার সমর্থন তাদের পথ প্রদর্শক হয়ে থাকে।

এই জ্ঞানের শক্তিবলে তাদের সামনে কুরআনের সেসব রহস্য ও আলো উন্মোচিত হয় যা কেবল বুদ্ধির ঝাপসা আলোতে উন্মোচিত হতে পারে না। আর এই জ্ঞান ও তত্ত্ব যা তাদেরকে দেয়া হয় এবং যার মাধ্যমে খোদার সত্তা,

গুণাবলী ও পরকাল সম্পর্কে সূক্ষ্ম ও সুগভীর বাস্তবতা তাদের সামনে প্রকাশ পায় তা এক আধ্যাত্মিক অলৌকিক ক্রিয়া যা পরিপক্ক দৃষ্টিশক্তির অধিকারীদের সামনে দৈহিক বা আক্ষরিক মো'জেযা থেকেও মহান ও অধিকতর সংবেদী হয়ে থাকে। প্রণিধানে স্পষ্ট হবে যে, বুদ্ধিমানদের দৃষ্টিতে সেসব অলৌকিক বিষয়াদির মাধ্যমেই তত্ত্বজ্ঞানী ও খোদা প্রেমিকদের গুরুত্ব ও মর্যাদা জানা যায়। এসব অলৌকিক ক্রিয়াই তাদের উচ্চ মর্যাদার সৌন্দর্য ও শোভা এবং তাদের নিখুঁত চেহারার আকর্ষণ ও সৌন্দর্য, কেননা মানুষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হলো, জ্ঞান ও সত্য তত্ত্বের প্রতাপ ও ত্রাস তাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে আর সত্য ও তত্ত্বজ্ঞান তার কাছে সবচেয়ে প্রিয়তর। যদি ধরে নেয়া হয়, একজন খোদাভীরু ও ইবাদতকারী ব্যক্তি দিব্যদর্শনে অভিজ্ঞ আর অদৃশ্য সংবাদও লাভ করে, অধিকন্তু কঠোর সাধনাও করে এবং বিভিন্ন প্রকার অলৌকিক বিষয়াদিও তার পক্ষ হতে প্রকাশ পেয়ে থাকে, কিন্তু ধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে সে মারাত্মকভাবে অজ্ঞ, এমনকি সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্যই করতে পারে না, বরং রুগ্ন চিন্তাধারায় নিপতিত আর ভ্রান্ত বিশ্বাসে নিমগ্ন, দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশে সকল ক্ষত্রে দুর্বল আর মতামত প্রকাশে মারাত্মক ভুল করে বসে, এমন ব্যক্তি সুস্থ মনমানসিকতাসম্পন্ন লোকদের কাছে অত্যন্ত তুচ্ছ ও হেয়ই প্রতিপন্ন হবে। এর কারণ হলো, যে ব্যক্তির পক্ষ থেকে বুদ্ধিমান মানুষ অজ্ঞতার দুর্গন্ধ পায় আর কোনো অর্বাচীনসুলভ কথা তার মুখে শুনে, তাৎক্ষণিকভাবে হৃদয়ে তার সম্পর্কে ঘৃণা জন্মে আর সে ব্যক্তি বুদ্ধিমানের দৃষ্টিতে কোনভাবেই সম্মানের যোগ্য বলে গণ্য হতে পারে না। সে যত বড় জগৎ বিমুখ ও ইবাদতকারীই হোক না কেন তাকে অত্যন্ত তুচ্ছ দেখায়। সুতরাং মানুষের এই প্রকৃতিগত অভ্যাস থেকে এটি স্পষ্ট যে, আধ্যাত্মিক অলৌকিক গুণ, অর্থাৎ জ্ঞান ও ঐশী অন্তর্দৃষ্টি তার মতে খোদা প্রেমিকদের জন্য আবশ্যকীয় শর্ত আর মহান ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গকে চেনার জন্য বিশেষ ও আবশ্যকীয় পরিচয়মূলক চিহ্ন।

সুতরাং এ সকল লক্ষণাবলী কুরআন শরীফের শ্রেষ্ঠ অনুসারীদের পূর্ণ ও উৎকর্ষ মাত্রায় দেয়া হয়। তাদের অধিকাংশের প্রকৃতিতে নিরক্ষরতার আধিপত্য থাকে আর প্রচলিত জ্ঞানও হয়ত তাদের পুরোপুরি অর্জিত থাকে না, কিন্তু ঐশী জ্ঞানের সূক্ষ্মতা ও নিগূঢ় তত্ত্বে সমসাময়িক যুগের মানুষের ওপর তারা এতটাই প্রাধান্য রাখেন যে, অনেক সময় বড় বড় বিরোধীরা তাদের বক্তৃতা শুনে বা

তাদের রচনা পড়ে গভীর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় আর অবলীলায় বলে বসে, তাদের জ্ঞান ও ঐশী অন্তর্দৃষ্টি ভিন্ন কোন জগৎ হতে প্রাপ্ত যা ঐশী সাহায্যের বিশেষ রঙে রঙিন। এর একটি প্রমাণ হলো, কোনো বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ছলে যদি ধর্ম-সংক্রান্ত বিষয়াদির মাঝে কোনো একটি বিষয়ে তাদের গবেষকসুলভ ও তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ বক্তৃতাদির সাথে কোনো বক্তৃতার তুলনা করতে চায় তাহলে একপর্যায়ে তাকে স্বীকার করতে হবে যে, সেই বক্তৃতাতেই প্রকৃত সত্য ছিল যা তাদের মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে; তবে শর্ত হলো (ঐ প্রতিদ্বন্দ্বীর মাঝে) যদি ইনসাফ ও সততা থাকে। বিতর্ক যতই গভীরে যেতে থাকবে, এমন অনেক সূক্ষ্ম ও সুন্দর প্রমাণাদি সামনে আসবে যার মাধ্যমে তাদের সত্য হওয়া দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে। অতএব সকল সত্যান্বেষীর সামনে এর সত্যতা প্রকাশের জন্য আমরা নিজেরাই দায়িত্ব নিচ্ছি। 'ইসমত'ও সেসব বিষয়ের একটি বটে, যার অর্থ করা হয় ঐশী তত্ত্বাবধান বা খোদাপ্রদত্ত সুরক্ষা। এই ইসমত বা সুরক্ষা কুরআন শরীফের পরিপূর্ণ অনুসারীদেরকে আলৌকিকভাবে প্রদান করা হয়। এখানে 'ইসমত' বলতে আমরা এটি বুঝাতে চাচ্ছি যে, তাদেরকে এমন সব হীন ও ঘৃণ্য অভ্যাস ও চিন্তাধারা, স্বভাবচরিত্র ও কর্ম থেকে দূরে রাখা হয় যাতে অন্যদের দিবারাত্র লিপ্ত থাকতে দেখা যায় আর কোনো ভুলভ্রান্তি হয়ে গেলেও ঐশী করুণা অচিরেই এর সুরাহা করে। এটি জানা কথা যে, ইসমত-এর বা সুরক্ষার বিষয়টি অতি সংবেদশীল একটি বিষয় আর তা অবাধ্য প্রবৃত্তির প্ররোচনা থেকে যোজন যোজন দূরের বিষয় যা খোদার বিশেষ দৃষ্টি ছাড়া লাভ হওয়া সম্ভব নয়।

যেমন ধরুন, কাউকে যদি বলা হয়, তোমাকে সকল লেনদেন, বক্তৃতা, ব্যবসাবাণিজ্য ও পেশায় কেবল মিথ্যার অভ্যাস হতে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকতে হবে তাহলে এটি তার জন্য কঠিন ও অসম্ভব প্রতিভাত হয়; বরং একাজ করার জন্য সে যদি চেষ্টা-সাধনাও করে তাহলেও এতটা বাধাবিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতার সে সম্মুখীন হয় যে, অবশেষে যা তার নীতি হয়ে যায় তা হলো, জাগতিক কাজকর্মে মিথ্যা ও অসত্য কথা এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। কিন্তু সে সকল পুণ্যবান লোকের জন্য, যারা সত্যিকার ভালোবাসা, গভীর উদ্দীপনা ও আন্তরিকতার সাথে পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলী অনুসারে জীবনযাপন করতে চায় তাদের জন্য কেবল মিথ্যা বলার ঘৃণ্য অভ্যাস থেকে বিরত থাকার বিষয়টিই সহজ করে তোলা হয় না, বরং তারা সকল অকরণীয় ও অকথ্য

বিষয় পরিহারের জন্য সর্বশক্তিমানের পক্ষ থেকে শক্তিও লাভ করে থাকে। খোদা তা'লা স্বীয় পরম করুণায় এমন সব অপছন্দনীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষ্য থেকে তাদেরকে নিরাপদ রাখেন, ফলে তারা ধ্বংসের আবর্তে নিপতিত হতে পারে না। কেননা তারা এ পৃথিবীর আলো হয়ে থাকেন। তাদের নিরাপত্তার মাঝে পৃথিবীর নিরাপত্তা নিহিত আর তাদের ধ্বংসের মাঝে পৃথিবীর ধ্বংস নিহিত থাকে। এদিক থেকে তাদেরকে তাদের সকল চিন্তাধারা, জ্ঞানবুদ্ধি, ক্রোধ, রিপুর তাড়না, আশা ও ভীতি, স্বচ্ছলতা-অস্বচ্ছলতা, সুখ-দুঃখ এবং স্বাচ্ছন্দ্য-অস্বাচ্ছন্দ্য, তাদের সকল প্রকার ইতর কথাবার্তা ও রুগ্ন চিন্তাধারা, অপূর্ণ জ্ঞান ও অবৈধ কর্ম আর অযথা চিন্তাধারা এবং অবাধ্য প্রবৃত্তির সকল প্রকার বাড়াবাড়ি ও অসম্পূর্ণতা থেকে রক্ষা করা হয়। কোন ঘৃণ্য বিষয়ে তারা লাগাতার লিপ্ত থাকতে পারে না। কেননা স্বয়ং খোদা তা'লা তাদের সুশিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন আর তাদের পবিত্র বৃক্ষে যে শাখাকে শুষ্ক দেখেন তাৎক্ষণিকভাবে তা স্বীয় তত্ত্বাবধানসুলভ হাত দ্বারা কর্তন করেন। ঐশী নিরাপত্তা প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি মুহূর্ত তাদের তত্ত্বাবধান করা অব্যাহত রাখে। সুরক্ষার এই নেয়ামত যা তাদের লাভ হয় তাও প্রমাণশূন্য নয়। বরং বিচক্ষণ মানুষ সামান্য সাহচর্যের কল্যাণে পুরো নিশ্চয়তার সাথে তা উদঘাটন করতে পারে। সেসবের একটি হলো খোদার ওপর নির্ভরশীলতা, যার ওপর অতি দৃঢ়তার সাথে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই স্বচ্ছ ঝর্ণাধারা অন্যদের ভাগ্যে আদৌ জুটতে পারে না, তা কেবল তাদের জন্যই মনমোহন, পছন্দনীয় ও বরণীয় করে তোলা হয়। এছাড়া তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতি এমনভাবে তাদের শক্তি জোগায় যে, তারা অনেক সময় বিভিন্ন প্রকার উপায় উপকরণ হতে বঞ্চিত থেকে এবং দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ উপকরণ হতে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে রিক্ত ও বঞ্চিত পেয়েও এমন প্রসন্নচিত্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনার মাঝে জীবন অতিবাহিত করেন আর এমন আপাত স্বচ্ছলতার মাঝে দিনাতিপাত করেন যেন তাদের কাছে অজস্র ধনভাণ্ডার রয়েছে। তাদের চেহারায় প্রাচুর্যের সতেজতা দেখা যায় আর সম্পদশালী হওয়ার অবিচলতা পরিলক্ষিত হয়। তারা অসচ্ছলতায় অনেক বড় মনে ও দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে স্বীয় সম্মানিত প্রভুর প্রতি ভরসা রাখেন। ত্যাগের বৈশিষ্ট্য তাদের বিশেষত্ব হয়ে থাকে আর সৃষ্টিসেবা হয়ে থাকে তাদের অভ্যাস। সারা পৃথিবীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হলেও কখনো কার্পণ্য বা দ্বিধাদ্বন্দ্বের অনুপ্রবেশ তাদের জীবনে ঘটতে পারে না। সত্যিকার অর্থে খোদা তা'লার এমন

সাত্তারিয়্যত তাদের দুর্বলতা ঢেকে রাখে যার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আবশ্যক আর যা শক্তির অতীত কোন বিপদ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে স্নেহের ক্রোড়ে স্থান দেয়, কেননা তাদের সকল কাজের তত্ত্বাবধায়ক স্বয়ং খোদা তা'লাই হয়ে থাকেন। যেমন তিনি নিজেই বলেছেন–

وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ

(সূরা আল আ'রাফ, ৭:১৯৭)

কিন্তু অন্যদেরকে জাগতিকতার কষ্টদায়ক উপকরণের হাতে ছেড়ে দেয়া হয় আর সেই অলৌকিক বৈশিষ্ট্য যা বিশেষভাবে এদের ক্ষেত্রে প্রকাশ করা হয় তা অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রকাশ করা হয় না। তাদের এই বৈশিষ্ট্য সাহচর্যের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে প্রমাণ করা সম্ভব। সেসবের মাঝে একটি মর্যাদা হলো ব্যক্তিগত ভালোবাসার মর্যাদা, যে মর্যাদায় কুরআনের সত্যিকার অনুসারীদের অধিষ্ঠিত করা হয়। তাদের শিরা-উপশিরায় ঐশী ভালোবাসা এতটা প্রভাব বিস্তার করে যে, তা তাদের অস্তিত্বের নির্যাস বরং তাদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকে। প্রকৃত প্রেমাস্পদের জন্য এক বিস্ময়কর ভালোবাসা তাদের হৃদয়ে উথলে ওঠে, এক অলৌকিক ভালোবাসা ও (তাঁকে পাওয়ার) অধীর আগ্রহ তাদের স্বচ্ছ হৃদয়ে রাজত্ব করে যা অন্যদের সাথে সম্পূর্ণভাবে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন এবং বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ঐশী প্রেমানল এমনভাবে প্রজ্জ্বলিত থাকে যে, বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে সহাবস্থানকারীদের তা সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে ও অনুভব হয় বরং (সত্যের সন্ধানে) প্রকৃত প্রেমিকরা যদি এই প্রেমাতিশয্য কোন অজুহাত ও প্রচেষ্টায় গোপনও রাখতে চায় তথাপি তা তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে।

যেভাবে জাগতিক প্রণয়াসক্তদের জন্য বন্ধুবান্ধব ও সহাবস্থানকারীদের সম্মুখে স্বীয় প্রেমাস্পদের প্রতি ভালোবাসাকে গোপন করা অসম্ভব, যাকে দেখার জন্য সে দিবারাত্র ব্যাকুল থাকে। অনুরূপভাবে সেই প্রেম যা তাদের কথা, তাদের চেহারা, তাদের চোখ, তাদের চালচলন বরং তাদের প্রকৃতির অংশ হয়ে গেছে, বরং তাদের প্রতিটি কেশ থেকে প্রকাশ পায় তা তারা গোপন রাখলেও গোপন থাকতে পারে না। যত সম্ভব গোপন করুক এর কোন না কোন চিহ্ন প্রকাশ পেয়েই যায়। তাদের অবিচলতার সবচেয়ে মহান নিদর্শন হলো, তারা তাদের প্রকৃত প্রেমাস্পদকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দেন আর তার পক্ষ থেকে কোন কষ্ট পেলে ব্যক্তিগত ভালোবাসার আতিশয্যে সেটিকে পুরস্কার জ্ঞান করেন এবং শাস্তিকে সুমিষ্ট শরবত বা সুমিষ্ট পানীয়তুল্য মনে করে। কোনো

তরবারির প্রখর ধার তাদের থেকে তাদের প্রেমাস্পদকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না আর বড় কোন পরীক্ষা তাদের প্রেমের এই স্মৃতি রোমন্থনে বাদ সাধতে পারে না। তারা এটিকেই নিজেদের প্রাণ মনে করে আর তারই ভালোবাসাকে উপভোগ করে এবং তার অস্তিত্বকেই সত্যিকার মনে করে আর তাঁর স্মরণকেই নিজেদের জীবনের সারবস্তু জ্ঞান করে। মরিয়া হয়ে তাঁকেই চায় আর প্রশান্তিও তাঁরই মাঝে খুঁজে পায়। সারা বিশ্বে কেবল তাঁকেই প্রাধান্য দেয় আর কেবল তাঁরই হয়ে যায়। তাঁর খাতিরেই জীবনযাপন করে আর তাঁর জন্যই মৃত্যুবরণ করে। পৃথিবীতে থেকেও তারা পৃথিবীহারা আর নিজেদের স্বার্থের বিষয়ে সচেতন হয়েও নিঃস্বার্থ। সম্মান নিয়েও তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই আর নামডাক নিয়েও নয়। নিজেদের প্রাণ ও নিজেদের আরাম নিয়েও তাদের কোন চিন্তা নেই, বরং তারা সবকিছু একজনের জন্য হারিয়ে বসে আর একজনকে পাওয়ার জন্যই সবকিছু জলাঞ্জলি দেয়। এক অদেখা অজানা অনলে জ্বলতে থাকে আর বলতে পারে না যে, কেন জ্বলছে এবং বোঝানো ও বুঝার বিষয়ে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে থাকে। সকল সমস্যা ও সকল লাঞ্ছনা সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকে আর একেই উপভোগ করে।

عشق است کہ برخاک مذلّت غلطاند　　عشق است کہ بر آتش سوزاں بنشاند

প্রেমই মানুষকে লাঞ্ছনার মাটিতে পড়ে ছটফট করার শক্তি যুগিয়ে থাকে,
প্রেমই প্রজ্জ্বলিত আগুনে তাকে বসিয়ে থাকে।

کس بہر کسے سر ندہد جان نہ فشاند　　عشق است کہ ایں کار بصد صدق کناند

কেউ কারো জন্য মুণ্ডুচ্ছেদ করে না, প্রাণ বিসর্জন দেয় না
প্রেমই এ কাজ পুরো বিশ্বস্ততার সাথে করিয়ে থাকে।

সেসবের অন্তর্ভুক্ত (একটি বিশেষত্ব) হলো উন্নত নৈতিক চরিত্র; যেমন উদারতা, বীরত্ব, ত্যাগ তিতিক্ষা, দৃঢ় মনোবল, স্নেহাধিক্য, সহনশীলতা, লজ্জাবোধ ও ভালোবাসা। এসব চারিত্রিক গুণাবলী সবচেয়ে সুন্দর ও সবচেয়ে যুক্তিযুক্তভাবে তাদের পক্ষ থেকেই প্রকাশ পায় আর তারাই কুরআনের আনুগত্যের কল্যাণে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে তা সুচারুরূপে ও সুন্দরভাবে করে যেতে থাকে। উন্নত চরিত্র যেভাবে প্রকাশ পাওয়া উচিত সেভাবে প্রকাশ করা হতে তাদেরকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে– এমন কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্বের তারা সম্মুখীন হন না। আসল কথা হলো মানুষের পক্ষ থেকে যে,

সকল জ্ঞানগত, কর্মগত ও চারিত্রিক গুলাবলী প্রকাশ পেতে পারে তা কেবল মানবীয় শক্তিবলে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়, বরং তা প্রকাশের মূলে রয়েছে খোদার কৃপা।

অতএব এরা যেহেতু সবচেয়ে বেশি খোদার কৃপাভাজন হয়ে থাকেন, তাই স্বয়ং সম্মানিত খোদা স্বীয় অনন্ত কৃপারাজির নিদর্শনস্বরূপ সকল গুণাবলীতে তাদেরকে ধন্য করেন বা অন্য ভাষায় এভাবে ধরে নিতে পার যে, বাস্তবে খোদা তা'লা ছাড়া অন্য কেউ নেক বা পুণ্যবান নয়। সকল মহান চারিত্রিক গুণাবলী ও পুণ্য তাঁর জন্যই স্বীকৃত। এরপর কোনো ব্যক্তি নিজের আমিত্ব ও ইচ্ছা ও অভিপ্রায়কে যতটা বিসর্জন দিয়ে কল্যাণসর্বস্ব সেই সত্তার নৈকট্য অর্জন করে ততটাই খোদার বৈশিষ্ট্য তার সত্তায় প্রতিফলিত হয়। সুতরাং বান্দার যেসকল গুণাবলী ও সত্যিকার সভ্যতা-ভব্যতা লাভ হয় তা খোদার নৈকট্যের কল্যাণেই সে লাভ করে আর এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক ছিল, কেননা সৃষ্টি নিজ গুণে কোন কিছুই নয়। সুতরাং চারিত্রিক ঔৎকর্ষের প্রতিফলন কেবল তাদের হৃদয়ে হয় যারা কুরআন শরীফের পূর্ণ অনুসরণ করে। সঠিক ও সত্য অভিজ্ঞতা হলো, যে স্বচ্ছতা ও আধ্যাত্মিক আনন্দ এবং ভালোবাসাপূর্ণ উচ্ছ্বাসে আপ্লুত হয়ে উন্নত চরিত্র তাদের পক্ষ থেকে প্রকাশ পায়, এর দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। যদিও মৌখিক দাবি সবাই করতে পারে আর বড় বড় বুলিও সকলেই আওড়াতে পারে, কিন্তু সত্য ও সঠিক অভিজ্ঞতার সংকীর্ণ যে দ্বার রয়েছে সেই দ্বারপথে নিরাপদে এরাই কেবল বের হয়। অন্যরা কিছুটা উন্নত চরিত্র প্রকাশ করলেও কৃত্রিমভাবে প্রকাশ করে। নিজেদের কৌলুষ গোপন রেখে, নিজেদের ব্যাধি মানবদৃষ্টির আড়াল করে বানোয়াট সভ্যতা-ভব্যতা প্রদর্শন করে ঠিকই, কিন্তু তুচ্ছাতিতুচ্ছ পরীক্ষার সময় তাদের আসল রূপ প্রকাশ পেয়ে যায়।

উন্নত চরিত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে তারা যে কৃত্রিম পন্থা অবলম্বন করে এর কারণ হলো, তারা নিজেদের বৈষয়িক স্বার্থ এবং সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য ও সাফল্য এতেই নিহিত বলে মনে করে। যদি তারা সর্বত্র নিজেদের অভ্যন্তরীণ নোংরামী প্রকাশ করে তাহলে তাদের জীবন ও জীবিকা-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির ক্ষেত্রে বিপত্তি দেখা দেয়। যদিও যোগ্যতা অনুসারে নৈতিক চরিত্রের কিছুটা বীজ তাদের মাঝেও থাকে, কিন্তু প্রায়শ তা প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার কণ্টকতলে চাপা পড়ে থাকে এবং রিপুর সংসর্গমুক্ত হয়ে ষোলআনা আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিতরূপে প্রকাশ পায় না, শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন তো দূরের কথা। বিশেষ করে তাদের মাঝেই

সেই বীজ পূর্ণরূপে বিকশিত হয় যারা সম্পূর্ণভাবে খোদার হয়ে যায় আর যাদের প্রবৃত্তিকে খোদা তা'লা অন্যদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কলুষ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত পেয়ে স্বয়ং নিজ পবিত্র বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ করেন আর তাদের হৃদয়ে সেই বৈশিষ্ট্যকে এতটা প্রিয়তর করে তুলেন যেভাবে তিনি স্বয়ং তাদের কাছে প্রিয়। অতএব তারা আত্মবিলীনতার কারণে খোদার রঙে রঙিন হওয়ার এমন মর্যাদা লাভ করেন যেন তারা খোদার (হাতের) এক যন্ত্র বা মাধ্যম, যার মাধ্যমে তিনি নিজের বৈশিষ্ট্যাবলী প্রকাশ করেন আর ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত পেয়ে তাদেরকে নিজের বিশেষ প্রস্রবণ হতে সুপেয় পানি পান করান যাতে কোন সৃষ্টি তাঁর সাথে নিজ গুণের ভিত্তিতে তাঁর শরীক নয়। এসকল দানের ভিতর হতে একটি সুমহান শ্রেষ্ঠত্ব, যা কুরআন শরীফের পূর্ণ অনুসারীদের দেয়া হয় তা হলো উবুদিয়্যত (খোদার পূর্ণ দাসত্ব)। অর্থাৎ তারা অগণিত শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও সব সময় ব্যক্তিগত ত্রুটিবিচ্যুতিকে দৃষ্টিতে রাখেন আর মহান আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্যের জ্ঞান থাকার কারণে সদা বিনয়, আত্মপেষণ-আত্মবিলোপ (নেস্তি) ও নিরহংকারিতার মাঝে জীবনযাপন করেন। হেয় ও তুচ্ছ হওয়া, দ্বীনহীন হওয়া, অনাথ ও দুর্বল হওয়া আর ভুলভ্রান্তির শিকার হওয়াকেই নিজেদের বাস্তব অবস্থা হিসেবে বিশ্বাস করে। তাদেরকে যেসকল উৎকর্ষতা দেয়া হয়েছে সেগুলোকে তারা সেই ক্ষণস্থায়ী আলোর ন্যায় মনে করে যা কোনো সময় সূর্য হতে দেয়ালের ওপর পড়ে থাকে যার সত্যিকার অর্থে দেয়ালের সাথে কোনো সম্পর্ক থাকে না আর ধারে নেয়া পোশাকের ন্যায় হাতছাড়া হয়ে যায়।

সুতরাং তারা সকল মঙ্গল ও সৌন্দর্য খোদাতেই সীমাবদ্ধ রাখে আর সকল পুণ্যের প্রস্রবণ তাঁর পবিত্র সত্তাকেই আখ্যায়িত করে। ঐশী গুণাবলী পূর্ণরূপে দেখা ও অভিজ্ঞতা করার কারণে একথা তাদের হৃদয়ে সত্যভিত্তিক বিশ্বাস হিসেবে আসীন হয়ে যায় যে, আমরা নিজেরা কিছুই নই। এমনকি তারা আপন সত্তা, ইচ্ছা ও বাসনা থেকে পুরোপুরি পৃথক হয়ে যায় আর খোদার মাহাত্ম্যের ফুঁসে উঠা সমুদ্র তাদের হৃদয়সমূহকে এমনভাবে আবেষ্টন করে নেয় যে, সহস্র সহস্র প্রকার আত্মবিলুপ্তি বা নাস্তি তাদের ওপর ছেয়ে যায় আর সুপ্ত শির্‌কের সকল প্রকার কলুষ হতে তারা পুরোপুরি পবিত্র ও মুক্ত হয়ে যায়। সে সকল দানের একটি হলো, তাদের তত্ত্বজ্ঞান ও খোদাকে চেনার বিষয়টিকে, সত্য দিব্যদর্শন, ঐশী জ্ঞান, স্পষ্ট এলহাম, এক-অদ্বিতীয় খোদার সাথে বাক্যালাপ ও কথোপকথন এবং অন্যান্য অলৌকিক বিষয়াদির মাধ্যমে পরমোৎকর্ষ পর্যায়ে পৌঁছানো হয়। এমনকি তাদের ও দ্বিতীয় জগতের মাঝে

কেবল অতিসূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ একটি পর্দা অবশিষ্ট থাকে যা অতিক্রম করে তাদের দৃষ্টি পারলৌকিক ঘটনাবলীকে এ পৃথিবীতেই প্রত্যক্ষ করে। পক্ষান্তরে অন্যরা তাদের গ্রন্থাবলী অন্ধকারে ভরে থাকার কারণে এ পর্যায়ে আদৌ পৌঁছতে পারে না, বরং তাদের বক্র শিক্ষাযুক্ত গ্রন্থ তাদের পর্দার ওপর আরো শত শত পর্দা লেপন করে আর রোগকে ক্রমবৃদ্ধি করে মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। অপরদিকে দার্শনিক, যাদের পদাঙ্ক আজকাল ব্রাহ্মসমাজীরা অনুসরণ করছে এবং যাদের ধর্মের ভিত্তি হলো নিছক যৌক্তিক চিন্তাধারার ওপর, তারা স্বীয় রীতিনীতির ক্ষেত্রে ত্রুটিবিচ্যুতিতে নিপতিত। তাদের তত্ত্বজ্ঞান শত শত প্রকার ভ্রান্তিবশত তাত্ত্বিক কারণ অতিক্রম করে না আর আনুমানিক ধ্যানধারণার ঊর্ধ্বে যায় না– এদের ভ্রান্তি ও ক্ষতিতে নিপতিত থাকার প্রমাণ হিসেবে একথাই যথেষ্ট। জানাকথা হলো, যে ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান নিছক তাত্ত্বিক সীমারেখার মাঝেই সীমাবদ্ধ আর তাও বেশ কয়েক প্রকার ভুলভ্রান্তিতে কলুষিত, সে সেই ব্যক্তির মোকাবিলায় নিজের জ্ঞানগত অবস্থার ক্ষেত্রে চরমভাবে পশ্চাদপদ ও অধঃপতিত থাকবে যার তত্ত্বজ্ঞান প্রাঞ্জলতা ও স্পষ্টতার পর্যায়ে উপনীত। জানাকথা যে, ভাবনাচিন্তা বা তাত্ত্বিক কথাবার্তার ঊর্ধ্বে স্পষ্ট অভিজ্ঞতা ও চাক্ষুষভাবে দেখার স্তরও রয়েছে। অর্থাৎ যেসকল বিষয় তাত্ত্বিকভাবে ও অনুমানের মাধ্যমে অবগত হওয়া যায় তা অন্য কোন পন্থায় প্রকাশ্য ও চাক্ষুষভাবেও জানা সম্ভব। অতএব যুক্তির নিরিখে থেকে এ ধরনের স্পষ্ট জ্ঞান অর্জন একান্ত সম্ভব। ব্রাহ্মসমাজীরা এর বাহ্যত প্রকাশ পাওয়ার কথা অস্বীকার করলেও এসত্যকে অস্বীকার করতে পারবে না, যদি তা বাহ্যত বিদ্যমান থাকে তাহলে তা অতীব মহান ও সম্পূর্ণ।

অধিকন্তু তাত্ত্বিক জগতে ও চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে যে বিষয় অপ্রকাশিত থেকে যায় তা প্রকাশিত হওয়া ও সামনে আসা নির্ভর করে এর ওপর। একান্ত একথাটি কে বুঝবে না যে একটি বিষয় স্পষ্টভাবে সামনে ভেসে ওঠা অনুমান ও ধারণার চেয়ে উত্তম ও উন্নত বিষয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদিও সৃষ্টিকূল দেখে বুদ্ধিমান ও সুস্থ প্রকৃতির মানুষের দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ হতে পারে যে, এসব জিনিসের অবশ্যই কোন স্রষ্টা থাকবে, কিন্তু ঐশী তত্ত্বজ্ঞান লাভের অত্যন্ত স্পষ্ট ও উজ্জল পন্থা হলো, তাঁর বান্দাদের প্রতি এলহাম হয়ে থাকে যা তাঁর অস্তিত্বের সত্যতার অত্যন্ত দৃঢ় একটি প্রমাণ। বস্তুর বাস্তব পরিণতি কী হবে তা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই এর চূড়ান্ত পরিণতি তাদের কাছে প্রকাশ করে দেয়া হয়। তারা এক অদ্বিতীয় খোদার পক্ষ থেকে তাদের আকুতি-মিনতির উত্তর

পায় আর তাদের সাথে খোদার বাক্যালাপ ও কথোপকথন হয়। দিব্যদর্শনে তাদেরকে পারলৌকিক ঘটনাবলী দেখানো হয়। তাদেরকে শাস্তি ও পুরস্কারের স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এছাড়াও আরো বেশ কয়েক প্রকার পারলৌকিক রহস্য তাদের সামনে উন্মোচন করা হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এসব বিষয় জ্ঞানভিত্তিক বিশ্বাসকে পূর্ণতা ও সম্পূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছায় আর মানুষকে ধারণার গভীর ও অধঃপতিত পর্যায় থেকে স্পষ্টতার সুউচ্চ মিনার পর্যন্ত নিয়ে যায়। বিশেষত এক-অদ্বিতীয় খোদার সাথে বাক্যালাপ ও কথোপকথন এসবের মাঝে সবচেয়ে উন্নত মানের, কেননা এর মাধ্যমে কেবল অদৃশ্য সংবাদই জানা যায় না বরং দুর্বল বান্দার প্রতি মহাসম্মানিত খোদার যে সকল বদান্যতা প্রদর্শিত হয়ে থাকে সে সম্বন্ধেও সংবাদ দেয়া হয়। অধিকন্তু এক আনন্দদায়ক কল্যাণময় বাণীর মাধ্যমে সে এমন প্রশান্তি ও প্রবোধ লাভ করে আর তাকে মহাসম্মানিত খোদার সন্তুষ্টি সম্পর্কে অবহিত করা হয় যার মাধ্যমে বান্দা জাগতিক ঘৃণ্য বিষয়াদির মোকাবিলার জন্য অসাধারণ শক্তি লাভ করে।

এককথায়, সে ধৈর্য ও অবিচলতার পাহাড় হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে কালাম বা বাণীর মাধ্যমে উন্নত পর্যায়ের জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি বান্দাকে প্রদান করা হয় আর তাকে সেই সব গুপ্ত রহস্যাবলী ও সুগভীর সূক্ষ্ম বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করা হয় যা বিশেষ ঐশী শিক্ষা ছাড়া কোনোভাবে জানা সম্ভব নয়। কেউ যদি এই সন্দেহের অবতারণা করে যে, যেসব বিষয় কুরআন শরীফের পূর্ণ আনুগত্যের ফলে লাভ হয় বলে উল্লেখ করা হলো সেসব বিষয়, বাস্তবে কীভাবে ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে সত্য প্রমাণিত হতে পারে? এই সন্দেহের উত্তর হলো সঙ্গ বা সাহচর্যের মাধ্যমে তা লাভ হয়। যদিও আমরা বেশ কয়েকবার লিখে এসেছি কিন্তু কথা দীর্ঘ হওয়ার আশংকা না করে সংক্ষেপে সকল বিরোধীর সামনে পুনরায় প্রকাশ করছি যে, সত্যিকার অর্থে এই মহান নেয়ামত ইসলামেই লাভ হয়, অন্য কোন ধর্মে নয়। সাহচর্য, ভক্তি, মিল বা সামঞ্জস্য, ধৈর্য এবং দৃঢ়চিত্ততার শর্তে সত্যান্বেষীর সামনে এর প্রমাণ উপস্থাপনের দায়িত্ব আমাদের। প্রত্যেক সন্ধানীর সামনে তার নিজ সামর্থ্য ও ব্যক্তিগত যোগ্যতা অনুসারে এই বিষয়গুলো প্রকাশ পেতে পারে। এ সকল বিষয়ের মাঝে অদৃশ্য-সংক্রান্ত যেসব সংবাদ রয়েছে, সে বিষয়ে আদৌ এ সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয় যে, জ্যোতিষী ও গণকরাও এই বৈশিষ্ট্যের অংশীদার, কেননা এরা কোনো বিশেষ জ্ঞান বা নীতির অধীনে অদৃশ্য সংবাদ প্রকাশ করে না আর অদৃশ্যের

জ্ঞান রাখার দাবিও করে না, বরং সম্মানিত খোদা যিনি তাদের প্রতি করুণাশীল আর তাদের প্রতি একটি বিশেষ কৃপা ও স্নেহদৃষ্টি রাখেন, তিনি বিশেষ প্রজ্ঞার অধীনে কোনো কোনো বিষয় সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তাদের বলে দেন যেন সে যে কাজের সংকল্প করে তা সহজে সমাধা হয়। যেমন, সৃষ্টির সামনে তিনি এটি প্রকাশ করতে চান যে, অমুক বান্দা খোদার পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত। সে যেসব সাহায্য লাভ করে তা সাধারণ রীতির অধীনে নয় বা দৈবক্রমে নয়, বরং বিশেষ ঐশী স্নেহদৃষ্টির ফলে প্রকাশিত হয়। অনুরূপভাবে যে বিজয় ও সাহায্য, সম্মান ও গ্রহণীয়তা তার লাভ হয় তা কোনো পরিকল্পনা ও কৌশলের ফসল নয়, বরং খোদা তা'লাই তাকে বিজয় দিতে চেয়েছেন আর স্বীয় সাহায্যে তাকে ধন্য করতে চেয়েছেন। অতএব সেই সম্মানিত ও দয়ালু খোদা এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের নিমিত্তে সেসকল নেয়ামত লাভ ও বিজয় হস্তগত হওয়ার পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণীস্বরূপ সেসকল নেয়ামত দানের সুসংবাদ জানিয়ে দেন।

সুতরাং সেসকল ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান করা হয় না, বরং এর উদ্দেশ্য হলো নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয়ে যাওয়া যে, সেই ব্যক্তি প্রকৃতই খোদার পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত আর সে সেই সকল বিশেষ লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাদের সাহায্যের জন্য বিশেষ মহিমায় মহাসম্মানিত খোদার দানের বিকাশ ঘটে। এখন এ বক্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্ট যে, ঐশী মদদপুষ্ট এই ব্যক্তির জ্যোতিষী প্রমুখদের সাথে কোন সামঞ্জস্য নেই আর ভবিষ্যদ্বাণী করা তার মূল উদ্দেশ্য হয় না, বরং মূল উদ্দেশ্যকে চেনা বা বোঝার জন্য তা কেবল প্রমাণ ও লক্ষণাবলী হয়ে থাকে। এছাড়া খোদা তা'লা বিশেষভাবে যাদেরকে নিজের জন্য মনোনীত করেন এবং নিজ হাতে পরিশুদ্ধ করেন এবং নিজ দলভুক্ত করেন তাদের লক্ষণ কেবল এটি নয় যে, তারা গোপন বিষয়াদি অবহিত করে আর এভাবে তাদের অবস্থা জ্যোতিষী, গণক, শুভাশুভ নির্ণয়কারী ও পুরোহিতদের অবস্থার সাথে গুলে যাবে! আর দুয়ের মাঝে আর কোনো পার্থক্য থাকবে না! বরং তাদের সাথে একটি মহান জ্যোতি থাকে যা প্রত্যক্ষ করে সত্যান্বেষী স্পষ্টভাবে তাদেরকে শনাক্ত করতে পারে। সত্যিকার অর্থে সেই জ্যোতিই তাদের সকল কথা-কর্ম, ওঠা-বসা, বিবেকবুদ্ধি ও ভেতর-বাহিরকে পরিবেষ্টন করে রাখে এবং এর শত শত শাখাপ্রকাশ পায় আর বিভিন্নভাবে তা বিকশিত হয়ে থাকে। কঠিন পরিস্থিতি ও বিপদাপদের সময় ধৈর্যের আকারে সেই জ্যোতি প্রকাশ পায় আর অবিচলতা ও খোদার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকার মাধ্যমে স্বীয় চেহারা প্রদর্শন করে। যাদের ওপর এই জ্যোতি

অবতীর্ণ হয় তাদেরকে ভয়াবহ বিপদাপদের সামনে দৃঢ়প্রোথিত পাহাড়ের মত মনে হয়। যেসব বিপদাপদ স্পর্শ করতেই অবুঝরা কাঁদে হইচই করে, বরং মৃত্যুর সন্নিকটবর্তী হয়ে যায়, এরা সেসব দুঃখ-যাতনার অতি কঠিন আঘাতকে তুচ্ছজ্ঞান করে। আর তাৎক্ষণিকভাবে ঐশী নিরাপত্তার চাদর তাদেরকে স্নেহের আঁচলে ঠাঁই দেয় এবং কোন দুর্বলতা ও অধৈর্য তাদের পক্ষ থেকে প্রকাশ পায় না, বরং সত্যিকার প্রেমাস্পদের পক্ষ থেকে দুঃখ পাওয়াকে তারা পুরস্কার বিবেচনা করে, অধিকন্তু প্রসন্ন হৃদয়ে ও উদার মনে তা গ্রহণ করে। বরং এটিকে তারা উপভোগ করে, কেননা শক্তি, সামর্থ্য ও ধৈর্যের পাহাড় তাদের প্রতি পরিচালিত করা হয়। খোদাপ্রেমের উত্তাল তরঙ্গ অন্যের স্মরণ হতে তাদেরকে বিরত রাখে। সুতরাং তাদের পক্ষ থেকে এমন এক ধৈর্য প্রকাশ পায় যা অলৌকিক আর কোনো মানবের পক্ষ থেকে খোদার সাহায্য ছাড়া তা প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়।

একইভাবে বিভিন্ন প্রয়োজনের সময় স্বল্পেতুষ্টির আকারে সেই জ্যোতি তাদের সামনে প্রকাশ পায়। সুতরাং জাগতিক কামনা-বাসনার প্রতি তাদের হৃদয়ে এক বিস্ময়কর অনীহা সৃষ্টি হয় যার ফলে তারা বস্তুজগতকে দুর্গন্ধময় বস্তুর ন্যায় মনে করে। একই জাগতিক সুখ ও আনন্দ, জগতপূজারিরা যার মোহে আচ্ছন্ন ও গভীর আগ্রহের সাথে যার পেছনে হন্যে হয়ে ছুটে এবং এক্ষেত্রে ভাটা দেখা দিলে ভীষণভাবে ত্রস্ত হয়ে ওঠে তা তাদের দৃষ্টিতে একেবারে তুচ্ছ জিনিস হয়ে থাকে। প্রকৃত বন্ধুর প্রতি বিশ্বস্ততা, ভালোবাসা ও সন্তুষ্টিতে হৃদয় পরিপূর্ণ থাকবে, তাঁর প্রতি গভীর আকর্ষণ ও উদ্দীপনা এবং অনুরাগে পুরো সময় কাটবে– নিজেদের সমূহ আনন্দ তারা এতেই দেখে। তারা সেই সম্পদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ যা তাঁর ইচ্ছাপরিপন্থি এবং সেই সম্মানকে পদদলিত করে যাতে মহাসম্মানিত প্রভুর প্রতি অনুরাগ নেই। একইভাবে সেই আলো কোন সময় সূক্ষ্ম বিচারশক্তি হিসেবে, কখনো উন্নত দৃষ্টিভঙ্গির গগনচুম্বী উড্ডয়নের মাঝে, কখনো কর্মশক্তির আশ্চর্যজনক বহিঃপ্রকাশের মাঝে, কখনো নমনীয়তা ও কোমলতার পোশাকে, কখনো কঠোরতা ও আত্মাভিমানের বেশে, কখনো উদারতা ও ত্যাগের পোশাকে, কখনো বীরত্ব ও অবিচলতা রূপে, কখনো এক চরিত্রে আর কখনো ভিন্ন কোনো চরিত্রে, কখনো এক অদ্বিতীয় খোদার সাথে বাক্যালাপের দ্বারা আর কখনোবা সত্য দিব্যদর্শন আর স্পষ্ট নিদর্শনের পোষাকে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ স্থানকালপাত্রভেদে মহাসম্মানিত প্রভুর পক্ষ থেকে সেই জ্যোতি প্রবল উচ্ছ্বাসে উৎসারিত হয়। জ্যোতি একটিই

কিন্তু এসব তাঁর শাখাপ্রশাখা মাত্র। যে ব্যক্তি কেবল একটি শাখাই দেখে আর শুধু একটি মাত্র প্রশাখার প্রতি দৃষ্টি রাখে তার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ থাকে। তাই অনেক সময় সে প্রতারিত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই পবিত্র বৃক্ষের সকল শাখার ওপর দৃষ্টি রাখে আর এর হরেক রকমের ফল ও কুঁড়ির অবস্থা সম্পর্কে জেনে যায় সে দিবালোকের মত সেসকল জ্যোতি প্রত্যক্ষ করে আর নূরানী জ্যোতির উন্মুক্ত তরবারি তার সকল অহংকারকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। এখানে হয়ত কোনো কোনো মানুষের এটি বুঝতে সমস্যা হতে পারে যে, এসব শ্রেষ্ঠত্ব সেসকল লোক কীভাবে লাভ করতে পারে যারা নবীও নয় আর রসূলও নয়? কিন্তু আমরা যেভাবে পূর্বেও লিখেছি, এই প্রশ্নটি কেবল একটি ভিত্তিহীন সন্দেহ যা সেসব লোকের হৃদয়ে বাসা বাঁধে যারা ইসলামের বাস্তবতা সম্পর্কে অনবহিত। যদি নবীদের অনুসারীরা আনুগত্যের মান অনুসারে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব, জ্ঞান ও তত্ত্ব হতে অংশ না পায় তাহলে উত্তরাধিকারের দ্বার সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ হয়ে যায় বা অতি সংকীর্ণ ও ছোট হয়ে যায়, কেননা এই অর্থ সম্পূর্ণভাবে উত্তরাধিকারের পরিপন্থি যে, কল্যাণের উৎস খোদার পক্ষ থেকে যাকিছু তাঁর নবী-রসূলগণ পেয়ে থাকেন আর বিশ্বাস ও তত্ত্বের জ্যোতিতে এই সকল পবিত্র লোকদের দেয়া হয় সেই শরবত বা সুধা সম্পর্কে যদি তাদের অনুসারীদের ওষ্ঠযুগল সম্পূর্ণভাবে অনবহিত থাকে আর কেবল শুষ্ক ও বাহ্যিক কথা বলে তাদের অশ্রু মোচন করা হয় তাহলে এমন কথার আবশ্যকীয় ফলাফল এটি দাঁড়াবে যে, বদান্যশীল খোদার সত্তায় একপ্রকার কার্পণ্য রয়েছে।

অধিকন্তু এর মাধ্যমে খোদার বাণী ও মহানবী (সা.)-এর মাহাত্ম্যের হানি অবধারিত, কেননা ঐশী বাণীর মহান প্রভাব ও নিষ্পাপ নবীর পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব এতেই নিহিত যে, ঐশী বাণীর স্থায়ী জ্যোতি স্বচ্ছ ও সোচ্চার হৃদয়কে সদা আলোকিত করে যাবে। এর প্রভাব সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হবে বা গুটিকতক ব্যক্তি পর্যন্ত প্রভাব দেখিয়ে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে অকার্যকর ঔষধের ন্যায় কেবল নামসর্বস্ব কার্যকারিতা অবশিষ্ট থাকবে এমনটি যেন না হয়। এছাড়া একটি সত্য যখন বাস্তবেই সর্বকালে ও সর্বযুগে অস্তিত্বের দিক থেকে প্রমাণিত চলে আসছে আর এখনো প্রমাণিত আর অগণিত সাক্ষ্য ও নিদর্শনের মাধ্যমে যার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া সম্ভব, সেখানে এমন স্পষ্ট সত্যকে কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কীভাবে অস্বীকার করতে পারে? আর এমন প্রকাশ্য

সত্য কী করে এবং কোথায় গোপন থাকতে পারে? অথচ অনুমানের দাবিও এটি যে, যতদিন বৃক্ষ থাকে তাতে ফলও ধরা চাই। হ্যাঁ! যে বৃক্ষ শুকিয়ে যায় বা মূল হতে কাটা পড়ে এর ফলের আশা করা অজ্ঞতা বইকি।

অতএব যেখানে ফুরকান মজীদ সেই মহান ও সবুজ-সতেজ বৃক্ষ যার মূল মাটির গভীরে প্রোথিত আর শাখা গগনচুম্বী, সেখানে এমন পবিত্র বৃক্ষের ফলফলাদিকে কীভাবে অস্বীকার করা যেতে পারে? এর ফলফলাদি স্পষ্টতই দৃশ্যমান যা সকল যুগে মানুষ আস্বাদন করে এসেছে আর এখনো আস্বাদন করছে এবং ভবিষ্যতেও খেতে থাকবে। কতক নির্বোধের একথা সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত ও অর্থহীন যে, এযুগে কেউ সেই ফলের কাছে পৌঁছতেই পারবে না, বরং তা খাওয়া কেবলই পূর্ববর্তীদের অদৃষ্টে লেখা ছিল। কেবল তারাই সেই সৌভাগ্যবান মানুষ ছিলেন যারা সেই ফল খেয়েছেন ও উপভোগ করেছেন। তাদের পর দুর্ভাগা মানুষের জন্ম হয়েছে যাদেরকে মালিক বাগানে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছেন! খোদা তা'লা কোনো সামর্থ্যবানের সামর্থ্য নষ্ট করেন না আর কোনো সত্যিকার সন্ধানীর জন্য তার কল্যাণের দ্বার বন্ধ হয় না। যদি কারো হৃদয়ে এ ভ্রান্ত চিন্তাধারা বদ্ধমূল থাকে যে, কোনো সময়, কোনো যুগে ঐশী কল্যাণধারার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায় আর সামর্থ্যবান লোকদের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম বৃথা যায় তাহলে সে এখন পর্যন্ত খোদা তা'লার মর্যাদাই অনুধাবন করে নি। এমন মানুষ সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত যাদের সম্পর্কে খোদা তা'লা নিজেই বলেন–

وَمَاقَدَرُوااللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ

(সূরা আল আন'আম: ৯২)

কিন্তু যদি এই অজুহাত দেখানো হয় যে, যেসব জ্ঞান ও তত্ত্ব এবং সত্য দিব্যদর্শন ও মহাসম্মানিত খোদার সাথে বাক্যালাপের সত্যতার কথা বলা হয়ে থাকে সেসব এখন কোথায় আর তা কীভাবে প্রমাণ করা যায়? এর উত্তর হলো, এ সবের প্রমাণ উত্তরস্বরূপ এ গ্রন্থে দেয়া হয়েছে। সত্যান্বেষীর জন্য তা পরীক্ষা করার খুব সহজ-সরল পথ খোলা রয়েছে, কেননা সে নিজেই এই পুস্তকে সেসব তত্ত্বজ্ঞান প্রত্যক্ষ করতে পারে। আর যেসব সত্য দিব্যদর্শন ও অদৃশ্য সংবাদ এবং অন্যান্য অলৌকিক বিষয়াদি রয়েছে তা ভিন্ন ধর্মীদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে তার সামনে প্রমাণিত হতে পারে বা সে নিজেই কিছুকাল পর্যন্ত সাহচর্যে থেকে পূর্ণ বিশ্বাসের পর্যায়ে উপনীত হতে পারে আর ইসলামের

অন্যান্য যেসব আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব রয়েছে তাও সাহচর্যে প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু এখানে যে কথা স্মরণ রাখতে হবে তা হলো, সত্য প্রেমিকদের ওপর যে সকল আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর বিষয়াদি প্রকাশ পায় আর তাতে যেসব কল্যাণরাজি নিহিত থাকে তা কোনো সত্যসন্ধানীর ওপর তখন প্রকাশ পায় যখন সেই সত্যান্বেষী পরম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে হেদায়েত লাভের মানসে সেসবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে। সে যদি এভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাহলে যতটা ও যে ধরনের প্রকাশ অবধারিত থাকে তা খোদা তা'লার পবিত্র ইচ্ছায় প্রকাশ পায়। কিন্তু যেখানে সন্ধানীর নিষ্ঠা ও নিয়্যতে কোনো ত্রুটি থাকে আর হৃদয় আন্তরিকতাশূন্য হয়ে থাকে এমন সন্ধানীকে কোনো নিদর্শন দেখানো হয় না। সম্মানিত নবীদের সাথে খোদার এটিই রীতি।

যেমনটি কিনা ইঞ্জিল পাঠে একথা অতিস্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় যে, অনেকবার ইহুদিরা ঈসা (আ.)-এর কাছে কিছু নিদর্শন দেখতে চেয়েছে; কিন্তু তিনি নিদর্শন দেখাতে পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করেছেন আর কোনো অতীত নিদর্শনের বরাতও টানেন নি। যেমন মার্ক ৮:১২ তেও এরই সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। আর উল্লিখিত বাক্য হলো, তখন ফরিসি বের হয় আর তার সাথে (অর্থাৎ মসীহ্‌র সাথে) বিতর্ক করে এবং তাকে পরীক্ষা করার জন্য আকাশ থেকে কোন নিদর্শন দাবি করে। সে আক্ষেপ করে বলে, এযুগের মানুষ কেন নিদর্শন দাবি করে? আমি সত্য বলছি, এ যুগের লোকদের কোনো নিদর্শন দেখানো হবে না। যদিও বাহ্যত এই বাক্য একথাই বলে যে, মসীহ্‌র পক্ষ থেকে কোনো নিদর্শন প্রকাশ পায় নি, কিন্তু এর আসল অর্থ হলো তখন পর্যন্ত মসীহ্‌র পক্ষ হতে কোনো নিদর্শন প্রকাশ পায় নি, সে কারণেই তিনি কোনো অতীত নিদর্শনের বরাত টানেন নি, কেননা কারো সদিচ্ছা বা ভক্তির কারণে কোনো নিদর্শন প্রকাশ পেতে পারে এমন নিষ্ঠাবান ও আন্তরিক মানুষ ইহুদিদের মাঝে খুব কমই ছিল। কিন্তু এরপর যারা নিষ্ঠাবান, আন্তরিক এবং সত্যান্বেষী হিসেবে মসীহ্‌র কাছে এসেছে তারা নিদর্শন দেখা হতে বঞ্চিত থাকে নি। যেমন, যিহুদা ইস্কুরিয়তির দূরভিসন্ধি সম্পর্কে হযরত ঈসার অবহিত হওয়া তার একটি নিদর্শনই ছিল যা তিনি তার শিষ্য ও সত্য বিশ্বাসীদের দেখিয়েছেন। যদিও তাঁর সব বিস্ময়কর কাজ চৌবাচ্চা-সংক্রান্ত কাহিনী এবং উল্লিখিত আয়াতের কারণে বিরোধীদের দৃষ্টিতে অস্বীকার্য ও আপত্তিকর গণ্য

হয় আর এখন প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার হতে পারে না, তথাপি হতে পারে উল্লিখিত নিদর্শন বিরোধীর দৃষ্টিতে প্রকাশ পেয়ে থাকবে। বস্তুত নিদর্শন ও অলৌকিক বিষয়াদি প্রকাশের জন্য সত্যসন্ধানীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা হলো শর্ত আর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার প্রমাণ হলো, কারো মাঝে বিদ্বেষ ও অহংকার না থাকা আর ধৈর্য, অবিচলতা এবং দীনতা ও বিনয়ের সাথে হেদায়েত লাভের উদ্দেশ্যে কোনো নিদর্শন কামনা করা, এছাড়াও সেই নিদর্শন প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ও শালীনতার সাথে অপেক্ষা করা। এককথায় ভদ্রতা, নিষ্ঠা ও ধৈর্য ঐশী কল্যাণরাজি প্রকাশ পাওয়ার জন্য মহান ও বড় শর্ত। যে ব্যক্তি ঐশী কল্যাণধারা হতে কল্যাণমণ্ডিত হতে চায় তার জন্য যথোচিত হবে ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের মূর্ত প্রতীক হয়ে সমূহ বিনয় ও ধৈর্যের সাথে সেই নেয়ামতকে এর ধারকবাহকের কাছ থেকে সন্ধান করা আর যেখানে তত্ত্বজ্ঞানের প্রস্রবণ দেখবে স্বয়ং পাগলপ্রায় সেই প্রস্রবণের দিকে ধাবিত হওয়া এবং এরপর ধৈর্য ও শিষ্টাচার বজায় রেখে কিছুদিন অপেক্ষা করা।

কিন্তু যারা খোদার পক্ষ থেকে নিদর্শন লাভ করে তাদের এটি সাজে না যে, তারা ভেল্কিবাজদের ন্যায় বাজারে বন্দরে তামাশা দেখিয়ে বেড়াবে আর এটি তাদের আয়ত্বেও নেই। বাস্তব সত্য হলো, তাদের পাথরে অগ্নি নিঃসন্দেহে অন্তর্নিহিত রয়েছে কিন্তু সত্যবাদী, ধৈর্যশীল ও নিষ্ঠাবানদের আন্তরিক ঘর্ষণ বা আঘাতের ওপরই এই অগ্নির প্রকাশ পাওয়া নির্ভর করে। আরো একটি কথা স্মরণ রাখা উচিত; খোদা প্রেমিকদের দিব্যদর্শন ও এলহামকে নিছক অদৃশ্যের সংবাদ অভিহিত করা একটি ভ্রান্তি, বরং সেসকল দিব্যদর্শন ও এলহাম ঐশী সাহায্য ও সমর্থনরূপী বাগানের সৌরভ হয়ে থাকে যা দূর থেকেই সেই বাগানের অস্তিত্বের সংবাদ দেয়। সেসকল দিব্যদর্শন ও এলহামের মাহাত্ম্য ও মহিমা সে ব্যক্তির সামনে যথাযথভাবে প্রকাশ পায় যার দৃষ্টি ঐশী সাহায্য ও সমর্থনের সন্ধানে থাকে, অর্থাৎ ঐশী সাহায্য-সমর্থনকে সে প্রকৃত নিদর্শন আখ্যায়িত করে ভবিষ্যদ্বাণীকে সেসকল ঐশী সাহায্য ও সমর্থনের আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ জ্ঞান করে যা ঐশী সমর্থনের প্রমাণস্বরূপ কার্যত প্রকাশ করা হয়েছে। এক কথায়, খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত হওয়ার কেন্দ্রবিন্দু হলো ঐশী সমর্থন আর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সমুজ্জ্বল প্রমাণাদির মাধ্যমে এসকল সমর্থন যে কার্যত বিদ্যমান তা সকল বিশেষ ও সাধারণ মানুষকে প্রদর্শন করিয়ে থাকে। সুতরাং ঐশী সাহায্য ও সমর্থন আসল বিষয় আর ভবিষ্যদ্বাণী এর শাখা। ঐশী সমর্থন

সূর্যের চাকতি বা গোলকের ন্যায় আর ভবিষ্যদ্বাণী সূর্যের আলোকরশ্মি বা কিরণস্বরূপ। ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে ঐশী সমর্থন যেভাবে লাভবান হয় তা হলো, এর ফলে সবাই জানতে পারে যে, তা সত্যিকার অর্থে বিশেষ ঐশী সমর্থন, সামান্য কোন দৈববিষয় নয় এবং তাকে ভাগ্য ও দৈব কোনো ঘটনা হিসেবেও চালিয়ে দেয়া যেতে পারে না। ঐশী সমর্থনের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণীর যা লাভ হয় তা হলো, সেই মহান সম্পর্কের কারণে এর সম্মান বৃদ্ধি পায় আর এতে একটি অনন্য বিশেষত্ব সৃষ্টি হয় যা খোদার সাহায্যপ্রাপ্তরা ছাড়া অন্যদের মাঝে দেখা যায় না। এই বিশেষত্বই সাধারণ ভবিষ্যদ্বাণী ও এই অসাধারণ ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর মাঝে পার্থক্যরূপে পরিগণিত হয়। সারকথা হলো, এই জাতির মাহাত্ম্য ও সম্মানের ধারণা পাওয়ার জন্য ভবিষ্যদ্বাণী ও পরম মার্গের ঐশী সাহায্য ও সমর্থনের মাঝে যে যোগসূত্র রয়েছে তা দৃষ্টিতে রাখা বাঞ্ছনীয়। কেননা এই যোগসূত্র অন্যদের ভবিষ্যদ্বাণীতে থাকা অসম্ভব ও সুদূর পরাহত। এছাড়া তাদের ভবিষ্যদ্বাণীতে এমন মারাত্মক ভ্রান্তি সামনে আসে যার মাধ্যমে তাদের সব লাঞ্ছনা প্রকাশ পেয়ে যায়, কিন্তু যারা খোদার লোক হয়ে থাকে তাদের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যদ্বাণী সদা সত্যের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে থাকে। এছাড়া সেসকল আশিসময় ভবিষ্যদ্বাণী বিস্ময়কর প্রকৃতির অভাবনীয় ঐশী সমর্থনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

খোদা স্বীয় বান্দাদের কর্মের ক্ষেত্রে নিজেই তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আশ্চর্যজনকভাবে সাহায্য করেন আর প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য, সদা তাদের সাহায্যে সোচ্চার থাকেন। তাদের ক্ষেত্রে তাঁর রীতি হলো, তাদেরকে স্বীয় সাহায্য ও সমর্থনের সংবাদ সম্পর্কে ঘটনা ঘটার পূর্বেই অবহিত করেন। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সময় স্বীয় জ্যোতির্ময় বাণীর মাধ্যমে তাদের আশ্বস্ত করেন ও নিশ্চয়তা প্রদান করেন আর এরপর এমন বিস্ময়করভাবে তাদের সাহায্য করেন যা চিন্তা ও ধারণার বাইরে। যে ব্যক্তি তাঁদের সাহচর্যে থেকে এসকল বিষয়কে গভীর দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে আর পরিষ্কার ও পবিত্র দৃষ্টিতে এসবের মাহাত্ম্য ও সম্মান সম্পর্কে চিন্তা করে তাকে অবলীলায় ও নিশ্চিতভাবে স্বীকার করতে হয় যে, এই ব্যক্তি খোদার সমর্থনপ্রাপ্ত আর তার প্রতি এক-অদ্বিতীয় খোদার বিশেষ দৃষ্টি রয়েছে। কেননা এটি সর্বজনবিদিত যে, যেখানে এক-আধবার নয় বরং বহুবার কোনো মানুষের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে যে, সে কোনো সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ঘটনা ঘটার পূর্বেই পায় আর স্বচক্ষে সেই সমর্থন প্রকাশ

পেতে দেখে, তা সত্ত্বেও কোনো মানুষ এতটা পাগল বা উন্মাদ নয় যে, এসকল সত্য ভবিষ্যদ্বাণী ও জোরালো সমর্থনে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনে সক্ষম হবে না। অবশ্য যদি সীমাতিরিক্ত বিদ্বেষ ও বিশ্বাসহীনতাবশত কোন চাক্ষুষ ঘটনা জেনেশুনে অস্বীকার করে তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার হৃদয় অস্বীকার করতে পারবে না আর সদা তাকে অভিযুক্ত করবে যে, তুই দুষ্কৃতিপরায়ণ ও বিদ্রোহী। এখন সত্যান্বেষীদের উপকারার্থে সদ্যপ্রাপ্ত কিছু দিব্যদর্শন ও এলহাম লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে আর খোদা তা'লা যদি চান তাহলে এভাবেই বিভিন্ন সময়ে এই অধম বান্দার সামনে খোদার পক্ষ থেকে যা প্রকাশ করা হবে তার উল্লেখ এ গ্রন্থে অব্যাহত রাখবে, ইল্লা মাশাআল্লাহ্। উদ্দেশ্য হলো, বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃত সন্ধানীরা যেন সত্যিই উপকৃত হয়, তাদের সংকীর্ণতা দূর হয় আর তাদের হৃদয় থেকে সেসব পর্দা উঠে যায় যে পর্দার কারণে তাদের মনোবল অতি হীন আর তাদের ধ্যানধারণা ক্রমশ তমসাচ্ছন্ন হয়ে উঠছে। এখানে আমরা পুনরায় একথাও প্রকাশ করছি যে, এগুলো এমন নয় যার প্রমাণ উপস্থাপনে এই অধম অক্ষম বা যার প্রমাণ হিসেবে কেবল স্বধর্মীদেরই উপস্থাপন করা হবে, বরং এগুলো সেসব কথা যার সত্যতা অতি স্পষ্ট এবং যার সত্যতা সম্পর্কে ধর্মবিরোধীরাও সাক্ষী আর যেসবের সত্যতা সম্পর্কে তারাও সাক্ষ্য দিতে পারে যারা ধর্মীয় দিক থেকে আমাদের শত্রু। এমন ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ হল, প্রকৃতপক্ষে যারা সত্য ও সঠিক পথের সন্ধানী তাদের সামনে যেন অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেয়ে যায় যে, সমূহ কল্যাণ ও আলো ইসলামেই সীমাবদ্ধ এবং ইসলামের মাঝেই নিহিত আর যেন এযুগের নাস্তিক প্রজন্মের বিরুদ্ধে খোদার অকাট্য যুক্তি পূর্ণতা লাভ করে।

অধিকন্তু তাদের স্বভাবগত শয়তানি যেন সকল ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সামনে প্রকাশ পেয়ে যায়, যারা অমানিশাকে ভালোবেসে ও আলোর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর সুমহান মর্যাদাকে অস্বীকার করে, সেই মহাসম্মানিত মানবের পদমর্যাদা সম্পর্কে নোংরা কথাবার্তা বলে বেড়ায় এবং সেই সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের প্রতি অন্যায় অপবাদ আরোপ করে। চরম অভ্যন্তরীণ অন্ধত্ব ও একান্ত ঈমানহীনতার কারণে তারা এ সম্পর্কে অনবহিত যে, পৃথিবীতে একমাত্র উৎকর্ষপ্রাপ্ত মানব তিনিই এসেছেন যার জ্যোতি সূর্যের ন্যায় সকল যুগে স্বীয় কিরণ বিচ্ছুরিত করে আসছে আর চিরকাল করে যাবে।

অধিকন্তু এসকল সত্য রচনাবলীর কল্যাণে ইসলামের মহিমা স্বয়ং যেন বিরোধীদের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে যায় আর যে সত্যিকার অর্থে সন্ধানী তার জন্য প্রমাণের রাস্তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এছাড়া যে কিছুটা বুদ্ধিমান বলে অহংকার করে তার সেই অহংকার যেন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। সেসকল দিব্যদর্শন ও এলহাম এজন্যও লেখা হচ্ছে যাতে করে এর ফলে মু'মিনদের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তাদের হৃদয় দৃঢ়তা ও প্রশান্তি বোধ করে। একইভাবে তারা যেন এই বাস্তব সত্যকে দৃঢ়ভাবে অনুধাবন করতে পারে যে, কেবল ইসলাম ধর্মই হলো, সিরাতে মুস্তাকীম বা সোজা-সঠিক পথ। "এখন আকাশের নীচে কেবল একজনই নবী এবং একটিই ঐশী গ্রন্থ বিদ্যমান, অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), যিনি সকল নবীর চেয়ে বড় মর্যাদাশীল ও শ্রেষ্ঠ, আর সকল রসূলের চেয়ে অধিক কামেল এবং যিনি হলেন খাতামুন্নাবীঈন ও শ্রেষ্ঠ মানব। যাঁর অনুসরণে খোদাপ্রাপ্তি ঘটে আর নিকষ আধার দূর হয় অধিকন্তু ইহজগতেই সত্যিকার মুক্তির লক্ষণাবলী প্রকাশিত হয়।

এছাড়া খাঁটি ও পরিপূর্ণ পথনির্দেশনা ও পবিত্রকরণ শক্তিতে ভরপুর কুরআন শরীফ যার মাধ্যমে ঐশী জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয় এবং মানবীয় দুর্বলতা থেকে মন পবিত্র হয় আর মানুষ অজ্ঞতা, ঔদাসীন্য ও সন্দেহের আবরণ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে হাক্কুল ইয়াকীন (বা অভিজ্ঞতামূলক বিশ্বাস)-এর পর্যায়ে উপনীত হয়। এছাড়া এসকল দিব্যদর্শন এবং এলহাম লেখা ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তা প্রমাণের একটি উদ্দেশ্য হল, স্থায়ীভাবে এক শক্তিশালী প্রমাণ যেন মুসলমানদের হস্তগত হয় এবং হীন, খোদাভীতিশূন্য ও পঙ্কিল হৃদয়ের মানুষ যারা মুসলমানদের সাথে অন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অহংকার করে তাদের পরাজিত ও নির্বাক হওয়ার বিষয়টি মানুষের সামনে চিরতরে স্পষ্ট হয়ে যায়। আজকাল ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তির এক প্রকার বিষাক্ত যে বাতাস বইছে, এর বিষক্রিয়া থেকে আধুনিক যুগের সত্যান্বেষী ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন নিরাপদ থাকে, কেননা এসব এলহামে এমন অনেক কথা আসবে যা প্রকাশ পাওয়া ভবিষ্যতের ওপর নির্ভর করে। অতএব এ যুগ যখন কেটে যাবে আর নতুন এক বিশ্ব পর্দার অন্তরাল হতে দৃশ্যপটে এসে স্বীয় চেহারা প্রদর্শন করবে এবং সেসকল কথার সত্যতা যা এ গ্রন্থে উল্লেখ আছে নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করবে তখন তাদের ঈমানের দৃঢ়তার

জন্য এসব ভবিষ্যদ্বাণী অনেক কাজে দিবে, ইনশাআল্লাহ্। সুতরাং মহাসম্মানিত খোদার পক্ষ থেকে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশিত হয়েছে তার কিছু এখানে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

সেগুলোর একটি হলো, কিছুদিন পূর্বেকার কথা, একবার আমার টাকার খুবই প্রয়োজন দেখা দেয়, যে প্রয়োজনের কথা আমাদের স্থানীয় আর্য বন্ধুদের ভালোভাবে জানা ছিল। একথাও তাদের ভালো করে জানা ছিল যে, বাহ্যত এমন কোন উপায় উপকরণও নেই যার ওপর নির্ভর করা যায়। বরং এ বিষয়টি তারা ব্যক্তিগতভাবে জানত আর তারা এ সম্পর্কে সাক্ষ্যও দিতে পারবে। যেহেতু তারা এমন কঠিন পরিস্থিতি ও সমস্যা সমাধানের উপকরণ না থাকা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত ছিল তাই বাধ্য হয়ে হৃদয়ে এই গভীর প্রেরণা জাগে যে, সমস্যা সমাধানের জন্য এক-অদ্বিতীয় খোদার দরবারে দোয়া করা উচিত, দোয়া গ্রহণীয়তার নিদর্শনস্বরূপ যেন সমস্যার সমাধান হয় আর বিরোধীদের জন্য ঐশী সাহায্যের নিদর্শন প্রকাশ পায়। অর্থাৎ যেন এমন নিদর্শন প্রকাশ পায় যার সত্যতার সাক্ষ্য তারা দিতে পারে। সুতরাং সেদিনই খোদা তা'লার কাছে নিদর্শনস্বরূপ আর্থিক সাহায্য সম্পর্কে সংবাদ দেয়ার দোয়া করা হয়। তখন এলহাম হয় যে,

دس دن کے بعد مَیں موج دکھاتا ہوں۔

اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰہِ قَرِیْبٌ۔ فی شایل مقیاس۔

Then you will go to Amritsar.

তখন তুমি অমৃতসর যাবে। অর্থাৎ দশ দিন পর রুপি আসবে।

খোদার সাহায্য সন্নিকটে। প্রসবের পূর্বে উষ্ট্রী যেভাবে লেজ উঁচিয়ে থাকে, যার ফলে বোঝা যায় যে, প্রসবের সময় সন্নিকট, অনুরূপভাবে খোদার সাহায্যও সন্নিকটে। এরপর ইংরেজী বাক্যে বলা হয়েছে, ১০ দিন পর যখন রুপি আসবে তখন তুমি অমৃতসরও যাবে। অতএব যেভাবে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীতে বলেছেন হুবহু সেভাবেই হিন্দু, অর্থাৎ আর্যদের সামনে ঘটনা ঘটেছে। অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে দশ দিন পর্যন্ত একটি কানাকড়িও আসে নি কিন্তু ১০ দিন পর, অর্থাৎ একাদশতম দিনে রাওয়ালপিণ্ডির সেটেলমেন্ট সুপারিনটেনডেন্ট মুহাম্মদ আফযাল খান সাহেব একশত দশ রুপি পাঠালেন আর অন্য একস্থান হতে আরো ২০ রুপি আসে। এরপর একাধারে রুপি

আসার ধারা এমনভাবে সূচিত হয় যা আমি আশাও করি নি। দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর যেদিন আফযাল খান প্রমুখদের প্রেরিত রুপি এলো আর অমৃতসরও যেতে হলো, কেননা অমৃতসরের নিম্ন আদালত হতে একটি সাক্ষ্য প্রদানের জন্য এ অধমের নামে সেদিনই একটি সমন আসে। অতএব এটি সেই মহান ভবিষ্যদ্বাণী যার খুঁটিনাটি সম্পর্কে এখানকার কিছু আর্য ভালোভাবে অবহিত আর তারা ভালোভাবেই জানে যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী করার পূর্বে একান্ত প্রয়োজন দেখা দেয়ার কারণে দোয়া করা হয়। সেই দোয়া গৃহীত হওয়া এবং দশ দিন পর রুপি আসার সংবাদ প্রদান আর একইসাথে রুপি আসার পর অমৃতসর যাওয়ার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া, এর সবকটি বাস্তবে সংঘটিত সত্য ঘটনা। তাদের চোখের সামনে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার বিষয়টি তাদের জানাও আছে।

যদিও তারা অন্ধকারের কারণে অস্বীকারের নোংরামী ও শত্রুতা হতে মুক্ত নয় আর নিজেদের অন্যান্য ভাইদের ন্যায় ইসলামের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষে অন্ধ অধিকন্তু জাগতিকতার মোহে আচ্ছন্ন, সত্য ও সততা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে উদাসীন, তবুও সাক্ষ্য দেয়ার সময় তাদের শপথ নেয়া হলে কসম খেয়ে সত্য বলা হতে তারা মুখ ফেরাতে পারবে না। খোদাকে ভয় না করলেও অসম্মান, লাঞ্ছনা ও কসমের পরিণতিকে ভয় করে অন্তত আবশ্যকীয় সত্য সাক্ষ্য প্রদান করবে। সেসবের একটি হলো, কসূর নিবাসী মৌলভী আবদুল্লাহ্ গোলাম আলী সাহেব পাদটীকা ২-এ যার স্মৃতিচারণ করা হয়েছে তিনি ওলীউল্লাহ্দের প্রাপ্ত এলহাম সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ পোষণ করতেন আর এই সন্দেহ সরাসরি তার বক্তৃতা হতে নয় বরং তার পুস্তিকার কতক উদ্ধৃতি হতে প্রকাশ পেত। কিছুদিন হয় নূর আহমদ নামে অমৃতসর নিবাসী তার শিষ্যদের একজন, যিনি হাফেয এবং হাজীও বটে, বরং কিছুটা আরবীও হয়ত জানেন এবং কুরআন সম্পর্কে বক্তৃতাও করে বেড়ান, ঘটনাচক্রে দরবেশবেশে ঘুরতে ঘুরতে তিনি এখানে চলে আসেন। এলহামকে অস্বীকারের ক্ষেত্রে তিনি মৌলভী সাহেব থেকে কিছুটা এগিয়েই আছেন বলে মনে হয়। ব্রাহ্মসমাজীদের ন্যায় কেবল মানবীয় ধ্যানধারণার নাম তিনি এলহাম রাখতেন। তিনি যেহেতু আমাদের কাছে অবস্থান করেন আর এলহাম সম্পর্কে এই ভ্রান্ত ধারণা তিনি নিজেই এ অধমের সামনে দাবি হিসেবে প্রকাশ করেন, তাই আমি খুবই ব্যথিত হই। যৌক্তিকভাবে যদিও বোঝানো হয়েছে, কিন্তু

কোনো কাজ হয় নি। অবশেষে খোদার দিকে বিশেষ মনোসংযোগ পর্যন্ত বিষয় গড়ায়। ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই তাঁকে অবহিত করা হয় যে, খোদার দরবারে দোয়া করা হবে। সেই দোয়া গৃহীত হওয়ার ফলে খোদা তা'লা এমন কোন ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করবেন যা তুমি স্বচক্ষে দেখবে– এটি অসম্ভব নয়। এ উদ্দেশ্যে সেই রাতে সর্বশক্তিমান খোদার দরবারে দোয়া করা হয়েছে। প্রত্যুষে দিব্যদর্শনে একটি পত্র দেখানো হয়েছে যা একব্যক্তি ডাকযোগে পাঠিয়েছেন। এই পত্রে ইংরেজী ভাষায় লেখা আছে I am quareller আর আরবীতে লেখা আছে– هٰذا شاهد نَزّاغ পত্রের লেখকের বাক্যের আদলে তা আমার প্রতি এলকা করা হয়েছে, এরপর সে অবস্থা কেটে যায়। এই অধম যেহেতু ইংরেজী ভাষা সম্পর্কে খুব একটা অবগত নয় তাই প্রভাতে প্রথমে এই কাশফ ও এলহাম সম্পর্কে মিয়া নূর আহমদ সাহেবকে অবহিত করে এবং আগত সেই পত্র সম্পর্কে অবহিত করে, তখনই একজন ইংরেজী জানা লোকের কাছে সেই ইংরেজী বাক্যের অর্থ জিজ্ঞেস করার পর জানা যায় যে, এর অর্থ হলো– 'আমি ঝগড়াটে'।

সুতরাং এই সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে একথা জানা গেছে যে, কোন বিবাদ সম্পর্কে এক পত্র আসতে যাচ্ছে। আর লেখকের পক্ষ থেকে লেখা দ্বিতীয় বাক্য হিসেবে দেখেছিলাম, যার এই অর্থ প্রকাশ পায় যে, পত্রের লেখক কোনো মোকদ্দমার সাক্ষ্য সম্পর্কে সেই পত্র লিখেছে। সেদিন হাফেয নূর আহমদ সাহেব প্রবল বৃষ্টির কারণে অমৃতসর যেতে পারেন নি। সত্যিকার অর্থে একটি স্বর্গীয় কারণে তার বাধাগ্রস্ত হওয়া দোয়া গৃহীত হওয়ারই একটি সংবাদ ছিল, তার জন্য যেভাবে খোদার কাছে নিবেদন করা হয়েছিল সেভাবে যেন তিনি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারেন। সারকথা হলো, এই পুরো ভবিষ্যদ্বাণীর সংবাদ তাকে শুনিয়ে দেয়া হয়েছে। সন্ধ্যায় তার সামনে অমৃতসর থেকে পাদরি রজব আলী সাহেবের একটি রেজিস্ট্রি পত্র আসে, যিনি সফীরে হিন্দ ছাপাখানার মালিক ও ব্যবস্থাপক ছিলেন। যা থেকে বুঝা যায় যে, পাদরি সাহেব আমার লিপিকারের বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতে নালিশ করেছেন যিনি এ গ্রন্থের লিপিকারও বটে আর এই অধমকে একটি ঘটনার সাক্ষী নির্ধারণ করেছেন আর একইসাথে একটি সরকারি সমনও আসে। সেই পত্র আসার পর সেই এলহামী বাক্য– هٰذا شاهد نَزّاغ যার অর্থ হলো 'এই সাক্ষী ধ্বংসাত্মক হবে'। এর এই অর্থ বোধগম্য হয় যে, সফীরে হিন্দ

ছাপাখানার ব্যবস্থাপকের হৃদয়ে এই দৃঢ় বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, এই অধমের সাক্ষ্য যা সঠিক ও বাস্তব ঘটনাসম্মত হবে তা দৃঢ়তা, সত্যতা আর নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান হওয়ার নিরিখে দ্বিতীয় পক্ষের জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে। এই মানসে উল্লিখিত ব্যবস্থাপক সাহেব এই অধমকে সাক্ষ্য দেয়ার কষ্ট দিয়েছেন এবং সমন জারি করিয়েছেন। ঘটনাক্রমে যা ঘটেছে তা হলো, যেদিন এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে আর অমৃতসরের উদ্দেশ্যে সফর করতে হয়েছে সেদিনই প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার দিন ছিল। সুতরাং প্রথম ভবিষ্যদ্বাণীও মিয়া নূর আহমদ সাহেবের সামনে পূর্ণ হয়েছে, অর্থাৎ সেই দিনই রুপি এসে যায় যা দশ দিনের পরের দিন ছিল আর অমৃতসরও যেতে হয়েছিল। অতএব সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য।

সেগুলোর আরেকটি হলো, একবার ফজরের সময় এলহাম হলো, হাজী আরবাব মুহাম্মদ লস্কর খানের নিকটাত্মীয়ের রুপি আসছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীও রীতি অনুসারে কতক আর্যকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে আর এই সিদ্ধান্ত হয় যে, তাদের মধ্য হতে কেউ ডাকের সময় হলে ডাকঘরে যাবে। সে মোতাবেক মলাওয়ামল নামের এক আর্য তখন ডাকঘরে যায় আর এই সংবাদ আনে যে, মর্দানের হুতি হতে দশ রুপি এসেছে আর সাথে একটি পত্রও আনে যাতে লেখা ছিল যে, এই দশ রুপি আরবাব সরওয়ার খান পাঠিয়েছেন। যেহেতু আরবাব শব্দের মাধ্যমে জাতিগত ঐক্যের অর্থ বুঝানো হয় তাই সেই সকল আর্যদের বলা হয়েছে যে, আরবাব শব্দে উভয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা ও পূর্ণতার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু তাদের কেউ কেউ একথা গ্রহণ করে নি বরং বলে, একই জাতিভুক্ত হওয়া ভিন্ন জিনিস এবং নিকটাত্মীয়তা ভিন্ন বিষয় আর এই অস্বীকার করা নিয়ে চরম নাছোড় মনোবৃত্তি প্রদর্শন করে। তাদের বাড়াবাড়ির ফলে বাধ্য হয়ে পত্র লিখতে হলো আর সেখান থেকে, অর্থাৎ মর্দানের হুতি হতে এক বন্ধু মুনশী এলাহী বক্স সাহেব যিনি সেখানে একাউনটেন্ট ছিলেন, বেশ কয়েকদিন পর পত্রের উত্তরে লিখেছেন যে, আরবাব সরওয়ার খান হলেন আরবাব মোহাম্মদ লস্কর খানের পুত্র। সেই পত্র আসার পর সব বিরোধী নির্বাক ও বিফল মনোরথ হয়ে যায়। অতএব সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য।

সেসবের আরেকটি হলো, ১৮৮৩ সনে এপ্রিলের এক প্রত্যুষে জাগ্রত অবস্থায় ঝিলাম হতে রুপি আসার সংবাদ দেয়া হয়। এ বিষয়ে এখানকার আর্যরা ভালোভাবে অবহিত ছিল, যাদের কেউ কেউ স্বয়ং ডাকঘরে যেত আর সংবাদ

নিয়ে আসত। এই রুপি পাঠানো সম্পর্কে ঝিলাম হতে কোনো পত্র আসে নি। যেহেতু এই অধমের পূর্ব থেকেই নেয়া ব্যবস্থানুসারে ডাকযোগে যেসকল পত্র ইত্যাদি আসত তা কোন আর্য ব্যক্তি ডাকঘর হতে নিয়ে আসত আর তারা প্রতিদিনের সব বিষয় অবহিত থাকত; এখনো ডাকঘরের ডাকমুন্সী একজন হিন্দুই। যখন এই এলহাম হয় সেযুগে শ্যামলাল নামে এক পণ্ডিতের পুত্র যে নাগরি ও ফার্সী উভয় ভাষায় লিখতে জানত, দিনপঞ্জিকা লিপিকার হিসেবে নিযুক্ত ছিল আর অদৃশ্য কিছু সংবাদ যা প্রকাশ পেত তা ঘটার পূর্বেই নাগরি ও ফার্সী ভাষায় তার হাতে লিখিয়ে রাখা হতো এবং এর উপরিভাগে উপরোক্ত শ্যামলালের স্বাক্ষর নেয়া হতো। অনুরূপভাবে, এই ভবিষ্যদ্বাণীও তার হাতে লেখানো হয় আর তখন কয়েকজন আর্যকেও খবর দেয়া হয়। ৫ দিন না পেরোতেই ঝিলাম থেকে ৪৫ রুপির মানিঅর্ডার এসে যায়। হিসাব করে দেখা গেছে যে, মানিঅর্ডার ঠিক সেদিনই করা হয়েছে যেদিন অদৃশ্যে জ্ঞাত খোদা রুপি রওয়ানা হওয়ার সংবাদ দিয়েছেন। আর এই ভবিষ্যদ্বাণীও ঠিক সেভাবেই পূর্ণ হয়েছে, যার ফলে বিরোধীদের সামনে সুস্পষ্টভাবে এর সত্যতা প্রকাশ পেয়ে গেছে আর এটি না মেনে তাদের কোনো উপায়ও ছিল না। কেননা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তারা ভালোভাবেই জানত যে, এই পরিমাণ রুপি এমাসে ঝিলাম থেকে প্রেরিত হওয়ার কোনো চিহ্ন বা লক্ষণ ছিল না আর এর সংবাদ আগাম প্রদানের নিমিত্তে পূর্বে কোনো পত্রও আসে নি। এর সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য।

নিদর্শনাবলীর আরেকটি ঘটনা হলো, কিছুকাল পূর্বে স্বপ্নে দেখলাম যে, হায়দ্রাবাদ হতে নবাব ইকবালুদ্দৌলা সাহেবের পক্ষ থেকে পত্র এসেছে আর তাতে কিছু রুপি পাঠানোর প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এই স্বপ্নও সেই হিন্দুর হাতে যথারীতি উপরোক্ত দিন-পঞ্জিকায় লেখানো হয়েছে আর বেশ কিছু আর্যকে অবহিত করা হয়েছে। এর অল্প কিছুদিন পর হায়দ্রাবাদ হতে পত্র আসে যে, নবাব সাহেব একশত রুপি পাঠিয়েছেন। সুতরাং এজন্য সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য।

এমনই আরেকটি (নিদর্শন) হলো, একবন্ধু বড় সমস্যার সময় লিখেছেন যে, তার এক আত্মীয় বিপজ্জনক কোনো মামলায় জড়িয়ে পড়েছেন আর মুক্তির কোনো উপায় চোখে পড়ছে না এবং নিস্তারের কোনো পথও দেখা যাচ্ছে না। সেই বন্ধু এই বেদনাদায়ক ঘটনা লিখে দোয়ার অনুরোধ করেছেন। যেহেতু

তার অদৃষ্টে মঙ্গল ছিল আর তকদীর টলে যাওয়ার ছিল, তাই সে রাতে এমন অনুকূল সময় ও পরিস্থিতি হাতে আসে যা দীর্ঘদিন পর্যন্ত দেখা যায় নি। দোয়া করা হয়েছে আর সেই পরিষ্কার ও অনুকূল ক্ষণ দোয়া গৃহীত হওয়ার আশা জাগিয়েছিল। অতএব তদনুসারে দোয়া গৃহীত হওয়ার এই লক্ষণ সম্পর্কে এক আর্যকে অবহিত করা হয়। এর কয়েকদিন পর সংবাদ আসে যে, মামলার বাদী আকস্মিকভাবে মারা গেছে আর এভাবে গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তি মুক্তি লাভ করে। সুতরাং এর সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য।

এছাড়া কখনো কখনো অন্য কোনো ভাষায় এলহাম হওয়া যা সম্পর্কে এই অধম সম্পূর্ণভাবে অনবহিত, অধিকন্তু সে সকল এলহাম কোনো ভবিষ্যদ্বাণী সংবলিত হওয়া বিরল বিস্ময়কর বিষয়াদির অন্তর্গত যা সর্বশক্তিমান খোদার ব্যাপক শক্তির প্রমাণ বহন করে। যদিও অপরিচিত ভাষার সকল শব্দ সংরক্ষিত থাকে না আর অনেক সময় এলহামের দ্রুততা এবং ভাষা ও উচ্চারণের সাথে অনবহিতি ও অপরিচিতির কারণে কিছুটা প্রভাব ও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে অধিকাংশ পরিষ্কার ও হাল্কা বাক্যাবলীতে অনুরূপ পার্থক্যের প্রভাব খুব সামান্যই পড়ে। আরেকটি অভিজ্ঞতা হল, এলকা দ্রুত হওয়ার কারণে কোনো কোনো শব্দ মনে থাকে না, কিন্তু কোনো বাক্য যখন দু'বার বা তিনবার এলকা হয় তখন তা ভালোভাবে মনে থাকে। এলহাম করার সময় সর্বশক্তিমান সেই সত্তা স্বীয় সেই ক্ষমতার অধীনে কাজ করেন যাতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উপকরণের কোনো মিশ্রণ থাকে না। তখন জিহ্বা খোদার হাতের একটি ইনস্টুমেন্ট বা যন্ত্রবিশেষ হয়ে থাকে। যেভাবে বা যেদিকে তিনি চান এই যন্ত্রকে, অর্থাৎ জিহ্বাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে থাকেন বা পরিচালিত করেন। আর প্রায়শ এটিই হয় যে, শব্দ দৃঢ়তার সাথে এবং দ্রুতলয়ে নির্গত হতে থাকে। কখনো কখনো এমনও হয় যেভাবে কেউ হাল্কা পায়ে ও গর্বের সাথে পদচারণা করে থাকে এক পদক্ষেপ নেয়ার পর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় পদক্ষেপ নেয়, অর্থাৎ পদসঞ্চালনার সময় নিজের পছন্দের ভঙ্গি প্রকাশ করে থাকে। এই উভয় রীতি অবলম্বনে নিহিত যুক্তি ও প্রজ্ঞা হলো, প্রবৃত্তিগত ও শয়তানি ধ্যানধারণার বিপরীতে ঐশী এলহাম যেন পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য পরিগ্রহ করতে পারে আর সম্মানিত খোদা তা'লার এলহাম স্বীয় জালালী (প্রতাপপূর্ণ) ও জামালী (সৌন্দর্যময়) কল্যাণের সুবাদে তাৎক্ষণিকভাবে যেন চেনা যায়। এক সময়ের কথা মনে পড়ে গেল, ইংরেজি ভাষায় প্রথমে এই এলহাম হয়

যে, ‘I love you’ অর্থাৎ আমি তোমাকে ভালোবাসি এরপর আবার এলহাম হয় যে, ‘I am with you’ অর্থাৎ আমি তোমার সাথে আছি পুনরায় এলহাম হয় ‘I shall help you’ অর্থাৎ আমি তোমাকে সাহায্য করব। আবার এলহাম হয় ‘I can wait, I will do’ (আমি অপেক্ষা করতে পারি এবং আমি করবো) অর্থাৎ আমি যা চাই করতে পারি। এরপর সজোরে এই এলহাম হয় যে, ‘We can wait, we will do’, যাতে শরীর কেঁপে ওঠে, অর্থাৎ আমরা যা চাই করতে পারি আর তখন গলার স্বর ও উচ্চারণ এমন মনে হলো যেন কোনো ইংরেজ শিয়রে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। ভীতিপ্রদ হওয়া সত্ত্বেও এতে একপ্রকার আনন্দঘন প্রশান্তি ছিল, যার ফলে অর্থ উদ্‌ঘাটনের পূর্বেই অন্তরে একপ্রকার প্রশান্তি ও স্বস্তি লাভ হয় আর ইংরেজি ভাষার এই এলহাম প্রায়ই হতো। একবার একজন ইংরেজি পড়ুয়া ছাত্র দেখা করতে আসে। তার সামনে এই এলহাম হয় যে, ‘This is my enemy’ অর্থাৎ এ আমার শত্রু, যদিও বোঝা গেছে যে, এই এলহাম এরই সম্পর্কে কিন্তু তারই কাছে এর অর্থও জিজ্ঞেস করা হয় আর অবশেষে সে এমন মানুষই প্রমাণিত হয় এবং তার ভেতর বিভিন্ন প্রকার নোংরামি দেখতে পাওয়া যায়।

একবার প্রভাতে দিব্যদর্শনে কয়েকটি ছাপানো পৃষ্ঠা দেখানো হয়েছে যা ডাকঘর হতে এসেছে। এর শেষের দিকে লেখা ছিল ‘I am by Issa’ অর্থাৎ আমি ঈসার সাথে আছি। সেই লেখাটি কোন ইংরেজি জানা লোককে জিজ্ঞেস করতে দুজন হিন্দু আর্যকে বলা হয়েছে আর এর এই অর্থ বোঝা গেছে যে, খ্রিষ্টানদের রীতি ও অভ্যাস অনুসারে কোনো খ্রিষ্টান ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কিছু আপত্তি ছাপিয়ে পাঠাবে। এ অনুসারে সেদিনই ডাক আসার সময় এক আর্যকে ডাকঘরে পাঠানো হয়। সে কয়েকটি ছাপানো পৃষ্ঠা আনে যাতে এক দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি খ্রিষ্টানদের রীতি অনুসারে বৃথা আপত্তি লিপিবদ্ধ করেছে। অনুসন্ধানের দাবি রাখে এমন একটি বিষয়ে একবার স্বপ্নে এই অধমের হাতে একটি রৌপ্য মুদ্রা দেয়া হয় যা ছিল বাদামী বর্ণের আর তাতে দুটো লাইন মুদ্রিত ছিল। প্রথম লাইনে ইংরেজি বাক্য ‘Yes, I am happy’ লেখা ছিল। এরপর পার্থক্যসূচক লাইন টেনে দ্বিতীয় লাইনে যা কিছু লেখা হয়েছে তা ছিল সেই প্রথম লাইনেরই অনুবাদ, অর্থাৎ লেখা ছিল– হ্যাঁ, আমি সন্তুষ্ট। একবার কিছুটা দুঃখ ও বেদনাঘন সময় আশার আশংকা দেখা দেয়, তখন দিব্যদর্শনে এক টুকরো কাগজে ইংরেজি ভাষায় ‘Life of pain’

অর্থাৎ 'দুঃখের জীবন' বাক্য লিখিত দেখানো হয়েছে। একবার কিছু বিরোধী সম্পর্কে, যারা শত্রুতাবশত অনর্থক কুরআন শরীফের অসম্মান করেছিল আর ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে সত্য-সুদৃঢ় ধর্ম ইসলামের ওপর অনর্থক আপত্তি ও অপলাপ করেছিল যার কোন যৌক্তিকতা নেই, তখন এই দুটি বাক্য ইংরেজিতে এলহাম হয় যে, God is coming by his armee, He is with you to kill enemy। অর্থাৎ খোদা তা'লা যুক্তিপ্রমাণের বাহিনী নিয়ে ছুটে আসছেন, তিনি শত্রুকে পরাজিত ও ধ্বংস করার জন্য তোমার সাথে আছেন। এভাবে আরো অনেক বাক্য আছে যার কতক মনে আছে আর কিছু ভুলে গিয়েছি, কিন্তু সবচেয়ে বেশি এলহাম হয়ে থাকে আরবি ভাষায়। বিশেষ করে কুরআনের আয়াতের ভাষায় অজস্র ও লাগাতার (এলহাম) হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু আরবি এলহাম অনুবাদসহ লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে যা কতক অসাধারণ ভবিষ্যদ্বাণী ও ঐশী অনুগ্রহের সাথে সম্পর্ক রাখে, যেন খোদার ইচ্ছায় এর মাধ্যমে নিষ্ঠাবান সন্ধানীর উপকার হয়। আর বিরুদ্ধবাদীরাও যেন জানতে পারে যে, খোদার কৃপাদৃষ্টি যে জাতির প্রতি থাকে আর যারা সঠিক পথে থাকে খোদা তা'লা কীভাবে তাদের সাথে স্বীয় বাক্যালাপ ও কথোপকথনে স্নেহসুলভ আচরণ করেন আর কীভাবে সেসব কৃপারাজি সম্পর্কে আগাম সংবাদ দিয়ে থাকেন যা তিনি নিছক স্নেহবশত যথাসময়ের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন। আর সেসকল এলহাম নিম্নরূপ:

بورکت یا احمد وکان ما بارك الله فیك حقًّا فیك۔

অর্থাৎ হে আহমদ! তোমাকে কল্যাণমণ্ডিত করা হয়েছে। খোদা তোমাতে যে কল্যাণরাজি রেখেছেন তা যথার্থভাবে রেখেছেন।

شانك عجیب و اجرك قریب۔

অর্থাৎ তোমার মহিমা বিস্ময়কর আর তোমার প্রতিদান সন্নিকটে।

انی راض منك۔ انی رافعك الیَّ۔ الارض والسماء معك کما ھو معی۔

আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। আমি তোমাকে আমার পানে উঠাতে চলেছি (পরম আধ্যাত্মিক উন্নতি, অনুবাদক)। স্বর্গমর্ত্য তোমার সাথে সেভাবে রয়েছে যেভাবে আছে আমার সাথে। একবচন বিশিষ্ট সর্বনাম হুয়া–مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ এর ব্যাখ্যায় ব্যবহার হয়েছে আর এসব বাক্যের সারকথা হলো খোদার স্নেহ ও কল্যাণরাজি যা হযরত খাইরুর রুসুলর অনুসরণের কল্যাণে সকল মু'মিনের

লাভ হয়ে থাকে আর সত্যিকার অর্থে এসকল কৃপার সত্যিকার কৃতিত্ব মহানবী (সা.)-এরই প্রাপ্য আর অন্য সবাই তাঁরই কল্যাণে এতে ধন্য হয়। একথা সর্বত্র স্মরণ রাখা উচিত যে, এলহামে যে প্রশংসা ও স্তুতি কোন মু'মিনের স্বপক্ষে করা হয়ে থাকে তা সত্যিকার অর্থে মহানবী (সা.)-এরই প্রশংসা হয়ে থাকে আর সেই মু'মিন অনুসরণের মান ও মাত্রা অনুযায়ী সেই প্রশংসা হতে অংশ লাভ করে। আর তাও কেবল খোদা তা'লার স্নেহ ও অনুগ্রহ হিসেবে, নিজের কোন যোগ্যতা ও গুণবলে নয়। এরপর বলেন–

انت وجیه فی حضرتی اخترتك لنفسی۔

তুমি আমার দরবারে সম্মানিত। আমি নিজের জন্য তোমাকে বেছে নিয়েছি।

انت منی بمنزلة توحیدی و تفریدی فحان ان تعان و تعرف بین الناس۔

তুমি আমার দৃষ্টিতে তেমনি মর্যাদা রাখ যেমনটি কিনা আমার তৌহীদ ও স্বাতন্ত্র্যতা। সুতরাং তোমাকে সাহায্য করার এবং মানুষের মাঝে তোমাকে পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি দেয়ার সময় এসে গেছে।

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا

মানুষের ক্ষেত্রে অর্থাৎ তোমার জীবনে কি এমন সময় অতিবাহিত হয় নি যখন পৃথিবীতে তোমায় স্মরণ করা বা তোমার কথা উল্লেখ করা হতো না। অর্থাৎ কেউ জানতো না যে, তুমি কে বা কী ছিলে আর তুমি কোন হিসেব বা গণনার মধ্যেই পড়তে না; অর্থাৎ তুমি কিছুই ছিলে না। এসব অতীত স্নেহ ও অনুগ্রহরাজির বরাত টানা হয়েছে যাতে তা প্রকৃত অনুগ্রহকারীর ভবিষ্যৎ অনুগ্রহের জন্য এক দৃষ্টান্ত পরিগণিত হয়।

سبحان الله تبارك و تعالٰی زاد مجدك۔ ینقطع اباؤك و یبدء منك۔

সকল পবিত্রতা খোদার প্রাপ্য যিনি অতীব কল্যাণময় ও মহান সত্তা। তিনি তোমার সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। তোমার পিতা-পিতামহের নাম ও উল্লেখ বন্ধ বা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে অর্থাৎ স্থায়ীভাবে তাদের নাম থাকবে না আর খোদা তোমার মাধ্যমে সম্মান ও মাহাত্ম্যের সূচনা করবেন–

نصرت بالرعب واحییت بالصدق ایها الصدیق۔ نصرت وقالوا لات حین مناص۔

প্রতাপের মাধ্যমে তোমাকে সাহায্য করা হয়েছে আর নিষ্ঠার সাথে সঞ্জীবিত

করা হয়েছে; হে সত্যবাদী! তোমাকে সাহায্য করা হয়েছে। বিরোধীরা বলে, এখন আর পালাবার পথ নেই, অর্থাৎ ঐশী সাহায্য এত বেশি হবে যে, বিরোধীদের মনোবল ভেঙ্গে যাবে আর তাদের হৃদয়ে নৈরাশ্য ছেয়ে যাবে অধিকন্তু সত্য স্পষ্ট হয়ে যাবে–

و ما کان اللّٰہ لیترکک حتی یمیز الخبیث من الطیب۔

খোদা এমন নন যে, অপবিত্র ও পবিত্রের মাঝে পার্থক্য না করেই তোমাকে পরিত্যাগ করবেন!

وَ اللّٰہُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِہٖ وَ لٰکِنَّ اَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ۔

খোদা নিজ বিষয়ে প্রবল পরাক্রমশালী কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

اذا جاء نصر اللّٰہ والفتح و تمت کلمة ربک ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون۔

যখন খোদার সাহায্য ও বিজয় আসবে আর তোমার প্রভুর কথা পূর্ণ হবে তখন কাফেররা এই সম্বোধনের যোগ্য হবে যে, এটিই সে কথা যার সম্পর্কে তোমরা তাড়াহুড়া করতে।

اردت ان استخلف فخلقت اٰدم انی جاعل فی الارض۔

অর্থাৎ আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করার ইচ্ছা করলাম তাই আমি আদমকে সৃষ্টি করলাম। আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করতে যাচ্ছি– এটি পুরো বাক্যের সংক্ষিপ্তরূপ অর্থাৎ তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছি। এখানে খলীফা বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে যিনি হেদায়েত ও পথপ্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্ ও সৃষ্টির মাঝে যোজক হয়ে থাকেন। এই যোজক জাগতিক খিলাফত নয় যা রাজত্ব ও শাসনের ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয় আর তা কোরাইশ ছাড়া ইসলামী শরীয়তে অন্য কারো জন্য স্বীকৃতিও পেতে পারে না বরং এখানে কেবল আধ্যাত্মিক মর্যাদা ও আধ্যাত্মিক প্রতিনিধিত্বের উল্লেখ করা হয়েছে। আদম বলতে সেই আদম বোঝায় না, যিনি আদি পিতা ছিলেন বরং এমন ব্যক্তি বোঝায় যার মাধ্যমে সঠিক পথের দিশা প্রদান ও হেদায়েতের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জন্মের ভিত রচিত হয় তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের নিরিখে সত্যান্বেষীদের পিতা। এটি একটি সুমহান ভবিষ্যদ্বাণী যার মাধ্যমে এমন সময়ে আধ্যাত্মিক জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা

হয়েছে যখন এ জামা'তের নামচিহ্নও ছিল না। এরপর এই রূপক আদমের আধ্যাত্মিক মর্যাদা স্পষ্ট করে বলেন–

دَنَا فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى

যখন কুরআন শরীফের এই আয়াত এলহাম হয়, এর অর্থ নির্ধারণ ও নির্ণয়ে কিছুটা বিলম্ব হয়। সেই অবস্থায় সংক্ষিপ্ত একটি স্বপ্ন দেখি আর তাতে এর অর্থ স্পষ্ট হয়ে যায়। এর বিস্তারিত বিবরণ হল, 'দানুউ' বলতে খোদার নৈকট্য বোঝায়। নৈকট্য কোন প্রকার স্থান পরিবর্তনের নাম নয় বরং মানুষকে তখন খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত বলা হয় যখন সে নিজের ইচ্ছা, রিপু, সমগ্র সৃষ্টিকুল ও সকল সাংঘর্ষিক বিষয় এবং খোদা ছাড়া বাকি সবকিছু হতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে আনুগত্য ও খোদাপ্রেমে আপাদমস্তক বিলীন হয়ে যায় আর খোদা ব্যতীত বাকি সবার সাথে পুরোপুরি দূরত্ব সৃষ্টি করে এবং খোদাপ্রেমের সমুদ্রে এমনভাবে অবগাহন করে যে, তার নিজ সত্তা ও আমিত্বের কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। যতক্ষণ স্বীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে না যাবে আর খোদার মাঝে বিলীনতার অলংকারে সজ্জিত না হবে ততক্ষণ সে নৈকট্যের যোগ্য হতে পারবে না। খোদার সত্তায় বিলীন জীবন তখন লাভ হয় যখন খোদাপ্রেম মানুষের খাদ্য হয়ে যায় আর অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, তাঁকে স্মরণ করা ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না আর হৃদয়ে তিনি ছাড়া অন্য কারো স্থান পাওয়া তার কাছে মৃত্যুতুল্য মনে হয়।

স্পষ্টত দেখা যায় যে, সে তাঁর ভালোবাসাতেই জীবন কাটায় আর এমনভাবে খোদার প্রতি আকৃষ্ট হয় যে, তার হৃদয় সদা খোদাপ্রেমে নিমজ্জিত থাকে আর তাঁর বেদনায় ব্যথিত থাকে। খোদা ছাড়া অন্য সবার প্রতি এমন ঘৃণা সৃষ্টি হয়, যেন খোদা ভিন্ন অন্যদের প্রতি তার ব্যক্তিগত শত্রুতা রয়েছে যাদের প্রতি আকৃষ্ট হলে সে সহজাতভাবেই দুঃখ পায়। এই অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে ঐশী জ্যোতির অবতরণস্থল তথা হৃদয় অত্যন্ত স্বচ্ছ হয়ে যাবে আর তার মাঝে ঐশী গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যাবলী প্রতিফলিত হয়ে তত্ত্বজ্ঞানীর একটি ভিন্ন শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাবে। 'তদল্লী'র অর্থ হলো সেই অবতরণ বা নীচে আসা যখন মানুষ আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হয়ে সেই রহমান ও রহীম সত্তার ন্যায় সৃষ্টির প্রতি স্নেহবশত সৃষ্টি-জগতের দিকে ফিরে আসে। যেহেতু 'দনুউ' বা নিকটে আসার পরমরূপ 'তদল্লী'র বা অবতরণের পরমরূপের পরিপূরক; তাই 'তদল্লী' বা অবতরণও 'দনুউ' বা আরোহণের অনুপাতেই হবে। পুণ্যের পথযাত্রীর হৃদয়ে খোদার নাম

ও গুণাবলীর প্রতিফলনের মাঝে 'দনুউ' বা নিকটে আসার বা অরোহণের পূর্ণতা নির্ভর করে। কোন ছায়া বা স্থান-কালের অস্পষ্টতা না রেখে সকল পরমোৎকর্ষ গুণাবলীসহ তার মাঝে প্রকৃত প্রেমাস্পদের আত্মপ্রকাশ করা আর কোন অস্পষ্টতা বা অস্বচ্ছতা না রাখাই হলো খেলাফতের বাস্তবতা এবং আল্লাহ্‌র রূহ ফুৎকারের প্রকৃত তাৎপর্য। আর এটিই খোদার গুণে গুণান্বিত হওয়ার মূল ভিত্তি।

অতএব খোদার অবতরণের প্রকৃত অর্থের দাবি হল, আবশ্যকীয়ভাবে তাঁর গুণে গুণান্বিত হওয়া, আর খোদার রঙে পূর্ণমাত্রায় রঙিন হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো, সৃষ্টির প্রতি স্নেহ ও তাদের মঙ্গল সাধনে সোচ্চার হওয়া এবং তাদের কল্যাণের জন্য সর্বান্তঃকরণে এতটাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে যাওয়া যার বেশি ধারণাই করা যায় না। তাই খোদার পূর্ণ সাক্ষাতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দুটো বিরোধী ও বিপরীত অবস্থার সমাহার হতে হলো। একদিকে সে পূর্ণরূপে খোদামুখী হলো আবার পূর্ণরূপে সৃষ্টিমুখী হলো। অতএব সে উভয় ধনুক অর্থাৎ খোদা ও মানবরূপী ধনুকের মাঝে একটি তন্ত্রীর ন্যায় অবস্থান করে, যে উভয়ের সাথে পূর্ণ সম্পর্ক রাখে। অতএব সারকথা হলো, পূর্ণ মোলাকাত বা সাক্ষাতের অভিজ্ঞতার জন্য 'দনুউ' ও 'তদল্লী' উভয়টি আবশ্যক। 'দনুউ' সেই পূর্ণ নৈকট্যের নাম যখন মানুষ পূর্ণ পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে খোদার পানে সর্বোত্তমভাবে পথ চলার কল্যাণে খোদাতে পূর্ণভাবে বিচরণশীল প্রমাণিত হয় আর নিজ হীন সত্তা হতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয়ে অনন্য ও অতুলনীয় সত্তারূপী সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে এক নতুন সত্তা সৃষ্টি করে যাতে অপরিচিতি, দ্বৈততা, অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতা নয় বরং খোদার পবিত্র রঙে পূর্ণ রঙিন অবস্থা বিরাজ করে। আর 'তদল্লী' মানুষের সেই অবস্থার নাম যখন মানুষ খোদার রঙে রঙিন হওয়ার পর ঐশী স্নেহ ও কৃপায় রঙিন হয়ে খোদার বান্দাদের প্রতি তাদের সংশোধন ও তাদের কল্যাণার্থে ফিরে আসে। সুতরাং স্মরণ রাখা উচিত, এখানে একই হৃদয়ে একই অবস্থা ও উদ্দেশ্যের সাথে দুধরনের প্রত্যাবর্তন দেখা যায়। একটি খোদা তা'লা মুখী, যিনি আদি সত্তা আর অপরটি হলো, তাঁর বান্দাদের প্রতি যা অস্থায়ী সত্তা। উভয় প্রকার সত্তা অর্থাৎ অনাদি-অনন্ত ও ক্ষণজীবি, একটি বৃত্তের ন্যায় যার উপরের দিক অবশ্যম্ভাবী আর নীচের দিক সম্ভাব্য। এখন এই বৃত্তের মাঝে পূর্ণ মানব দনুউ ও তদল্লীর কারণে উভয়দিকে উৎকর্ষ ও পূর্ণ যোগাযোগের ফলে এমন আদর্শ রূপ ধারণ করে

যেমনটি একটি ধনুকের দু'টি তন্ত্রীর মাঝে হয়ে থাকে অর্থাৎ খোদা ও সৃষ্টির মাঝে মাধ্যম হয়ে যায়। প্রথমে তাকে দনুউ ও খোদার নৈকট্যের বিশেষ পোষাক প্রদান করা হয় এবং সে নৈকট্যের মহান মর্যাদায় আরোহণ করে। আর এরপর তাকে সৃষ্টির প্রতি আনা হয়। সুতরাং তার আরোহণ ও অবতরণ দু'টি তন্ত্রীর আকারে প্রকাশ পায়। আর এই উভয় সম্পর্কের সমাহার, পূর্ণ মানবের সত্তা, সেই দুটি তন্ত্রীর মাঝে ধনুকের ন্যায় হয়ে থাকে। আর ধনুক আরবদের পরিভাষায় কামানের চিল্লার জন্য ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ দাঁড়াল, সে খোদার নিকটতর হলো, তারপর অবতরণ করল অর্থাৎ সৃষ্টির দিকে ফিরে আসল। সুতরাং এই আরোহণ ও অবতরণের কারণে দুই তন্ত্রীর জন্য একই ধনুকের ন্যায় হয়ে গেল। আর যেহেতু তার চেহারা সৃষ্টিমুখী হওয়া খোদার গুণে গুণান্বিত হওয়ার একটি স্বচ্ছ প্রস্রবণ, তাই সৃষ্টির প্রতি তার দৃষ্টি একান্ত স্রষ্টার দিকেই দৃষ্টির অনুরূপ। অথবা এভাবে ধরে নিতে পার যে, যেহেতু সত্যিকার মালিক বান্দাদের প্রতি তাঁর পরম স্নেহের টানে এমনভাবে তাদের দিকে ফিরে আসেন, যেন তিনি বান্দাদের কাছেই নিজ তাবু গেঁড়েছেন। সুতরাং পুণ্যের পথযাত্রী খোদার পানে অগ্রসর হতে গিয়ে যখন স্বীয় পরাকাষ্ঠায় পৌঁছে গেল তখন যেখানে খোদা ছিলেন সেখানেই তাকে ফিরে আসতে হলো। অতএব এ কারণে তার পরম 'দনুউ' অর্থাৎ পরম নৈকট্য তার 'তদল্লী' বা অবতরণের কারণ হয়েছে।

يحى الدين و يقيم الشريعة-

ধর্মকে জীবিত করবেন আর শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করবেন।

يا اٰدم اسكن انت و زوجك الجنة- يا مريم اسكن انت و زوجك الجنة- يا احمد اسكن انت و زوجك الجنة- نفخت فيك من لدنى روح الصدق-

হে আদম, হে মরিয়ম, হে আহমদ! তুমি এবং যে তোমার অনুগত ও বন্ধু, জান্নাতে অর্থাৎ প্রকৃত মুক্তির মাধ্যমে বা নিবাসে প্রবেশ কর। আমি আমার পক্ষ থেকে সত্যের প্রাণ তোমার মাঝে ফুৎকার করেছি। (এলহামে উল্লেখিত) এই আয়াতেও রূপক আদমকে 'আদম' নাম দেয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ হযরত আদম (আ.)-এর জন্ম যেভাবে উপকরণ ছাড়া অনুরূপভাবে আধ্যাত্মিক আদমেও বাহ্যিক কোন উপকরণের মাধ্যম ছাড়াই এই আত্মার ফুৎকার হয় আর আত্মার এই ফুৎকার প্রকৃতপক্ষে নবীদেরই বিশেষত্ব। এছাড়া

অনুসরণ, অনুগমন ও উত্তরাধিকার হিসেবে উম্মতে মুহাম্মদিয়ার বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে এই নেয়ামত প্রদান করা হয়ে থাকে। আর এ শব্দগুলিতেও যেসকল ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে তা স্পষ্ট। এরপর বলেন–

نصرت وقالوا لات حين مناص۔

তোমাকে সাহায্য করা হয়েছে। তারা বললো এখন আর পলায়নের কোন উপায় নেই।

ان الذین کفروا وَ صدوا عن سبیل اللّٰہ رد علیھم رجل من فارس شکر اللّٰہ سعیہ۔

যারা অস্বীকার করেছে আর খোদার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে পারস্য বংশীয় এক সুপুরুষ তাদের কথা খণ্ডন করেছেন। খোদা তার প্রচেষ্টার মূল্যায়নকারী।

کتاب الولی ذوالفقار علی۔

ওলীর গ্রন্থ আলীর তরবারির ন্যায় অর্থাৎ বিরোধীকে নিশ্চিহ্নকারী। যেভাবে আলীর তরবারি বড় বড় ভয়াবহ যুদ্ধে দর্শনীয় কাজ করে দেখিয়েছে, অনুরূপভাবে এটিও দেখাবে। আর এটিও একটি ভবিষ্যদ্বাণী যা, গ্রন্থের সুমহান প্রভাব এবং সার্বজনীন কার্যকারিতার প্রমাণ বহন করে। এরপর বলেন

ولو کان الایمان معلقا بالثریا لنالہ۔

ঈমান যদি সুরাইয়াতে ঝুলন্ত থাকত অর্থাৎ পৃথিবী হতে সম্পূর্ণভাবে উঠে যেত তাহলেও পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তি তা লাভ করতো–

یکاد زیتہ یضیٓء ولو لم تمسسہ نار۔

আগুন তাকে স্পর্শ না করলেও তা জ্বলে উঠতে উদ্যত।

ام یقولون نحن جمیع منتصر سیھزم الجمع و یولون الدبر۔ وان یروا ایۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر واستیقنتھا انفسم وقالوا لات حین مناص فبما رحمۃ من اللّٰہ لنت علیھم ولو کنت فظا غلیظ القلب لا نفضوا من حولك۔ ولو ان قرانا سیرت بہ الجبال۔

তারা কি বলে যে, আমরা একটি শক্তিশালী জামা'ত যারা উত্তর লেখার সামর্থ্য রাখে! অচিরেই এসব জামা'ত পালিয়ে যাবে আর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। এরা যখন কোনো নিদর্শন দেখে তখন বলে এটি একটি চিরাচরিত ও পুরোনো জাদু! অথচ তাদের হৃদয় এসকল নিদর্শনে বিশ্বাস রাখে আর তারা সত্যিকার অর্থে বুঝতে পেরেছিল যে, এখন আর অবজ্ঞা প্রদর্শনের কোনো উপায় নেই।

এটি খোদার রহমত যে, তুমি তাদের প্রতি কোমলচিত্ত হয়েছ। তুমি যদি কঠোর ও রুক্ষ স্বভাবের হতে তাহলে এরা তোমার কাছেও ভিড়তো না এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতো। যদিও কুরআনের নিদর্শনাবলী দেখতে এমন যে, তাতে পাহাড়ও কেঁপে ওঠে। (এলহামে উল্লেখিত) এ আয়াতগুলো সেসকল কতিপয় লোক সম্পর্কে এলহাম হয়েছে যাদের অবস্থা ও ধারণা এমন ছিল। হয়ত এমন মানুষ আরো সৃষ্টি হবে যারা এমন কথা বলবে; আর (তারা) পূর্ণ বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছে আবার অস্বীকার করে বসবে। এরপর বলেন,

انا انزلناه قريبا من القاديان۔ و بالحق انزلناه و بالحق نزل۔ صدق الله و رسوله وكان امر الله مفعولا۔

অর্থাৎ আমরা এসকল নিদর্শন ও আশ্চর্যজনক বিষয়াদিকে, অধিকন্তু তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ এই এলহামকে কাদিয়ানের সন্নিকটে অবতীর্ণ করেছি এবং সত্যিকার প্রয়োজন সহকারে অবতীর্ণ করেছি আর সত্যিকার প্রয়োজনে তা অবতীর্ণ হয়েছে। খোদা ও তাঁর রসূল সংবাদ দিয়েছিলেন যা স্বীয় সময়ে পূর্ণতা লাভ করেছে আর খোদা যা চেয়েছেন তা হওয়ারই ছিল। এই শেষ বাক্যগুলো এ কথার দিকে ইঙ্গিত বহন করে যে, সে ব্যক্তির আবির্ভাবের জন্য মহানবী (সা.) স্বীয় উল্লিখিত হাদীসে ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন এবং খোদা তা'লাও স্বীয় পবিত্র বাণীতে ইঙ্গিত করেছেন। সেসকল ইঙ্গিত বারাহীনের তৃতীয় খণ্ডের এলহামে উল্লিখিত রয়েছে। অপরদিকে কুরআনের ইশারা এই আয়াতে রয়েছে যে,

هُوَ الَّذِیۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰی وَ دِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡهِرَهٗ عَلَی الدِّیۡنِ کُلِّهٖ

(সূরা আস সাফ, ৬১:১০)

এই আয়াত জাগতিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে হযরত মসীহ্‌র পক্ষে একটি ভবিষ্যদ্বাণী আর ইসলাম ধর্মের যে পূর্ণ বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা মসীহ্‌র মাধ্যমে প্রকাশ পাবে। হযরত মসীহ্ (আ.) যখন পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন তখন তাঁর হাতে ইসলাম ধর্ম সর্বত্র বিস্তার লাভ করবে। কিন্তু এই অধমের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে যে, এই অধম স্বীয় দীনতা, বিনয়, খোদার ওপর নির্ভরশীলতা, ত্যাগ স্বীকার এবং নিদর্শন ও জ্যোতির দিক থেকে মসীহ্‌র প্রথম জীবনের নিদর্শন। এই অধমের প্রকৃতি ও মসীহ্‌র প্রকৃতি অতি সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেন একই রত্নের দুটো টুকরো বা একই বৃক্ষের দুটো ফল। আর এতটা মিল

ও সামঞ্জস্য যে, দিব্যদর্শনে পার্থক্য অতিসূক্ষ্ম ছিল। এছাড়া বাহ্যিকভাবেও একটি সাদৃশ্য রয়েছে, আর তাহলো মসীহ্ এক কামিল ও সুমহান নবী অর্থাৎ মূসার অনুসারী ও মূসার ধর্মের সেবক ছিলেন আর তাঁর ইঞ্জিল তৌরাতের শাখা ছিল। এই অধমও সেই মহান মর্যাদাবান নবীর তুচ্ছ সেবকদের অন্তর্গত যিনি (সা.) রসূলদের নেতা ও রসূলদের শিরোমণি। তিনি প্রশংসাকারী হলে ইনি সবচেয়ে বড় প্রশংসাকারী। তিনি প্রশংসিত হলে ইনি সবচেয়ে বড় প্রশংসিত। যেহেতু এই অধমের হযরত ঈসার সাথে একটি পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে তাই মহা সম্মানিত খোদা আদি থেকেই ঈসার ভবিষ্যদ্বাণীতে এই অধমকেও অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছেন অর্থাৎ হযরত মসীহ্ উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীর বাহ্যিক ও দৈহিক সত্যায়ন বা পূর্ণতা আর এই অধম আধ্যাত্মিক ও যৌক্তিকভাবে এর পরিপূরণস্থল অর্থাৎ আধ্যাত্মিকভাবে ইসলাম ধর্মের বিজয় যা অকাট্য যুক্তি ও সমুজ্জ্বল প্রমাণাদির ওপর নির্ভরশীল, তা এই অধমের মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া নির্ধারিত, তা তার জীবদ্দশায় হোক বা মৃত্যুর পরেই হোক না কেন। যদিও ইসলাম ধর্ম স্বীয় সত্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে আদি হতে জয়যুক্তই চলে আসছে আর শুরু থেকে এর বিরোধীরা লাঞ্ছিত হয়ে আসছে, কিন্তু বিভিন্ন দল ও জাতির সামনে এই বিজয়ের বহিঃপ্রকাশ এমন এক যুগের জন্য নির্ধারিত ছিল যা বিভিন্ন পথ খুলে যাওয়ার কারণে সারা পৃথিবীর দেশগুলোকে সংযুক্ত রাষ্ট্রের বা একই জাতিসত্তায় পরিণত করবে। আর শিক্ষা এবং ধর্ম প্রচারের সকল উপকরণ পূর্ণ সুযোগসুবিধা সহকারে উপস্থাপন করবে যা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে ঐশী শিক্ষার জন্য হবে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও যথাযথ। অতএব এটিই সেই যুগ, কেননা পথ খুলে যাওয়া ও এক জাতির অন্য জাতি সম্পর্কে এবং এক দেশের অন্য দেশ সম্পর্কে অবহিত হওয়ায় তবলীগের উপকরণ সহজলভ্য হয়েছে। আর ডাক, রেল, তার ও জাহাজ এবং পত্রপত্রিকা ইত্যাদির কারণে ধর্মীয় পুস্তকপুস্তিকা ইত্যাদির প্রচারের জন্য অনেক সহজসাধ্যতা সৃষ্টি হয়েছে।

এককথায়, নিঃসন্দেহে এখন সেসময় এসে গেছে যাতে সারা পৃথিবী একটি বিশ্বপল্লীতে রূপ নিয়েছে। আর বেশ কিছু ভাষার বিস্তার ও প্রচলনের কারণে বুঝার ও বুঝানোর অনেক মাধ্যম সামনে এসেছে। অপরিচিতি ও না জানার সমস্যা হতে অনেক ক্ষেত্রে মুক্তি লাভ হয়েছে। স্থায়ী মেলামেশা ও সকালসন্ধ্যা সহাবস্থানের কল্যাণে প্রকৃতিগতভাবে এক জাতির প্রতি অন্য জাতির যে ঘৃণা

ও ভীতি ছিল তা অনেকটা কমে গেছে। যেমন, হিন্দুরা এখন লন্ডন ও আমেরিকা পর্যন্ত ভ্রমণ করে আসছে অথচ তাদের জগৎ হিমালয় পাহাড়ের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল। সামুদ্রিক সফর যাদেরকে ধর্ম হতে বহিস্কার করতো তারা এখন লন্ডন ও আমেরিকা পর্যন্ত গিয়ে ভ্রমণ করে আসে। সারকথা হলো, এযুগে ধর্ম প্রসারের সকল মাধ্যম পুরো উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়েছে। যদিও পৃথিবীর বুকে অনেক অন্ধকার ও অমানিশা বিস্তার লাভ করছে কিন্তু তাসত্ত্বেও ভ্রষ্টতার রাজত্বের অবসান হতে যাচ্ছে বলে মনে হয় এবং ভ্রষ্টতার চরমরূপ ক্রমশ তিরোহিত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে বলে প্রতিভাত হয়। কিছুটা খোদার পক্ষ থেকেই সুস্থ প্রকৃতি সোজা পথ সন্ধানে রত হয়েছে, আর নেক ও পবিত্র প্রকৃতি সত্য ও সঠিক পন্থার সাথে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে চলেছে। একত্ববাদের স্বাভাবিক প্রেরণা সোচ্চার হৃদয়সমূহকে একত্ববাদের স্বচ্ছ প্রস্রবণের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। সৃষ্টিপূজার অট্টালিকা যে দুর্বল, তা বুদ্ধিমানদের সামনে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠছে। কৃত্রিম খোদা পুনরায় বুদ্ধিজীবিদের দৃষ্টিতে মানুষের পোশাক পরিধান করা আরম্ভ করছে।

এ ছাড়া ঐশী সাহায্য সত্য ধর্মের সাহায্যের জন্য এতটা ব্যগ্র-ব্যাকুল যে, সেই নিদর্শন ও অলৌকিক বিষয়াদি যা শুনার কারণে খোদার দুর্বল ও তুচ্ছ বান্দাদের খোদার আসনে বসানো হয়েছিল, তা এখন রসূলদের সর্দারের তুচ্ছ সেবক ও দাসদের মাধ্যমে প্রকাশিত ও অনুভূত হচ্ছে। পূর্ববর্তী যুগে যেভাবে কিছু নবী গোপনে নিজ শিষ্যদের কতিপয় নিদর্শন দেখাতেন, এখন সেসকল নিদর্শন রসূলদের সর্দারের তুচ্ছ অনুসারীদের মাধ্যমে শত্রুদের সামনে প্রকাশ পেয়ে থাকে আর সে সকল শত্রুরই সাক্ষ্যের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতার সূর্য সারা বিশ্বের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে চলেছে। এছাড়া এযুগ ধর্মপ্রচারের জন্য এতটা সহায়ক যে, পূর্ববর্তী যুগে যে বিষয় শতশত বছরে প্রচার করা সম্ভব হতো না এযুগে তা কেবল এক বছরে বিশ্বের সকল দেশে প্রসার লাভ করতে পারে। তাই ইসলামী হেদায়েত ও ঐশী নিদর্শনের ডঙ্কা বাজানোর জন্য এযুগে এত শক্তি ও সামর্থ্য বা উচ্ছ্বাস দেখা যায় যার দৃষ্টান্ত কোন যুগে খুঁজে পাওয়া যায় না। এক দেশের ঘটনাবলী অন্য দেশে পৌঁছানোর জন্য রেল, তার ও পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি শত শত মাধ্যম সদা প্রস্তুত। সুতরাং নিঃসন্দেহে যৌক্তিক ও আধ্যাত্মিকভাবে ইসলাম ধর্মের সত্যতার প্রমাণাদি সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ

করা এমনই যুগের জন্য অপেক্ষমান ছিল আর উপকরণে সজ্জিত এ যুগই এ সম্মানিত অতিথির সেবার জন্য সকল প্রকার উপকরণ প্রস্তুত করে রেখেছে। অতএব খোদা তা'লা এই নগণ্য দাসকে এই যুগে পাঠিয়ে আর শত শত স্বর্গীয় নিদর্শন ও অদৃশ্য অলৌকিক বিষয়াদি এবং তত্ত্বজ্ঞান ও নিগূঢ় সত্য প্রদানের মাধ্যমে শত শত অকাট্য যৌক্তিক প্রমাণাদির জ্ঞানে সশস্ত্র করে কুরআনের সত্য শিক্ষা সকল দেশ ও জাতির মাঝে প্রসার ও প্রচলন করা এবং স্বীয় সত্যতা তাদের সামনে প্রকাশের ইচ্ছা করেছেন। এই ইচ্ছার সুবাদে খোদা তা'লা এই অধমকে সামর্থ্য দান করেছেন আর ঐশী কিতাবে সংবদ্ধ সত্যের অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে গিয়ে ১০ হাজার রুপির বিজ্ঞাপন এ গ্রন্থের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে অধিকন্তু শত্রু ও বিরোধীদের সাক্ষ্যখচিত ঐশী নিদর্শনাবলী উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সকল বিরোধীকে এর মোকাবিলা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যেন সত্য স্পষ্ট করার ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি না হয় এবং প্রত্যেক বিরোধী যে নির্বাক ও পরাজিত হয়েছে, তার সাক্ষি যেন সে নিজেই হয়ে যায়।

বস্তুতঃ খোদা তা'লা ধর্মের প্রচার-প্রসারের জন্য যে সকল উপকরণ দিয়েছেন আর স্বীয় কৃপা ও অনুগ্রহবশত সত্য স্পষ্ট করার জন্য এই অধমকে যে সকল প্রমাণাদি দান করেছেন তা অতীতের উম্মতগুলোর কাউকে আজ পর্যন্ত দান করেন নি। এ সম্পর্কে অদৃশ্য হতে এই অধমকে যে সকল যোগ্যতা ও সামর্থ্য দেয়া হয়েছে তা তাদের কাউকে দেয়া হয় নি– وذٰلك فضل الله يؤتيه من يشآء সুতরাং মহাসম্মানিত খোদা যেহেতু বিশেষ উপকরণকে কাজে লাগানোর জন্য এই অধমকে বেছে নিয়েছেন আর এই অধমকে এমন যুগে সৃষ্টি করেছেন যা তবলীগের কাজের সম্পূর্ণতার জন্য অত্যন্ত উপযোগী ও সহায়ক, তাই তিনি বদান্যতা ও কৃপাবশতঃ এই শুভসংবাদও দিয়েছেন অর্থাৎ আদি থেকে এটিই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, উল্লিখিত আয়াত এবং وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ আয়াত আধ্যাত্মিকভাবে এই অধমের ক্ষেত্রে পূর্ণ হওয়ার ছিল। খোদা তা'লা ঐসকল যুক্তি প্রমাণকে এবং ঐসকল কথাকে যা এই অধম বিরোধীদের উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করেছে নিজেই বিরোধীদের কাছে পৌঁছে দিবেন। পৃথিবীর সামনে তাদের ব্যর্থ, নির্বাক ও পরাস্ত হওয়া প্রকাশ করে উল্লিখিত আয়াতের অর্থকে বাস্তবায়ন করবেন فالحمد لله علٰى ذٰلك।

এর পর যে এলহাম হয়েছে তা হলো–

صل علی محمد و اٰل محمد سید ولد آدم و خاتم النبیین۔

মুহাম্মদ ও তাঁর বংশধরের প্রতি দরূদ প্রেরণ কর যিনি সমগ্র আদম সন্তানের সর্দার ও খাতামান্নাবীঈন। এটি একথার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে যে, এসব মর্যাদা ও অনুগ্রহরাজি এবং ঐশী দান তাঁরই কল্যাণে আর তাঁকে ভালোবাসারই প্রতিদান। সুবহান আল্লাহ! খোদার সন্নিধানে এই বিশ্বনেতার কত মহান মর্যাদা আর কত অসাধারণ নৈকট্য যে, তাঁর প্রেমিক খোদার প্রেমাস্পদে পরিণত হয় আর তাঁর সেবককে সারা পৃথিবীর সেবাধন্য হওয়ার মর্যাদা দেয়া হয়।

ہیچ محبوبے نماند ہمچو یار دلبرم   مہر و مہ را نیست قدرے در دیارِ دلبرم

কোন প্রেমাস্পদ আমার প্রেমাস্পদের মত হতে পারে না,
আমার প্রেমাস্পদের শহরে চন্দ্র-সূর্যের কোন মূল্য নেই।

آں کجا روئے کہ دارد ہمچو رویش آب و تاب   واں کجا باغے کہ مے دارد بہار دلبرم

সেই চেহারা কোথায় যা তার চেহারার ন্যায় উজ্জ্বলতা রাখবে?
সেই বাগান কোথায় যাতে আমার প্রেমাস্পদের ন্যায় বসন্ত থাকবে?

এখানে আমার মনে পড়লো, একরাতে এই অধম এত অজস্র ধারায় দরূদ শরীফ পাঠ করে যে, অন্তরাত্মা তাতে বিমোহিত হয়ে যায়। সে রাতেই স্বপ্নে দেখি, স্বচ্ছ-পরিস্কার পানির ন্যায় আলোর কিছু মশক (দুজন) এই অধমের গৃহে নিয়ে আসছে। তাদের একজন বলে যে, এটি সেই কল্যাণরাজি যা তুমি মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি প্রেরণ করেছ। এমনই অভাবনীয় আরো একটি ঘটনা মনে পড়ল, একবার এলহাম হয় যার অর্থ হলো, ঊর্ধ্বলোকের সৃষ্টি বিতণ্ডায় লিপ্ত, অর্থাৎ ধর্মকে সঞ্জীবিত করার জন্য ঐশী ইচ্ছা প্রবল, কিন্তু ঊর্ধ্বলোকে (ধর্মের) সঞ্জীবিতকারী ব্যক্তি কে– এখনো তা প্রকাশিত হয় নি– তাই তারা মতভেদে লিপ্ত। তখনই স্বপ্নে দেখি যে, মানুষ একজন (ধর্মের) নব জীবনদাতার সন্ধান করছে। এক ব্যক্তি এই অধমের সামনে আসে এবং ইঙ্গিতে বলে যে,

هذا رجل يحب رسول الله

অর্থাৎ ইনি সেই ব্যক্তি যিনি রসূলুল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসা রাখেন। আর একথার অর্থ ছিল, এই পদ লাভের সবচেয়ে বড় শর্ত হলো, রসূলের

ভালোবাসা আর তা এ ব্যক্তির সত্তায় পূর্ণ হয়। অনুরূপভাবে উল্লিখিত এলহামে রসূলের আল বা বংশধরদের প্রতি দরূদ প্রেরণের যে নির্দেশ রয়েছে তাতেও রহস্য হলো, ঐশী জ্যোতির মাধ্যমে কারো কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার সাথে 'আহলে বাইত'-এর প্রতি ভালোবাসার সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে। যে ব্যক্তি খোদা তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয় সে ঐসকল পূত-পবিত্রদের উত্তরাধিকার লাভ করে আর সকল জ্ঞান ও তত্ত্বে তাদের উত্তরাধিকারী গণ্য হয়। এখানে একটি অতি স্বচ্ছ দিব্যদর্শন মনে পড়ল, আর তা হলো– একবার মাগরিবের নামাযের পর একান্ত জাগ্রত অবস্থায় কিছুটা অচেতনে যা হাল্কা তন্দ্রার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল, একটি বিস্ময়কর অবস্থা দৃশ্যমান হয়; প্রথমে একসাথে কয়েক ব্যক্তির দ্রুত আগমন-ধ্বনি শুনতে পাই, যেমনটি কিনা দ্রুত হাঁটতে গিয়ে পায়ের জুতা-মোজা হতে এসে থাকে। তখনই অতি গুরুগম্ভীর চেহারার সুপ্রিয় ও সুন্দর পাঁচ ব্যক্তি অর্থাৎ জনাব পয়গম্বর (সা.), হযরত আলী, হাসান-হোসাইন ও ফাতেমা যাহরা (রা.) সামনে আসেন। তাদের একজন, যতটা মনে পড়ে যেন হযরত ফাতেমা (রা.)– অত্যন্ত স্নেহ ও ভালোবাসার সাথে এক স্নেহময়ী মায়ের ন্যায় এই অধমের মাথা স্বীয় রানের ওপর রাখেন। এরপর আমাকে একটি গ্রন্থ দেয়া হয় যা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটি কুরআনের তফসীর যা আলী (রা.) লিখেছেন। এখন আলী (রা.) সেই তফসীর তোমাকে দান করছেন, অতএব এর সকল প্রশংসা খোদার প্রাপ্য। এরপর এই এলহাম হয়–

انك على صراط مستقيم۔ فاصدع بما تؤمر و اعرض عن الجاهلين۔

তুমি সোজা-সঠিক পথে রয়েছ। সুতরাং যে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে তা স্পষ্টভাবে শুনিয়ে দাও আর অজ্ঞদের এড়িয়ে চল।

وقالوا لولا نزل على رجل من قريتين عظيم۔ وقالوا انى لك هذا۔ ان هذا لمكرمكرتموه فى المدينة۔ ينظرون اليك و هم لا يبصرون۔

তারা বলবে অন্য শহরের কোন বড় আলেম ও বিজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি কেন এটি অবতীর্ণ হয় নি? তারা বলবে এই মর্যাদা তুমি কোত্থেকে লাভ করলে, এটি একটি ষড়যন্ত্র যা তোমরা গাঁটছড়া বেধে শহরে করেছ। তারা তোমার প্রতি তাকায় বটে কিন্তু দেখে না অর্থাৎ তোমাকে তারা দেখতে পায় না।

تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان۔

আমরা আমাদের সত্তার নামে শপথ করে বলছি, আমরা তোমার পূর্বে উম্মতে

মুহাম্মদিয়ায় অনেক কামেল ওলী পাঠিয়েছি, কিন্তু শয়তান তাদের অনুসারীদের পথকে বিকৃত করেছে। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার বিদআত মিশ্রিত হয়েছে আর কুরআনের সহজ সরল পথ সেগুলোতে অক্ষত-অপরিবর্তিত থাকে নি।

قل ان کنتم تحبون اللّٰہ فاتبعونی یحببکم اللّٰہ۔ واعلموا ان اللّٰہ یحی الارض بعد موتھا۔ ومن کان للّٰہ کان اللّٰہ لہ۔ قل ان افتریتہ فعلی اجرام شدید۔

তুমি বল, তোমরা যদি খোদাকে ভালোবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর। অর্থাৎ রসূল মকবুল (সা.)-এর আনুগত্য কর যেন খোদা তোমাদের ভালোবাসেন। আর নিশ্চিতভাবে জেনে নাও যে, আল্লাহ্ তা'লা নতুনভাবে ভূমিকে সঞ্জীবিত করে থাকেন। যে ব্যক্তি খোদার হয়ে যায় খোদা তাঁর হয়ে যান। তুমি বল, যদি আমি প্রতারণামূলকভাবে এটি রচনা করে থাকি তাহলে আমি ভয়াবহ অপরাধ করেছি

انک الیوم لدینا مکین امین۔ وان علیک رحمتی فی الدنیا والدین۔ وانک من المنصورین۔

আজ আমার দৃষ্টিতে তুমি মহান মর্যাদার অধিকারী ও বিশ্বস্ত, আর ধর্ম ও জাগতিক বিষয়ে তোমার প্রতি আমার আশীর্বাদ, অধিকন্তু তোমাকে সাহায্য করা হয়েছে

یحمدک اللّٰہ و یمشی الیک۔

খোদা তোমার প্রশংসা করেন এবং তোমার পানে ছুটে আসছেন।

الا ان نصراللّٰہ قریب۔

শোন! খোদার সাহায্য সন্নিকটে।

سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔

পবিত্র সেই সত্তা যিনি স্বীয় বান্দাকে রাতের বেলা ভ্রমণ করিয়েছেন অর্থাৎ ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তির যুগে যা রাত-সদৃশ, স্বর্গীয় সাহায্যের মাধ্যমে তত্ত্বজ্ঞান ও দৃঢ় বিশ্বাসের বিভিন্ন পর্যায়ে উপনীত করেছেন।

خلق اٰدم فاکرمہ ۔

তিনি আদমকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সম্মানিত করেছেন।

جری اللہ فی حلل الانبیاء ۔

নবীদের পোশাকে আল্লাহ্‌র সিংহ। এই এলহামী বাক্যের অর্থ হলো নসীহত করা ও সঠিক পথের দিশা দেয়া আর খোদার ওহীপ্রাপ্ত হওয়া, সত্যিকার অর্থে খোদার নবীদের পোশাক হয়ে থাকে আর অন্যদের তা লাভ হয় ধারস্বরূপ। এই পোশাক উম্মতে মুহাম্মদিয়ার কোন কোন ব্যক্তিকে প্রদান করা হয় দুর্বলদের পূর্ণতা দেয়ার জন্য। মহানবী (সা.) বলেন–

عُلَمَآءُ اُمَّتِیْ كَاَنْبِيَآءِ بَنِیْ اِسْرَآئِيْلَ

সুতরাং এসব মানুষ যদিও নবী নন কিন্তু তাদের ওপর নবীদের কাজ সোপর্দ করা হয়ে থাকে।

وکنتم علی شفا حفرة فانقذکم منها۔

আর তোমরা গর্তের কিনারায় ছিলে সুতরাং তা হতে তোমাদের মুক্তি দিয়েছেন অর্থাৎ মুক্তির উপকরণ দান করেছেন।

عسٰی ربکم ان یرحم علیکم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للکافرین حصیرا۔

খোদা তা'লা তোমাদের প্রতি করুণা করতে চান। তোমরা যদি পাপ ও বিদ্রোহের প্রতি ফিরে যাও তাহলে আমরাও শাস্তির দিকে ফিরে যাবো। আর আমরা জাহান্নামকে কাফিরদের জন্য কারাগার বানিয়েছি। এখানে এই আয়াত হযরত মসীহ্‌র প্রতাপান্বিত রূপে আবির্ভূত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত। অর্থাৎ নমনীয়তা, কোমলতা, স্নেহ ও অনুগ্রহের রীতি যদি গ্রহণ না করে আর খাঁটি সত্য যা সুস্পষ্ট প্রমাণাদি ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেছে, তার প্রতি বিদ্রোহ প্রদর্শন করে, তাহলে সেযুগও আসতে যাচ্ছে যখন খোদা তা'লা অপরাধীদের জন্য কঠোরতা, রুদ্ধতা, শাস্তি ও শক্ত ব্যবহারকে কাজে নিয়োজিত করবেন আর হযরত ঈসা (আ.) গভীর প্রতাপ সহকারে পৃথিবীতে নাযেল হবেন। আর সকল পথ এবং রাস্তা-ঘাটকে খড়কুটামুক্ত করে দিবেন এবং বক্র ও অসত্যের নাম-চিহ্নও থাকবে না। ঐশী প্রতাপ ভ্রষ্টতার বীজকে শাস্তিমূলক বিকাশের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। এ যুগ, সেই যুগের জন্য পূর্বাভাস বা পূর্বসংবাদদাতা সাব্যস্ত হয়েছে। অর্থাৎ খোদা তা'লা তখন জালালীভাবে (প্রতাপের সাথে) সত্যের প্রমাণ উপস্থাপন করবেন। এখন তদস্থলে জামালীভাবে অর্থাৎ কোমলতা ও অনুগ্রহের মাধ্যমে সত্যের নিখুঁত প্রমাণ স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করছেন।

توبوا واصلحوا والى الله توجهوا وعلى الله توكلوا واستعينوا بالصبر والصلٰوة۔

তওবা কর আর অনাচার, পাপাচার, কুফরী ও অবাধ্যতা হতে বিরত হও এবং নিজেদের অবস্থার সংশোধন কর একইসাথে খোদার প্রতি মনোযোগী হয়ে যাও এবং নামায ও ধৈর্যের মাধ্যমে তাঁর কাছে সাহায্য যাচনা কর, কেননা পুণ্য করলে পাপ দূর হয়ে যায়।

بشرى لك يا احمدى۔ انت مرادى و معى۔ غرست كرامتك بيدى۔

হে আমার আহমদ! তোমার জন্য শুভসংবাদ। তুমি আমার লক্ষ্য এবং আমার সাথে আছ। আমি তোমার কেরামত বা সম্মানের বৃক্ষকে নিজ হাতে রোপন করেছি।

قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم ذٰلك ازكىٰ لهم۔

মু'মিনদের বলে দাও তারা যেন নিজেদের চোখকে না মাহরামদের দেখা হতে বিরত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান ও কানকে অবৈধ বিষয়াদি হতে নিরাপদ রাখে; তাদের পবিত্রতার জন্য এটিই আবশ্যক ও অলঙ্ঘনীয়। এটি একথার প্রতি ইঙ্গিত যে, সকল মু'মিনের জন্য নিষিদ্ধ কাজ এড়িয়ে চলা এবং নিজেদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অবৈধ কাজ হতে বিরত রাখা আবশ্যক আর এ রীতিই তার পবিত্রতার ভিত্তি।

چشم گوش و دیده بند اے حق گزین　　یاد کُن فرمان قل للمؤمنین

হে সত্যপূজারি! চোখ কান বন্ধ কর 'কুল লিল মু'মিনীন'
নির্দেশটি স্মরণ কর।

خاطرِ خود زین و آن یکسر برآر　　تاشود بر خاطرت حق آشکار

নিজের হৃদয়কে এটি-ওটি থেকে বা গুরুত্বহীন বিষয় হতে সম্পূর্ণভাবে বের করে আন, যেন তোমার হৃদয়ে সত্য স্পষ্ট হয়ে যায়।

زیر پا کن دلبرانِ ایں جہان　　تانماید چہرۂ آں محبوب جان

এ পৃথিবীর প্রেমাস্পদের পদতলে পিষ্ট কর, যেন সেই আন্তরিক বন্ধু তোমাকে চেহারা দেখান।

کاملانِ حیّ اند ہم زیر زمیں　　تو بگوری باحیاتِ ایں چنیں

কামিলগণ মাটির নিচে থেকেও জীবিত, আর তুমি এ (পার্থিব) জীবন সত্ত্বেও কবরেই রয়ে গেলে।

سالہا باید کہ خون دل خوری تا بکوئے دلستانے رہبری

বন্ধুর গলি পাওয়ার জন্য তোমাকে বছরের পর বছর রক্ত পানি করতে হবে, কেবল তবেই তুমি প্রেমাস্পদের গলির দিকে যেতে পার।

کے بآسانی رہے بکشایدت صد جنوں باید کہ تا ہوش آیدت

অত সহজে তোমার রাস্তা কীভাবে খুলতে পারে? তোমার বিবেক বুদ্ধি ফিরে আসার জন্য শতশত উন্মাদনার প্রয়োজন রয়েছে।

و اذا سألك عبادی عنی فاِنّی قریب۔ اجیب دعوۃ الداع اذا دعان۔ و ما ارسلنٰك الا رحمة للعلمین۔

আর আমার বান্দা যখন তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তো জেনে নাও আমি সন্নিকটে, (আমি) দোয়াকারীর দোয়া শ্রবণ করি, আর আমি তোমাকে পাঠিয়েছি যেন সবার জন্য রহমতের উপকরণ সৃষ্টি করতে পারি।

لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینة۔ وکان کیدهم عظیما۔

আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্য হতে যারা কাফির হয়ে গেছে অর্থাৎ অবিশ্বাসে চরম নাছোড় মনোবৃত্তি প্রদর্শন করেছে, তাদের স্পষ্ট নিদর্শন দেখানো ছাড়া তারা নিজেদের অবিশ্বাস হতে বিরত হওয়ার ছিল না। আর তাদের ষড়যন্ত্র একটি ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ছিল। এটি একথার প্রতি ইঙ্গিত যে, খোদা তা'লা এ অধমের হাতে যে সকল স্বর্গীয় নিদর্শন ও যৌক্তিক প্রমাণাদি প্রকাশ করেছেন তা সত্যের প্রমাণকে সম্পূর্ণতা দেয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ যুগের তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ের মানুষ, অজ্ঞতা ও নোংরামির পোকা যাদেরকে অভ্যন্তরীণভাবে অন্তঃসারশূন্য করে ফেলেছে, তারা স্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও অকাট্য প্রমাণ ছাড়া কুফরী হতে বিরত হবার পাত্র ছিল না। বরং তারা ইসলামরূপী বাগানকে পৃথিবী হতে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। খোদা এমনটি যদি না করতেন তাহলে পৃথিবীতে অমানিশা নেমে আসতো। এটি যে কথার ইঙ্গিত বহন করে তা হল, পৃথিবীর এসকল স্পষ্ট নিদর্শনের অনেক প্রয়োজন ছিল আর পৃথিবীর মানুষ যারা স্বীয় অবিশ্বাস ও নোংরামির ব্যাধির কারণে কুষ্ঠ রোগীর ন্যায় গলে-পচে গেছে, তারা ঊর্ধ্বলোকীয় এই ঔষধ ছাড়া আরোগ্য লাভ করতে পারে না, যা ছিল সত্যান্বেষীদের জন্য জীবনসুধা।

واذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون۔ الا انهم هم المفسدون۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔

তাদেরকে যখন বলা হয় পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করো না আর কুফর, শিরক ও বাজে বিশ্বাসের প্রসার করো না, তখন তারা বলে, আমাদের পথই সঠিক, আমরা নৈরাজ্যবাদী নই বরং সংশোধনকারী ও সংস্কার সাধনকারী। শোন! এরাই বিশৃংখলাকারী, যারা ভূপৃষ্ঠে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছে। তুমি বল, আমি দুষ্কৃতকারী সৃষ্টির দুষ্কৃতি হতে খোদার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং অন্ধকার রাত হতে খোদার আশ্রয় চাই। অর্থাৎ এই যুগ নৈরাজ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে ভয়াবহ অন্ধকার রজনীতুল্য। সুতরাং এই যুগকে আলোকিত করার জন্য ঐশী শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন রয়েছে। মানবীয় শক্তিবলে এটি সাধিত হওয়া অসম্ভব।

انی ناصرك۔ انی حافظك۔ انی جاعلك للناس اماما۔ اكان للناس عجبا۔ قل هو الله عجیب۔ یجتبی من یشآء من عباده۔ لا یُسئل عما یفعل وهم یُسئلون۔ وتلك الایام نداولها بین الناس۔

আমি তোমায় সাহায্য করব। আমি তোমার সুরক্ষার (ব্যবস্থা) করব। আমি তোমাকে মানুষের জন্য ইমাম নিযুক্ত করবো। মানুষ কি এজন্য আশ্চর্যান্বিত যে, খোদা আশ্চর্যজনক বিষয়াদির অধিপতি, সদা বিস্ময়কর ক্রিয়াদি ঘটিয়ে থাকেন, স্বীয় বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চান মনোনীত করেন? স্বীয় কাজের জন্য তিনি জিজ্ঞাসিত হন না যে, এমনটি কেন করলেন, কিন্তু মানুষ জিজ্ঞাসিত হয়। আর আমরা মানুষের মাঝে এই দিনকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আনি অর্থাৎ কখনও একজনের পালা আসে আবার কখনো অন্য জনের। আর ঐশীকৃপা পালাক্রমে উম্মতে মুহাম্মদিয়ার সদস্যদের ওপর বর্ষিত হয়।

وقالوا انّٰی لك هذا۔ وقالوا ان هذا الا اختلاق۔ اذا نصرالله المؤمن جعل له الحاسدین فی الارض فالنار موعدهم۔ قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون۔

তারা বলবে, এটি তুমি কোত্থেকে পেলে? এটি তো একটি কৃত্রিম বিষয়। খোদা তা'লা যখন মু'মিনকে সাহায্য করেন তখন পৃথিবীতে তার বিরুদ্ধে অনেক হিংসুক দাঁড় করিয়ে দেন। সুতরাং যারা বিরত হয় না বরং হিংসায় নাছোড় মনোবৃত্তি প্রদর্শন করে তাদের প্রতিশ্রুত স্থান হবে জাহান্নাম। তুমি বল, এসব ব্যবস্থা খোদার পক্ষ থেকে, এরপর তাদেরকে তাদের বৃথা কার্যকলাপে লিপ্ত ছেড়ে দাও।

تلطف بالناس و ترحم عليهم انت فيهم بمنزلة موسٰى واصبر على ما يقولون۔

মানুষের সাথে নমনীয় ও কোমল ব্যবহার কর এবং তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন কর। তুমি তাদের মাঝে মূসার পদমর্যাদায় রয়েছ। আর তাদের কথায় ধৈর্য ধারণ কর। হযরত মূসা সহনশীলতা ও নমনীয়তায় সকল বনী ইসরাঈলী নবীর মাঝে অগ্রগামী ছিলেন। ইসরাঈলীদের মাঝে ঈসা বা অন্য কোন নবী এমন হন নি যিনি হযরত মূসার মর্যাদায় পৌঁছতে পারতেন আর তা তৌরাত থেকে প্রমাণিত। যেমন, গণনা পুস্তকের ১২তম অধ্যায়ে ৩নং শ্লোকে লেখা আছে মূসা (আ.) ভূপৃষ্ঠের সকল মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি সহনশীল ছিলেন।

সুতরাং তৌরাতে খোদা তা'লা মূসার সহনশীলতার এমন প্রশংসা করেছেন যে, বনী ইসরাঈলী নবীদের মাঝে কোন নবীর জন্য এমন প্রশংসাসূচক বাক্য ব্যবহার করেন নি। অবশ্য কুরআন শরীফে মহানবী (সা.)-এর যে মহান চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে তা হযরত মূসা থেকে সহস্র সহস্র গুণ মহান, কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.) সেই সকল শ্রেষ্ঠ চারিত্রিক গুণাবলীর সমাহার যা অন্যান্য নবীদের মাঝে পৃথক পৃথকভাবে বিদ্যমান ছিল। অধিকন্তু মহানবী (সা.) সম্পর্কে বলেছেন–

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

(সূরা আল কালাম, ৬৮:৫)

তুমি সুমহান চারিত্রিক ও নৈতিক মানে অধিষ্ঠিত। 'আযীম' শব্দ ব্যবহার করে যে বিষয়ের প্রশংসা করা হয় তা আরবদের বাগধারায় বস্তুর পরম মার্গের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। উদাহরণস্বরূপ যদি বলা হয়, এই বৃক্ষটি আযীম, সেক্ষেত্রে এর অর্থ হবে কোন বৃক্ষের জন্য যতটা দৈর্ঘ, প্রস্থ ও কাণ্ড বিশিষ্ট হওয়া সম্ভব তার সবকটি এ বৃক্ষের রয়েছে। অনুরূপভাবে এ আয়াতের অর্থ হলো, মানুষের জন্য যতটা শ্রেষ্ঠ চরিত্র ও উন্নত বৈশিষ্ট্য অর্জন করা সম্ভব সেই সব উৎকর্ষ চারিত্রিক গুণাবলীর মহান ও পরম মান হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্তায় বিদ্যমান। অতএব এ প্রশংসা এতটাই উন্নত মানের যার চেয়ে মহান প্রশংসার কথা ভাবাই যায় না। অন্যত্র মহানবী (সা.) সম্পর্কে যে বলা হয়েছে–

وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا

(সূরা আন নিসা, ৪:১১৪)

এতে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ তোমার প্রতি খোদার কৃপা সবচেয়ে বড়

আর কোন নবী তোমার মর্যাদায় পৌঁছতে পারবে না। এই প্রশংসাই যবুরের ৪৫তম অধ্যায়ে মহানবী (সা.) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ বলেন, খোদা তা'লা, যিনি তোমার খোদা, সন্তুষ্টির আতরে তোমাকে তোমার সাথীদের চেয়ে অধিক সুরভিত করেছেন। যেহেতু উম্মতে মুহাম্মদিয়ার আলেমগণ ইসরাঈলী নবীদের মত তাই উল্লিখিত এলহামে এই অধমকে হযরত মূসার সাথে তুলনা করা হয়েছে। বদান্যশীল খোদা যিনি তাঁর (সা.) দুর্বল উম্মতকে স্বীয় পরম স্নেহ ও অনুগ্রহবশত এরূপ সম্মানজনক বাক্যালাপের মর্যাদা দেন, সেসব কল্যাণ নবীদের সর্দার (সা.) এরই প্রাপ্য।

اللّٰهم صلّ على محمد و اٰل محمد

এরপর এই এলহামী বাক্য রয়েছে।

واذا قيل لهم اٰمنوا كما اٰمن الناس قالوا انؤمن كما اٰمن السفهآء الا انهم هم السفهآء ولكن لا يعلمون۔ و يحبون ان تدهنون۔ قل يايها الكفرون لا اعبد ما تعبدون۔ قيل ارجعوا الى الله فلا ترجعون۔ وقيل استحوذوا فلا تستحوذون۔ ام تسئلهم من خرج فهم من مغرم مثقلون۔ بل اتيناهم بالحق فهم للحق كارهون۔ سبحانه وتعالى عما يصفون۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا اٰمنا وهم لا يفتنون۔ يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا۔ ولا يخفى على الله خافية۔ ولا يصلح شيء قبل اصلاحه۔ ومن رُدّ من مطبعه فلا مرد له۔

আর যখন তাদের বলা হয়, যেভাবে মানুষ ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আনয়ন করো, তারা বলে আমরা কি সেভাবে ঈমান আনবো যেভাবে নির্বোধরা ঈমান এনেছে? শোন! তারাই নির্বোধ, কিন্তু তারা জানে না। তারা চায় তুমি যেন তাদের সাথে চাটুকারিতামূলক আচরণ কর। তুমি বল, হে অস্বীকারকারীরা! আমি তার পূজা করি না যার পূজা তোমরা করো। তোমাদের বলা হয়েছিল, খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করো, কিন্তু তোমরা প্রত্যাবর্তন করছ না। এছাড়া তোমাদের বলা হয়েছিল তোমরা নিজেদের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হও, কিন্তু তোমরা তা করো না। তুমি কি তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাও, যে জরিমানা বা আর্থিক ক্ষতির কারণে তারা সত্য গ্রহণ করাকে একটি বোঝা জ্ঞান করে? বরং তাদেরকে কোন বিনিময় না নিয়ে সত্য দেয়া হচ্ছে কিন্তু তারা সত্যকে ঘৃণা করছে। খোদা তা'লা সেসব ত্রুটি হতে পবিত্র এবং এর ঊর্ধ্বে যা তারা তাঁর পবিত্র সত্তার বিরুদ্ধে উত্থাপন করে থাকে। তারা কি মনে করে, তারা কেবল মৌখিক দাবি করেই পার পেয়ে যাবে

আর তাদের কোন পরীক্ষা করা হবে না? তারা এমন কাজের জন্য প্রশংসা পেতে চায়, যা তারা করে নি। কোন কিছুই খোদার দৃষ্টির আড়ালে নয়। যতক্ষণ কোন কিছুর সংশোধন তিনি না করেন তা সংশোধিত হতে পারে না। তাঁর পক্ষ থেকে যার ওপর প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মোহর লেগে যায় কেউ তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে না।

لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين۔ لا تقف ما ليس لك به علم۔ ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا انهم مغرقون۔ يا ابراهيم اعرض عن هذا انه عبد غير صالح۔ انما انت مذكر وما انت عليهم بمسيطر۔

এই দুঃখে কি তুমি নিজেকে ধ্বংস করে দেবে যে মানুষ কেন ঈমান আনে না? তুমি যে বিষয়ের জ্ঞান রাখ না তাঁর পিছনে পড়ো না। যারা সীমালঙ্ঘনকারী তাদের সম্পর্কে আমার সাথে কথা বলো না; তাদের নিমজ্জিত করা হবে। হে ইব্রাহীম! একে এড়িয়ে চল, সে পুণ্যবান নয়। তুমি কেবল একজন সদুপদেশদাতা, তাদের জন্য দারোগা নও। কিছু লোকের সম্পর্কে এই কয়েকটি এলহাম বিশেষ এলকা হয়েছে। এরপর এই এলহাম হয়েছে যে–

واستعينوا بالصبر والصلٰوة واتخذوا من مقام ابراهيم مصلًّى۔

ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে সাহায্য যাচনা কর আর ‘মাকামে ইব্রাহীম’-কে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ কর। এখানে ‘মাকামে ইব্রাহীম’ বলতে উন্নত নৈতিক গুণাবলী ও খোদার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক বুঝায় অর্থাৎ খোদার ভালোবাসা, খোদার কাছে সমর্পণ, তাঁর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকা এবং বিশ্বস্ততা বুঝায় আর এটিই ইব্রাহীমের সত্যিকার পদমর্যাদা যা উম্মতে মুহাম্মদিয়া অনুসরণের গুণে ও উত্তরাধিকারস্বরূপ লাভ করেছে আর যে ব্যক্তি ইব্রাহীমের বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্ট, তার আনুগত্যও এতেই নিহিত।

يظل ربك عليك و يغيثك و يرحمك۔ و ان لم يعصمك الناس فيعصمك الله من عنده۔ يعصمك الله من عنده و ان لم يعصمك الناس۔

খোদা তা’লা তোমার ওপর স্বীয় রহমতের ছায়া বিস্তার করবেন আর তোমার ফরিয়াদ শুনবেন এবং তোমার প্রতি করুণা করবেন। তোমাকে রক্ষা করার বিষয়ে সকল মানুষও যদি দ্বিধাদ্বন্দ্বের শিকার হয় খোদা তোমায় রক্ষা করবেন। সবাই দ্বিধাদ্বন্দ্বে লিপ্ত হলেও খোদা অবশ্যই স্বীয় সাহায্যের মাধ্যমে তোমাকে রক্ষা করবেন। অর্থাৎ খোদা স্বয়ং তোমাকে সাহায্য করবেন আর তোমার

প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ হওয়া হতে রক্ষা করবেন, অধিকন্তু তাঁর সাহায্য তোমার সাথে থাকবে।

و اذ یمکر بك الذی کفر۔ اوقد لی یاھامان لعلی اطلع الی اله موسی وانی لأظنه من الکاذبین۔

আর স্মরণ কর! যখন অস্বীকারকারী কোন ষড়যন্ত্রের বশবর্তী হয়ে স্বীয় সাথীকে বলে, কোন ফেতনা ও পরীক্ষার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর যেন আমি মূসার খোদা সম্পর্কে অর্থাৎ এ ব্যক্তির খোদা সম্পর্কে অবগত হতে পারি যে, সে কীভাবে তাকে সাহায্য করে আর আদৌ তার সাথে আছে কি-না? কেননা আমি মনে করি, সে মিথ্যাবাদী। এটি ভবিষ্যতে ঘটিতব্য কোন ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত যা অতীতের ঘটনাস্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে।

تبت یدا ابی لھب وتب۔ ما کان له ان یدخل فیھا الا خائفا و ما اصابك فمن اللّٰہ۔

আবু লাহাবের উভয় হাত ধ্বংস হয়ে গেছে আর সে নিজেও ধ্বংস হয়েছে। কোন ভয়ভীতির তোয়াক্কা না করে এভাবে ধৃষ্টতার সাথে একাজে হস্তক্ষেপ করা তার জন্য সঙ্গত ছিল না। আর তুমি যে কষ্টেরই সম্মুখীনই হও না কেন তা খোদার পক্ষ থেকে। এটি কোন ব্যক্তির দুষ্কৃতির দিকে ইঙ্গিত যা লেখালেখি বা তার অন্য কোন কাজের মাধ্যমে তার পক্ষ থেকে প্রকাশ পাবে। সঠিক অর্থ আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

الفتنة ھٰھنا فاصبر کما صبر اولو العزم۔ الا انھا فتنة من اللّٰہ لیحب حبا جما۔ حبا من اللّٰہ العزیز الاکرم عطاءً غیر مجذوذ۔

এখানে ফেতনা রয়েছে। সুতরাং দৃঢ়প্রত্যয়ীরা যেভাবে ধৈর্য ধরেছেন, সেভাবে ধৈর্য ধারণ কর। সাবধান! এই পরীক্ষা খোদার পক্ষ থেকে, যেন তিনি তোমাকে সেই ভালোবাসা দেন যা কিনা সর্বোত্তম। এটি সেই খোদার ভালোবাসা যিনি অতীব সম্মানিত ও অতীব মহান, এ হলো সেই দান যা(র ধারা) কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না।

شاتان تذبحان۔ وکل من علیھا فان۔

দুটো ছাগ জবাই করা হবে আর ভূপৃষ্ঠে এমন কেউ নেই যে, মৃত্যু এড়াতে পারে, অর্থাৎ সকলেই তকদীরের মুখোমুখী হবে আর মৃত্যু হতে কারো নিস্তার নেই; কেউ চারদিন পূর্বে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে আর কেউ পরে তার সাথে গিয়ে যোগ দিয়েছে।

ہمیں مرگ است کزیاران بپوشد روئے یاراں را   بیکدم می کند وقت خزاں فصل بہاراں را

মৃত্যুই বন্ধুর চেহারা বন্ধু হতে আড়াল করে,
এবং নিমিষেই বসন্তকে শরতে পর্যবসিত করে।

ولا تهنوا ولا تحزنوا۔ اليس الله بكاف عبده۔ ألم تعلم ان الله على كل شيء قدير۔ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا۔

অলস হয়ো না আর দুঃখিতও হয়ো না, খোদা আপন বান্দার জন্য যথেষ্ট। তুমি কি জান না, খোদা সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। আর খোদা তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী করবেন–

اوفى الله اجرك و يرضى عنك ربك و يتم اسمك و عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم و انتم لا تعلمون۔

খোদা তোমার প্রতিদান পূর্ণমাত্রায় দিবেন এবং তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন আর তোমার নামকে পূর্ণতা দেবেন। তুমি একটি জিনিসকে পছন্দ করতে পার কিন্তু বাস্তবে তা হয়ত তোমার জন্য অকল্যাণকর। আর হতে পারে তুমি একটি জিনিসকে অপছন্দ কর কিন্তু বাস্তবে তা তোমার জন্য কল্যাণকর। আর খোদা তা'লা যেকোন বিষয়ের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে অবহিত কিন্তু তোমরা অবগত নও।

كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف۔ ان السمٰوت والارض كانتا رتقا ففتقناهما۔ وان يتخذونك الا هزوا۔ اهذا الذى بعث الله۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى اليَّ انما الهكم اله واحد والخير كله فى القراٰ ن لا يمسه الا المطهرون۔ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون۔

আমি এক গুপ্ত ধনভাণ্ডার ছিলাম, পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা করলাম। আকাশ ও পৃথিবী আবদ্ধ ছিল, তাই আমরা এদের উভয়কে খুলে দিলাম। তারা তোমার সাথে হাসি ঠাট্টাই করবে এবং তিরস্কারের ছলে বলবে, সৃষ্টির সংশোধনের জন্য আল্লাহ্ কি একেই নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ প্রকৃতিই যাদের নোংরা তাদের সংশোধনের আশা রেখো না। পুনরায় বলেন, তুমি বল আমি কেবল তোমাদের মত এক মানুষ। আমার প্রতি এই ওহী করা হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা ব্যতীত অন্য কেউ তোমাদের উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র উপাস্য যার সাথে কোন কিছু শরীক করা উচিত নয়। সকল কল্যাণ কুরআনে নিহিত, এটি ছাড়া অন্য কোন

স্থান হতে কল্যাণ লাভ করা সম্ভব নয়। কুরআনের তত্ত্ব কেবল তাদের জন্য উন্মোচিত হয় যাদেরকে খোদা তা'লা স্বহস্তে পবিত্র করেন আর আমি দীর্ঘকাল তোমাদের মাঝে বসবাস করছিলাম তোমরা কি বিবেকবুদ্ধি খাটাবে না?

ہست فرقانِ مبارک از خدا طیب شجر　　نونہال و نیک بوو سایہ دار و پُرزبر

পবিত্র কুরআন খোদার পক্ষ থেকে একটি পবিত্র বৃক্ষ, যা (একাধারে) চারাগাছও, সুরভিতও, ছায়াপ্রদ এবং ফল-সমৃদ্ধও।

میوہ گر خواہی بیا زیر درخت میوہ دار　　گر خردمندی مجنباں بید را بہر ثمر

যদি তুমি ফল চাও তাহলে ফলবান বৃক্ষের নিচে আস, যদি বুদ্ধি থাকে তাহলে ফলের জন্য উইলো গাছকে নেড়ো না।

ور نیاید باورت دروصف فرقان مجید　　حسن آں شاہد بپرس از شاہدان یا خود نگر

যদি তোমার কুরআনের বৈশিষ্ট্যাবলীর ওপর বিশ্বাস না থাকে, তাহলে সেই প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য যারা দেখেছে তাদের জিজ্ঞেস কর বা নিজেই গবেষণা কর।

وانکہ او نامد پےٴ تحقیق و درکین مبتلاست　　آدمی ہرگز نباشد ہست او بدتر زِ خر

কিন্তু যে ব্যক্তি গবেষণার জন্য আসেনি আর বিদ্বেষে লিপ্ত সে আদৌ মানুষ নয় বরং গাধা থেকেও নিকৃষ্ট।

قل ان ھدی اللہ ھو الھدٰی و انّ معی ربّی سیھدین۔ ربّ اغفر وارحم من السمآء۔ ربّ انی مغلوب فانتصر۔ ایلی ایلی لما سبقتنی ایلی اُوس۔

তুমি বল, খোদার পক্ষ থেকে আগত হেদায়েতই প্রকৃত হেদায়েত। আর আমার প্রভু আমার সাথে আছেন, অচিরেই তিনি আমার পথ খুলে দিবেন। হে আমার খোদা! তুমি আকাশ হতে দয়া ও ক্ষমায় ধন্য কর। আমি পরাজয়ের সম্মুখীন, আমার পক্ষ হতে তুমি মোকাবিলা কর। হে আমার খোদা! হে আমার খোদা! তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করেছ? এই এলহামের অর্থাৎ এলি আওস-এর শেষ বাক্য দ্রুততার সাথে নাযেল হওয়ার কারণে অস্পষ্ট থেকে যায় আর এর কোন অর্থ স্পষ্ট হয় নি। সঠিক বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্‌ই রাখেন।

اے خالق ارض و سما بر من در رحمت کشا دانی تو آں دردِ مرا کز دیگراں پنہاں کنم

হে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা! আমার প্রতি রহমতের দ্বার অবারিত কর; তুমি আমার সেই বেদনা সম্পর্কে অবগত যা আমি অন্যদের কাছে গোপন রাখি।

ازبس لطیفی دلبرا در ہر رگ و تارم درا تا چوں بخودیابم ترا دل خوشتر از بستاں کنم

হে বন্ধু! তুমি পরম সূক্ষ্ম, আমার সকল রগ ও স্নায়ুতে প্রবেশ কর, যেন যখন তোমাকে নিজের মাঝে পাবো তখন নিজের হৃদয়কে বাগান থেকেও বেশি উৎফুল্ল করতে পারি।

ور سرکشی اے پاک خو جاں برکنم در ہجر تو زانساں ہمی گریم کزو یک عالمے گریاں کنم

হে পবিত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী! যদি তুমি মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে তোমার বিরহে প্রাণ বিসর্জন দিবো, আর আমি এত কাঁদবো যে, এক বিশ্বকে কাঁদিয়ে তুলবো।

خواہی بقہرم کن جدا خواہی بلطفم رو نما خواہی بکش یا کن رہا کے ترک آں داماں کنم

অসন্তুষ্ট হয়ে আমা থেকে পৃথক হয়ে যাও বা স্নেহপরবশ হয়ে নিজের চেহারা আমাকে দেখাও বা আমাকে মার বা ছেড়ে দাও সেই আঁচল আমি কীভাবে পরিত্যাগ করতে পারি।

এসব ইঙ্গিত বিশেষ স্থানের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

یا عبدالقادر انی معك اسمع و ارٰی غرست لك بیدی رحمتی و قدرتی و نجیناك من الغم و فتناك فتونا۔ لیأتینکم منی ھدی۔ الا ان حزب اللہ ھم الغالبون۔ وما کان اللہ لیعذبھم وانت فیھم وما کان اللہ لیعذبھم وھم یستغفرون۔

হে আব্দুল কাদের! আমি তোমার সাথে আছি, আমি দেখি ও শুনি। আমি তোমার জন্য নিজ হাতে রহমত ও কুদরতকে বা কৃপা ও শক্তিমত্তাকে রোপন করেছি আর তোমাকে দুঃখ হতে মুক্তি দিয়েছি এবং তোমাকে বিশেষভাবে বেছে নিয়েছি। তুমি আমার পক্ষ হতে সাহায্য লাভ করবে। সাবধান! খোদার বাহিনীই জয়যুক্ত হয়। যতক্ষণ তুমি তাদের মাঝে আছ বা যতদিন তারা ইস্তিগফার করবে ততদিন খোদা এমন নন যে, তাদের শাস্তি দিবেন।

انا بدك اللازم انا محييك نفخت فيك من لدنى روح الصدق والقيت عليك محبة منى ولتصنع على عينى كزرع اخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه۔

আমি তোমার অলজ্ঘনীয় মুক্তির পথ। আমি তোমার জীবনদাতা। আমি তোমার মাঝে সত্যের প্রাণ সঞ্চার করেছি। আমার নিজের পক্ষ থেকে তোমার মাঝে ভালোবাসা সঞ্চার করেছি যেন আমার সামনে তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করা হয়। সুতরাং তুমি সেই বীজের ন্যায় অঙ্কুরিত হয়েছ আর তা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এক পর্যায়ে নিজ কাণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে গেছে। এ আয়াতগুলোতে খোদা তা'লার সেসকল সাহায্য ও অনুগ্রহের দিকে ইঙ্গিত, অধিকন্তু সেই উন্নতি, সৌভাগ্য, সম্মান ও মাহাত্ম্যের সংবাদ দেয়া হয়েছে যা ধীরে ধীরে স্বীয় পরম মার্গে পৌঁছবে।

انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرلك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر۔

তোমাকে আমরা প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি অর্থাৎ দান করবো, আর মাঝে যা কিছু অপছন্দনীয় ও কঠিন বিষয়াদি রয়েছে তার কারণ হল, খোদা তা'লা তোমার পূর্বাপরের সকল পাপ ক্ষমা করতে চান। অর্থাৎ খোদা যদি চাইতেন তাহলে উদ্দিষ্ট কাজ কোন কষ্ট ছাড়াই সাধিত হয়ে যেত আর সহজেই মহান বিজয় অর্জন হতো, কিন্তু কষ্টের কারণ হলো, তা যেন পদমর্যাদায় উন্নতি এবং ভুলভ্রান্তির ক্ষমার কারণ হয়। আজকে যখন এই অধম পরিমার্জনের জন্য পাণ্ডুলিপি দেখছিল তখন দিব্যদর্শনে কিছু পৃষ্ঠা হাতে দেয়া হয়েছে, আর তাতে লেখা ছিল, 'বিজয়ের ডঙ্কা বেজে উঠেছে'। এরপর একজন মুচকি হেসে এসকল পৃষ্ঠার বিপরীত দিকে একটি ছবি দেখায় এবং বলে, দেখ! তোমার ছবি কী বলে? দেখার পর এই অধমের চোখে পড়ল, তা অধমেরই ছবি, পোশাক ছিল সবুজ, তবে অত্যন্ত প্রতাপান্বিত, বিজয়ী সশস্ত্র সেনাপতি যেমন হয়ে থাকে। ছবির ডানে-বামে লেখা ছিল– 'হুজ্জাতুল্লাহিল কাদের' ও 'সুলতান আহমদ মুখতার' আর তারিখ ছিল সোমবার, ১৯ জিলহজ্জ ১৩০০ হিজরী মোতাবেক ২২ আক্টোবর ১৮৮৩ এবং ৬ কার্তিক ১৯৪০ বিক্রমী।

اليس الله بكاف عبده فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ اليس الله بكاف عبده فلما تجلّى ربه للجبل جعله دكا۔ والله موهن كيد الكافرين بعد العسر يسر و لله الامر من قبل ومن بعد۔ اليس الله بكاف عبده۔ ولنجعله اية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا قول الحق الذى فيه تمترون۔

খোদা কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? সুতরাং খোদা তা'লা তাকে সেসকল অপবাদ হতে নির্দোষ প্রমাণ করেন যা তাঁর ওপর আরোপ করা হয়েছে আর খোদার দৃষ্টিতে তিনি সম্মানিত ছিলেন। খোদা কি স্বীয় বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? সুতরাং খোদা যখন পাহাড়ে স্বীয় জ্যোতির বিকাশ ঘটালেন তখন তা একে টুকরো টুকরো করে দিলো অর্থাৎ সমস্যার পাহাড় বিজিত হয়। খোদা তা'লা কাফেরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিবেন অধিকন্তু তাদের পরাস্ত ও লাঞ্ছিত করবেন। অস্বচ্ছলতার পর রয়েছে স্বচ্ছলতা। সিদ্ধান্ত পূর্বেও খোদারই ছিল এবং পরেও তাঁরই হবে। খোদা কি স্বীয় বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? আমরা একে মানুষের জন্য রহমতের নিদর্শন প্রমাণ করব; আর এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত পূর্বেই হয়ে গেছে। এটি সেই সত্য কথা, যাতে তোমরা সন্দেহ পোষণ কর।

محمد رسول اللّٰہ والذین معه اشدآء علی الکفار رحماء بینھم۔ رجال لا تلھیھم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللّٰہ۔ متع اللّٰہ المسلمین ببرکاتھم۔ فانظروا الی اٰثار رحمة اللّٰہ۔ وانبئونی من مثل ھؤلآء ان کنتم صٰدقین۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا لن یقبل منه وھو فی الاخرۃ من الخاسرین۔

মুহাম্মদ (সা.) খোদার রসূল। আর যারা তার সাথে আছে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর অর্থাৎ কাফেররা তাদের সামনে নির্বাক ও ব্যর্থ আর তাদের সত্যতার প্রতাপ কাফেরদের হৃদয়ে বিরাজমান। পরস্পরের প্রতি তারা দয়ার্দ্রচিত্ত। তারা এমন সুপুরুষ, ব্যবসাবাণিজ্য যাদেরকে খোদার স্মরণ থেকে উদাসীন করতে পারে না আর ক্রয়বিক্রয়ও এদের পথে বাদ সাধে না। অর্থাৎ খোদাপ্রেমে তারা এমন পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন যে, জাগতিক ব্যস্ততা যত বেশিই হোক না কেন তা তাদের সঠিক জীবন পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। খোদা তা'লা তাদের কল্যাণে মুসলমানদের উপকৃত করবেন। সুতরাং তাদের আবির্ভাব ঐশী আশীর্বাদের স্বরূপ হয়ে থাকে। অতএব এসকল লক্ষণ দেখ! আর যদি এদের কোন দৃষ্টান্ত তোমাদের কাছে থাকে অর্থাৎ যদি তোমাদের সমমনা ও স্বধর্মীয়দের মাঝে এমন মানুষ থাকে যারা এভাবে ঐশী সাহায্যে ধন্য হয়ে থাকে, তাহলে এমন মানুষ নিয়ে আস, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের প্রত্যাশী ও সন্ধানী হবে, সে ধর্ম তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না, আর পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

يا احمد فاضت الرحمة على شفتيك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر۔ واقم الصلوة لذكرى۔ انت معى وانا معك۔ سرك سرى۔ وضعنا عنك وزرك الذى انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ انك على صراط مستقيم۔ وجيها فى الدنيا والأخرة و من المقربين۔

হে আহমদ! তোমার ওষ্ঠাধর হতে রহমত উৎসারিত হয়েছে। আমরা তোমাকে প্রভূত তত্ত্বজ্ঞান দান করেছি। সুতরাং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে নামায পড় এবং ত্যাগ স্বীকার কর। তুমি আমার সাথে রয়েছ আর আমি তোমার সাথে। তোমার রহস্য আমার রহস্য। আমরা সেই বোঝা অপসারণ করেছি যা তোমার কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে এবং তোমার নামকে সমুন্নত করেছি। তুমি সঠিক পথে আছ। ইহলোক ও পরলোকে তুমি সম্মানিত ও নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

حماك الله۔ نصرك الله۔ رفع الله حجّة الاسلام جمال۔ هو الذى امشاكم فى كل حال۔ لا تحاط اسرار الاولياء۔

খোদা তোমার তত্ত্বাবধান করবেন। খোদা তোমায় সাহায্য করবেন। খোদা ইসলামের সত্যতার প্রমাণকে সমুন্নত করবেন। ঐশী জামাল বা সৌন্দর্যই সর্বাবস্থায় তোমাকে পরিচ্ছন্ন করেছে। স্বীয় বন্ধু বা ওলীদের ক্ষেত্রে খোদা তা'লার যে রহস্য রয়েছে তা আয়ত্বের বাইরে। কেউ একভাবে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয় আবার কেউ ভিন্নভাবে। ইয়াকুব গ্রেফতার হয়ে সেই মর্যাদা পেয়েছে, যা অন্যরা সবকিছু বিসর্জন দিয়ে লাভ করে। এটি এ কথার প্রতি ইঙ্গিত যে, খোদা তা'লায় দুটো বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা বান্দার তরবিয়ত বা সুশিক্ষায় নিয়োজিত, একটি বৈশিষ্ট্য হলো কোমলতা, স্নেহ ও অনুগ্রহ; যাকে বলা হয় 'জামাল'। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো ক্রোধ ও কঠোরতা, এর নাম হলো 'জালাল'। সুতরাং খোদার চলমান রীতি হলো যারা তাঁর মহান দরবারে আহূত হয় তাদের তরবিয়ত কোন সময় জামালী বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে হয় আবার কখনো জালালী বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে। যেখানে মহাসম্মানিত খোদার সুমহান স্নিগ্ধ-কোমল স্নেহ ও ভালোবাসা সক্রিয় হয় সেখানে সদা জামালী গুণের বিকাশ বা প্রতিফলন ঘটতে থাকে। কিন্তু কখনো কখনো জালালী বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেও বিশেষ বান্দাদের সংশোধন ও তরবিয়ত করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যেমন, খোদার নবীদের সাথেও খোদার এ চলমান রীতি এটিই যে, সদা খোদার জামালী গুণাবলী তাদের তরবিয়তে নিয়োজিত থাকে কিন্তু কখনো কখনো তাদের দৃঢ়চিত্ততা ও উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী প্রকাশের জন্য জালালী

গুণাবলীও প্রকাশিত হয়ে আসছে আর তারা দুষ্কৃতকারীদের হাতে বিভিন্ন প্রকার দুঃখ পেয়ে থাকেন, যেন তাদের সেসব উৎকৃষ্ট চারিত্রিক গুণাবলী প্রকাশ পেয়ে যায় যা প্রাণান্তকর কষ্টের সম্মুখীন হওয়া ছাড়া প্রকাশ পেতে পারে না আর যেন পৃথিবীর মানুষ জানতে পারে, তারা অপরিপক্ক নয় বরং সত্যিকার অর্থে বিশ্বস্ত।

وقالوا انّٰى لك هذا ان هذا الا سحر يؤثر۔ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة۔ لا يصدق السفيه الا سيفة الهلا ك۔ عدو لى و عدو لك قل اتى امر الله فلا تستعجلوه۔ اذا جاء نصرالله الست بربكم قالوا بلٰى۔

আর তারা বলবে তুমি এটি কোথায় পেলে? এটি এক জাদু বৈ কিছু নয় যা অন্যের অনুকরণে অবলম্বন করা হয়। আমরা তোমাকে আদৌ মেনে নেবো না যতক্ষণ খোদাকে স্বচক্ষে না দেখব। নির্বোধরা ধ্বংসাত্মক আঘাত ছাড়া কোন কিছু মেনে নেয় না। সে আমার এবং তোমার শত্রু। তুমি বল, খোদার নির্দেশ আসছে সুতরাং তোমরা তাড়াহুড়া করো না। যখন খোদার সাহায্য আসবে তখন বলা হবে, আমি কি তোমাদের খোদা নই? তখন তারা বলবে কেন নয়?

اني متوفيك ورافعك اليَّ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيٰمة ولا تهنوا ولا تحزنوا و كان الله بكم رءُوفًا رحيما۔ الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ تموت وانا راض منك فادخلوا الجنة ان شاء الله اٰمنين۔ سلام عليكم طبتم فادخلوها اٰمنين۔ سلام عليك جعلت مباركا۔ سمع الله انه سميع الدعاء انت مبارك في الدنيا والاخرة۔ امراض الناس وبركاته ان ربك فعال لما يريد۔ اذكر نعمتي التي انعمت عليك وانى فضلتك على العلمين۔ ياايتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضيةً فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى۔ منَّ ربكم عليكم و احسن الى احبابكم وعلمكم مالم تكونوا تعلمون۔ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها۔

আমি তোমাকে পূর্ণ নেয়ামত দান করব এবং আমার দিকেই উন্নীত করব। যারা তোমার আনুগত্য করবে অর্থাৎ সত্যিকার অর্থে খোদা ও রসূলের অনুসারীদের মাঝে প্রবেশ করবে তাদেরকে তাদের অস্বীকারকারী শত্রুদের ওপর কেয়ামত পর্যন্ত জয়যুক্ত রাখব। অর্থাৎ যুক্তি ও প্রমাণের দিক থেকে তারা স্বীয় বিরোধীদের বিরুদ্ধে জয়যুক্তই থাকবে। আর সততা ও নিষ্ঠার সমুজ্জ্বল জ্যোতি তাদের সাথে থাকবে। অতএব অলস হয়ো না আর দুঃখ করো না।

খোদা তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। শোন! নিশ্চয় যারা খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকে তাদের কোন ভয় নেই আর তারা দুঃখিতও হয় না। তুমি এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে যখন খোদা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। সুতরাং তুমি নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে, ইনশাআল্লাহ। তোমার প্রতি শান্তি। তুমি শিরক থেকে মুক্ত হয়ে গেছ তাই তুমি শান্তিপূর্ণভাবে জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমার প্রতি শান্তি, তোমাকে কল্যাণমণ্ডিত করা হয়েছে। খোদা তা'লা দোয়া গ্রহণ করেছেন। তিনি দোয়া গ্রহণ করেন। তুমি ইহ ও পরকালে কল্যাণমণ্ডিত, এ কথার মাধ্যমে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এর পূর্বে খোদা তা'লা কয়েকবার এলহামে এ অধমের মুখে এই দোয়া জারি করেছেন যে,

رب اجعلنی مبارکا حیثما کنت۔

অর্থাৎ হে আমার প্রভু! আমাকে এমনভাবে কল্যাণমণ্ডিত কর যে, আমি যেখানেই থাকি না কেন, কল্যাণ যেন আমার সাথে বিরাজিত থাকে। এরপর খোদা তা'লা স্বীয় অনুগ্রহ ও স্নেহবশতঃ সেই দোয়া গ্রহণ করেছেন যা তিনি নিজেই শিখিয়েছেন। আর এটি স্বীয় দাসকে অনুগ্রহ ও দানে ধন্য করার এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত, অর্থাৎ এলহাম হিসেবে প্রথমে তাঁর নিজের পক্ষ থেকে মুখে একটি প্রশ্ন জারি করিয়ে দেয়া আর এরপর এটি বলা যে, তোমার চাহিদা পূরণ করা হলো। আর এই কল্যাণ সম্পর্কে ১৮৬৮ বা ১৮৬৯ সনেও উর্দু ভাষায় একটি বিস্ময়কর এলহাম হয় যা এখানে লিপিবদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়। এই এলহামের যে কারণ সামনে আসে তাহলো, মৌলভী আবু সাঈদ মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী, যিনি কোন সময় এ অধমের সহপাঠীও ছিলেন, তিনি মৌলভী পাশ করে সবেমাত্র বাটালায় আসেন আর বাটালা নিবাসীদের দৃষ্টিতে তার ধ্যানধারণা অসহনীয় মনে হয়। তখন এক ব্যক্তি উক্ত মৌলভী সাহেবের সাথে কোন বিতর্কিত বিষয়ে মুনাযিরা বা বিতর্কের জন্য এ অধমকে বাধ্য করে। তার বারংবার জোর দেয়ার কারণে এই অধম সন্ধ্যার পর সেই ব্যক্তির সাথে জনাব মৌলভী সাহেবের ঘরে যায় এবং মৌলভী সাহেবকে তার পিতার সাথে মসজিদে পায়। সারকথা হলো, এই অধম তখন মৌলভী সাহেবের বক্তৃতা শুনে বুঝতে পারে যে, তার বক্তৃতায় এমন কোন অত্যুক্তি নেই যা আপত্তিকর বিবেচিত হতে পারে। তাই সম্পূর্ণভাবে খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে এই বিতর্ক পরিহার করা হয়। রাতে মহাসম্মানিত খোদা স্বীয় এলহাম ও সম্বোধনে এই বিতর্ক পরিহারের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, তোমার প্রভু

তোমার এ কাজে সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তিনি তোমাকে প্রভূত কল্যাণে ভূষিত করবেন; এমনকি বাদশাহ্‌রা তোমার পোশাকে বরকত অন্বেষণ করবে। এর পর দিব্যদর্শনে সেসকল বাদশাহ্‌কে দেখানো হয়েছে যারা ঘোড়ার পিঠে আসীন ছিলেন। যেহেতু সম্পূর্ণভাবে খোদা ও তাঁর রসূলের জন্য বিনয় ও নম্রতার পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে তাই পরম অনুগ্রহশীল খোদা তাকে প্রতিদানশূন্য রাখতে চান নি فتدبّروا و تفكّروا ।

এরপর বলেন, 'মানুষের ব্যাধি এবং খোদার কল্যাণরাজি' অর্থাৎ কল্যাণমণ্ডিত করার লাভ হলো, এর ফলে মানুষের আধ্যাত্মিক ব্যাধি দূর হবে আর যারা পুণ্যবান তারা তোমার কথার মাধ্যমে হেদায়েত পাবে। অনুরূপভাবে দৈহিক ব্যাধি এবং কষ্টও (দূর হবে) যার সাথে অটল তকদীরের কোন সম্পর্ক নেই। পুনরায় বলেন, তোমার প্রভু সর্বশক্তিমান, তিনি যা চান করেন এবং আরো বলেন, খোদার নেয়ামতের কথা স্মরণ রাখ। আমি তোমাকে সমসাময়িক যুগের সকল আলেমের ওপর প্রাধান্য দান করেছি। এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, এই শ্রেষ্ঠত্ব তোফায়লী (অর্থাৎ কারো কল্যাণে কারো ওপর নির্ভর করে) এবং আংশিক হবে অর্থাৎ যে ব্যক্তি হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্য করে খোদার দৃষ্টিতে তার মর্যাদা তার সমসাময়িক যুগের সকল মানুষের চেয়ে বড় ও মহান। অতএব প্রকৃত ও পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব সম্পূর্ণভাবে খোদার পক্ষ থেকে হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর অনুকূলে প্রমাণিত। বাকি সকলেই তাঁর (সা.) আনুগত্যে ও তাঁর ভালোবাসার কল্যাণে আনুগত্য ও ভালোবাসায় নিবেদিত থাকার মান অনুসারে পদমর্যাদা লাভ করে فما اعظم شان كماله اللّٰهم صل عليه واله । এরপর এলহামের অবশিষ্টাংশের অনুবাদ হলো, হে খোদার সত্তায় শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা! স্বীয় প্রভুর পানে ফিরে আস। তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট আর তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এরপর আমার বান্দাদের মাঝে প্রবেশ করো আর আমার জান্নাতে এসে যাও। খোদা তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন আর তোমার বন্ধুদের প্রতি সদয় হয়েছেন আর তোমাকে সেই জ্ঞান দান করেছেন, যা অর্জন তোমার নিজের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর তুমি যদি খোদার নিয়ামতরাজি গণনা করতে চাও, তাহলে এটি তোমার পক্ষে অসম্ভব। এসব এলহামের পর কিছু এলহাম ফার্সি এবং উর্দু ভাষায় হয়েছে আর একটি হয়েছে ইংরেজী ভাষায়। অন্বেষীদের উপকারার্থে তাও লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে আর তা হলো–

بخرام کہ وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیاں بر منار بلند تر محکم افتاد۔

তুমি আনন্দিত হও। তোমার সময় সন্নিকটে আর মুহাম্মদীদের পা সুউচ্চ মিনারে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। পবিত্র মুহাম্মদ (সা.) নবীদের সর্দার। খোদা তোমার সকল কর্মকাণ্ড সঠিক খাতে পরিচালিত করবেন আর তোমার সকল অভীষ্ট তোমাকে দান করবেন। ফিরিশতা বাহিনীর প্রভু সেদিকে দৃষ্টি দিবেন। এসব নিদর্শনের উদ্দেশ্য হলো, পবিত্র কুরআন যে খোদার গ্রন্থ এবং আমার মুখনিঃসৃত কথা (তা প্রমাণ করা)। খোদার অনুগ্রহের দ্বার উন্মুক্ত আছে আর তাঁর পবিত্র রহমত এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে।

The days shall come when God shall help you. Glory be to this Lord God, Maker of earth and heaven.

সেদিন সন্নিকটে যখন খোদা তোমাকে সাহায্য করবেন। আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা মহাপ্রতাপান্বিত খোদার এসকল এলহামের পর, পণ্ডিত দিয়ানন্দের অনুসারী কয়েকজন আর্য ব্যক্তির সামনে এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে যার অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া পাঠকদের জন্য অর্থহীন হবে না। অতএব তা লিখতে গিয়ে কলেবর বৃদ্ধি পেলেও ইসলামের মাহাত্ম্য সম্পর্কে অনবহিতদের মঙ্গলের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তা লেখা হচ্ছে। এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার পূর্বে অদ্ভুত ধরনের এক সমস্যা ও কষ্টদায়ক পরিস্থিতি সামনে এসেছে। অবশেষে খোদা তা'লা এসব সমস্যা দূরীভূত করে ১৮৮৩ সনের ১০ সেপ্টেম্বর সোমবার এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেছেন। এর বিশদ বিবরণ হলো ০৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার খোদা তা'লা একান্ত প্রয়োজনের সময় এই অধমকে আশ্বস্ত করার জন্য স্বীয় আশিসময় বাণীর মাধ্যমে এই শুভসংবাদ দিয়েছেন যে, বিশ এবং এক রুপি আসতে যাচ্ছে। যেহেতু এই শুভসংবাদে একটি অভিনব দিক হলো, এতে আগত রুপির পরিমাণ সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করা হয়েছে আর কোন বিশেষ সংখ্যা সম্পর্কে অবহিত করা অদৃশ্যে জ্ঞাত সত্তার বিশেষত্ব, অন্য কারো পক্ষে তা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় মহাবিস্ময়কর বিষয় ছিল, এই সংখ্যা ছিল অপরিচিত রীতির, কেননা গ্রন্থের নির্ধারিত মূল্যের সাথে এই সংখ্যার কোন সম্পর্ক ছিল না।

সুতরাং এসকল বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যের কারণে এই এলহাম পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কতক আর্যকে জানিয়ে দেয়া হয়। পুনরায় নিশ্চয়তাস্বরূপ ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ তারিখে তৃতীয়বার এলহাম হয়, ২০ (বিশ) এবং ১ (এক) রুপি এসেছে, যা থেকে বুঝা যায় যে, আজ এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবে। অতএব এলহাম

হওয়ার পর খুবসম্ভব তিন মিনিটের অধিক সময় অতিক্রান্ত হয় নি, উযির সিং নামে এক ব্যক্তি রুগী নিয়ে আসে আর সে আসতেই এক রুপি নযরানা দেয়। যদিও চিকিৎসা করা এই অধমের পেশা নয় আর ঘটনাক্রমে কোন রুগী আসলেও যদি তার ঔষধ জানা থাকে তাহলে সম্পূর্ণভাবে পুণ্যের উদ্দেশ্যে খোদার জন্য ও তাঁর সন্তুষ্টির মানসে তা দেয়া হয়ে থাকে, কিন্তু সেই রুপি তার কাছ থেকে নেয়ার কারণ হলো তাৎক্ষণিকভাবে হৃদয়ে এ ধারণা জাগ্রত হওয়া যে, এটি সেই ভবিষ্যদ্বাণীর একটি অংশ। এরপর এ ধারণার বশবর্তী হয়ে এক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে ডাকঘরে পাঠানো হয় যে, হয়ত দ্বিতীয় অংশ ডাকঘরের মাধ্যমে পূর্ণ হবে। ডাকঘরের ডাক-মুন্সী, যিনি একজন হিন্দু, উত্তরে বলেন, আমার কাছে কেবল ৫ রুপির একটি মানি অর্ডার রয়েছে যার সাথে একটি কার্ডও নথি করা আছে যা এসেছে ডেরাগাজী খাঁন থেকে। আমার কাছে এখন অন্য কোন রুপি নেই, এলে হস্তান্তর করব। এ সংবাদ শুনে গভীরভাবে আশ্চর্যান্বিত হই আর এমন উৎকণ্ঠা দেখা দেয় যা ভাষায় বর্ণনা করার মত নয়। অতএব এই সংশয়ের মাঝেই অধম হাঁটুতে মাথা রেখে বসেছিল আর ভাবছিল যে, ৫ এবং ১ মিলে ছয় হলো, এখন ২১ কী করে হবে? হে আমার প্রভু! এটি কী হলো? এই ভাবনায় নিমজ্জিত থাকা অবস্থায় এই এলহাম হলো ২০ ও ১ রুপি এসেছে, এতে সন্দেহ নেই। এই এলহাম হওয়ার পর দ্বিপ্রহর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই সেদিনই এক আর্য ডাক ঘরে যায় যে ডাক-মুন্সীর প্রথম বর্ণনা শুনেছে আর তাকে ডাক-মুন্সী কোন কথার প্রেক্ষিতে সংবাদ দেয় যে, আসলে ২০ রুপি এসেছে আর প্রথমে আমি যে ৫ রুপি বলেছি তা আসলে মুখ ফসকে কথার ছলে বেরিয়ে গিয়েছিল। অতএব, সেই আর্যই এক কার্ডসহ ২০ রুপি নিয়ে আসে, যা একাউন্টেন্ট মুন্সী এলাহী বখশ সাহেবের পক্ষ থেকে প্রেরিত ছিল। জানা যায় যে, সেই কার্ডও মানি অর্ডারের কাগজের সাথে নথি করা ছিল না। একই সাথে এটিও জানা যায় যে, রুপি পূর্বেই এসেছিল। এছাড়া ডাকঘর থেকেই পাওয়া, মুন্সী এলাহী বখশ সাহেবের লেখা থেকে, এটিও জানা যায় যে, মানি অর্ডার ১৮৮৩ সনের ৬ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ যেদিন এলহাম হয়েছিল সেদিনই কাদিয়ান পৌঁছে গিয়েছিল। সুতরাং পোস্ট মাস্টারের সকল হিসাব ভুল প্রমাণিত হয় আর মহাসম্মানিত খোদার সকল কথা সত্য প্রমাণিত হয়। সুতরাং এই আশিসময় দিনের স্মরণে এক রুপির মিষ্টি ক্রয় করে আর্য সম্প্রদায়ের কতককে খাইয়েও দেয়া হয়।

فالحمد للّٰہ علی اٰلآئہ و نعمآئہ ظاھرھا و باطنھا

اے خدا اے چارۂ آزار ما اے علاج گریہ ہائے زار ما

হে খোদা, হে আমাদের দুঃখের মহৌষধ, হে আমাদের ক্রন্দন ও আহাজারির আরোগ্য!

اے تو مرہم بخش جانِ ریش ما اے تو دلدارِ دلِ غم کیش ما

হে তুমি! যিনি আমাদের ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে মলম লেপনকারী, হে তুমি! যিনি আমাদের দুখঃভারাক্রান্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা দাতা।

از کرم برداشتی ہر بار ما واز تو ہر بار و برِ اشجار ما

তুমি অনুগ্রহবশত আমাদের সকল বোঝা বহন করেছ, আর আমাদের গাছের সকল প্রকার ফলফলাদি তোমারই অনুগ্রহে।

حافظ و ستاری از جود و کرم بیکساں را یاری از لُطفِ اتم

তুমিই উদারতা ও বদান্যতাবশত আমাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী ও দুর্বলতা গোপনকারী আর পরম মেহেরবানীবশত অসহায়দের প্রতি সহানভূতিশীল তুমিই।

بندۂ درماندہ باشد دل طپاں ناگہاں درماں براری ازمیاں

বান্দা যখন দুঃখভারাক্রান্ত ও অস্থির হয়ে যায় তখন তুমি হঠাৎ করে সেখান থেকেই আরোগ্যের বিধান কর।

عاجزی را ظلمتے گیرد براہ ناگہاں آری برو صد مہر و ماہ

যখন কোন অসহায় বান্দাকে পথে অন্ধকার ঘিরে ফেলে তখন তুমি হঠাৎ করে তার জন্য শতশত চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টি করে দাও।

حسن و خلق و دلبری بر تو تمام صحبتی بعد از لقائے تو حرام

সৌন্দর্য ও সাহসিকতার বৈশিষ্ট্য তোমাতেই পরিপূর্ণতা পেয়েছে। তোমার সাক্ষাত লাভের পর কারো সাথে সম্পর্ক নিষিদ্ধ।

آں خرد مندی کہ او دیوانہ ات شمع بزم است آنکہ او پروانہ ات

সেই বুদ্ধিমান যে তোমার জন্য পাগল, সে-ই সভা বা বৈঠকের প্রদীপ যে তোমার প্রেমে পাগল।

ہر کہ عشقت در دل و جانش فتد ناگہاں جانے در ایمانش فتد

প্রত্যেক সে ব্যক্তি যার অন্তরাত্মায় তোমার প্রেম প্রবেশ করে তখন তাৎক্ষণিকভাবে তার ঈমানে শক্তি এসে যায়।

عشق تو گردد عیاں بر روئے او بوئے تو آید زبام و کوئے او

তোমার প্রেম তার চেহারায় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় আর তার ঘরদোরে ও গলিতে তোমার সৌরভ পাওয়া যায়।

صد ہزاراں نعمتش بخشی ز جود مہر ومہ را پیشش آری در سجود

তুমি অনুগ্রহ করে তাকে লক্ষ লক্ষ নেয়ামত দান করো, সূর্য ও চন্দ্রকে তার সামনে সেজদাবনত কর।

خود نشینی از پئے تائید او روئے تُو یاد اوفتد از دید او

তাকে সাহায্য করার জন্য তুমি স্বয়ং প্রস্তুত হয়ে যাও, তাকে দেখলে তোমার চেহারা মনে পড়ে।

بس نمایاں کارہا کاندر جہاں می نمائی بہر اکرامش عیاں

এ তুমি পৃথিবীতে আশ্চর্যজনক সব কাজ করে থাক তার সম্মান প্রকাশার্থে।

خود کنی و خود کنانی کار را خود دہی رونق تو آں بازار را

তুমি নিজেই কাজ করো আর নিজেই করাও তুমি স্বয়ং সেই বাজারকে সৌন্দর্য দিয়ে থাক।

خاک را در یکدمے چیزے کنی کز ظہورش خلق گیرد روشنی

মাটিকে তুমি নিমিষে (মূল্যবান) জিনিসে পরিণত করো যেন তার আবির্ভাবে সৃষ্টি আলো লাভ করে।

بر کسی چوں مہربانی میکنی از زمینی آسمانی میکنی

যখন তুমি কারো প্রতি অনুগ্রহ করো, তাকে তুমি মর্ত্যীয় হতে স্বর্গীয় সত্তায় পরিণত কর।

صد شعاعش می دہی چوں آفتاب تا نماند طالبِ دیں در حجاب

তাকে সূর্যের ন্যায় তুমি শতশত কিরণ দাও, যেন ধর্মের সন্ধানী অন্ধকারে না থেকে যায়।

تاز تاریکی برآید عالمے تا نشاں یابند از کویت ہمے

যেন এক পুরো বিশ্ব অন্ধকার হতে বেরিয়ে আসে যেন মানুষ তোমার গলির সংবাদ পায়।

زیں نشانہا بدرگان کور و کراند صد نشاں بینند و غافل بگذرند

কিন্তু দুষ্কৃতকারীরা এসকল নিদর্শন সম্পর্কে অন্ধ ও বধির, তারা শত শত নিদর্শন দেখে আর ঔদাসীন্যবশত (অবজ্ঞার সাথে) চলে যায়।

عشق ظلمت دشمنی باآفتاب شب پرانِ سرمدی جان در حجاب

তারা অন্ধকারের প্রতি ভালোবাসা রাখে আর সূর্যের সাথে শত্রুতা রাখে, তারা চিরস্থায়ী বাদুড় আর তাদের জীবন অন্ধকারের পর্দায় আচ্ছন্ন।

آں شہِ عالم کہ نامش مصطفی سیدِ عشاق حق شمس الضحیٰ

তিনি সমগ্র পৃথিবীর বাদশাহ্ যার নাম মুস্তফা (সা.) তিনি খোদাপ্রেমিদের সর্দার, উজ্জ্বল সূর্য।

آنکہ ہر نورے طفیل نور اوست آنکہ منظور خدا منظور اوست

তিনি তিনিই, যার আলো হতে সকল আলো উৎসারিত, তিনি সেই (রসূল), যাকে তিনি ভালোবাসেন খোদাও তাকে ভালোবাসেন।

آنکہ بہرِ زندگی آبِ رواں در معارف ہمچو بحر بیکراں

তিনি জীবনের জন্য প্রবহমান পানি, তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি অকূল সমুদ্র।

آنکہ بر صدق و کمالش در جہاں صد دلیل و حجت روشن عیاں

তিনি সেই সত্তা যার সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হিসেবে পৃথিবীতে শত শত যুক্তি ও উজ্জ্বল প্রমাণাদি বিরাজমান।

آنکہ انوارِ خدا بر روئے او مظہر کارِ خدائے کوئے او

তিনিই সেই সত্তা যার চেহারায় খোদার জ্যোতি বিরাজমান, যার গলি ঐশী নিদর্শনাবলীর বিকাশস্থল।

آنکہ جملہ انبیاء و راستاں خادمانش ہمچو خاکِ آستاں

তিনি সেই সত্তা সকল নবী ও খোদাভীরু মানুষ যার আস্তানার ধুলা হিসেবে তাঁর সেবায় নিয়োজিত।

آنکہ مہرش میرساند تا سما میکند چوں ماہِ تاباں درصفا

তিনি সেই সত্তা যার ভালোবাসা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়, আর স্বচ্ছতায় চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল বানিয়ে দেয়।

میدہد فرعونیاں را ہر زماں چوں ید بیضائے موسیٰ صد نشاں

তিনি ফেরাউনিদের সকল যুগে মূসার শুভ্র হাতের ন্যায় শতশত নিদর্শন দেখান।

آں نبی در چشم ایں کوران زار ہست یک شہوت پرست و کیں شعار

সেই নবী, এই দুর্ভাগা অন্ধদের দৃষ্টিতে একজন রিপু-পূজারি ও প্রতিশোধপ্রবণ ব্যক্তি।

شرمت آید اے سگ ناچیز وپست می نہی نامِ یلاں شہوت پرست

হে হীন ও ইতর কুকুর! লজ্জা করো, তুই বীরদের নাম রিপু-পূজারি রাখছিস।

ایں نشانِ شہوتی ہست اے لئیم کز رخش رخشاں بود نور قدیم

হে ইতর! এটি কি একজন রিপু-পূজারির লক্ষণ যে, তাঁর চেহারায় চিরস্থায়ী আলো ঝলমল করে।

در شبی پیدا شود روزش کند درخزاں آید دل افروزش کند

তিনি রাতে এসেছেন আর তাকে দিনে পর্যবসিত করেছেন, শরতে এসে তাকে মনোমুগ্ধকর করেছেন বা বসন্তে রূপান্তরিত করেছেন।

مظہرِ انوارِ آں بیچوں بود در خرد از ہر بشر افزوں بود

যে সেই অনন্য খোদার জ্যোতির বিকাশস্থল আর বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে সবার চেয়ে এগিয়ে।

اتباعش آں دہد دل را کشاد کش نہ بیند کس بصد سالہ جہاد

যার অনুসরণ হৃদয়ে এমন প্রশান্তি দেয় যে, কেউ শতবছর জিহাদ করেও তা পায় না।

اتباعش دل فروزد جاں دہد جلوۂ از طاقتِ یزداں دہد

তাঁর অনুসরণ হৃদয়কে আলোকিত করে ও প্রাণসঞ্চার করে, ঐশী শক্তিমত্তার বিকাশ ঘটায়; এর অনুসরণ হৃদয়কে জ্যোতির্মণ্ডিত করে আর গোপন বন্ধু সম্পর্কে অবহিত করে।

اتباعش سینہ نورانی کند باخبر از یار پنہانی کند

তাঁর অনুসরণ হৃদয়কে আলোকিত করে এবং সেই গোপন বন্ধু সম্পর্কে অবহিত করে।

منطق او از معارف پُر بود ہر بیانِ او سراسر دُر بود

যার কালাম বা গ্রন্থ সত্য ও তত্ত্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ যার প্রতিটি উক্তি খাঁটি মণিমুক্তা।

از کمالِ حکمت و تکمیل دیں پا نہد بر اوّلین و آخریں

পরম প্রজ্ঞা ও ধর্মের সম্পূর্ণতার দিক থেকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সর্দার।

و از کمال صورت و احسن اتم☆ جملہ خوباں را کند زیر قدم

পরম সৌন্দর্য ও গুণে পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্বের কারণে সকল সুন্দর লোকের স্থান তার পদতলে।

تابعش چوں انبیا گردد ز نور نورش افتد برہمہ نزدیک و دور

তাঁর অনুসারী জ্যোতির কারণে নবীদের ন্যায় হয়ে যায়, কাছের-দূরের সবার ওপর তার আলো পড়ে।

شیر حق پُر ہیبت از ربّ جلیل دشمنان پیشش چو روباہ ذلیل

মহাপ্রতাপান্বিত খোদার পক্ষ থেকে সত্যের প্রতাপান্বিত সিংহ, তার সামনে শত্রুরা লাঞ্ছিত শিয়ালের ন্যায়।

ایں چنیں شیرے بود شہوت پرست ہوش کن اے روبہی ناچیز وپست

এমন সিংহ কি রিপু-পূজারি হতে পারে? হে ইতর ও তুচ্ছ শিয়াল! বিবেক-বুদ্ধি খাটা।

چیستی اے کورکِ فطرت تباہ طعنہ بر خوباں بدیں روئے سیاہ

হে নোংরা প্রকৃতির অধিকারী অন্ধ! তোর গুরুত্বইবা কী, যে তুই সুন্দর লোকদের প্রতি এই কালো মুখ নিয়ে কটাক্ষ করছিস?

* টীকা: মনে হয় মুদ্রণজনিত ত্রুটি হয়েছে। সম্ভবত সঠিক পঙ্‌ক্তিটি হবে–
وز کمالِ صورت و حُسنِ اتم (প্রকাশক)

شہوتِ شاں از سر آزادی است نے اسیرِ آں چو تو آں قوم مست

এসব সুন্দর লোকের চাওয়াপাওয়া স্বাধীনতার কারণে, খোদার ভালোবাসায় মত্ত সেই জাতি তোমার মত রিপুর হাতে বন্দি নয়।

خود نگہ کن آں یکے زندانی است واں دگر داروغۂ سلطانی است

তুমি চিন্তা করো, এক ব্যক্তি বন্দিদশায় আছে, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কারাগারের রাজ দারোগা,

گرچہ در یکجاست ہر دو را قرار لیک فرقی ہست دوری آشکار

যদিও উভয়েই একই স্থানে অবস্থান করে, কিন্তু উভয়ের পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট।

کار پاکاں بر بداں کردن قیاس کارِ ناپاکاں بود اے بدحواس

পবিত্রদের কাজকে পাপীদের মাপকাঠিতে অনুমান করা, হে কাণ্ডজ্ঞানহীন! এটি অপবিত্রদের রীতি।

کاملاں کز شوق دلبر می روند باد و صد بارے سبکتر می روند

কামেল মানুষ যারা বন্ধুর সাক্ষাতের অধীর আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে চলেছে, তারা দুশত বোঝা উঠিয়েও ক্ষীপ্র পদচারণায় চলে।

ایں کمال آمد کہ با فرزند و زن از ہمہ فرزند و زن یکسو شدن

শ্রেষ্ঠত্ব হলো, স্ত্রী-সন্তান থাকা সত্ত্বেও পরিবার-পরিজন সবার থেকে পৃথক।

در جہان و باز بیرون از جہان بس ہمیں آمد نشانِ کاملاں

পৃথিবীতে থেকে পৃথিবী থেকে পৃথক থাকা এটিই শ্রেষ্ঠ লোকদের নিদর্শন।

چوں ستوری زیر بار افتد بسر در تہی رفتن سریع و تیز تر

যখন কোনো ঘোড়া বোঝা চাপালে মুখ ধুবড়ে পড়ে, কিন্তু বোঝাশূন্য অবস্থায় দ্রুত দৌঁড়ায় আর চালাক হয়ে থাকে,

ایں چنیں اسپی کجا آید بکار نابکارست ایں در اسپانش مدار

এমন ঘোড়া কোন্ কাজের? এ তো অকর্মণ্য; একে ঘোড়াদের অন্তর্ভুক্ত করো না।

اسپ آں اسپ است کو بارِ گران   می کشد ہم میردو بس خوش عنان

কাজের ঘোড়া সেটি যা ভারী বোঝা বহন করে আর তা সত্ত্বেও সুন্দর চালে চলে।

کاملے گر زن بدارد صد ہزار   صد کنیزک صد ہزاراں کاروبار

যদি কোন কামেল মানবের এক লক্ষ স্ত্রী থাকে, শতশত দাসী থাকে আর লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসাবাণিজ্যও থাকে,

پس گر افتد در حضورِ او فتور   نیست آں کامل ز قربت ہست دور

কিন্তু যদি (তার) খোদার দরবারে বিনয়াবনত উপস্থিতিতে ত্রুটি থাকে, তাহলে সে কামেল নয় বরং সে খোদার নৈকট্য (লাভ করা) হতে বহুদূরে বা বঞ্চিত।

نیست آں کامل نہ مردے زندہ جان   گر خرد مندی ز مردانش مخواں

সে কামেলও নয় আর আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত পুরুষও নয়; যদি বুদ্ধিমান হয়ে থাক, তাহলে তাকে পুরুষদের অন্তর্ভুক্ত মনে করবে না।

کامل آں باشد کہ بافرزند و زن   باعیال و جملہ مشغولئ تن

কামেল সে ব্যক্তি হয়ে থাকে যে স্ত্রী বাচ্চা থাকা সত্ত্বেও, পরিবারপরিজনে এবং সকল দৈহিক কার্যক্রমে মগ্নতা সত্ত্বেও,

باتجارت باہمہ بیع و شرا   یک زماں غافل نگردد از خدا

সকল প্রকার ব্যবসাবাণিজ্য এবং সকল ক্রয়-বিক্রয়ে লেগে থেকেও, কখনও খোদা সম্পর্কে উদাসীন হয় না।

ایں نشانِ قوّتِ مردانہ است   کاملاں را بس ہمیں پیمانہ است

এটি হলো পুরুষালী শক্তির পরিচয়, কামেলদের মানদণ্ড এটিই।

سوختہ جانے ز عشقِ دلبرے   کے فراموشش کند با دیگرے

যার প্রাণ বন্ধুর প্রেমে দগ্ধ, কীভাবে তাকে ভুলে সে অন্যদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারে?

او نظر دارد بغیر و دل بہ یار   دست درکار و خیال اندر نگار

সে বাহ্যত অন্যদের প্রতি তাকায় কিন্তু তার হৃদয় থাকে বন্ধুতে নিবদ্ধ, তার হাত কাজে রত থাকলেও হৃদয় প্রেমাস্পদের মাঝে পড়ে থাকে।

دل طپاں در فرقتِ محبوب خویش سینہ از ہجران یاری ریش ریش

স্বীয় প্রেমাস্পদের বিরহে তার হৃদয় ছটফট করে, বন্ধুর বিরহে বক্ষ ক্ষতবিক্ষত থাকে।

اوفتادہ دور از روئے کسے دل دواں ہر لحظہ در کوئے کسے

সে প্রেমাস্পদের দৃষ্টি হতে দূরে পড়ে রয়েছে, কিন্তু হৃদয় সদা প্রেমাস্পদের গলিতে ছুটে চলেছে।

خم شدہ از غم چو ابروئے کسے ہر زماں پیچاں چو گیسوئے کسے

দুঃখের আতিশয্যে কারো ভ্রুর ন্যায় তার দেহ বাঁকা হয়ে গেছে, কারো পাক খাওয়া চুলের ন্যায় সদা আঁকাবাঁকা অবস্থায় বিরাজ করছে বা ছটফট করছে।

دلبرش در شد بجان و مغز وپوست راحت جانش بیاد رُوئے اوست

তার প্রেমাস্পদ তার প্রাণ, মগজ ও ছিলকায় অর্থাৎ তার তনুমনে ঘর করে নিয়েছে, তার হৃদয়ের প্রশান্তি তার চেহারা স্মরণ করার মাঝে নিহিত।

جاں شد اوکے جان فراموشش شود ہر زماں آید ہم آغوشش شود

সে তার প্রাণ হয়ে গেছে আর প্রাণকে কীভাবে ভুলানো সম্ভব? সে সবসময় আসে আর তার সাথে কোলাকুলি করে।

دیدہ چوں بر دلبرِ مست اوفتد ہرچہ غیرِ اوست از دست اوفتد

দৃষ্টি যখন নেশায় মত্ত বন্ধুর উপর পড়ে, তখন বন্ধু ছাড়া বাকী সবকিছু হাত থেকে পড়ে যায়।

غیر گو در بر بود دور است دور یارِ دور افتادہ ہر دم در حضور

অন্যরা পাশে থাকলেও দূরে আর বন্ধু দূরে থাকলেও সদা পাশেই থাকে।

کاروبار عاشقاں کارِ جداست برتر از فکر و قیاسات شماست

প্রেমিকদের ব্যাপারই আলাদা, তোমার চিন্তা-ভাবনার ও ধারণার জগত হতে উর্ধ্বে।

قوم عیارست دل در دلبری چشمِ ظاہر بین بدیوار و دری

এই জাতি বড়ই বুদ্ধিমান, তাদের হৃদয় থাকে বন্ধুর মাঝে আর বাহ্যিকতার পূজারিদের চোখ থাকে ঘরবাড়ির প্রতি।

جاں خروشاں از پئے مہ پیکرے   بر زباں صد قصہا از دیگرے

তাদের প্রাণ এক সর্বসুন্দরের জন্য ছটফট করে কিন্তু মুখে থাকে অন্যদের শত শত কাহিনী।

فانیاں را مانعے از یار نیست   بچہ او زن برسر شان بارِ نیست

আত্মবিলীন লোকদের জন্য কোন জিনিসই বন্ধুর পথে বাদ সাধতে পারে না, স্ত্রী-সন্তান তাদের মাথার বোঝা নয়।

باد و صد زنجیر ہر دم پیش یار   خار با او گل گلِ اندر ہجر خار

শত শত বন্ধনকে উপেক্ষা করে তারা সদা প্রেমাস্পদের সামনেই উপস্থিত থাকে; তাঁর সান্নিধ্যে কাঁটা তাদের ফুল মনে হয় আর তার বিরহে ফুল কাঁটা মনে হয়।

تو بیک خارے براری صد فغان   عاشقاں خنداں بپائے جاں فشاں

তুমি একটি কাঁটা ফুটলে শতবার চিৎকার করো, আর প্রেমিকরা জীবন উৎসর্গ করেও হাসতে থাকে।

عاشقاں در عظمتِ مولیٰ فنا   غرقتہ دریائے توحید از وفا

প্রেমিকরা প্রভুর মাহাত্ম্যে বিলীন, বিশ্বস্ততার কারণে একত্ববাদের সমুদ্রে নিমজ্জিত।

کین و مہر شان ہمہ بہر خداست   قہر شان گرہست آں قہر خداست

তাদের শত্রুতা ও বন্ধুত্ব সব খোদার জন্য, তাদের ক্রোধ যদি থেকে থাকে তা খোদারই ক্রোধ।

آن کہ در عشقِ احد محو وفناست   ہرچہ زو آید ز ذات کبریاست

যে এক খোদার প্রেমে বিলীন ও নিবেদিত, তার পক্ষ থেকে যা-ই প্রকাশ পায় তা মহামহিমান্বিত খোদার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

فانی است و تیر اُو تیر حق است   صید او دراصل نخچیر حق است

সে খোদার সত্তায় বিলীন আর তার তির খোদার তির, তার শিকার সত্যিকার অর্থে খোদার শিকার।

آنچہ می باشد خدا را از صفات   خود دمد در فانیاں آں پاک ذات

খোদার যে বৈশিষ্ট্যাবলী রয়েছে, সেই পবিত্র সত্তা সেসব বৈশিষ্ট্য নিবেদিতদের মাঝে নিজেই ফুৎকার করেন।

خوئے حق گردد در ایشان آشکار   از جمال و از جلال کردگار

খোদার গুণাবলী তাদের মাঝে প্রকাশ পায়, তা খোদার জামালী বৈশিষ্ট্যই হোক বা জালালী হোক।

لطفِ شان لطفِ خدا ہم قہر شاں   قہر حق گردد نہ ہمچو دیگراں

তাদের ভালোবাসা খোদার ভালোবাসা আর তাদের ক্রোধ খোদার ক্রোধ হয়ে যায়, তাদের বিষয় অন্যদের (বিষয়ের) মত হয় না।

فانیاں ہستند از خود دور تر   چوں ملائک کارکن از دادگر

এসব নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি আত্মম্ভরিতা থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে থাকে, তারা ফিরিশতার ন্যায় ন্যায়পরায়ণ খোদার কর্মীবাহিনী।

گر فرشتہ قبض جانے میکند   یا کرم بر ناتوانے میکند

যদি ফিরিশতা কারো রূহ কবজ করে বা কোন দুর্বলের প্রতি মেহেরবানী করে।

ایں ہمہ سختی و نرمی از خداست   او زِ خواہشہائے نفسِ خود جداست

এ সব কঠোরতা ও কোমলতা খোদার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, ফিরিশতা প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত।

ہم چنیں میدان مقامِ انبیاء   واصلان و فاصلاں از ماسواء

নবীদের মোকাম ও মর্যাদাও এমনই বলে নিশ্চিত হও, তারা নিজেরা খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত আর অন্যদের জন্য খোদাপ্রাপ্তির মাধ্যম, অধিকন্তু খোদা ছাড়া অন্যদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী।

فانی اند و آلۂ ربّانی اند   نور حق در جامۂ انسانی اند

তারা খোদার সত্তায় বিলীন আর তারা খোদার অস্ত্র, মানুষের বেশে খোদার জ্যোতি।

سخت پنہاں در قبابِ حضرت اند   گم زِ خود در رنگ و آبِ حضرت اند

তারা খোদার গম্বুজে সম্পূর্ণভাবে প্রচ্ছন্ন, আমিত্ব হতে মুক্ত, খোদা তা'লার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীতে বিলীন।

اختران آسمانِ زیب و فر رفتہ از چشمِ خلائق دور تر

সৌন্দর্য ও প্রতাপরূপী আকাশের তারা, আর মানুষের চোখ থেকে দূরে চলে গেছেন।

کس ز قدر نور شاں آگاہ نیست زانکہ ادنیٰ را با علیٰ راہ نیست

কেউ তাদের জ্যোতির মূল্য সম্পর্কে অবহিত নয়, কেননা তুচ্ছরা উচ্চ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

کور کورانہ زند رائے دنی چشمِ کورش بے خبر زاں روشنی

অন্ধ অন্ধত্বের কারণে তুচ্ছ মতামতই ব্যক্ত করে থাকে, কেননা তার অন্ধ চোখ সেই আলো সম্পর্কে অনবহিত।

ہم چنیں تو اے عدوِّ مصطفیٰ مے نمائی کوریٔ خود را بما

অনুরূপভাবে তুমিও হে মুস্তফার শত্রু! আমাদের সামনে নিজের অন্ধত্বকে প্রকাশ করছ।

بر قمر عوعو کُنی از سگ رگے نور مہ کمتر نہ گردد زیں سگے

যেমনটি কুকুরের অভ্যাস হয়ে থাকে (সে) চাঁদকে লক্ষ্য করে ঘেউ ঘেউ করে, কিন্তু সেই কুকুরসুলভ অভ্যাসের কারণে চাঁদের আলো হ্রাস পেতে পারে না।

مصطفیٰ آئینۂ روئے خداست منعکس دروے ہماں خوئے خداست

মুস্তফা খোদার চেহারা (দর্শনের) আয়না, তাঁর মাঝে খোদার সকল গুণাবলী প্রতিফলিত রয়েছে।

گر ندیدستی خدا او را بہ بیں من رأنی قد رأی الحق ایں یقین

যদি খোদাকে না দেখে থাক তাহলে তাঁকে দেখ! যে আমাকে দেখল সে যেন খোদাকে দেখল– এটি সত্য হাদীস।

آنکہ آویزد بمستانِ خدا خصم او گردد جنابِ کبریا

যে ব্যক্তি খোদার প্রেমিকদের সাথে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়, মহামহিমান্বিত খোদা স্বয়ং তার শত্রু হয়ে যান।

دست حق تائید ایں مستان کند   چوں کسی بادست حق دستاں کند

খোদার হাত এসব প্রেমিকদের সাহায্য করে থাকে, যখন কেউ এসব (প্রেমিকের সাথে) প্রতারণা করে। (মুসাওয়ের)

منزلِ شاں برتر از صد آسماں   بس نہاں اندر نہاں اندر نہاں

তাদের মর্যাদা শত শত আকাশ হতেও উচ্চতর তারা মহাপর্দার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন।

پا فشردہ در وفائے دلبرے   وازسرش برخاک افتادہ سرے

তারা বন্ধুর বিশ্বস্ততায় অবিচল আর তাদের মাথা তাঁর ভালোবাসায় ভূলুণ্ঠিত রয়েছে।

جانِ خود را سوختہ بہر نگار   زندہ گشتہ بعد مرگ صد ہزار

বন্ধুর জন্য তারা নিজেদের প্রাণকে জ্বালিয়ে ছাই করেছে, লক্ষ মৃত্যুকে বরণের পর জীবিত হয়ে উঠেছে।

صاحب چشم اندر آنجا بے تمیز   چشمِ کوراں خود نباشد ہیچ چیز

যেখানে চক্ষুষ্মানরাই পার্থক্য করতে পারে না,
সেখানে অন্ধরা তো কিছুই নয়।

روئے شان آں آفتابے کاندراں   چشم مرداں خیرہ ہم چوں شپراں

তাদের চেহারা সেই সূর্য, যার আলোতে খোদার সুপুরষদের চোখও রাতের পাখির ন্যায় বিস্ফারিত হয়ে যায়।

تو خودی زن رائے تو ہمچوں زناں   ناقص ابن ناقص ابن ناقصاں

তোমার মতামতও মেয়েদের ন্যায় তুমি নিজেও মেয়েলোকের মত; তুমি নিজে ব্যাধিগ্রস্ত, তোমার পিতা ব্যাধিগ্রস্ত আর তোমার চৌদ্দগোষ্ঠী রুগ্ন।

خوب گر نزدِ تُو زِشت است و تباہ   پس چہ خوانم نام تو اے روسیاہ

যদি সুন্দর ব্যক্তি তোমার দৃষ্টিতে কুৎসিত ও মন্দ অবস্থায় থাকে, তাহলে হে কালো চেহারার মানুষ! তোমাকে কী নামে ডাকবো?

کوریت صد پردہ ہا بر تو فگند   وایں تعصبہائے تو بیخت بکند

তোমার অন্ধত্ব তোমার ওপর শত পর্দা লেপন করে রেখেছে, আর তোমার বিদ্বেষ তোমার মূলকে উৎপাটন করেছে।

اے بسا محبوبِ آں ربِّ جلیل　　پشت از کوری حقیر است و ذلیل

সেই প্রতাপান্বিত খোদার অনেক প্রেমাস্পদ রয়েছে, তোমার অন্ধত্বের কারণে যারা তোমার দৃষ্টিতে ইতর ও তুচ্ছ।

اے بسا کس خوردہ صد جامِ فنا　　پیش ایں چشمت پُر از حرص و ہوا

এমন অনেক মানুষ আছে যারা আত্মবিলীনতার শত শত পেয়ালা সুরা পান করেছেন, তারা তোমার এই চোখের কাছে কামনা-বাসনাপূজারি ও লোভী!

گر نماندے از وجودِ تو نشاں　　نیک بودے زیں حیاتِ چوں سگاں

যদি তোমার অস্তিত্বের নামচিহ্ন মিটে যেতো তাহলে এই কুকুরসুলভ জীবনযাপন করা হতে ভাল হতো।

زاغ گر زادی بجایت مادرت　　نیک بود از فطرت بد گوہرت

তোমার মা যদি তোমার স্থানে কাকের জন্ম দিত, তাহলে তোমার পাপাচারী ফিতরত হতে তা ভাল ছিল।

زانکہ کذب و فسق و کفرت در سراست　　وایں نجاست خواریت زاں بدتراست

যেহেতু তোমার মাথায় মিথা, অবাধ্যতা ও কুফর ছেয়ে আছে কিন্তু তোমার আবর্জনা ভক্ষণ এর চেয়ে বেশি ঘৃণ্য।

تو ہلاکی اے شقی سرمدی　　زانکہ از جانِ جہاں سرکش شدی

হে চিরদুর্ভাগা! তুমি ধ্বংসপ্রাপ্ত, কেননা তুমি বিশ্বের জীবনের সেই উৎস এর প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছ।

اے در انکار و شکے از شاہِ دیں　　خادمان و چاکرانش را بہ بیں

হে সে ব্যক্তি যে ধর্মের বাদশাহ্‌র অস্বীকারকারী ও (তাতে) সন্দেহ পোষণকারী! তুমি তাঁর সেবক ও চাকর-বাকরদের দেখ।

کس ندیدہ از بزرگانت نشاں　　نیست در دستِ تُو بیش از داستاں

তোমার প্রবীণদের কোন নিদর্শন কেউ দেখে নি, তোমার হাতে কাহিনীর চেয়ে বেশি কিছু নেই।

لیک گر خواہی بیابنگر زِما صد نشانِ صدق شانِ مصطفیٰ

কিন্তু যদি তুমি চাও তাহলে আস আর মুস্তফার মহান মর্যাদা যে সত্য এর শত নিদর্শন আমাদের পক্ষ থেকে দেখ।

ہاں بیا اے دیدہ بستہ از حسد تا شعاعش پردۂ تو بر درد

হে সে ব্যক্তি যে হিংসার কারণে চোখ বন্ধ করে নিয়েছে, আস! যেন তোমার (চোখের) পর্দাকে তাঁর জ্যোতি ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

صادقاں را نور حق تابد مدام کاذباں مردند و شد تُر کی تمام

সত্যবাদীদের জন্য সত্যের জ্যোতি সদা ঝলমল করে, মিথ্যাবাদীরা ধ্বংস হয়েছে আর (তাদের) অহঙ্কার চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে।

مصطفیٰ مہرِ درخشانِ خداست بر عدوش لعنتِ ارض و سماست

মুস্তফা খোদা তা'লার সমুজ্জ্বল সূর্য, তাঁর শত্রুদের ওপর স্বর্গ-মর্ত্য সবার অভিশাপ।

ایں نشان لعنت آمد کایں خساں ماندہ اندر ظلمتی چوں شپراں

অভিশাপের প্রমাণ হলো এসব ইতররা বাদুড়ের ন্যায় অন্ধকারে পড়ে আছে।

نے دلِ صافی نہ عقلے راہ بیں راندۂ درگاہِ رب العالمیں

তাদের হৃদয়ও পরিস্কার নয় আর তাদের বিবেকের চোখ পথও দেখে না, আর বিশ্বপ্রতিপালকের দরগাহ হতে বিতাড়িত।

جاں کنی صد کن بکینِ مصطفیٰ رہ نہ بینی جز بدینِ مصطفیٰ

মুস্তফার শত্রুতায় শত শতবারও যদি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাও, তবু মুস্তফার ধর্ম ছাড়া তুমি কোন রাস্তা খুঁজে পাবে না।

تانہ نورِ احمد آید چارہ گر کس نمی گیرد ز تاریکی بدر

যতক্ষণ আহমদের জ্যোতি কারো মুক্তির জন্য না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ অন্ধকার থেকে বের হতে পারবে না।

از طفیلِ اوست نور ہر نبی نام ہر مرسل بنام او جلی

সকল নবীর জ্যোতি তারই কল্যাণে লাভ হয়েছে, সকল প্রেরিত রসূলের নাম তাঁর নামের কল্যাণে আলোকিত হয়েছে।

آں کتابے ہمچو خور دادش خدا کز رخش روشن شد ایں ظلمت سرا

খোদা তাঁকে সূর্যের মত সেই কিতাব দিয়েছেন, এর জ্যোতির্মণ্ডিত চেহারার কল্যাণে এই অন্ধকার জগৎ জগমগ করে উঠেছে।

ہست فرقاں طیب و طاہر شجر از نشانہا میدہد ہردم ثمر

কুরআন একটি পূত ও পবিত্র বৃক্ষ যা সকল যুগে নিদর্শনরূপী ফল দিয়ে থাকে।

صد نشانِ راستی دروَے پدید نے چو دینِ تو بنایش برشنید

সত্যের শতশত নিদর্শন তাতে বিদ্যমান, তোমার ধর্মের মত এর ভিত্তি শোনা কথার ওপর নয়।

پُر ز اعجاز است آں عالی کلام نور یزدانی درُو رخشد تمام

সেই মহান বাণী নিদর্শনে পরিপূর্ণ, তাতে ঐশী জ্যোতি পুরো ঔজ্জ্বল্যের সাথে ঝলমল করছে।

از خدائی ہا نمودہ کار را بر دریدہ پردۂ کفار را

তা ঐশী শক্তির ভিত্তিতে কাজ করেছে, আর কাফেরদের পর্দা উন্মোচন করেছে।

آفتاب است و کند چوں آفتاب گرنہ کوری بیابنگر شتاب

তা সূর্য আর অন্যদেরকেও সূর্যের মত বানিয়ে দেয়, যদি তুমি অন্ধ না হও তাহলে তাড়াতাড়ি আস আর দেখ।

اے مزوّر گر بیائی سوئے ما واز وفا رخت افگنی در کوئے ما

হে মিথ্যাবাদী! যদি তুমি আমাদের কাছে আস আর বিশ্বস্ততার সাথে আমাদের গলিতে বসতি গাড়।

و از سر صدق و ثبات و غم خوری روزگارے در حضور ما بری

আর যদি নিষ্ঠা, দৃঢ়চিত্ততা, অবিচলতা ও ব্যথিত হৃদয়ে আমাদের কাছে কিছুকাল অবস্থান করো।

عالمے بینی زِ ربّانی نشاں سوئے رحماں خلق و عالم راکشاں

তাহলে ঐশী নিদর্শনাবলীর এক জগৎ তুমি দেখতে পাবে, যা সৃষ্টি ও বিশ্বকে রহমানের প্রতি আকর্ষণ করে।

گر خلافِ واقعہ گفتم سخن راضیم گر تو سرم بڑّی زِ تن

যদি আমি একথা অবাস্তব বলে থাকি, তাহলে তুমি আমার মাথা দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করলেও আমি সন্তুষ্ট।

راضیم گر خلق بردارم کشند از سرِ کیں با صد آزارم کشند

মানুষ যদি আমাকে ক্রুশবিদ্ধ করে আর শত্রুতাবশতঃ আমাকে শতশত দুঃখ দিয়ে হত্যাও করে তাতেও আমি সন্তুষ্ট।

راضیم گر باشدم ایں کیفرے خوں رواں برخاک افتادہ سرے

আমাকে যদি এ শাস্তিও দেয়া হয় আমি সন্তুষ্ট যে, আমার মাথা এমন অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকবে যখন তা থেকে রক্ত ঝরে।

راضیم گر مال و جان و تن رود و آنچہ از قسمِ بلا برمن رود

আমার প্রাণ, সম্পদ ও দেহ যদি নিঃশেষ হয়ে যায় এবং অন্যান্য বিপদাপদ আমার প্রতি অবতীর্ণ হয় তাহলেও আমি সন্তুষ্ট।

گردرُو غم رفتہ باشد بر زباں راضیم بر ہر سزائے کاذباں

আমার মুখ থেকে যদি মিথ্যা বেরিয়ে থাকে, তাহলে আমি মিথ্যাবাদীর জন্য নির্ধারিত সকল শাস্তি গ্রহণে প্রস্তুত।

لیک گر توزیں سخن پیچی سرے بر تو ہم نفرین ربِّ اکبرے

কিন্তু তুমিও যদি একথা গ্রহণে অস্বীকার করো, তাহলে তোমার প্রতিও যেন খোদার অভিশাপ বর্ষিত হয়।

زیں سخنہا ہر کہ روگرداں بود آں نہ مردے رہزن مرداں بود

যে-ই এসকল কথার প্রতি বিমুখ, সে পুরুষ নয় বরং মানুষকে লুণ্ঠনকারী।

اے خدا بیخِ خبیثانے برار کز جفا باحق نمیدارند کار

হে খোদা! নোংরাদের মূল কেটে দাও বা ধ্বংস কর, যারা অন্যায়ভাবে সত্যকে পরিত্যাগ করে।

دل نمیدارند و چشم و گوش ہم باز سر پیچاں ازاں بدرِ اتم

তাদের হৃদয়ও নেই আর চোখ এবং কানও নেই, তা সত্ত্বেও সেই পূর্ণ চাঁদের প্রতি বিদ্রোহী।

دین شان بر قصہ ہا دارد مدار   گفتگوہا بر زباں دل بے قرار

তাদের ধর্মের শুধু কাহিনীর ওপরই ভিত্তি, মুখে কথা থাকলেও হৃদয় অশান্ত।

فرق بسیار است در دید و شنید   خاک بر فرقِ کسے کیں را ندید

দেখা ও শোনার মাঝে অনেক পার্থক্য আছে, তার জন্য পরিতাপ যে একথা বুঝে নি!

دید را کُن جستجو اے ناتمام   ورنہ درکار خودی بس سردو خام

হে অসম্পূর্ণ মানুষ! তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধান করো নতুবা নিজের কাজে ব্যর্থ ও বিফল হবে।

بر سماعت چوں ہمہ باشد بنا   آں نیفزاید جوئے صدق و صفا

যেখানে শুধু শোনা কথার ওপর সবকিছুর ভিত্তি, সেখানে তা ভুট্টা (বা সামান্য) পরিমাণ নিষ্ঠা ও পবিত্রতা বৃদ্ধি করে না।

صد ہزاراں قصہ از روئے شنید   نیست یکساں باجوئے کاں ہست دید

লক্ষ লক্ষ শোনা কাহিনী একটি চোখে দেখা ভুট্টার সমান হতে পারে না।

دیں ہمان باشد کہ نورش باقی است   و از شراب دید ہر دم ساقی است

ধর্ম সেটি যার জ্যোতি স্থায়ী হয়, আর সর্বদা তত্ত্বজ্ঞানের সুধা পরিবেশন করতে থাকে।

دل مدہ الّا بخوبی کز جمال   و انماید بر تو آیاتِ کمال

সেই সুদর্শন ছাড়া অন্য কাউকে মন দিবে না, যে নিজের সৌন্দর্যের কারণে তোমাকে পরম মার্গের নিদর্শন প্রদর্শন করে।

کوریٔ خود ترک کن ماہے بہ بیں   اے گدا برخیز واں شاہے بہ بیں

নিজের অন্ধত্ব ছেড়ে দাও আর চন্দ্রকে দেখ, হে ফকির! উঠ আর সেই বাদশাহ্‌র প্রতি তাকাও;

رو بہ بین و قد بہ بین و خد بہ بیں   واز محاسنہائے خوباں صد بہ بیں

চেহারা দেখ, উচ্চতা দেখ, আর গঠন-গড়ন দেখ আর (তার মাঝে বিরাজমান) সৌন্দর্যশালীদের শতশত গুণাবলী ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করো।

یکدم از خود دور شو بہرِ خدا تا مگر نوشی تو کاساتِ لقا

খোদার জন্য সম্পূর্ণভাবে নিজের আমিত্বের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো, যেন তুমি খোদার সাক্ষাতের সুধা পান করতে পার।

دین حق شہر خدائے امجد است داخلِ او در امانِ ایزد است

সত্য ধর্ম মহাসম্মানিত খোদার শহর, যে এতে প্রবেশ করেছে সে খোদার নিরাপত্তায় এসে গেছে।

در دمے نیک و خوش اسلوبی کند ہم چو خود زیبا و محبوبی کند

তিনি নিমিষে নেক ও পাক স্বভাবসম্পন্ন বানিয়ে দেন, নিজের মত সুন্দর ও প্রেমাস্পদ বানিয়ে দেন।

جانبِ اہلِ سعادت پے بزن تا شوی روزے سعید اے جانِ من

পুণ্যবানদের পানে অগ্রসর হও যেন একদিন হে আমার স্নেহভাজন! তুমিও নেক হতে পার।

اے بصد انکاروکیں از کودنی رو درِ حق زن چرا سر می زنی

হে নির্বুদ্ধিতাবশতঃ ভয়াবহ অস্বীকারকারী, শত্রুতা পোষণকারী, যাও সত্যের দ্বারের কড়া নাড়, কেন মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ?

نالہا کُن کے خداوندِ یگاں بگسلاں از پائے من بند گراں

ফরিয়াদ করো যে, হে অদ্বিতীয় খোদা! আমার পায়ের ভারী শিকল খুলে দাও।

تا مگر زاں نالہائے درد ناک دست غیبی گیردت ناگہ زِ خاک

এই করুণ আর্তনাদের কল্যাণে একটি অদৃশ্য হাত হয়ত তোমাকে মাটি থেকে উত্থিত করবে।

بے عنایاتِ خدا کار است خام پُختہ داند ایں سخن را والسلام

খোদার করুণা ছাড়া কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়, বুদ্ধিমানই একথা ভালভাবে বুঝে, ওয়াস্‌সালাম।

পাদটীকা নম্বর চার (৪)

এই অধম এ পর্যন্ত লেখা শেষ করলে ‘যা গোলাম নবী’ নিবাসী শিহাবুদ্দীন (একত্ববাদী) নামের এক ব্যক্তি এসে বলে যে, মৌলভী গোলাম আলী সাহেব, মৌলভী আহমদুল্লাহ সাহেব অমৃতসরী ও মৌলভী আবদুল আজীজ সাহেব এবং অন্য কিছু মৌলভী এমন ওহীর কথা অস্বীকার করার ক্ষেত্রে চরম নাছোড় মনোবৃত্তি প্রদর্শন করছে, যা রসূলদের ওহীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বরং তাদের কিছু মৌলভী এই বিষয়কে উন্মাদদের ধারণা হিসেবে অভিহিত করেছে। এক্ষেত্রে তাদের যুক্তি হলো, এই এলহাম যদি সত্য ও সঠিক হয়ে থাকে তাহলে মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণ তা লাভের সবচেয়ে বেশি যোগ্যতা ও অধিকার রাখতেন, অথচ তারা তা লাভ করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই।

এখন এই অধম বান্দা নিবেদন করছে যে, মৌলভী সাহেবদের পক্ষ থেকে শিহাবুদ্দীন একত্ববাদী যে আপত্তি তুলেছে সত্যিই যদি তা তাদের মুখ থেকে নিঃসৃত হয়ে থাকে তাহলে এর উত্তরে সকল সত্যান্বেষীর এবং উল্লিখিত লোকদের স্মরণ রাখা উচিত, কোনোকিছুর জ্ঞান না থাকার অর্থ এই নয় যে, সেই বস্তুর অস্তিত্বই নেই। সাহাবা কেরাম (রা.)-এর এ ধরনের এলহাম লাভ করা মোটেই অসম্ভব ছিল না কিন্তু সময়ের উপযোগিতার নিরিখে সাধারণ্যে বা সর্বজনীনভাবে সেসব প্রচার করেন নি। যুগের নিরিখে সকল নতুন যুগে খোদা তা’লার দাবি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং নবুয়্যতের বা নবীর যুগে ঐশী প্রজ্ঞার দাবি ছিল নবী ছাড়া অন্যদের এলহাম, নবীর ওহীর মত লিপিবদ্ধ না করা যেন নবী নয় এমন ব্যক্তির কথার নবীর কথার সংমিশ্রণ না ঘটে। কিন্তু সে যুগের অবসানে যত ওলী ও আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ব্যক্তিরা অতিবাহিত হয়েছেন তাদের সকলের এলহাম সুপ্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত আর তা সকল যুগে লিপিবদ্ধও হয়ে আসছে। এর সত্যায়নের জন্য শেখ আবদুল কাদের জিলানী ও মুজাদ্দিদ আলফে সানির মকতুবাত ও অন্যান্য ওলীউল্লাহদের রচনাবলী দেখা উচিত যে, কত অজস্র ধারায় তাদের এলহাম

নোট: পাদটীকা নম্বর চার (৪), টীকা নম্বর এগারো (১১)-এর ২৫৬ পৃষ্ঠার সাথে সম্পর্ক রাখে। –অনুবাদক

বিদ্যমান। বরং ইমাম রব্বানী সাহেব স্বীয় মকতুবাতের দ্বিতীয় খণ্ডের ৫১তম পত্রে পরিষ্কার ভাবে লিখেন, যারা নবী ছিলেন না তারাও মহা সম্মানিত খোদার সাথে বাক্যালাপের সম্মানে ভূষিত হন। এমন ব্যক্তি মুহাদ্দিস নাম পান আর তার মর্যাদা নবীর মর্যাদার কাছাকাছি হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে শেখ আবদুল কাদের জিলানী সাহেব 'ফুতুহুল গায়েব'-এর বেশ কয়েক স্থানে এর বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যদি ওলীউল্লাহদের বক্তৃতা ও রচনাবলীর অনুসন্ধান করা হয় তাহলে তাদের নিজেদের ভাষায় এমন কথা অনেক খুঁজে পাওয়া যাবে। উম্মতে মুহাম্মদিয়ায় মুহাদ্দাসের পদ বিদ্যমান থাকা এত ব্যাপকভাবে প্রমাণিত যে, তা অস্বীকার করা বড় উদাসীন ও অজ্ঞ লোকদের কাজ বৈ-কী। এ উম্মতে আজ পর্যন্ত সহস্র-সহস্র ওলীউল্লাহ ও কৃতী সন্তান অতিবাহিত হয়েছেন যাদের অলৌকিক ঘটনাবলী ও নিদর্শন বনী ইসরাঈলের নবীদের মত প্রমাণিত ও সাব্যস্ত। অনুসন্ধানী জানতে পারবে যে, এক-অদ্বিতীয় খোদা যেভাবে এই উম্মতের নাম শ্রেষ্ঠ উম্মত রেখেছেন ঠিক সেভাবে এই উম্মতের জ্যেষ্ঠদের সবচেয়ে বেশি শ্রেষ্ঠত্বেও ভূষিত করেছেন যা কোনোভাবে গোপন থাকতে পারে না আর তা অস্বীকার করা ঘৃণ্যভাবে সত্যকে গোপন করার নামান্তর। এছাড়া, সাহাবীদের পক্ষ থেকে এমন এলহামের প্রমাণ পাওয়া যায় নি মর্মে যে আপত্তি করা হয় সে সম্পর্কে আমরা বলব যে, তা সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত ও অযথা, কেননা সহীহ হাদীস অনুসারে সম্মানিত সাহাবীদের এলহাম ও অলৌকিক নিদর্শনের ভুরিভুরি প্রমাণ রয়েছে।

সিরিয়ায় মুসলমান সেনাদলের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে খোদাপ্রদত্ত সংবাদ অনুসারে হযরত উমর (রা.)-এর অবগত হওয়া যা বায়হাকী ইবনে উমরের পক্ষ হতে বর্ণনা করেছেন, তা যদি এলহাম না হয়ে থাকে তাহলে তা কী ছিল? আর মদিনায় বৈঠকস্থলে বসা অবস্থায় তার মুখ থেকে يا سارية الجبل ধ্বনি নিঃসৃত হওয়া এবং সেই আওয়াজ অদৃশ্য শক্তির বলে বহুদূর থেকে সারিয়া ও তাঁর সৈন্যবাহিনীর কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হওয়া যদি অলৌকিক বিষয় না হয়ে থাকে তাহলে তা কী ছিল? অনুরূপভাবে জনাব আলী মুর্তজা কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুর কোন কোন এলহাম ও দিব্যদর্শন সুপ্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। আমি আরো জিজ্ঞেস করি যে, কুরআন শরীফে এসম্পর্কে খোদা তা'লার সাক্ষ্য দেয়া কি যথেষ্ট নয়? তিনি কি সাহাবীদের পক্ষে বলেন নি–

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

পুনরায় যেভাবে খোদা তা'লা স্বীয় সম্মানিত নবীর সাহাবীদেরকে সকল শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে অতীতের সকল উম্মতের চেয়ে উত্তম ও মহান আখ্যায়িত করেন আর সেখানে অপরদিকে উদাহরণস্বরূপ, পূর্ববর্তী উম্মতগুলোর শ্রেষ্ঠ লোকদের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন যে, হযরত ঈসার মা মরিয়ম সিদ্দীকা, অনুরূপভাবে হযরত মূসার মা, হযরত ঈসার শিষ্য ও হযরত খিযর প্রমুখ, যাদের কেউ নবী ছিলেন না, তারা যেখানে খোদার পক্ষ থেকে এলহামপ্রাপ্ত মানুষ ছিলেন আর ওহীয়ে এলাম* বা অবগতিমূলক ওহীর মাধ্যমে অদৃশ্য রহস্যাবলী সম্পর্কে তাদের অবহিত করা হতো সেখানে ভাবা উচিত এর ফলাফল কী বের হয়? এর মাধ্যমে কি এটি প্রমাণিত হয় না যে, উম্মতে মুহাম্মদিয়ার একনিষ্ঠ অনুসারীদের সেসকল লোকদের চেয়ে বড় মানের এলহামপ্রাপ্ত ও মুহাদ্দাস হওয়া উচিত?– কেননা তারা কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা অনুসারে শ্রেষ্ঠ উম্মত। কুরআন শরীফ সম্পর্কে আপনারা কেন প্রণিধান করেন না আর কেন চিন্তা করতে গিয়ে ভুল করেন? বুখারী ও মুসলিম থেকে প্রমাণিত যে, এই উম্মতের স্বপক্ষে মহানবী (সা.) শুভসংবাদ দিয়েছেন যে, এই উম্মতেও পূর্ববর্তী উম্মতগুলোর ন্যায় মুহাদ্দাস জন্মগ্রহণ করবেন– আপনারা কী এটি অবহিত নন? আর মুহাদ্দাসের দাল হরফে জবর যুক্ত করে লিখলে হয় মুহাদ্দাস। এ শ্রেণি তারা হয়ে থাকেন, খোদার সাথে যাদের বাক্যালাপ ও কথোপকথন হয়ে থাকে আর আপনি জানেন ইবনে 'আব্বাস'-এর কিরাআতে এসেছে।

و ما ارسلنا من قبلك من رسول و لا نبى ولا محدث الا اذا تمنّٰى القى الشيطٰن
فى امنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطٰن ثم يحكم الله اٰيته

আয়াত অনুসারে যা বুখারীও লিখেছেন, মুহাদ্দাসের প্রতি এলহাম হওয়া নিশ্চিত ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত, যাতে শয়তানের কোন ভূমিকা থাকতে পারে না। আর এটি জানাকথা যে, যদি খিযির ও মূসার মায়ের এলহাম নিশ্চিত ও অকাট্য না হয়ে কেবল সন্দেহের স্তুপই হয়ে থাকে তাহলে কোন নিষ্পাপের জীবনকে হুমকিগ্রস্ত করা বা ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া কী করে তাদের জন্য বৈধ হয়ে গেল বা অন্য এমন কাজ করা কীভাবে বৈধ হতে পারে, যা শরীয়ত ও যুক্তির নিরিখে অবৈধ? নিশ্চিত জ্ঞানই ছিল যার কারণে সে কাজ করা তাদের জন্য আবশ্যক হয়ে পড়ে আর সেসকল বিষয় তাদের জন্য বৈধ হয়ে যায় যা

* নোট: ওহীয়ে এলাম এমন ওহী যা নবীত্ব বিহীন ব্যক্তিরা লাভ করেন। –অনুবাদক

অন্যদের জন্য আদৌ সঙ্গত নয়। এছাড়া ন্যায়ের দৃষ্টিতে দেখা উচিত যে, এমন কোন বিষয় যা পরীক্ষিত ও সুবিদিত, যার সত্যতা প্রমাণিত এবং সত্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সঠিক হওয়া সুপ্রতিষ্ঠিত তা কেবল কাল্পনিক চিন্তাধারার কারণে দোদুল্যমান হতে পারে না وَالظَّنُّ لَا يُغْنِيْ عَنِ الْحَقِّ شَيْئًا । সুতরাং এই অধমের এলহামে এমন কোন বিষয় নেই যা পর্দাবৃত ও গুপ্ত বরং তা এমনই বিষয় যা শতশত পরীক্ষার আবর্তে প্রবেশ করে সফলভাবে বেরিয়ে এসেছে আর মহাসম্মানিত খোদা বড় বড় বিবাদে আমাকে স্পষ্ট বিজয় দান করেছেন। এ পর্যায়ে মনে পড়লো, তৃতীয় খণ্ডে এক হিন্দুর মামলা সম্পর্কে যেসকল সত্য-স্বপ্ন লেখা হয়েছে তাতেও এক বিস্ময়কর বিতণ্ডা ও অস্বীকারের মুখে এলহাম হয়েছিল, যার সুবাদে ভয়াবহ ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা দূরীভূত হয়েছে।

এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, এই সত্য স্বপ্নে যা এক ধরনের স্পষ্ট দিব্যদর্শন ছিল, একথা জানানো হয়েছে যে, বিসম্বর দাস নামের এক ক্ষত্রিয় হিন্দু, যিনি আজও কাদিয়ানে জীবিত আছেন, ফৌজদারী মামলা হতে অব্যহতি পাবেন না তবে তার অর্ধেক শাস্তি মওকুফ হয়ে যাবে। খোশ হালা নামের তার অপর এক সাথি, যে এখনও জীবিত আছে আর কাদিয়ানেই আছে, পুরো কারাশাস্তি ভোগ করবে। দিব্যদর্শনের এই অংশ সম্পর্কে যে পরীক্ষা দেখা দেয় তা হলো এই অধমের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে চীফ কোর্ট হতে উল্লিখিত মামলা নিম্ন আদালতে প্রেরিত হয়। মামলার সাথে সম্পৃক্তরা তখন এটিকে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া মনে করে এই গুজব ছড়িয়ে দেয় যে, উভয় অপরাধী নির্দোষ খালাস পেয়েছে। আমার মনে আছে, রাতের বেলা এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে আর এই অধম মসজিদে এশার নামায পড়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। নামাযীদের একজন বলে যে, বাজারে এই সংবাদ ছড়াচ্ছে যে, অভিযুক্তরা গ্রামে এসে গেছে। কিন্তু এ অধম যেহেতু মানুষকে প্রকাশ্যে জানিয়ে দিয়েছিল যে, অভিযুক্তদের উভয়ই আদৌ নির্দোষ খালাস পাবে না, একারণে তখন যে দুঃখ, ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করার ছিল তা করেছে। খোদা, যিনি এই অধমের সর্বাবস্থায় নিরাপত্তা বিধায়ক, নামাযের প্রারম্ভে বা একান্ত নামাযের মধ্যবর্তী পর্যায়ে এলহামের মাধ্যমে এই শুভসংবাদ দেন, لا تخف انك انت الاعلى (অর্থাৎ ভয় পেয়ো না, তুমিই জয়যুক্ত হবে) আর সকালে প্রকাশ পেয়ে যায় যে, নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার সংবাদ সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন। অবশেষে তাই ঘটে যা এই অধমকে জানানো হয়েছে আর যা শরমপত নামের একজন আর্যসহ আরো

কিছু লোকের কাছে ঘটনা ঘটার পূর্বেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে এমনই অপর একটি ভীতিকর ঘটনাও ঘটেছে যার বৃত্তান্ত এর চেয়েও বিস্ময়কর। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, কোন প্রজার বিরুদ্ধে এই অধমের পিতা-মরহুমের পক্ষ থেকে স্বীয় ভূমিস্বত্ব সংক্রান্ত এক মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এ অধমের সামনে স্বপ্নে এটি প্রকাশ করা হয় যে, এই মামলায় ডিক্রি হয়ে যাবে। তদনুসারে এই অধম সেই স্বপ্ন কাদিয়ানে বসবাসরত এক আর্যকে জানিয়ে দিয়েছে, এরপর দৈবক্রমে যা হয় তা হলো, শেষ দিন শুধু বিবাদী তার কয়েকজন সাথীসহ আদালতে উপস্থিত হয় আর এদিক থেকে কোন মুখতার (উকীল) বা অন্য কেউ উপস্থিত হয় নি। সন্ধ্যাবেলা বিবাদী ও সকল সাক্ষী এসে বলে, মামলাটি খারিজ হয়ে গেছে। এই সংবাদ শুনতেই সেই আর্য আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ও হাসি-বিদ্রূপ করে। যতটা উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা তখন বিরাজ করে তা বর্ণনা করার মত নয়।

কিন্তু একথা ভাবাই যেতো না যে, একটি বিশাল জনগোষ্ঠির কথা অবাস্তব সাব্যস্ত হবে যাদের মাঝে এমন মানুষও ছিল কোন পক্ষের সাথে যাদের সম্পর্ক নেই। এই ভয়াবহ দুঃখ ও বেদনার ঘোরে গভীর প্রতাপের সাথে এলহাম হয়, যা লৌহ কিলকের ন্যায় হৃদয়ে গেঁথে যায়– আর তা হলো, ডিক্রি হয়ে গেছে, মুসলমান! অর্থাৎ তোমার কি বিশ্বাস হয় না? আর মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সন্দেহ কর! অবশেষে অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, সত্যিকার অর্থে ডিক্রিই হয়ে গিয়েছিল, দ্বিতীয় পক্ষ রায় শুনতে ভুল করেছে। অতএব সত্যিকার অর্থে এটি অত্যুক্তি নয় যে, শতশত এলহাম রয়েছে যা প্রভাতের উজ্জ্বল কিরণের ন্যায় পরিষ্কারভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে। বহু রহস্যাবৃত এলহাম আছে, যা এই অধম বর্ণনা করতে অপারগ। একান্ত বিরোধীদের উপস্থিতিতে বারবার এত স্পষ্ট এলহাম হয়েছে, যা পূর্ণ হওয়ার পর বিরোধীদের স্বীকার করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। কয়েকদিন পূর্বের কথা একবার কোন বিষয়ে তিনভাবে দুঃখ-বেদনার মুখোমুখী হতে হয় যার সুরাহার কোন উপায় চোখে পড়ছিল না। ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া ও সমস্যায় পড়া ছাড়া অন্য কোন গত্যন্তর ছিল না। সেদিনই এ অধম রীতি অনুসারে জঙ্গলে ভ্রমণে যায়, সাথে মালাওয়ামাল নামের এক আর্য ছিল। ফিরে আসার পর গ্রামের প্রবেশ দ্বারের সন্নিকটে ننجيك من الغمّ- এলহাম হয়, পুনরায় ننجيك من الغمّ ألم تعلم ان الله على كل شيء قدير- এলহাম হয় অর্থাৎ আমরা তোমাকে

সেই দুঃখ হতে মুক্তি দিব, অবশ্যই মুক্তি দিব। তুমি কি জান না, খোদা তা'লা সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। যেস্থানে এই এলহাম হয়েছে সেখানেই এই আর্যকে এলহাম সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল। এরপর খোদা সেই তিন প্রকার দুঃখ দূর করে দিয়েছেন فالحمد لله علىٰ ذٰلك । দৈব বিস্ময়কর বিষয়াদির একটি হলো– যখন শিহাবুদ্দীন একত্ববাদী, মৌলভী সাহেবদের দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করে, সে রাতে ইংরেজীতে একটি এলহাম হয়েছে যা শিহাবুদ্দিনকে শুনানো হয়েছে আর তাহলো– Though all man should be angry but God is with you. He shall help you. Words of God can not exchange. অর্থাৎ সকলেও যদি অসন্তুষ্ট হয়ে যায় খোদা তোমার সাথে আছেন, তিনি তোমায় সাহায্য করবেন, খোদার কথা পরিবর্তন হতে পারে না। এছাড়া আরো কিছু এলহাম হয়েছে যা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে–

الخير كله فى القراٰن كتاب الله الرحمٰن۔ اِليه يصعد الكلم الطيب۔

অর্থাৎ সকল কল্যাণ কুরআনেই নিহিত রয়েছে যা আল্লাহ্ তা'লার গ্রন্থ। তিনিই আল্লাহ্, যিনি রহমান, রহমানের দিকেই সেই পবিত্র বাণী আরোহণ করে–

هو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا و ينشر رحمته۔

আল্লাহ্ সেই সম্মানিত সত্তা যিনি নৈরাশ্যের পর পানি বর্ষণ করেন আর স্বীয় রহমত সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত করেন অর্থাৎ একান্ত প্রয়োজনের সময় ধর্মের সংস্কারের প্রতি মনোযোগী হন يجتبى اليه من يشآء من عباده۔ বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চান মনোনীত করেন–

وكذٰلك مننا على يوسف لنصرف عنه السوٓء والفحشاء ولتنذر قوما ما انذر اٰباءهم فهم غافلون۔

আর এভাবে আমরা ইউসুফের প্রতি অনুগ্রহ করেছি যেন পাপ ও অশ্লীলতা তাঁর কাছেও ঘেঁষতে না পারে আর সেসকল লোকদের যেন তুমি সতর্ক করতে পার যাদের পিতা-পিতামহকে কেউ সতর্ক করে নি, যে কারণে তারা ঔদাসীন্যের ঘোরে নিপতিত। এখানে 'ইউসুফ' বলতে এ অধমকে বোঝানো হয়েছে যা আধ্যাত্মিক কোন সামঞ্জস্যের কারণে প্রযোজ্য। আল্লাহ্ই তা ভাল জানেন। এরপর বলেন,

قل عندي شهادة من الله فهل انتم مؤمنون ان معي ربي سيهدين۔ رب اغفر وارحم من السمآء ربنا عاج۔ رب السجن احب اليَّ مما يدعونني اِليه۔ رب نجني من غمي۔ ايلي ايلي لما سبقتني۔ کرمہائے تو مارا کرد گستاخ۔

অর্থাৎ তোমার অনুগ্রহ আমাদের ধৃষ্ট করে তুলেছে, তুমি বল, আমার কাছে খোদার সাক্ষ্য রয়েছে, সুতরাং তোমরা ঈমান আনবে কি? অর্থাৎ খোদার সমর্থন ও অদৃশ্য রহস্যাবলী সম্পর্কে অবহিত করা, অপ্রকাশিত বা গুপ্ত বিষয়াদি ঘটার পূর্বেই অবহিত করা, দোয়া গ্রহণ করা, বিভিন্ন ভাষায় এলহাম করা ও ঐশী তত্ত্ব-তথ্য ও রহস্যাবলী সম্পর্কে অবহিত করা– এসব খোদার সাক্ষ্য বৈ-কী, যা গ্রহণ করা ঈমানদারের জন্য আবশ্যক। উল্লিখিত বাকী এলহামগুলোর অনুবাদ হলো, অবশ্যই আমার খোদা আমার সাথে আছেন; তিনি আমাকে পথ সম্পর্কে অবহিত করেন। হে আমার খোদা! আমার পাপ ক্ষমা কর এবং আকাশ থেকে করুণা বর্ষণ কর। আমাদের প্রভু 'আজ' (এখন পর্যন্ত এর অর্থ জানা যায় নি।) এরা যে সকল ইতর কথাবার্তার প্রতি আমাকে ডাকে তা হতে কারাগারই শ্রেয়–হে আমার প্রভু। হে আমার খোদা! আমাকে আমার দুঃখ হতে পরিত্রাণ দাও। হে আমার খোদা! হে আমার খোদা! তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করেছ?

তোমার ক্ষমা আমাদের ধৃষ্ট করে তুলেছে। এ হলো সব রহস্য, যা নিজ নিজ সময়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যার জ্ঞান কেবল অদৃশ্য-জ্ঞাত সম্মানিত খোদা-ই রাখেন। এরপর বলেন, هو شعنا نعسا۔ এই দুটো হয়তো ইব্রানি শব্দ যার অর্থ এখন পর্যন্ত এ অধমের কাছে স্পষ্ট হয় নি। এরপর দুটো ইংরেজি বাক্য রয়েছে যা দ্রুত এলহাম অবতীর্ণ হওয়ার কারণে ভাষাগত দিক থেকে সঠিক কিনা বলতে পারি না, আর তা হলো– I love you. I shall give you a large party of Islam. যেহেতু এখন অর্থাৎ আজকে কোন ইংরেজী জানা মানুষ নেই আর অর্থ পুরোপুরি বুঝা যায় নি তাই অর্থ ছাড়াই লেখা হয়েছে। এরপর এলহাম হয়–

يا عيسٰى انى متوفيك و رافعك اليَّ (و مطهرك من الذين كفروا)[2]۔ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيٰمة۔ ثلة من الاولين و ثلة من الاٰخرين۔

হে ঈসা! আমি তোমাকে পূর্ণ প্রতিদান দিবো অথবা মৃত্যু দিবো বা নিজের

দিকে উঠাবো অর্থাৎ পদমর্যাদা উন্নীত করবো বা পৃথিবী হতে নিজের দিকে উঠাবো। তোমার অনুসারীদেরকে তোমার অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে কিয়ামত পর্যন্ত জয়যুক্ত রাখব অর্থাৎ তোমার সমবিশ্বাসী ও তোমার ধর্মের অনুসারীদেরকে যুক্তি-প্রমাণের ক্ষেত্রে ও কল্যাণের নিরিখে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যদের ঊর্ধ্বে স্থান দিবো। পূর্ববর্তীদের মধ্য হতেও একটি শ্রেণি রয়েছে আর পরবর্তীদের মধ্য হতেও একটি জামা'ত রয়েছে। এখানে ঈসা বলতে এই অধমকে বুঝানো হয়েছে। এরপর উর্দুতে এলহাম করেছেন, আমি ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করবো আর স্বীয় শক্তিমত্তা প্রকাশের মাধ্যমে তোমাকে উত্থিত করবো। পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছে পৃথিবী তাকে গ্রহণ করে নি কিন্তু খোদা তাকে গ্রহণ করবেন আর অতি জোরালো সব আক্রমণের মাধ্যমে তাঁর সত্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিবেন।

الفتنة هٰهنا فاصبر كما صبر اولو العزم۔

এখানে একটি নৈরাজ্য বিরাজ করছে সুতরাং দৃঢ় প্রত্যয়ী নবীদের মত ধৈর্য ধারণ করো–

فلما تجلّٰى ربه للجبل جعله دكا۔

খোদা যখন সমস্যার পাহাড়ে আত্মপ্রকাশ করবেন সেগুলোকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিবেন।

قوة الرحمٰن لعبيد الله الصمد۔

এটি খোদার শক্তি, যা স্বীয় বান্দার জন্য সেই পরবিমুখতার মূর্ত প্রতীক আল্লাহ্ প্রকাশ করবেন–

مقام لا تترقى العبد فيه بسعى الاعمال۔

অর্থাৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ খোদার বান্দা হওয়া একটি পদমর্যাদা যা বিশেষ দান হিসেবে প্রদত্ত হয়, চেষ্টা করে হস্তগত হতে পারে না–

يا داؤد عامل بالناس رفقا واحسانا واذاحييتم بتحية فحيوا باحسن منها۔ واما بنعمة ربك فحدث۔

হে দাউদ! আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সাথে নমনীয় ও সদয় ব্যবহার করো আর সালামের প্রত্যুত্তর উত্তমভাবে প্রদান করো। তোমার প্রভুর নিয়ামতরাজির কথা মানুষের কাছে প্রকাশ করো।

You must do what I told you. তোমার তা করা উচিত যা আমি বলেছি।

اشکر نعمتی رأیت خدیجتی انك الیوم لذو حظ عظیم۔ انت محدث اللّٰہ فیك مادة فاروقیة۔

আমার নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। কেননা সময় আসার পূর্বেই তুমি তা লাভ করেছ। তুমি আজ মহা সৌভাগ্যবান। তুমি খোদার মুহাদ্দাস, তোমার মাঝে ফারুকী বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

سلام علیك یا ابراهیم۔ انك الیوم لدینا مکین امین۔ ذو عقل متین۔ حب اللّٰہ خلیل اللّٰہ اسد اللّٰہ و صل علی محمد۔ ما ودعك ربك و ما قلی۔ ألم نشرح لك صدرك۔ ألم نجعل لك سهولة فی کل امر بیت الفکر و بیت الذکر۔ و من دخله کان اٰمنا۔

হে ইব্রাহীম! তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। তুমি আজ আমাদের দৃষ্টিতে মর্যাদাবান, বিশ্বস্ত, সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন এবং খোদার বন্ধু অর্থাৎ খলীলুল্লাহ, আসাদুল্লাহ অর্থাৎ খোদার সিংহ। মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ কর। অর্থাৎ এটি সেই সম্মানিত নবীর অনুসরণেরই কল্যাণ। আর বাকী অংশের অনুবাদ হলো, খোদা তোমায় পরিত্যাগ করেন নি আর তিনি তোমার প্রতি অসন্তুষ্টও নন। আমরা কি তোমার বক্ষ প্রশস্ত করি নি? আমরা কি সকল বিষয়ে তোমার জন্য স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করি নি? অর্থাৎ তোমাকে বাইতুল ফিকর ও বাইতুয যিকর দান করেছি।

যে ব্যক্তি বাইতুয যিকরে (অর্থাৎ মসজিদ মোবারকে) নিষ্ঠার সাথে এবং ইবাদতের উদ্দেশ্যে সঠিক মনোবৃত্তি ও ঈমানের সৌন্দর্য নিয়ে প্রবেশ করবে সে অশুভ পরিণাম হতে নিরাপত্তা লাভ করবে। এখানে বাইতুল ফিকর [(যে কক্ষে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পুস্তক ইত্যাদি রচনা করতেন)] বলতে সেই কক্ষ বুঝায় যাতে এই অধম কিতাব লেখার কাজে রত ছিল আর রত থাকে আর বাইতুয যিকর বলতে সেই মসজিদ বুঝায় যা এ কক্ষের পাশে নির্মাণ করা হয়েছে। উল্লিখিত শেষ বাক্য এই মসজিদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার জন্য বলা হয়েছে, যার অক্ষর হতে মসজিদের ভিত্তির তারিখও বের হয় আর তা হলো–

مبارِك و مبارَك و کل امر مبارَك یجعل فیه

অর্থাৎ এই মসজিদ কল্যাণসাধনকারী ও কল্যাণমণ্ডিত আর সকল কল্যাণময় বিষয় এতেই করা হবে। এরপর এ অধম সম্পর্কে বলেন–

رفعت و جعلت مبارکا۔

তোমাকে (মর্যাদায়) উন্নীত করা হয়েছে এবং আশিসমণ্ডিত করা হয়েছে।

والذین اٰمنوا و لم یلبسوا ایمانھم بظلم اولئک لھم الامن وھم مھتدون۔

অর্থাৎ খোদা তা'লা তোমাকে যা দান করেছেন, সেসকল কল্যাণরাজি ও আলোর ওপর যারা ঈমান আনবে আর তাদের ঈমান যদি বিশুদ্ধ বিশ্বস্ততা থেকে উদ্ভূত হয় তাহলে ভ্রষ্টতার পথ হতে তারা নিরাপদ থাকবে আর তারাই খোদার দৃষ্টিতে হেদায়েতপ্রাপ্ত।

یریدون ان یَطْفِئُوْا نور اللّٰہ۔ قل اللّٰہ حافظہ۔ عنایۃ اللّٰہ حافظک۔ نحن نزّلناہ و انا لہ لحافظون۔ اللّٰہ خیر حافظا وھو ارحم الراحمین۔ ویخوفونک من دونہ۔ ائمۃ الکفر۔ لا تخف انک انت الاعلٰی ینصرک اللّٰہ فی مواطن۔ ان یومی لفصل عظیم۔ کتب اللّٰہ لاغلبن انا ورسلی لا مبدل لکلماتہ بصآئر للناس۔ نصرتک من لدنی۔ انی منجیک من الغم۔ وکان ربک قدیرا۔ انت معی و انا معک۔ خلقت لک لیلا و نھارا۔ اعمل ما شئت فانی قد غفرت لک۔ انت منی بمنزلۃ لا یعلمھا الخلق۔

বিরোধীরা খোদার নূরকে নির্বাপিত করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হবে, তুমি বল! খোদা এই নূরের স্বয়ং তত্ত্বাবধায়ক। ঐশীকৃপা তোমার তত্ত্বাবধায়ক। আমরা এটি অবতীর্ণ করেছি আর আমরাই এর তত্ত্বাবধান করবো। খোদা সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণকারী আর সবচেয়ে দয়ালু। তারা তোমাকে বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে ভয় দেখাবে। এরাই কুফরের বা অবিশ্বাসের নেতা ও হোতা। ভয় করো না, বিজয় তোমারই অদৃষ্ট অর্থাৎ যুক্তি প্রমাণ ও গ্রহণযোগ্যতা এবং কল্যাণের দৃষ্টিকোণ হতে তুমিই জয়যুক্ত। খোদা বহু ময়দানে তোমায় সাহায্য করবেন অর্থাৎ বিতর্ক ও মুনাযিরায় তোমারই বিজয় লাভ হবে। পুনরায় বলেন, আমার দিন, সত্য ও মিথ্যার মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য করবে। খোদা লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন যে, বিজয় আমার ও আমার রসূলদেরই। খোদার কথা কেউ টলাতে পারবে না। খোদার এই ব্যবহার বা রীতি ধর্মের সত্যতার জন্য প্রমাণস্বরূপ। আমি আমার পক্ষ থেকে তোমাকে সাহায্য করবো আর আমি স্বয়ং তোমার দুঃখ দূর করবো। এছাড়া তোমার খোদা সর্বশক্তিমান। তুমি আমার সাথে আছ আর আমি তোমার সাথে আছি। তোমার জন্য দিবারাত্র সৃষ্টি করেছি। তুমি যাচ্ছেতাই করলেও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। তুমি আমার দৃষ্টিতে এমন এক মর্যাদা রাখ যা সম্পর্কে সৃষ্টি অনবহিত। এই শেষ বাক্যের অর্থ এটি

নয় যে শরিয়তের নিষিদ্ধ বিষয়াদি করা বৈধ বরং এর অর্থ হলো নিষিদ্ধ বিষয়াদী তোমার দৃষ্টিতে ঘৃণ্য হিসেবে প্রতিভাত করা হয়েছে আর নেক কর্মের প্রতি ভালোবাসা তোমার প্রকৃতির অংশ করে দেয়া হয়েছে। এককথায় খোদার যা ইচ্ছা, তাকেই বান্দার ইচ্ছা বা বান্দার কাছে পছন্দনীয় করে তোলা হয়েছে। অধিকন্তু ঈমানের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল বিষয়াদি তার দৃষ্টিতে প্রকৃতিগতভাবে পছন্দনীয় করে তোলা হয়েছে و ذٰلك فضل الله يؤتيه من يشآء।

و قالوا ان هو (الا)[1] افك افترى۔ و ما سمعنا بهذا فى اٰبائنا الاولين ولقد كرمنا بنى ادم وفضلنا بعضهم على بعض۔ اجتبيناهم و اصطفيناهم كذٰلك ليكون اٰية للمؤمنين۔ ام حسبتم ان اصحاب الكهف و الرقيم كانوا من اٰياتنا عجبا۔ قل هو الله عجيب۔ كل يوم هو فى شان۔ ففهمناها سليمان و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا۔ سنلقى فى قلوبهم الرعب۔ قل جآءكم نور من الله فلا تكفروا ان كنتم مؤمنين۔ سلام على ابراهيم صافيناه و نجيناه من الغم تفردنا بذٰلك۔ فاتخذوا من مقام ابراهيم مصلّى۔

তারা বলবে, প্রতারণার ভিত্তিতে সে এই দাবি করেছে, আমরা আমাদের জ্যেষ্ঠ বা পূর্ববর্তী ওলীদের মাঝে এমনটি শুনি নি। অথচ আদম সন্তানদের সমানভাবে সৃষ্টি করা হয় নি। খোদা তা'লা কতককে কতকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন আর তাদেরকে অন্যদের মধ্য হতে মনোনীত করেছেন। এটিই সত্য কথা যেন তা মু'মিনদের জন্য নিদর্শন হয়। তুমি কি মনে কর যে, আমাদের বিস্ময়কর কার্যাবলী কেবল গুহাবাসী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ? না, খোদা সদা বিস্ময়াদির মালিক আর তাঁর বিস্ময়াবলী প্রকাশের ধারা কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না। তিনি প্রতিদিন একটি নতুন মহিমায় থাকেন। সুতরাং আমরা সোলায়মানকে সেই নিদর্শন বুঝিয়েছি অর্থাৎ এই অধমকে অন্যরা নিছক অন্যায়ভাবে অস্বীকার করেছে অথচ তাদের হৃদয় বিশ্বাস করে বসেছে সুতরাং আমরা অচিরেই তাদের হৃদয়ে ত্রাস সঞ্চার করব। তুমি বল! খোদার পক্ষ থেকে আলো অবতীর্ণ হয়েছে, সুতরাং তোমরা যদি মু'মিন হয়ে থাক তাহলে অস্বীকার করো না। ইব্রাহীমের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমরা তাকে মনোনীত করেছি আর দুঃখ যন্ত্রণা হতে মুক্তি দিয়েছি। আমরাই একাজ করেছি। সুতরাং ইব্রাহীমের পদাঙ্ক অনুসরণ করো অর্থাৎ মহানবীর সত্য-পথ, যা আজকের যুগে বেশিরভাগ মানুষের সামনে সন্দেহযুক্ত আর কতিপয় লোক ইহুদীদের ন্যায় কেবল বাহ্যিকতার পূজারি, অপরদিকে কতিপয় মুশরিকের

ন্যায় সৃষ্টি পূজার পর্যায়ে অধঃপতিত হয়েছে। তাদের উচিত, খোদা তা'লার পথ সম্পর্কে এই অধম বান্দার কাছে জিজ্ঞেস করা আর এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

ترسم آں قوم کہ بر دُرد کشاں مے خندند   در سرِ کار خرابات کنند ایماں را

আমার ভয় হয়, যারা তত্ত্বজ্ঞানের সুধা পানকারীদের তিরস্কার করে, তারা একদিন মন্দকর্মের বেদিতে ঈমানকে জলাঞ্জলি দেবে।

ربّ اغفر و ارحم

... হে আমার প্রভু! তুমি ক্ষমা করো ও করুণা প্রদর্শন করো।

دوستاں عیب کنندم کہ چرا دل بتو دادم   باید اول بتو گفتن کہ چنیں خوب چرائی

বন্ধু আমাকে দোষারোপ করে যে কেন, আমি তোমাকে ভালোবাসলাম বা তোমাতে মন দিলাম। অথচ প্রথমে তাদের উচিত তোমাকে জিজ্ঞেস করা যে, কেন তুমি এত সুন্দর?

والفضل من الله و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم

অর্থাৎ কৃপা খোদার পক্ষ থেকে বর্ষিত হয়, মহা মহিমান্বিত খোদা প্রদত্ত শক্তি ও সামর্থ্য ছাড়া আর কোন শক্তি ও সামর্থ্য নেই।

আমরা এবং আমাদের গ্রন্থ

প্রথমদিকে যখন এ গ্রন্থ লেখা হয়েছে তখন এর রূপ ভিন্ন ছিল। এরপর ঐশী কুদরতের আকস্মিক বিকাশ এই অধম বান্দাকে মূসার ন্যায় এমন এক জগৎ সম্পর্কে সংবাদ দেয়, যা সম্পর্কে পূর্বে অবহিত ছিলাম না। অর্থাৎ এই অধমও হযরত মূসার ন্যায় আপন চিন্তাভাবনার তিমির রাতে ভ্রমণ করছিল আর আকস্মিকভাবে অদৃশ্য হতে اِنِّیۡ اَنَا رَبُّكَ '(অর্থাৎ আমি তোমার প্রভু') ধ্বনি আসে আর এমন রহস্যাবলী উন্মোচিত হয় যা ছিল বুদ্ধি ও চিন্তাভাবনার নাগালের বাইরে। সুতরাং এখন এ গ্রন্থের মুতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপক, বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক অর্থে বিশ্ব-প্রতিপালক খোদা তা'লা। আর জানা নেই যে, কতটা ও কোনো কলেবর পর্যন্ত একে পৌঁছানোর ইচ্ছা আছে। আর সত্য কথা হলো, চতুর্থ খণ্ড (শেষ হওয়া) পর্যন্ত তিনি যতটা ইসলামের সত্যতার জ্যোতি প্রকাশ করেছেন সেটিও সত্য স্পষ্ট করার জন্য যথেষ্ট। তাঁর কৃপা ও বদান্যতায় আশা করা যায় যে, যতদিন সন্দেহের অমানিশা পুরোপুরি দূরীভূত না করবেন ততদিন নিজের অদৃশ্য সমর্থনের মাধ্যমে তিনি সাহায্যকারীর ভূমিকায় থাকবেন। যদিও এই অধমের নিজের আয়ুষ্কালের কোন বিশ্বাস নেই, কিন্তু এতে আমি যারপরনাই আনন্দিত যে, বিলুপ্তি ও মৃত্যুর ঊর্ধ্বে সেই চিরঞ্জীব জীবনদাতা, চিরস্থায়ী স্থিতিদাতা সত্তা কিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা ইসলাম ধর্মের সাহায্যে রত আর জনাব খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর প্রতি তাঁর এমন কৃপা রয়েছে, যা ইতিপূর্বে কোন নবীর প্রতি হয় নি।

এখানে সেসকল পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী ঈমানদার লোকদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আবশ্যক যারা আজ পর্যন্ত এ পুস্তক ছাপার কাজে সাহায্য করে আসছেন। খোদা তা'লা তাদের সকলের প্রতি করুণা পরবশ হোন। যেভাবে তারা, আন্তরিক ভালোবাসার সাথে তাঁর ধর্মের সমর্থনে প্রতিটি মুহূর্ত চেষ্টা সাধনায় কাটিয়েছেন খোদা তা'লা সেভাবে তাদের প্রতি কৃপা করুন। কোন কোন ভদ্রলোক এই পুস্তককে কেবল ক্রয়বিক্রয়ের বিষয় হিসেবে নিয়েছেন, কিন্তু কারো কারো বক্ষ খোদা উন্মোচন করেছেন এবং তাদের হৃদয়ে নিষ্ঠা ও ভালোবাসা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু পরে উল্লিখিত শ্রেণির মানুষ এখনো তারাই যাদের আর্থিক সঙ্গতি অতি সামান্যই। স্বীয় পবিত্র নবীদের ক্ষেত্রে খোদার রীতি এটিই চলে আসছে যে, প্রথমদিকে দুর্বল ও মিসকিনরাই

সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে। যদি মহাসম্মানিত খোদার ইচ্ছা থাকে তাহলে কোন সঙ্গতিশীল ব্যক্তির মনকে এ কাজের জন্য তিনি উন্মুক্ত করে দিবেন। وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ খোদা তা'লা সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

BARĀHĪN-E-AḤMADIYYA

Ḥaḍrat Mirza Ghulam Ahmad[as] of Qadian claimed to be the same Promised Messiah and Mahdi that the Holy Prophet Muhammad[sa] prophesied would come to rejuvenate Islam and restore its original lustre.

During his early life, Mirza Ghulam Ahmad[as] saw a dream in which he handed a book of his own authorship to the Holy Prophet[sa]. As soon as the book touched the Holy Prophet's blessed hand, it transformed into a beautiful, honey-filled fruit which was then used to revive a dead person lying nearby.

The Promised Messiah[as] was inspired with the following interpretation:

> Allah the Almighty then put it in my mind that the dead person in my dream was Islam and that Allah the Almighty would revive it at my hands through the spiritual power of the Holy Prophet, may peace and blessings of Allah be upon him.

It is this very book—*Barāhīn-e-Aḥmadiyya*—which is to be instrumental in revitalizing Islam in the latter days in accordance with the grand prophecy of the Holy Prophet[sa]. Its subject matter is of universal importance and, as such, it will prove to be a source of lasting value for all readers. The significance of *Barāhīn-e-Aḥmadiyya* cannot be overstated.

ISBN 978-984-991-068-8

9789849910688